বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য

গোলাম সাকলায়েন

বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য

—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ—

(মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত)

ডক্টর গোলাম সাকলায়েন এম. এ., পি-এইচ্. ডি.

বাংলা-বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনায় ঃ
বাংলা-বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।
(পূ. পাকিস্তান)

প্রথম সংস্করণ
ডিসেম্বর, ১৯৬৪

প্রচ্ছদ রূপায়ণে ঃ
এস. আর. চৌধুরী

মুদ্রণে ঃ
খোন্দকার জসিম উদ্দীন
হেমায়েত ইসলাম মেসিন প্রেস,
নূরুন্নাহার হাউজ
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

মূল্য দশ টাকা

বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য

Thesis approved by the University
of Dacca for the Degree of
Doctor of Philosophy.

ভূমিকা

গ্রাম-বাংলায় আমাদের শৈশবকাল কেটেছে 'শহীদে কারবালা', 'জঙ্গনামা' 'ছহিবড় জঙ্গনামা', 'হানিফার লড়াই' ইত্যাদি পুঁথি-সাহিত্যের সুরের মাদকতা ও ইন্দ্রজালের মধ্যে। মুহর্‌রম মাস প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে। গ্রামবাংলায় সেকালের মতো এত ব্যাপকভাবে না হলেও অন্ততঃ মুহর্‌রম মাসে এখনও তেমনি পুঁথি পড়া হয়। কিন্তু রুচির বদল হওয়ার জন্যে একদল শহরের মানুষ আমরা আর পুঁথি পড়তে পারি না। তা না পারলেও, শৈশবস্মৃতি ভোলা দায়। বয়স হলেও মানুষ যা ভুলতে পারে না, যা তার অবচেতন মনে কোনো না কোনো খানে একটু খানি স্থান ক'রে নেয় তা তার মানসক্ষেত্রে ঐতিহ্য নির্মাণ করে বৈকি? পুঁথিসাহিত্যের যুগ আমরা অতিক্রম করে এসেছি। এখন পুঁথিসাহিত্য আমাদের বাংলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাসের একটা ধারা বা পর্যায় মাত্র। তবু আমার মতো বাঙালী মুসলমানের অনেকের কাছেই পুঁথি-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

তাহলেও এযাবৎ পুঁথি-সাহিত্য সম্পর্কে কোনো গবেষণা হয়নি। পুঁথি-সাহিত্যের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি, তার বিষয়বস্তু ও রচনাকাল ইত্যাদি আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল কারবালায় ইমাম হুসেনের শাহাদৎ-কাহিনীই এর বেশীরভাগ স্থান জুড়ে রয়েছে। তাছাড়া, এ-সাহিত্যের কি নামকরণ করা যায়? পুঁথি সাহিত্য? দোভাষী সাহিত্য, না মিশ্রভাষা-রীতির সাহিত্য? এ নিয়ে মতদ্বৈধের অভাব নেই।

আমার স্নেহভাজন ছাত্র ডক্টর গোলাম সাক্‌লায়েন আমার কাছে গবেষণা করতে এলে এ-সাহিত্যের বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি, বিশেষ দেশকালে এর সৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় চিন্তা ক'রে এর মধ্যে থেকে 'বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য' নামক বিষয়টি তাঁকে তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ ক'রে দিই। গোলাম সাকলায়েনকে আমরা যে-দায়িত্ব দিয়েছিলাম অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তিনি তা পালন করেছেন।

মর্সীয়ার সংজ্ঞা ও উৎপত্তি বিচার ক'রে ইতিহাস থেকে মুহর্‌রমের ধর্মীয় পটভূমি এবং তথ্য বিশ্লেষণ ক'রে বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তিনি ধারাবাহিক ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গ অঞ্চলে আরবী, ফারসী ও হিন্দী উর্দু প্রভৃতি মিশ্ররীতি বা দোভাষী বাংলায় 'জঙ্গনামা' ও 'শহীদে কারবালা' জাতীয় কাব্য রচিত হবার বহু পূর্বে মুঘল আমলে শৈখ ফয়জুল্লাহ, দৌলত উজীর বাহরাম খান (ষোড়শ শতাব্দী), মুহম্মদ খান (আনুমানিক ১৫৮০-১৬৫০ খৃঃ) ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং হামিদ ও হায়াত মাহ্‌মূদ প্রমুখ কবি অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরবী-ফারসী শব্দ-বিবর্জিত সাধু বাংলায় ইমাম হুসৈনের শাহাদৎ বিষয়ক মর্সীয়া কাব্য রচনা করেছিলেন। দোভাষী বাংলায় মর্সীয়া কাব্য-রচনার প্রবর্তন করেছিলেন পশ্চিম বাংলায় ইংরেজ আমলের অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ফকীর গরীবুল্লাহ্‌।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ এমনকি বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মর্সীয়া সাহিত্যের ধারাটি যে-ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, প্রস্তুত-গ্রন্থে গোলাম সাকলায়েন তার সার্থক আলোচনা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাংলা গদ্যে মীর মোশার্‌রফ হোসেন এবং বিংশ শতাব্দীতে কায়কোবাদ, আবুল মা'আলী মুহম্মদ

হামিদ আলী, মতীয়ুর রহমান খান ও ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ কবি পাশ্চাত্য প্রভাবজাত অমিত্রাক্ষর ছন্দে মুহর্‌রম-বিষয়ক যে সব কাহিনী-কাব্য রচনা করেছেন, তিনি মর্সীয়া সাহিত্যের ধারায় তারও উল্লেখ করেছেন। জারীগানও বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্যের অঙ্গীভূত। এ-গ্রন্থে 'পল্লী সাহিত্যে মর্সীয়া' নামক সর্বশেষ অধ্যায়টিতে তারও উল্লেখ ও বিশ্লেষণ রয়েছে।

এটি বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্যের একটি সমালোচনা-মূলক সুশৃঙ্খল গবেষণা-গ্রন্থ। বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণ এ-গ্রন্থেই প্রথমবারের জন্য বাংলায় মর্সীয়া বিষয়ক যাবতীয় রচনার একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা পাবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের ছাত্রহিসেবে ডক্টর গোলাম সাকলায়েন এ-বিষয়ে পথিকৃৎ হয়ে রইলেন, সেটিই আমার আনন্দের কথা।

বাংলা-বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
২৬শে অক্টোবর, ১৯৬৪।

মুহম্মদ আবদুল হাই
অধ্যক্ষ।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
এম. এ., বি-এল্ (ক্যাল);
ডিপ্লো-ফোন, ডি-লিট (প্যারিস),
বিদ্যাবাচস্পতি।

ফোন: ৫৮৪৭
পেয়ারা ভবন
৭৭, বেগমবাজার রোড,
ঢাকা-১

পরিচিতি

ডক্টর গোলাম সাক্‌লায়েন 'বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য' লিখিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি শূন্যস্থান পরিপূর্ণ করিলেন। মর্সীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত এই সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন, এবং পল্লী সাহিত্যে মর্সীয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকখানি কেবল মর্সীয়া সাহিত্যের ইতিহাস নহে, ইহাতে তিনি পটভূমিকারূপে ভারতে ফারসী ও উর্দু মর্সীয়া সাহিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, শীয়া ধর্মমতের উৎপত্তি এবং ভারতে তথা বাংলা দেশে তাহার প্রসারের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়াছেন, এবং মুহর্রম উৎসবের ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি গ্রন্থের পরিশিষ্টে সচিত্র মুহর্রমের অনুষ্ঠানের বৃত্তান্ত দিয়াছেন, এবং ইংরেজ আমলের মর্সীয়া কাব্যে ব্যবহৃত আরবী, ফারসী, হিন্দী ও উর্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ, বার ইমামের তালিকা, গলাত সম্প্রদায়ভুক্ত শীয়াগণের বিভিন্ন উপদল এবং তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের বর্ণনা, এবং ইসলাম ধর্মীয় কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থপঞ্জী ও নামসূচী

সংযুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থপঞ্জীতে ১৪৮ খানি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বাংলা, ইংরেজি এবং আরবী, ফারসী ও উর্দু পুস্তকের উল্লেখ আছে। ইহার অতিরিক্ত বহু সাময়িক পত্র ও পত্রিকার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থপঞ্জী হইতে গ্রন্থকারের বহু বিস্তৃত অধ্যয়ন ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার আমার প্রাক্তন ছাত্র। ছাত্রাবস্থাতেই আমি তাঁহার জ্ঞানানুরাগের পরিচয় পাই। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর থিসিস ছিল। সকল পরীক্ষকই এক বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করেন। এই বহু মূল্যবান পুস্তক রচনার জন্য আমি গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করি এবং তাঁহার জীবনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
প্রধান সম্পাদক,
বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

তারিখ
২৪। ১০। ৬৪ ইং

গ্রন্থকারের নিবেদন

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে বাংলা সাহিত্যে গবেষণা করিবার জন্য আমি ঢাকার বাংলা একাডেমীর বৃত্তিলাভ করি। আমার গবেষণার বিষয় ছিল 'বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য' অর্থাৎ বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। গবেষণার জন্য আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করা হয়। আমি বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের তত্ত্বাবধানে গবেষণা শেষ করি। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণার জন্য আমাকে 'ডক্টর অব্ ফিলজফি' উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। এই গবেষণার পরীক্ষকত্রয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ এবং ডক্টর সুকুমার সেন ইহা পরীক্ষা ও অনুমোদন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

বাঙালী মুসলমানের নিকট কারবালার যুদ্ধ এবং হযরত রসুলের প্রিয়তম দৌহিত্র ইমাম হুসেনের স্মৃতি বিজড়িত কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁহাদের ধর্মীয়-জীবনের সহিত কারবালার কাহিনী ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা দেশের বহু কবি কাব্য-প্রণয়নের জন্য অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই জনপ্রিয় কাহিনীকেও গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের রচিত কারবালা বিষয়ক কাব্যগুলি সমভাবে অগণিত বাঙালী পাঠক-পাঠিকার চিত্তকে রসসিক্ত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, এই কাব্যগুলি পাঠ করিয়া তাহারা জীবন সংগঠনেও অনুপ্রেরণা কম

পায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই কাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

পাক-ভারতে মুঘল শাসনের গোড়া পত্তনের পূর্বেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে দাক্ষিণাত্যের বীজাপুর-গোলকুণ্ডা রাজ্যে মুহর্‌রম মাসে আড়ম্বরের সহিত মর্সীয়া পাঠ করা হইত। তখন হিন্দু-মুসলমান সকলেই মুহর্‌রম-মিছিলে যোগদান করিয়া কারবালার মাতম করিত। এই মাতম উপলক্ষে প্রথম প্রথম ঈরাণী কবি মুহতাশম্ কাশানীর (মৃ° ১৫৮৮) ফারসী 'হফ্‌তবন্দ' পড়া হইত। কিন্তু শীঘ্রই দাকিনীতে অর্থাৎ প্রাচীন উরদূ ভাষায় মর্সীয়া রচিত হইতে লাগিল। আহ্‌মদ নগরের কবি আশরফ্‌ সর্বপ্রথম এই ধরণের 'মর্সীয়া' রচনা করেন। (আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্‌। সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ঢাকা ১৩৬৪, পৃঃ ১৪) অতঃপর, উত্তর ভারত ও অন্যান্য স্থানে মর্সীয়া রচনার প্রচলন হয়। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কোন্ সময় হইতে 'মর্সীয়া' শব্দের ব্যবহার চালু হয় এবং তাহা সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন তাহার নিশ্চিত সন্ধান জানা যায় না; তবে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি মুহম্মদ খানের 'মোক্তাল হোসেন' (মকতূল হুসৈন) কাব্যে (প্রকাশিত ১৬৪৫ খ্রীঃ) এই 'মর্সীয়া' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সমসাময়িককালে বাংলা দেশের বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের শীয়াসুন্‌নী মুসলমানগণকে মুহর্‌রম অনুষ্ঠানের সময় বুকে করাঘাত করিয়া শোক প্রকাশ করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছেন :

'আশুয়ার চান্দে ছাতি পেটে সর্বজন।
অগ্নিমধ্যে ঝুঁকি কেহ করেত প্রণাম॥
শাস্ত্রেতে পরম পাপ দোষ পরিণাম।
কেতাব বচন কেহ না বুঝে কারণ।
পুঁথি্য দেখ জানি ছাতি পেটে সর্বজন।'

সুতরাং, জনসাধারণকে উপদেশ প্রদানের খাতিরে মুহম্মদ খান বলেন ঃ

'জারি মরচিয়া বহু পাপ না করিবে।
আসহাবগণে গালি কভু নাহি দিবে॥' (মকতুল হুসৈন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপি-বিভাগে এক অজ্ঞাতনামা কবি-রচিত 'মর্সীয়া' নামীয় একখানি খণ্ডিত পুঁথি আছে (পুঁথির নং ৫৩৭)। পুঁথিখানি আনুমানিক দুই শত বছরের প্রাচীন। অতঃপর, ইংরেজ আমলের কবি হামীদুল্লাহ্ খান ইমাম হুসৈনের শাহাদৎ কাহিনী অবলম্বনে যে 'গুলজার-ই-শাহাদৎ' কাব্য প্রণয়ন (রচনাকাল ১৮৬৩ খ্রীঃ) করিয়াছেন, তাহাতে 'মর্সীয়া বা মনঃশোক আলাপন' শীর্ষক একটি অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। একেবারে হালে কবি নজরুল ইসলাম 'মর্সীয়া' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং 'মর্সীয়া' শীর্ষক একটি সুন্দর কবিতাও রচনা করিয়াছেন। (মোহাম্মদী, জ্যেষ্ঠ, ১৩৪০, ৮ম সংখ্যা-৬ষ্ঠ বর্ষ, পৃঃ ৫১৩) এতদ্ব্যতীত, এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং কারবালা-যুদ্ধ-সম্বলিত পুঁথিগুলিকে 'মর্সীয়া সাহিত্য' নামকরণ করিয়াছেন যথাক্রমে কবি আবদুল কাদির (কাব্য মালঞ্চ, কলিকাতা ১৯৪৫, ভূমিকার পৃষ্ঠা ১৯) এবং ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ২৬৫)। প্রসঙ্গক্রমে, আমি একটা কথা বলিতে চাই। 'মর্সীয়া' শব্দের লৈখিক প্রয়োগ ছাড়াও এই শব্দটির মৌখিক ব্যবহার (একটু বিকৃতভাবে) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এই অঞ্চলের লোকেরা মুহর্রমের সময়ে বিশেষভাবে যে-গান গাহিয়া থাকে, তাহার নাম মর্চে (Morce)। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চল সমূহে মুহর্রমের সময় গীত এই শোক সঙ্গীতই 'জারী' নামে পরিচিত। বর্তমান গ্রন্থের

পঠ অধ্যায়ে (পৃঃ ৪৫৫) এ-সম্পর্কে যথারীতি আলোচিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমিও কারবালা যুদ্ধসম্পর্কিত বাংলা পুঁথি ও কাব্যগুলিকে সমগ্রভাবে 'বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য' নামকরণ করিয়াছি ; (হযরত আলী বা হযরত রসূলুল্লাহ্‌র যুদ্ধ বিষয়ক 'জঙ্গনামা' কাব্যগুলি বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নহে) এবং এই বিশিষ্ট ধারার কাব্যগুলির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করিতে গিয়া আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি যে, এ-গুলি রচনার পশ্চাৎপটে আরবী-ফারসী-উরদূ মর্সীয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পাক-ভারত ও বঙ্গে শীয়া দরবেশ ও শাসকদের ধর্মপ্রচার তৎপরতা ও মুহর্‌রমের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত না করিলে বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা কখনই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

কাজেই, বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় আলোচনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে এই সাহিত্যের 'পটভূমির' প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় বাংলা মর্সীয়া কাব্যগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে (মুঘল ও ইংরেজ আমল) বিভক্ত করিয়া বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে ; কারণ, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যধারার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে।

শীয়া (এবং কিছু সংখ্যক সুন্নীও বটে) মুসলমানেরা প্রতি বৎসর পাক-ভারতের নানাস্থানে মিছিল, তাজীয়া প্রভৃতি বাহির করিয়া অত্যন্ত জাকজমকের সহিত মুহর্‌রম উৎসব পালন করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের জনপ্রিয় জাতীয় অনুষ্ঠান। প্রচলিত অনুষ্ঠানের নানা তথ্য ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করিয়া আমি সেগুলি চিত্রাদিসহ গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবেশ করিয়াছি। চিত্রগুলি ঢাকার হুসৈনী দালানের মুহর্‌রম অনুষ্ঠানের সময় আমি গ্রহণ

করিয়াছি। কতকগুলি বিষয়ের চিত্র গ্রহণ করিতে না পারায় আমি সেগুলি অন্যের সাহায্যে অঙ্কন করিয়া দিয়াছি।

বহু শতাব্দী যাবৎ কারবালার ঘটনা জনসাধারণ ও লেখক পরম্পরায় অতিরঞ্জিত হওয়ায় ইহার মূল সত্য অনেকখানি চাপা পড়িয়াছে। কাজেই, 'মুহর্রমের ঐতিহাসিক তথ্য' আলোচনার ব্যাপারে আমি বিভিন্ন ভাষায় রচিত বহু খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও গবেষকের লিখিত ইতিহাস ও গ্রন্থাদি হইতে প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের মতামত উদ্ধৃত করিয়া আমার যুক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছি। এই গ্রন্থ রচনায় আমি কোথাও স্বীয় ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হই নাই; সর্বত্র সাধ্যমত ঐতিহাসিকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তথ্য ও তত্ত্বের অবতারণা করিয়া মুহর্রমের প্রকৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। শীয়া ও সুন্নী সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত-দের মতামতের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছি।

বর্তমান গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে আমাকে পদে পদে নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। তবু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরী, রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরী, রাজশাহী কলেজ লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ পাকিস্তান (ঢাকা), মওলানা আকরম খান ও কবি আবদুল কাদিরের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, পাবনা অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বহু পণ্ডিত ও সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার হইতে প্রচুর মালমসলা ও উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারার জন্য গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকর্তাদের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করিতেছি। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ও মৌলিক গবেষক মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য

বিশারদের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলি আমার কাজের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ফলতঃ, তাঁহার সংগৃহীত মুহম্মদ খান, ফকীর গরীবুল্লাহ্ প্রমুখ কবির রচিত কারবালা-যুদ্ধ বিষয়ক কাব্যগুলির একাধিক পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত থাকায় সেগুলি পড়িবার ও আলোচনা করিবার পক্ষে আমার বিশেষ সুবিধা হয়।

বর্তমান গ্রন্থ-রচনা করিবার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া এবং সুদীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর কাল উপদেশাদি দিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যক্ষ জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে ডক্টর আবূ মহামেদ হবিবুল্লাহ্ সাহেবের নিকট আমি আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি। তিনি অনুগ্রহ পূর্বক ইতিহাস-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলি পড়িয়া এবং প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু রদ্-বদল করিবার উপদেশ দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদদ্বয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব তাঁহাদের শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে নানাভাবে উপদেশ দিয়াছেন এবং কতকগুলি মূল্যবান পুস্তক সরবরাহ করিয়া আমাকে ঋণী করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে গবেষণার জন্য আমাকে তাঁহারাই প্রবর্তনা দেন, কাজেই তাঁহাদের কাছে আমার ঋণ অনেক।

কোন কোন বিষয়ে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় আমাকে খোঁজ-খবর দিয়া আমার শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর সেনের সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকিলেও গবেষণা-সংক্রান্ত ব্যাপারে যখনই আমি চিঠিপত্র মারফত তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়াছি, তখনই তাঁহারা আমার প্রশ্নের জবাব দিয়া পোষকতা করিয়াছেন। অন্যান্য ব্যাপারে

যাঁহারা আমাকে আনুকূল্য দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণ করি মরহুম ডক্টর গোলাম মকসুদ হিলালী, মরহুম মীর ওয়াহেদ আলী, ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার, অধ্যাপক আলা উদ্দীন আল্ আজহারী এবং অধ্যাপক আহমদ শরীফ সাহেবকে। অন্যান্যদের মধ্যে যাঁহাদের নাম এ-স্থলে উল্লেখ করা হয় নাই, তাঁহাদের সকলের কাছেও আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বাংলা একাডেমীর কর্তৃপক্ষকেও আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গ্রন্থ-প্রণয়নে বানান-পদ্ধতি সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন। গ্রন্থ-মধ্যে যে-সব স্থলে আরবী শব্দ আসিয়াছে, সে-সব স্থলে আমি আরবী বর্ণমালার ধ্বনি অনুসারে বাংলা শব্দ লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং সে উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অক্ষরান্তরীকরণ পদ্ধতি (transliteration) গ্রহণ করিয়াছি। সর্বত্র সে নিয়ম রক্ষিত না হইলে, তজ্জন্য আমার অনবধানতাই প্রধানতঃ দায়ী। কাব্যাদি আলোচনার সময় কবিগণ যেভাবে নর-নারী প্রভৃতির নাম লিখিয়াছেন, আমি তাহার পরিবর্তন করি নাই; অনেক ক্ষেত্রে বন্ধনীর মধ্যে আরবী বর্ণমালার ধ্বনি অনুসারে নাম লিখিয়া দিয়াছি। কতকগুলি শব্দ প্রচলিত রীতি অনুসারেই ব্যবহার করিয়াছি, পরিবর্তন করি নাই। বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত আরব দেশের মানচিত্রখানি বিখ্যাত ঐতিহাসিক সৈয়্যিদ আমীর আলীর "A short History of the Saracens" গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত Map of Arabia in the time of the Prophet-এর ছায়া অবলম্বনে অঙ্কিত।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রথম বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত সময় 'খ্রীষ্টাব্দ' বুঝিতে হইবে। যেমন: (১৫৮০-১৬০০) লিখিলে (১৫৮০-১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) বুঝাইবে। গ্রন্থ-মুদ্রণের ব্যাপারে আমি যাঁহাদের আনুকূল্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর এম, আহমেদ, বাংলা-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এবং বর্তমান অধ্যক্ষ ডক্টর মযহারুল ইসলাম সাহেবের কথা বার বার স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য। মফঃস্বল হইতে পুস্তক মুদ্রণ যে কি ঝঞ্ঝাটের কাজ, তাহা আমি পদে পদে অনুভব করিয়াছি। তাছাড়া, পুস্তকের কাগজ ভাল না দিতে পারার জন্য আমি বড় লজ্জিত। তৎসত্ত্বেও, রাজশাহী হেমা প্রেসের জনাব মোহাম্মদ ইসহাক আলী, এল এল. বি. সাহেব গ্রন্থখানির মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের জন্য যে-যত্ন লইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থখানির মধ্যে দুই একটি শব্দের ভুলের জন্য আমি দুঃখিত। সহৃদয় পাঠকের সুবিধার্থে গ্রন্থের শেষে একটি 'শুদ্ধিপত্র' দেওয়া হইল।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'বিদেশী শব্দ তালিকা' সন্নিবেশিত হইল। মুঘল আমলের 'বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের' ভাষা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষা বলিয়া আমি ঐ আমলের কাব্যগুলির 'বিদেশী শব্দ তালিকা' দেই নাই। বিদেশী শব্দ ব্যবহারের বাড়াবাড়ি ইংরেজ আমলে মুসলমানী বাংলায় (দোভাষী বাংলা) রচিত মর্সীয়া কাব্য-গুলির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বলিয়া আমি মুঘল পরবর্তী যুগের কাব্যগুলির 'বিদেশী শব্দ তালিকা' প্রদান করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত, যে-সব গ্রন্থ ও বিচ্ছিন্ন রচনা হইতে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাহার 'গ্রন্থপঞ্জী' গ্রন্থশেষে নিবদ্ধ হইল।

গোলাম সাকলায়েন

বাংলা-বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৪।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের পটভূমি

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের আলোচনা

—

চিত্রসূচী

পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা-পরিচিতি

গ্রন্থে ব্যবহৃত বিষয়-সঙ্কেত

ই. বা. সা.	—	ইসলামি বাংলা সাহিত্য
পা. পা.	—	পাকিস্তান পাবলিকেশন্স
ব. সা. প. প	—	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
বা. এ. প.	—	বাংলা একাডেমী পত্রিকা
বা. সা. ই.	—	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
বা. সা. ইতি.	—	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
বা. প্রা. পু বি.	—	বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ
মা. মো.	—	মাসিক মোহাম্মদী
মু. বা. সা.	—	মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য
র সা প. প.	—	রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
সা. প. প.	—	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
সা. প.	—	সাহিত্য পত্রিকা
ঢা. বি বা. বি.	—	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা-বিভাগ
হি. এ. মা. রে.	—	হিন্দুস্তানী একাডেমী কা তে মাহি রেসালা
জ°	—	জন্ম
প্র°	—	প্রকাশিত
বাং	—	বাংলা সন
হি°	—	হিজরী সন
ত্রি°	—	ত্রিপুরাব্দ সন
মৃ°	—	মৃত্যু
তাখা°	—	তাখাল্লুস
উ. বি.	—	উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
ঢা. বি. লা.	—	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী

[illegible] — রচনা-কাল

[illegible] — রাজত্ব-কাল

[illegible] — সংস্করণ

A. S. B. — Asiatic Society of Bengal

C. U. — Calcutta University

D. U. — Dacca University

E. D. — H. M. Elliot & S. Dowson

E. I. — Encyclopædia of Islam

E. R. E. — Encyclopædia of Religion & Ethics

F. N. — Foot-note

J. A. S. B. — Journal of the Asiatic Society of Bengal

J. R. A. S. Journal of the Royal Asiatic Society

R. Q. I. — The Religious Quest of India

S. E. I. — Shorter Encyclopædia of Islam

O. D. B. L. — Origin and Development of Bengali Language

ed. — edited by

tr. — translated by

মানচিত্র

অক্ষরান্তরীকরণ পদ্ধতি

ا = অ, আ
ب = ব
ت = ত
ث = স
ج = জ
ح = হ
خ = খ
د = দ
ذ = য
ر = র
ز = য
س = স
ش = শ
ص = স
ض = য
ط = ত
ظ = য

ع = আ
غ = গ (ঘ)
ف = ফ
ق = ক
ک = ক
ل = ল
م = ম
ن = ন
و = ও, উ, ঊ
ه = হ
ی = ঈ
اَ = (জবর) অ
اِ = (জের) ই, এ
اُ = (পেশ) উ, ও

॥ প্রথম খণ্ড ॥

বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্যের পটভূমি।

প্রথম খণ্ড

বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের পটভূমি

প্রথম অধ্যায়

মর্সীয়া সাহিত্য

১। মর্সীয়ার সংজ্ঞা ও উৎপত্তি

কোন ট্র্যাজিক বা শোকময় ঘটনা সম্পর্কে প্রশংসাসূচক গান, গাথা অথবা কাব্য রচনা করার রেওয়াজ পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির মধ্যে রহিয়াছে। 'মর্সীয়া' শব্দটি আরবী। ইহার অর্থ শোক করা, মাতম করা, ক্রন্দন করা, বিলাপ করা। কারবালা-যুদ্ধ-পূর্ব যুগে কোন মৃত ব্যক্তির জীবনের গৌরবময় অংশের প্রশংসা কীর্তন প্রসঙ্গে পনের হইতে বিশটি শ্লোক বিশিষ্ট শোকগাথা লিখিত হইলে তাহা মর্সীয়ার অন্তর্ভুক্ত হইত। কিন্তু পরে মর্সীয়ার অর্থের পরিবর্তন ঘটে। কারবালার মরুপ্রান্তরে নিহত ইমাম হুসৈন এবং অন্যান্য বীর শহীদগণের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রশংসাসূচক কবিতাই বিশেষভাবে 'মর্সীয়া' নামে অভিহিত হয়। ইহা কসীদা কবিতার বিপরীত। কোন জীবিত ব্যক্তির গুণকীর্তন কসীদা কবিতার বৈশিষ্ট্য। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কবিতা লিখিয়া কোন পুরস্কার প্রাপ্তির আশা নাই দেখিয়া কবিগণ মর্সীয়াকেই পরবর্তী কালে কসীদায় রূপান্তরিত করেন। হযরত ইমাম হাসান, হুসৈন এবং অন্যান্য শহীদানের

আত্মত্যাগের গুণ-বর্ণনা প্রসঙ্গে শোকগীতিকাই মর্সীয়ার রূপ গ্রহণ করে। ইহা মুহর্রম মাসের প্রথম দশ দিন মজলিশ অনুষ্ঠানে পঠিত হয় এবং তাজিয়া সহ শী'য়াগণ মিছিলের সময় পথ দিয়া চলিবার কালে আবৃত্তি করিয়া থাকে [১]।

বদায়ুন-নিবাসী কবি নিযামী ইহার সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কোন মৃত ব্যক্তির জীবনের গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে ছন্দে রচিত বিলাপ অথবা দুঃখ প্রকাশক বিষয়ের নাম 'মর্সীয়া', কিন্তু বর্তমানে কারবালার বিষাদময় ঘটনা কাব্যাকারে লিখিত হইলে তাহাকে মর্সীয়া নামে অভিহিত করা হয় [২]। পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ মনীষী Hughes সাহেব এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলেন, মর্সীয়া কাহারও শবযাত্রা উপলক্ষে বিষাদগীতি ; বিশেষতঃ মুহর্রম মাসে ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসৈনের আত্মবিসর্জন উপলক্ষে কবিত্বময় ছন্দে যে-শোকগাথা গীত হয়, তাহাই 'মর্সীয়া' [৩]। মর্সীয়ার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Elegy' ; এই শোকগীতি বিষাদক্লিষ্ট করুণ রসের অভিব্যক্তি।

---

১ ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল : উরদু সাহিত্যের ইতিহাস। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত ; সাধনা প্রেস, কলিকাতা—১২, পৃষ্ঠা ১৭৬। এবং "The Marsia is an elegy of the dead ... It is opposite to the Qasida which is a panegyric of the living. The Marsia is, however, confined to the elegiac poems on the death of Hasan and Hussain and other Mohammadan martyrs at Karbala which are chanted during the procession of the taziah at the annual celebration of the Moharram festival." (Ram Babu Saksena : A History of Urdu Literature, Allahabad 1940 p. 123)

২ বদায়ুনী নিযামী সম্পাদিত—আনীস ও দবীর কি পাঁচ মর্সীউঁ কা মজমুয়া। নিযামী প্রেস—১৯৩৩ জুন। 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

৩ T. P. Hughes : Dictionary of Islam, London 1885. p. 327

উৎপত্তি

(আরবী সাহিত্যে)

যুদ্ধের বর্ণনাকে আশ্রয় করিয়া আরবদেশে কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়, এবং এই কাব্যে মর্সীয়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মানুষের মন কোন প্রকারে উত্তেজিত হইলে, তখন সেই উত্তেজিত ভাবকে কাব্যাকারে ব্যক্ত করা হইত [৪]। ইহা আরব দেশের তামসিক যুগের কথা। আরব দেশে মর্সীয়া রচনার মারফত মানুষের হৃদয়ের বিষাদময় ভাবকে প্রকাশ করিয়া অপরের মনের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হইত। অবশ্য একথা সত্য, তামসিক যুগে মর্সীয়া সাহিত্য চর্চার যে-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, ইসলামী যুগে তাহা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই যুগে যথার্থই মর্সীয়া সাহিত্যের উন্নতি বিধান হইয়াছিল [৫]। আত্মীয় বিয়োগের ফলে মানুষের মনে যে গভীর বেদনার ছায়াপাত হয়, তাহা কাব্য ও কবিতা রচনার মূল ভিত্তি। পৃথিবীর সব দেশেই এই বেদনাবোধ হইতে কাব্য-সাহিত্য রূপ লাভ করিয়াছে। আরবদেশের কাব্যও ইহার ব্যতিক্রম নহে *। মর্সীয়া এই ধরণের বেদনার সৃষ্টি। তামসিক

---

৪ শিবলী নোমানী : মোআজেনায়ে আনীস ওয়া দবীর। লক্ষ্ণৌ, ১৯২১, পৃ: ৬

৫ নাসির উদ্দীন হাশিমী : দাকিন মে উর্দু। লাহোর, ১৯৫২, পৃঃ ২২৬

* তুলনীয় : "In the old Testament we find, in the lament of David over Saul and Jonathan, a poem strikingly resembling an Arab Marthiyah ; and in the triumph-song of Deborah over the defeat and death of Sisera, a very close parallel to similar composition among the Arabs." [Charles James Lyall : The Mufaddaliyat, Vol. II, Oxford, 1918, p XXIV (Introduction.)]

যুগেই আরবদেশে মর্সীয়া সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। সে সময়ে অনেকে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় মর্সীয়া কবিতা লিখিতেন। এই কবিদের মধ্যে যে-দুইজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁহারা হইতেছেন: খান্সা[৬] এবং মোতাম্মিম বিন্ নুবয়্রা[৭]। এই দুই

৬ খান্সা: ইনি আরবের একজন মহিলা কবি। তাঁহার ভ্রাতা সাখরের সহিত তাঁহার প্রীতির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ছিল। সাখর কোন এক যুদ্ধে নিহত হইলে খান্সা ভ্রাতৃশোকে হতবিহ্বল হইয়া পড়েন। তিনি মৃত সাখরের পুরাতন জুতাগুলি দ্বারা মাল্য রচনা করিয়া গলায় পরিধান করেন; এবং পাগলের বেশে চতুর্দিক পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। এই অবস্থায় খান্সা মক্কা শরীফে হজ্জ-ব্রত সমাধা করিতে উপস্থিত হন। তখন হযরত ‘উমরের রাজত্বকাল। খান্সা হেরেম শরীফে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিতেন এবং ভ্রাতার শোকে হাত দিয়া বুক চাপড়াইতেন। একদিন হযরত ‘উমর (রাঃ) তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া নিষেধ করিলেন। তখন তিনি ভ্রাতৃশোকের অবস্থা বর্ণনা করিলে হযরত ‘উমর বলিলেন যে, মাতম বা শোকের এই প্রথা ইসলাম নির্মূল করিয়া দিয়াছে। ইহাতে খান্সা অধিকতর বিচলিত হন এবং মুখে মুখে কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। (Nicholson : A History of the Arabs. Cambridge University Press. 2nd Edition. 1930. p. 126 এবং শিব্লী নোমানী: মোআজেনায়ে আনীস ওয়া দবীর। লক্ষ্ণৌ, ১৯২১, পৃষ্ঠা ৮)।

৭ মোতাম্মিম বিন্ নুবয়রা: ইনি খান্সার সমসাময়িক কালের কবি। তিনিও আপন ভ্রাতাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। একটি যুদ্ধে খালিদ বিন্ উলিদ তাঁহার ভ্রাতাকে নিহত করিলে মোতাম্মিম সংসার পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যান; এবং আরবদেশের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। তিনি যেখানেই গিয়া উপস্থিত হইতেন, সেখানেই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। তিনি করুণ সুরে আপন ভ্রাতৃহত্যা সম্পর্কে স্বরচিত মর্সীয়া পাঠ করিতেন; তখন চতুর্দিকস্থ লোকের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিত। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া লোকে বলাবলি করিত যে লোকটি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য পরামর্শ দিত, যাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধর থাকিয়া যায়। তাঁহাকে বহু পীড়াপীড়ি করিবার পর তিনি একটি বিবাহ করিলেন। কিন্তু পত্নীর প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না; অবশেষে পত্নীকে

ব্যক্তির ভ্রাতৃবিয়োগের ফলে মর্সীয়া কবিতা রচিত হয় এবং তাহা সর্ব্বপ্রথম গীত হয়। তখন খলীফা 'উমর ফারুকের যুগ। মর্সীয়া সাহিত্য সম্পর্কে আল্লামা শিবলী নোমানী লিখিয়াছেন যে, কেবল ভাগ্যবিড়ম্বিত ব্যক্তিরাই এই সময় পর্যন্ত মর্সীয়া রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরে যখন মর্সীয়া কাব্য-রচনার স্বরূপ পরিবর্তিত হইল এবং কাব্য রচনা কবিগণের উপার্জনের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, তখন মূল মর্সীয়া কবিতা এবং কাব্য রচনার ধারা স্বাভাবিক ভাবেই বিলুপ্ত হইল [৮]। এই সময়ে কবিগণ দেখিলেন যে, কোন জীবিত ব্যক্তির প্রশংসা কীর্তন করিলে অর্থাগম হয়; সুতরাং, কসীদা (জীবিত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশংসাগীতি) কবিতা রচনার দিকে তাঁহারা ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ইহার ফলে মর্সীয়া কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে থাকে [৯]। তবু, কিছু কিছু আরবদেশীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় এই যুগের কোন কোন মর্সীয়া কবিতা পাওয়া যায়, যাহাতে গভীর বিষাদের ভাব পরিলক্ষিত হয়।

তালাক দিতে হইল। এমতাবস্থায় তিনি একদিন হযরত 'উমরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হযরত 'উমর তাঁহার ভ্রাতৃহত্যা সম্পর্কিত মর্সীয়া শ্রবণ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। খলীফা স্বীয় ভ্রাতা জয়েদ সম্পর্কে মর্সীয়া লিখিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিলেন। পরদিন যখন তিনি হযরত 'উমরের ভ্রাতা জয়েদের সম্পর্কে মর্সীয়া লিখিয়া এবং তাহা পড়িয়া খলিফাকে শুনাইলেন, তখন খলীফা বলিয়া ছিলেন যে, ইহাতে দুঃখ, বেদনা আফসোসের কোনই আভাস পাওয়া যায় না। একথা শুনিয়া মোতাম্মিম খলিফা 'উমরকে বলিয়াছিলেন, "আমীরুল মুমেনিন, জয়েদ আপনার ভ্রাতা ছিলেন, আমার নহে।" (শিবলী নোমানী: মোআজেনায়ে আনীস ওয়া দবীর, লক্ষ্ণৌ, ১৯২১, পৃষ্ঠা ৮ এবং Charles James Lyall: Ancient Arabian Poetry, London, 1930. pp. 35-36)

৮ শিবলী নোমানী: পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬—১৪।

৯ Ram Babu Saksena--A History of Urdu Literature, Allahabad. 1940 p. 123

অপরের মনে প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষেত্রে এই মর্সীয়া কবিতাগুলির গুরুত্ব কম নহে [১০]। হযরত 'উস্‌মানের মৃত্যু উপলক্ষে কাফ বিন্ মালিক নামক একজন আরবীয় কবি আরবী ভাষায় মর্সীয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন [১১]। অতঃপর, হযরত আলী শহীদ হইবার পর আবি আস্‌বদ দাওয়লী নামক অপর একজন কবি আরবী ভাষায় একখানি মর্সীয়া কাব্য প্রণয়ন করেন। হযরত 'উস্‌মান ও হযরত আলীর মৃত্যুর মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে কারবালার দুর্ঘটনা ঘটে। কারবালার দুর্ঘটনা একটি ভয়াবহ ব্যাপার। যদি আরব জাতির পূর্বের বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান থাকিত, তবে কবিগণ এমন করুণ ভাষায় আরবী মর্সীয়া কাব্য রচনা করিতেন যে, তাহার দ্বারা সমগ্র বিশ্বে অনল-শিখা প্রজ্বলিত হইত। কিন্তু, আরব জাতির মধ্যে পূর্বের বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছিল।

বনি উমাইয়া রাজবংশের পতনের পর আব্বাসিয়া রাজবংশীয় শাসকদের রাজত্বকালে কাব্য সাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। কিন্তু, এ-সময়ে রাজপুরুষগণের প্রশংসা-সূচক কসীদা লিখিয়া কবিগণ পুরস্কার লাভ করিতেন; ফলে মর্সীয়া সাহিত্যের অচলাবস্থার পরিবর্তন হইল না। তবে, মা'আন ও জাফর বার্মাকীর বদান্যতার জন্য তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর যে-মর্সীয়া কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে গভীর দুঃখবেদনার আভাস পাওয়া যায় [১২]।

ফারসী সাহিত্যে মর্সীয়া

প্রাচীন আরবদেশে মর্সীয়া কবিতা রচনার প্রচলন হয়।

---

১০ শিবলী নোমানী : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬—১৪।

১১ আল্লামা জালাল উদ্দীন সিউতি রচিত 'তারিখুল খুলাফা' গ্রন্থের উরদু তরজমা 'তাজকিরায়ে বাহাদুরানে ইস্‌লাম' : অনুবাদক—মওলানা আতাউর রহমান সিদ্দিকী। লাহোর, ১৩৪২ হিঃ, পৃঃ ১০৯।

১২ শিব্‌লী নোমানী : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬-১৪

অতঃপর, ইহা পারস্যদেশে চালু হয় [১৩]। ফারসী সাহিত্যের উপর আরবী মর্সীয়ার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় [১৪]। ফারসী সাহিত্যের কবিগণের স্বতউৎসারিত হৃদয়াবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য এই সাহিত্যের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি ফরদৌসী (আনু° জ° ৯৪১ খ্রীঃ) এবং ফর্‌রুখী রচিত মর্সীয়া কাব্যের স্থানে স্থানে গভীর বেদনার ভাব চমৎকাররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে।

মহাকবি ফরদৌসী তাঁহার জগদ্বিখ্যাত 'শাহ্‌নামায়' (শাহ্‌নামহ্‌) সুহ্‌রাবের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতার জবানীতে যে-শোকগাথা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ফরদৌসীর সমসাময়িককালেই কবি ফর্‌রুখী, সুলতান মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পর শোকমূলক আর একখানি মর্সীয়া গাথা করুণ ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। ফর্‌রুখীর রচিত মর্সীয়াকে আধুনিক যুগের দৃষ্টিতে মর্সীয়া কাব্য বলা যায় না। তথাপি, ইহার মধ্যেই যে মর্সীয়া কাব্যের বীজ লুক্কায়িত ছিল, তাহা অনস্বীকার্য। এই যুগের পর কিছুকাল যাবৎ মর্সীয়া কবিতা ও কাব্য চর্চার অবনতি ঘটে। তবু, কবি শৈখ সাদী এবং ভারতের আমীর খসরু ফারসী ভাষায় এইরূপ মর্সীয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন[১৫]। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ তুসীর যুগেও কারবালা যুদ্ধে ইমাম হুসৈনের শাহাদতের ঘটনা অবলম্বনে মর্সীয়া কাব্য রচিত হয় [১৬]। ইহার পর সাফাবী (স্বফবী) এবং তৈমুর যুগ আসিলে ফারসী ভাষায় কাব্যের রূপ পরিবর্তিত হইল। কবি সনায়ী (জ° একাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ) নজিরী

---

১৩ Ram Babu Saksena—Op. cit. p. 18

১৪ নাসির উদ্দীন হাসিমী : দাকিন মে উরদু। লাহোর, ১৯৫২, পৃঃ ২২৬

১৫ শিব্‌লী নোমানী : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬-১৪। এবং ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল : পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৬

১৬ নাসির উদ্দীন হাশিমী : পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৬

ও উর্‌ফী (১৬শ শতাব্দী) নূতন ধরণের কবিতা রচনা করিতে মনোযোগী হন। সুতরাং সাধারণ নিয়মের বশবর্তী হইয়া এই যুগের বিখ্যাত কবি মুল্লা মুহ্‌তাশম্‌ কাশানী (মৃ° ১৫৮৮) বাদশাহ্‌ তহ্‌মাস্‌প সাফাবীর প্রশংসাকীর্তন করিয়া 'ক্বসীদা' কবিতা রচনা করেন। এই ক্বসীদা কবিতাই ক্রমে ফারসী সাহিত্যে বহুল প্রচারিত হয়; কারণ, রাজা বাদশাহ্‌র নিকট হইতে পুরস্কার লাভের আকাঙ্ক্ষায় ফারসী সাহিত্যের অনেক কবিই ক্বসীদা কবিতা লিখিতে যত্নবান হন।

ঈরাণের সাফাবী বংশীয় বাদশাহ্‌গণের রসূলপ্রীতি অত্যন্ত প্রগাঢ় ছিল। কাজেই, বাদশাহ্‌ আদেশ দিলেন যে, রাজা ও রাজবংশের প্রশংসা ও স্তুতিমূলক কবিতা না লিখিয়া এখন হইতে যেন কবিগণ হযরত রসূল এবং আহল-ই-বয়তের গুণ ও কারবালায় ইমাম হুসৈনের পরিবারবর্গের দুঃখকষ্টের কাহিনী কবিতায় বর্ণনা করেন। সাফাবী রাজবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে বাদশাহ্‌ তহ্‌মাস্‌প (রা°কা° ১৫২৪-৭৬) ও আব্বাস দি গ্রেট (রা°কা° ১৫৮৮-১৬২৯) আহ্‌লে বয়ত সম্পর্কে কবিতা রচনা করিবার জন্য কবিগণকে উৎসাহিত করিতেন[১৭]। বাদশাহ্‌গণ বলিতেন যে, এই কাজের জন্য কবিগণ যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক আল্লাহ্‌র দরবার হইতে এবং পার্থিব পুরস্কার শাহী দরবার হইতে লাভ করিতে পারিবেন। বাদশাহ্‌ তহ্‌মাস্‌পের নির্দেশ শুনিয়া তাঁহার আশ্রিত কবি মুহ্‌তাশ্‌ম কাশী (বা কাশানী) সর্বপ্রথম ফারসী ভাষায় শোকমূলক একটি মর্সীয়া কাব্য (হফত বন্দ) * লিখিলেন। এই কাব্যখানি সর্বসাধারণের দ্বারা সাদরে পরিগৃহীত

---

১৭ E. G. Browne : A Literary History of Persia, Vol. IV. Cambridge University Press 1930, p. 28.

* 'হফত-বন্দ' কবিতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ব্রাউন বলেন : "Muhtasham composed his celebrated 'haft-band, or poem of Seven-verse strophes, in praise of the Imams, and this time

হইয়াছিল এবং তিনি ঈরাণের শাহী দরবার হইতে অনেক পুরস্কারও লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ফারসী ভাষায় মর্সীয়া সাহিত্যের আদর্শ-স্থানীয় কাব্য হিসাবে কবি কাশানীর এই কাব্যখানি উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্ব্যতীত, কারবালা যুদ্ধের শহীদদের সম্বন্ধেও কবি কাশানী তর্‌জী'-বন্দ্‌ বা তরকীব্‌-বন্দ কবিতা লিখিয়াছেন [১৮]। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ফারসী ভাষায় মর্সীয়া সাহিত্য রচনার প্রচলন হয়। কাশানী-রচিত মর্সীয়া অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বিখ্যাত [১৯]। অতঃপর, তালিব আমুলী, ঘজালী, কলীম এবং অন্যান্য কয়েকজন কবি কিছু কিছু শোকগাথা লিখিয়াছিলেন [২০]।

পারস্যের সাফাবী বংশীয় শাসকদের আমলেই মুহর্‌রম মাসে হযরত আলীর বংশধরগণের প্রতি শত্রুপক্ষের অত্যাচারের জন্য শোক-প্রকাশ ও শত্রুপক্ষের কার্যাবলীর তীব্র নিন্দা করিবার একটা ধর্মীয় প্রবণতা গড়িয়া উঠে[২১]। শাহ্‌ ইসমাঈল (১৪৮৭-১৫২৪)

---

was duly and amply rewarded, whereupon many other poets followed his example, so that in a comparatively short-time some fifty or sixty such haft-bands were produced". (A Literary History of Persia, Vol. IV, 1953, p. 173) এবং 'হফ্‌ত বন্দ' কবিতার নমুনা E. G. Browne-এর পূর্বোক্ত ইতিহাসের ১৭৩-১৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৮ শিব্‌লী নোমানী: পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪। এবং ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল: পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস; ১ম সংস্করণ, ১৩৬০; পৃ: ১৫২। এবং E. G. Browne: A Literary History of Persia, Vol. IV, 1953, p. 173.

১৯ ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ: 'বাংলা সাহিত্যের উপাখ্যান: গুলে বকাওলী'। সাহিত্য পত্রিকা—প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৪ শীত-পৃ: ১৩

২০ ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল: উরদু সাহিত্যের ইতিহাস, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। সাধনা প্রেস, কলিকাতা—১২, পৃষ্ঠা ১৪৭

২১ E. G. Browne: op. cit., p. p. 28-29

সাফাবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ষোড়শ শতকের (১৫০০) গোড়ার দিকে তৈমুর বংশীয় সর্বশেষ নরপতি হুসৈন বায়কারাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া সাফাবী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের নৃপতিগণ গোঁড়া শী'য়া ছিলেন। প্রথম তিন চারজন সাফাবী-সুলতান ঈরাণের সুন্নীগণের প্রতি কঠোর নির্যাতন চালাইয়াছিলেন। তাঁহারা সুন্নীগণের প্রতি নির্যাতন করিবার সময় শী'য়া ধর্মপ্রচারের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। ধর্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শী'য়া-ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও উপাখ্যান লইয়া গদ্যে-পদ্যে বহু গ্রন্থ লিখিত হইতে থাকে। এই সাফাবী বাদশাহ্-গণের উৎসাহেই মুহর্‌রম মাসের 'তাজীয়া' বর্তমান রূপ গ্রহণ করে। তাজীয়ার সঙ্গে আবৃত্তির জন্য কারবালার ঘটনা লইয়া মর্সীয়া কাব্য বা শোকগাথা লিখিত হয়[২২]। মুল্লা মুহ্‌তশম্ কাশানীর পরে কবি মুক্‌বিল মর্সীয়া কাব্য রচনার দিকে বিশেষ মনোযোগী হন। তিনি মর্সীয়া সাহিত্যকে মূল-সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করেন; এবং একক প্রচেষ্টায় কয়েকখানি মর্সীয়া কাব্য রচনা করেন। তিনি যত কাজ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কারবালার লোমহর্ষণ ঘটনার প্রত্যেক অংশের বিস্তৃত বর্ণনা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কারবালা ঘটনার প্রথম হইতে ইমাম হুসৈনের পরিবারবর্গের বন্দী হওয়া এবং তাঁহাদের মুক্তি লাভের পরে মদীনা আগমন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা তিনি পুংখানুপুংখরূপে তাঁহার কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকে মর্সীয়া কাব্য না বলিয়া কাব্যের মাধ্যমে কারবালা-ঘটনার একটি যথার্থ ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি মুক্‌বিলের মৃত্যুর পর ঈরাণের মর্সীয়া সাহিত্যের আরও উৎকর্ষ সাধিত হয়; এবং মর্সীয়া সাহিত্যে শ্রেণী-বিভাগের রীতি প্রচলিত হয়[২৩]।

---

২২ ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২-১৩

২৩ শিব্‌লী নোমানী: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪-১৫

উনবিংশ শতাব্দীতে ঈরাণী কবি ক্বানী (১৮০৭-৫৩) হৃদয়স্পর্শী ভাষায় 'মর্সীয়া' রচনা করেন। তাঁহার মর্সীয়াগুলি* অতীব করুণ ও শ্রুতিমধুর। শীরাজ নগরে ক্বানীর জন্ম হয়। তাঁহার আসল নাম মীর্যা হবীব ; পিতা মীর্যা মুহম্মদ আলীও স্বয়ং একজন কবি ছিলেন [২৪]। মর্সীয়া ছাড়া ক্বানী গজল ও অন্যান্য কবিতাও লিখিয়াছেন। শ্রুতিমধুর শব্দ-ব্যবহার এবং ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব অসামান্য ; কিন্তু তাঁহার কবিতার মধ্যে সর্বত্র গভীর ভাবের সমাবেশ নাই। ০০ ক্বানীর মর্সীয়া সম্বন্ধে একথা স্বীকৃত-সত্য যে, তিনি ইহার নির্মাণ-কৌশলে অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার মর্সীয়ার গঠন-প্রণালী প্রচলিত-রীতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র। ভাষা সহজ ও সরল হওয়ায় ইমাম হুসৈনের শাহাদৎ বৃত্তান্ত অত্যন্ত করুণ হইয়া ফুটিয়াছে [২৫]।

পারস্য হইতে ঈরাণী কবি ও সাহিত্যিকগণের ভারত আগমনের ফলে ভারতেও মর্সীয়া কাব্য ও সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টা নূতন করিয়া শুরু হয়।

২। ভারতে ফারসী মর্সীয়া

ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী নগরী বাদশাহ্‌গণের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয় এবং ফারসী

---

* কবি ক্বানীর রচিত 'মর্সীয়ার' নমুনা ঐতিহাসিক ব্রাউনের 'A Literary History of Persia' vol IV, 1953, p p. 178-179 দ্রষ্টব্য।

২৪ E. G. Browne : A Literary History of Persia, vol. IV, Cambridge, 1953, p p. 177—181, 326—328.

২৫ Ibid., p p. 177—178.
and ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল : পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম সংস্করণ, ১৩৬০, পৃঃ ১৭৩।

দরবারী ভাষারূপে নির্দিষ্ট হয়। ফারসী মারফত উত্তর-ভারতে সাহিত্য-সাধনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে। কিন্তু, মর্সীয়া কাব্য-চর্চার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ সম্পর্কে ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ বলেন যে, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণবশতঃ ঈরাণের সাফাবী রাজবংশীয় নরপতিগণের সহিত তাইমুর বংশীয় সুন্নী মুঘলদের চিরন্তন শত্রুতা ছিল; এ-কারণে কবিগণ কোন উৎসাহ বোধ করেন নাই। ইহার ফলে, উত্তর ভারতের ফারসী-সাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে মর্সীয়া কবিতা বা কাব্য রচিত হইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, দিল্লীর মুঘল শাসককুলের শত্রু দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির নরপতিগণ শী'য়া সম্প্রদায়ভুক্ত থাকায় তাঁহাদিগের সহানুভূতি ও উৎসাহ লাভ করিয়া শী'য়া ধর্ম প্রচারক ও কবি-সাহিত্যিকগণ দক্ষিণ ভারতে ছড়াইয়া পড়েন; ফলে শী'য়ামতবাদমূলক সাহিত্য রচনার তৎপরতা বৃদ্ধি পায়[১]। সম্রাট্ বাবুর, লোদী-বংশের সর্বশেষ সম্রাট্‌কে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া (১৫২৬) মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন করেন; কিন্তু তদীয় পুত্র হুমায়ুন ভারত হইতে শেরশাহ্ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া (১৫৪৪) সাময়িকভাবে পারস্যের বাদশাহ্ তহ্‌মাস্পের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। সুতরাং ঈরাণে সম্রাট্ হুমায়ুনের অবস্থান এবং ঈরাণ হইতে তাঁহার সামরিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা লাভ, ঈরাণ-ভারতের মধ্যে সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পক্ষে এক নবযুগের সূচনা করে। এই সময়ে পারস্য দেশীয় সৈন্য ছাড়াও অনেক ঈরাণী কবি, পণ্ডিত ও সাহিত্যিক হুমায়ুনের ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের সময় অনুগামী হন। নবাগত ঈরাণী কবি-সাহিত্যিকগণের সংশ্রবের ফলে ফারসী ভাষা মার্জিত ও সুরুচিসম্মত হয়। মুঘল-আমলে ভারতের সর্বত্র ফারসী সাহিত্যের ব্যাপকচর্চা হইতে থাকে। ইতঃপূর্বেই ফারসী

---

১ ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ : পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।

ভাষা প্রচলিত ছিল। উহা আফগানীস্তান ও তুর্কীস্থান হইতে আসে। এখন ঈরাণের মূল উৎস হইতে এই ভাষা ও সাহিত্যের প্রবাহ শুরু হইল [২]। কাজেই, দিল্লী ও দিল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের কবি-সাহিত্যকগণ যখন ব্যাপকভাবে সাহিত্যচর্চা শুরু করিলেন, তখন তাঁহারা প্রথমে ফারসী ও পরে উরদূ ভাষায় অন্যান্য কাব্যধারার চর্চা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের শী'য়া রাষ্ট্রগুলিতে মর্সীয়া-কাব্যচর্চা পূর্ণোদ্যমে শুরু হইলেও উত্তর ভারতের শী'য়া কবি ও সাহিত্যিকগণ সম্রাটের ভয়ে ধর্মমূলক কোন কাব্য রচনা করিতে সাহসী হন নাই; বরং মুঘল রাজদরবারের কবিগণ কসীদা কবিতা রচনা করিয়া সম্রাট্ ও শাসকবর্গের সন্তোষ বিধান করিতেন। ইহার কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক; ফলে, মৃতব্যক্তির গুণকীর্তন অপেক্ষা জীবিত ব্যক্তির প্রশংসাকীর্তনের প্রতি তাঁহাদের অধিকতর ঝোঁক দেখা যায়। সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের রাজদরবারের কবি হাজী মুহম্মদ জান কুদ্‌সী স্বীয় যুবকপুত্রের অকাল-মৃত্যুতে শোকপূর্ণ একটি মর্সীয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌র দৌহিত্র ইমাম হুসৈনের আত্মত্যাগ সম্পর্কে একটি মর্সীয়া কবিতাও রচনা করেন নাই। মুল্লাহ্ যুহূরী (মৃ° ১৬১৬) দাক্ষিণাত্যের শাসক দ্বিতীয় ইবরাহীম আদিল শাহ্‌র (১৫৮০-১৬২৬) দরবারী কবি ছিলেন। তিনি রাজ-প্রশংসামূলক কসীদা কবিতা রচনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন; কারণ তাহা না করিলে নরপতির নিকট হইতে পুরস্কার মিলিত না। শাসকের উপদেশক্রমে কবি যুহূরী মর্সীয়া কাব্য রচনা করেন; এবং এই কাব্যের পরিসমাপ্তিতে দ্বিতীয় ইবরাহীম আদিল শাহ্‌র প্রশংসাসূচক অংশ সংযোজন করেন।

প্রাক্-মুঘল আমলে কিছু সংখ্যক লেখক ও কবির রচনার নমুনা ঐতিহাসিক বদায়ুনী কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। আমীর খসরু

২ এস, মুহম্মদ ইকরাম: পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। ১ম সংস্করণ ১৩৫৪; পা-পা; পৃ: ১৯৪।

(১২৫৩-১৩২৫) ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বুঘরা খান (পূর্ব পাঞ্জাবের শাসক) যখন বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে খসরু বাংলাদেশে আগমন করেন। অতঃপর, খসরু তথা হইতে দিল্লী যান। রাজধানী দিল্লীর সাহিত্যাকাশে তিনি উজ্জ্বল ভাস্কররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ফারসী ভাষায় তৎরচিত কসীদা, গজল, মসনবী তৎকালে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সাহায্য করিয়াছিল। তবে, ফারসী ভাষায় তিনি মর্সীয়া রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না[৩]। জামালী ছিলেন সুলতান সিকন্দর লোদীর (রাং কাং ১৪৮৮-১৫১৭) প্রিয় কবি। সুলতানের মৃত্যু ঘটিলে ইনি মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি মর্সীয়া (ব্যাপকঅর্থে) রচনা করেন। জামালীর রচনা অতিশয় মাধুর্যপূর্ণ। মুঘল আমলে যে-সকল কবি ও সাহিত্যিক ঈরাণ হইতে ভারতে আগমন করিয়া কাব্য ও কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উরফী, নাজিরী ও যুহূরী অন্যতম। এই কবিত্রয়ের প্রত্যেকেই মর্সীয়া কবিতা ও কাব্যরচনা করেন নাই বটে ; কিন্তু তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের শীয়া নরপতিগণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের উরদূ সাহিত্যে মর্সীয়া সাহিত্যের যথার্থ উন্নতি বিধান হইয়াছিল।

৩। ভারতে উরদূ মর্সীয়া সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ

ভারতের দাক্ষিণাত্যে উরদূ সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। উরদূ ভাষায় মর্সীয়া কাব্যের উৎপত্তির মূলে দাক্ষিণাত্যের উরদূ কবিগণের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং

---

৩ এস, মুহম্মদ ইকরাম : পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮১-১৮২।

ষোড়শ শতাব্দীর-প্রথমার্ধে পারস্যে যেমন শী'য়া সাফাবী রাজ-বংশের পত্তন হয়, তেমনি ভারতের দাক্ষিণাত্যের শী'য়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সম্রাট্ বাবুর কর্তৃক ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার (১৫২৬) অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্বেও দাক্ষিণাত্যে মর্সীয়া কাব্য রচনার প্রচলন ছিল[৪]। ভারতীয় ভাষায় অর্থাৎ ফারসী, উরদূ এবং বাংলা ভাষায় মর্সীয়া সাহিত্য ধারার প্রবর্তন যে পারস্য দেশীয় বণিক, দরবেশ, পণ্ডিত প্রভৃতির অনুপ্রেরণা হইতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। সুদূর দাক্ষিণাত্যে (বর্তমান হায়দরাবাদ) উর্দূ ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু হয়। সেখানে উর্দূ ভাষা অশিক্ষিত জনসাধারণের ব্যবহৃত কথ্যভাষা ছিল। ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজবংশের শাসকের বিদ্রোহ ফলপ্রসূ হয়। সম্ভবতঃ, কেন্দ্র হইতে স্বাধীনতার নিদর্শন স্বরূপ দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি 'প্রাচীন উরদূ' বা 'দাকিনীকে' রাজভাষারূপে গ্রহণ করে। ইহার বিশ বৎসর পূর্বে মুহম্মদ তুঘলকের সৈন্যবাহিনী ঐস্থানে উরদূর প্রবর্তন করে; তাহাই পরিশেষে দাক্ষিণাত্যের রাজভাষারূপে গৃহীত হয়[৫]। উরদূ সাহিত্যের সূচনা দাক্ষিণাত্যের কবি ওয়ালী (১৬৬৮-১৭৪৪) হইতে হইয়াছে। তবে, তখনকার ভাষা ছিল 'দাকিনী'। কবি ওয়ালী কারবালার অরুন্তুদ ঘটনা অবলম্বনে মসনবী রচনা করিয়াছিলেন, কোনও মর্সীয়া লিখেন নাই। ভারতে মর্সীয়া সাহিত্যের আদি কবি কে, তাহা বহুদিন পর্যন্ত জানিবার উপায় ছিল না। তবে, মীর্যা সওদা (১৭১৩-১৭৮০) ও খাজা

---

৪ নাসির উদ্দীন হাশিমী : পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৬

৫ ডক্টর এম, ডি, তাসীর : 'উরদূ সাহিত্য' (পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার) : সম্পাদক-এস, এম, ইকরাম—প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪, পৃঃ ২২১-২২২

মীর দার্দে'র (১১৩৩-১১৯৯ হিঃ) পূর্বেই মর্সীয়া কাব্য রচনার প্রচলন ছিল। তাঁহাদের পূর্ব পর্যন্ত মর্সীয়া চার পংক্তিবিশিষ্ট কবিতা বা 'বন্দ'-এ রচিত হইত ; সওদাই সর্বপ্রথম মর্সীয়া কবিতা ছয় পংক্তি বা 'মুসদ্দস্' ধারায় রচনা-রীতির প্রচলন (১৭৫০) করেন ; এবং ইহা এখন পর্যন্ত অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। তিনি ছিলেন মর্সীয়া সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ কবি ; এবং একটি নবযুগ প্রবর্তনের মূল কারণ। তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা ও কবিত্ব-শক্তির ফলে পরবর্তী-কালে মীর আনীস্ ও মীর্যা দবীরের যুগে এ-সাহিত্য উন্নতির স্বর্ণ-শিখরে আরোহণ করে। মীর্যা সওদা 'দীওয়ান' ও 'মসনবী' ব্যতীত 'সালাম'ও *** রচনা করেন [৬]। মীর ত্বকীও (১৭১২-১৮১০) মর্সীয়া লিখিয়াছিলেন। উর্‌দূ কবিগণের জীবন-চরিত সংগ্রহকার মীর ত্বকী ও মীর হাসান (মৃ° ১৭৮৬) সেই যুগের অনেক মর্সীয়া কবিতা লেখকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মীর আমানী, মীর আল্ আলী দরখ্শান্, সিকন্দর, ক্বাদির, গোমান, আশেমী, নদীম, স্ববর প্রভৃতি অন্যতম। আধুনিক গবেষণার সাহায্যে জানিতে পারা গিয়াছে যে, দাক্ষিণাত্যের গোলকুণ্ডা রাজ্যের শাসনকর্তা মুহম্মদ কুলী কুতুব শাহ্ই ++ (১৫৮০-১৬১১)

---

৬ (ক) শিব্লী নোমানী : পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২১

(খ) সগীর আহমদজান : 'সওদা' হি.এ. মা. রে। জুলাই, ৩য় সংখ্যা ; ১৯৩৩, পৃঃ ৩৩৪।

*** সালাম : যে ছন্দে গজল লিখিত হয়, সেই ছন্দে মর্সীয়া রচনা করাকে 'সালাম' নামে অভিহিত করা হয়।

++ মুহম্মদ কুলী কুতুবশাহ্—ইনি ঈরাণের শাহ আব্বাস এবং দিল্লীর সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক। তিনি শী'য়া ধর্মাবলম্বী ছিলেন, আপন ধর্মের স্বপক্ষে তিনি প্রচার, বক্তৃতা এবং প্রতিযোগিতামূলক আলোচনার ব্যবস্থা করিতেন ও আপন ধর্মমত রাজদরবারে চালু করিতেন। (Ram Babu Saksena : History of Urdu Literature. Allahabad, 1940. p. 56.)

উরদূ ভাষার প্রথম বিশিষ্ট কবি। তিনি মর্সীয়া শ্রেণীর বহু কবিতাও লিখিয়াছিলেন। তদানীন্তন দাক্ষিণাত্যে এই সকল কবি যখন দাকিনী ভাষায় মর্সীয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন উরদূ ভাষার ছিল শৈশবাবস্থা। ইহা তখন যথেষ্ট শক্তিশালী ভাষারূপে পরিগণিত হয় নাই ; কিন্তু বীজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যের রাজন্যবর্গ মর্সীয়া কাব্য সাহিত্যের কবিদিগকে শুধু পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা শী'য়া সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় নিজেরাও মর্সীয়া সাহিত্য ও কাব্যাদি রচনা করিতেন এবং মর্সীয়া সাহিত্য রচনা কার্যে আত্মনিয়োগ করাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন[৭]। বীজাপুরের আদিলশাহী শাসকগণের মুক্তহস্তদান ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সর্বপ্রথম মুহর্রমের মজলিশ্ অনুষ্ঠানের নিয়ম চালু হয় ; এবং সঙ্গে সঙ্গে কুতুবশাহী এবং নিযামশাহী শাসকগণের রাজত্বের সময় মর্সীয়া কাব্যরচনার ধারা যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়। প্রথম প্রথম এই সকল মজলিশ-অনুষ্ঠানে ঈরাণী কবি মুহ্তশম্ কাশানীর ফারসী ভাষায় লিখিত মর্সীয়া পাঠ করা হইত। কিন্তু পরে দাকিনী উরদূ ভাষায় ইহা রচিত হয়। অতঃপর, মর্সীয়া কবিতা আবৃত্তির জন্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে এবং বহু মর্সীয়া-কাব্য রচিত হইতে থাকে। মর্সীয়া রচনাকারী এই বিশিষ্ট সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য কবিও মর্সীয়া কাব্য প্রণয়নে যত্নবান হইতেন। এই সময়ে বিখ্যাত মসনবী 'রওজাতুস শুহ্দা'[৮] নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থখানি

---

৭ মীর্যা মুহম্মদ আসকারী : তারীখ-ই-আদবে উরদূ। লক্ষ্ণৌ, ১৯২৯, পৃঃ ২৬৫-২৭০।

৮ 'রওজাতুস শুহ্দা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির তিনটি কপির সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার দুই কপি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে এবং অপর একটি কপি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। (নাসির উদ্দীন হাশিমী : ইউরোপ মে দাকিনী মখতুতাত, ১৯৩০, পৃঃ ৩৫৩)

দাকিনী উর্‌দূ ভাষায় অনূদিত হয়[৮]। অনূদিত এই গ্রন্থের নাম 'করবল্‌কথা' বা ده مجلس।** এই গ্রন্থে ইমাম হুসৈনের শাহাদৎ এবং কারবালার অপরাপর ঘটনা মর্সীয়া-কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বীজাপুরের দ্বিতীয় আলী আদিলশাহ্‌ এবং গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লাহ্‌ কুতুবশাহ্‌র রাজত্বকালে মর্সীয়া কাব্য রচনার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। আদিলশাহী এবং কুতুবশাহী সুলতানগণ ইমামিয়া শী'য়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কাজেই, তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যে শী'য়া ধর্ম রাজকীয় ধর্মরূপে গণ্য হইত। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, বীজাপুর ও গোলকুণ্ডায় অবস্থিত দুইটি সরকারী আশুরখানায় মুহর্‌রম মাসে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত মর্সীয়া পাঠ করা হইত[৯]। দাক্ষিণাত্যের ঐ সকল রাজ্যে মুহর্‌রমের প্রথম দিন শাহী-দামামা বাজান হইত না; এবং মাংস ও পানের দোকান বন্ধ রাখা হইত। হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্মনির্বিশেষে মিছিলে এবং মাতম-অনুষ্ঠানে যোগদান করিত[১০]। মজলিশের সময় এই সকল স্থানে চৌদ্দখানা অলম চৌদ্দ 'মাসুমের'

৮ অনুবাদকের নাম ফজলে আলী ফজলী। তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি দিল্লীর লোক, দাক্ষিণাত্যে বসবাস করিতেন। আবার কেহ কেহ বিপরীত মত পোষণ করেন। (হামীদ হাসান কাদ্‌রী: দাস্তানে তারীখ-ই-উরদূ। সিন্ধু সেন্টজন কলেজ, আগ্রা ১৯৪১, পৃঃ ৫৩)

** মুহর্‌রম মাসের প্রথম দশদিন এই গ্রন্থের বিষয়গুলি আলোচিত হইত, এইজন্য ইহার নাম ده مجلس দেওয়া হইয়াছিল।

৯ ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩—১৪।
নাসির উদ্‌দীন হাশিমী: দাকিন মে উরদূ, লাহোর, ১৯৫২, পৃঃ ২২৭।

১০ নাসির উদ্দীন হাশিমী: পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৭

জন্য প্রোথিত হইত। গোলকুণ্ডা শহরকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করা হইত। আশুরখানাগুলির ভিতর ব্রঞ্জের তৈরী দুই তিন শত প্রদীপের ঝাড়বিশিষ্ট এক একটি বৃক্ষ নির্মাণ করা হইত। উহা দ্বারা আশুরখানা আলোকে ঝল্‌মল্‌ করিত এবং মর্সীয়া পাঠকগণ রজনীতে সেইস্থানে শহীদগণের প্রশংসাসূচক কবিতা ও উরদূ ভাষায় রচিত মর্সীয়া ও নৌহা পাঠ করিত। দশই মুহর্‌রম তারিখে সুলতান স্বয়ং কালো রঙের পোষাকে দেহ আবৃত করিয়া নগ্নপদে অলম্‌পাঞ্জা সহ মিছিলে যোগদান করিতেন *। বীজাপুরের শাহী আশুরখানার নাম ছিল 'হুসৈনী মহল'। দাক্ষিণাত্যের কবি নসরতী আপন কসীদা কাব্যে এই হুসৈনী-মহলের সৌন্দর্য ও পারিপাট্যের পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ভারতীয় দাকিনী ভাষায় কারবালার অরুন্তুদ ঘটনার সর্বাপেক্ষা যে-প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিযামশাহী রাজ্যের কবি আশ্‌রফ কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। অতঃপর, যে-মর্সীয়া কাব্যগ্রন্থ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে, তাহা গোলকুণ্ডার প্রসিদ্ধ কবি ওয়াজ্‌হীর লিখিত। এই সময় হইতে দাকিনী ভাষায় মর্সীয়া সাহিত্য একটি শক্তিশালী শাখা হিসাবে পরিণত হইল [১১]। তৎপর, অন্যান্য কবি মর্সীয়া কাব্য রচনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে গোলকুণ্ডার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি গাওয়াসী, লতিফ, কাযেম, আফজল, শাহ্‌ কুলীখানশাহী, নূরী এবং বীজাপুরের মীর্যা ও হাশিমীর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। মীর্যা সারাজীবন মর্সীয়া কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানা যায়, এমন কি একখানি

---

* শীয়াগণের মুহর্‌রম-অনুষ্ঠানে পালিত উৎসবাদির বিস্তৃত বিবরণ 'পরিশিষ্ট'—ক'-য়ে দ্রষ্টব্য।

১১ ডক্টর আবু মুহামেদ হবিবুল্লাহ: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৪
নাসির উদ্দীন হাশিমী : পূর্বোক্ত, পৃঃ—২২৬

মর্সীয়া কাব্য রচনা করিবার সময় তাঁহার মৃত্যু ঘটে++। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার কবি আহ্‌মদ কারবালার ঘটনা লইয়া 'মুসিবত-ই-আহলে বয়ত' নামক একখানি মস্‌নবী কাব্য রচনা করেন। মুহম্মদ হানিফার উপাখ্যান লইয়াও দুইখানি মহাকাব্য জাতীয় গ্রন্থ লিখিত হয়।

মীর জমীরের সময়ে উরদূ ভাষায় মর্সীয়া সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যরূপে পরিণত হয়। তিনি তাঁহার রচনায় যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ নানা খুঁটিনাটি ঘটনার বর্ণনা দেন এবং ঘটনাসমূহের রূপকপূর্ণ চিত্রের কথা উল্লেখ করেন। জমীরের মর্সীয়ায় অশ্ব, তরবারী ও অস্ত্রশস্ত্রের গুণ ও মহিমার কথা বলা হইয়াছে। ইহা বর্তমান কালের মর্সীয়া সাহিত্যের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তাঁহার মর্সীয়াতে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। ছন্দের ক্ষেত্রে সুষ্ঠুতা এবং শব্দ-গঠন নিপুণতায় কবির পারদর্শিতা লক্ষণীয়। মীর জমীর সর্বপ্রথম মিম্বরে বসিয়া মর্সীয়া পাঠ করিবার রীতি-পদ্ধতির প্রচলন করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণ যে-পদ্ধতিতে মর্সীয়া রচনা করিতেন, তাহা চল্লিশ-পঞ্চাশ বন্দের বেশী দীর্ঘ হইত না; জমীর এই রীতির পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহার দৈর্ঘ্য আরও প্রসারিত করেন। মর্সীয়া কাব্যের গঠন প্রণালী তাঁহার সময়ে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। তিনি প্রথমে তমহীদ, তৎপর সরাপা, যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা ও শেষে শাহাদতের বর্ণনা দিয়া কাব্য সম্পূর্ণ করেন[১২]।

++ মীর্যা ও হাশিমীর রচিত মর্সীয়া কাব্যের পাণ্ডুলিপি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। (নাসির উদ্দীন হাশিমী: ইউরোপ মে দাকিনী মাখতুতাত। ১৯৩০, পৃঃ ৩১৮-৩২১)

১২ ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল: 'মর্সীয়া কাব্য এবং মীর আনীস ও মীর্যা দবীর'। ইমরোজ, ৫ম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬০ সাল, পৃঃ ১০১ এবং উরদূ সাহিত্যের ইতিহাস—পূর্বোক্ত, পৃঃ১৪৮-১৪৯।

অতঃপর, মীর খলীকের (১৭৭৪-১৮০৪) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইনি মীর আমানীর বংশজাত মীর হাসানের পুত্র এবং মীর যহীকের পৌত্র। মীর খলীকের চারি ভ্রাতার মধ্যে তিন ভ্রাতাই কবি ছিলেন। খল্‌ক, খলীক এবং মুহ্‌সীন—তিন ভ্রাতাই মর্সীয়া কবিতা লিখিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। মীর খলীক প্রথম জীবনে গজল রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষ জীবনে তিনি মর্সীয়ার চর্চা করিয়া গিয়াছেন। মীর জমীর এবং মীর খলীকের মধ্যে মর্সীয়া কাব্য সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়, এবং তাঁহাদের কাব্যচর্চা এবং বাগ্‌বিতণ্ডার ফলে মর্সীয়া সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি লাভ হয়। মর্সীয়া কাব্যের বিকাশের এই যুগকে সাধারণতঃ 'জমীর ও খলীকের যুগ' বলিয়াই চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর, মীর খলীকের পুত্র মীর বাবুর আলী আনীস্ (১৮০২-১৮৭৪) মর্সীয়া কাব্যের ইতিহাসে আবির্ভূত হইয়া ইহার সর্বপ্রকার উন্নতি বিধান করেন। তৎসম্পর্কে পরে বর্ণিত হইবে।

দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা দিল্লী ও লক্ষ্ণৌতে মর্সীয়া সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি বিধান হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ শহরের অধিকাংশ আমীর-ওমরা শীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এ-কারণে, তাঁহারা কারবালা যুদ্ধক্ষেত্রের বীর শহীদগণের দুঃখকষ্টের কথা অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করিতেন; এবং ক্রন্দন ও শোক প্রকাশ করাকে ধর্মীয়-কার্য বলিয়া গণ্য করিতেন। শুধু তাহাই নহে, অপরাপর কবিকেও তাঁহারা মর্সীয়া সাহিত্য রচনার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ (রা°কা° ১৮৪৭-৫৬) নিজেও কবি ছিলেন। তৎরচিত মর্সীয়া কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম 'জিলদে মরাসী' (মর্সীয়া খণ্ড); ইহাতে ২৫টি কবিতা সন্নিবিষ্ট। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম

'দফ্তর-ই-গম্ ও বহ্র-ই-আলম্' (দুঃখের সমুদ্র); ইহাতে ২২টি কবিতা আছে; এবং তৃতীয় খণ্ডের নাম 'সরমায়া-ই-ঈমান' (ঈমানের মূলধন), ইহাতে ৩৩টি মর্সীয়া-কবিতা সন্নিবিষ্ট। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা আগমন করেন এবং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে[১৩]। মর্সীয়া সাহিত্যের যথার্থ উন্নতি ও বিকাশের সময় লক্ষ্ণৌ শহরে মুহর্রম মাসে শী'য়াগণের শোক প্রকাশের কাল দশদিনের পরিবর্তে চল্লিশ দিন নির্দিষ্ট হইল। এই সময়-বৃদ্ধির কারণ, মর্সীয়া সাহিত্যে উদ্দীপনাময় কাব্য-রচনার বহুল প্রচলন। প্রকৃতপক্ষে, এই সময়ে মর্সীয়া সাহিত্যের যেরূপ, উন্নতি বিধান হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্য কখনও হয় নাই। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ (তাখাং আখতার) স্বয়ং মর্সীয়া কাব্য রচনা করিতেন; এবং তাহা মজলিশ অনুষ্ঠানে পঠিত হইত। এই সময়ে মর্সীয়া সাহিত্য গগণের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে দুইজন কবি আবির্ভূত হন। ইঁহারা: মীর আনীস্[ক]

---

১৩ মীর্যা মুহম্মদ আশকারী: তারীখ-ই-আদবে উর্দূ। লক্ষ্ণৌ, নওলকিশোর প্রেস, ১৯২৯, পৃঃ ২৫৪।

ক মীর আনীস্: মীর বাবর আলী আনীস্ (১৮০২) ফয়জাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মীর খলীকের নিকট তিনি বাল্যশিক্ষা প্রাপ্ত হন। আনীসের পূর্বপুরুষগণের সকলেই কবি ছিলেন। তিনি কাব্যচর্চাকে একটা সম্মানজনক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাব-কবি। লক্ষ্ণৌ শহরে আগমনের পর তিনি পিতার উপদেশে কবি নাসিখের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নাসিখের নির্দেশে কবি তাঁহার পূর্বনাম বদল করিয়া 'আনীস' গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই মর্সীয়া কাব্য রচনায় তিনি তৎপর হন; এবং পরবর্তীকালে মর্সীয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে সমাদৃত হন। আনীসের কাব্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁহার কাব্যের অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব পরিলক্ষিত হইলেও কল্পনামাধুর্য দ্বারা তিনি সেই অভাব অনেকখানি

এবং মীর্যা দবীর*। তাঁহারা উভয়েই মর্সীয়া সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি। তাঁহাদের কাব্য ও কবিতা অত্যন্ত প্রভাবশালী। মীর আনীসের পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ উরদূ ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ছিলেন। আনীস্ এবং তৎপরবর্তী পুরুষগণের মধ্যে অনেকেই পূর্ব-পুরুষের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহাদের অনেকেই বংশপরম্পরায় মর্সীয়া কবিতা ও কাব্য রচনা করিয়াছেন। আনীস্ ব্যক্তিগত জীবনে ব্যায়াম-চর্চা, অশ্বারোহণ ও সৈন্যচালনাকৌশল উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এই জ্ঞানের সুযোগ লইয়া মর্সীয়া-রচনার সময় যুদ্ধক্ষেত্রের নানা অবস্থার চিত্র বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার মর্সীয়া-কাব্যে তম্‌হীদ, যুদ্ধচিত্র ও চরিত্র-বর্ণনায় তিনি যে-কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। এতৎভিন্ন, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের হৈ-হল্লা, অশ্ব ও অশ্বারোহী সৈন্যদলের চালচলন

পূর্ণ করিয়াছিলেন। আনীস স্বীয় কাব্যে বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের বর্ণনা প্রদানের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদে জীবনলীলা সম্বরণ করেন। (Ram Babu Saksena : A History of Urdu Literature, Allahabad, 1940, pp 127-130) এবং ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল—'মরসীয়া কাব্য এবং মীর আনীস ও মীর্যা দবীর'। ইমরোজ, ৫ম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা ১৩৬০ সাল, পৃঃ ১০২-১০৬।

* মীর্যা দবীর : মীর্যা সালামত আলী দবীর (১৮০৩) দিল্লী নগরীতে ভূমিষ্ঠ হন। তদীয় পিতা মীর্যা গোলাম হুসৈন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন বলিয়া কবির জীবনীলেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। দবীর ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। মর্সীয়া কাব্য রচনার ক্ষেত্রে মীর আনীসের সঙ্গে তাঁহার প্রতিযোগিতা চলে; তিনি অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া বিপক্ষের বিদ্রূপ সত্ত্বেও আনীসের কবিত্বের যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করিতেন না। তিনি ১৮৫৫

ও তলোয়ারের ঝনৎকার অর্থাৎ যুদ্ধের খুঁটিনাটি বিষয়ের সূক্ষ্ম বর্ণনায় তিনি স্বাভাবিক কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য কবিতা রচনা করিলেও মর্সীয়া রচনার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী[১৪]।

মীর্যা দবীর (১৮০৩-৭৫) মীর আনীসের ন্যায় আর একজন খ্যাতিসম্পন্ন কবি। তিনি মীর জমীরের প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং অচিরেই মর্সীয়া কাব্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে সমাদৃত হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি রাজা-বাদশাহ্-গণের নিকট হইতে রাজকীয় সম্মান লাভে সহায়ক হইয়াছিল। মীর আনীস্ স্বভাব-কবি ছিলেন, কিন্তু দবীরের মর্সীয়ায় শব্দাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যের কুশলতা বিশেষরূপে লক্ষণীয়। তিনি বাল্যকাল হইতে লক্ষ্ণৌ নগরীতে বাস করিতেন এবং এখানেই কাব্য সাধনায় নিয়োজিত থাকেন। মীর আনীস্ ফয়জাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ আসিলে লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী মর্সীয়া সাহিত্যের দুই ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন কবির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফলে, মর্সীয়া কাব্য-ধারায় দুইটি পৃথক দলের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার বাদ-প্রতিবাদ ও প্রতিযোগিতার ফলে মর্সীয়া কাব্য-সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ-কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যা-

---

খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ যান এবং ১৮৫৯ খ্রীঃ পাটনায় অবস্থানের সময় দৃষ্টিশক্তি হারান। ১৮৭৫ খ্রীঃ তিনি মারা যান। (ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল : 'মরসীয়াকাব্য এবং মীর আনীস ও মীর্যা দবীর', ইমরোজ ৫ম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা ১৩৬০ সাল, পৃঃ ১০৩-১০৪ এবং রামবাবু সাকসেনা : এ হিষ্ট্রি অব্ উরদূ লিটারেচার ১৯৪০, পৃঃ ১৩১-৩২)।

১৪ শিব্‌লী নোমানী : পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২ এবং ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল : উরদূ সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, পৃঃ ১৪৯-৫২।

পতির মধ্যে যেমন তুলনা চলে, তেমনি উরদূ ভাষায় মর্সীয়া কাব্য সাহিত্যের এই দুই শ্রেষ্ঠ-কবির মধ্যেও তুলনা চলিতে পারে। আধুনিক যুগে দেশাত্মবোধমূলক বা উত্তেজনাপূর্ণ যে-সব কাব্য ও কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহাদের চিন্তাধারা ও গঠন-প্রণালী এই মর্সীয়া-কাব্য হইতেই সংগৃহীত। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ উরদূ কবি, শমসুল-উলিমা আলতাফ হুসৈন হালীর (১৮৩৭-১৯১৪) 'মদ্দ্ ও জজর-ই-ইস্লাম' + ('মুসদ্দস্-ই-হালী' নামে খ্যাত) লিখিবার উৎস এখানেই নিহিত[১৫]। বস্তুতপক্ষে, মীর আনীস্ এবং মীর্যা দবীরের ন্যায় দুই প্রতিভাদীপ্ত কবির কাব্য-সাধনার ফলে উর্দূ মর্সীয়া-কাব্যের চরম উন্নতি সাধিত হয়; এবং মর্সীয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রও বিশেষভাবে প্রসারিত হয়।

৪। বঙ্গে মর্সীয়া সাহিত্য

বাংলা দেশে ফারসী, উর্দূ এবং বাংলা ভাষায় মর্সীয়া-কাব্য ও কবিতা রচিত হইয়াছে। মুঘল আমলে ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতিতে যে-মুঘল প্রভাব নবীন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহার ছাপ বাংলা দেশের সাহিত্যেও পড়িয়াছে। সম্রাট্ হুমায়ুনের সঙ্গে ঈরাণী সৈনিক, কবি, শিল্পী-সাহিত্যিকগণের ভারতে প্রবেশ-লাভ, মধ্য এশিয়ার অঞ্চল-সমূহের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় শী'য়া সাধক এবং বণিকগণের বাংলায় বাণিজ্য-ব্যপদেশে আগমন এবং ঈরাণের রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে বহু

+ ছয় পংক্তি বিশিষ্ট কবিতায় লিখিত ইসলামের উত্থান-পতন বর্ণিত কাব্য। দেশপ্রেম কাব্যখানির বৈশিষ্ট্য।

১৫ ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল : পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫২-১৫৪।

শী'য়া মতাবলম্বী নর-নারীর বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়-জীবনে পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল [১]। এ-কারণে, বাংলাদেশে ফারসী, উর্‌দূ ও বাংলা ভাষায় মর্সীয়া-কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা কবিগণ লাভ করিলেন। এতৎভিন্ন, মুঘল সম্রাট্‌গণ কর্তৃক বহু শী'য়া আমীর, ওমরা এবং সুবাদার সুবে-বাংলার শাসক নির্বাচিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গের সুন্‌নী নর-নারী শী'য়াধর্মভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই প্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল মর্সীয়া-কাব্য ও সাহিত্য নির্মাণ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সর্বশেষ মুঘল সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্ সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া ইংরেজগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে। বাহাদুর শাহ্ নিজে ছিলেন শী'য়া [২]। তিনি কাব্য ও কবিতার সমজদারও ছিলেন। কাজেই, তিনি দিল্লীর রাজদরবারের এবং লক্ষ্মৌর কবিগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন; সুতরাং ঐ সময়ে মর্সীয়া সাহিত্যের অনুশীলন যথেষ্ট হইত। কিন্তু বাহাদুর শাহ্‌কে রেঙ্গুনে নির্বাসনদণ্ড দেওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই দিল্লী হইতে শী'য়া কবিগণ কলিকাতা ও মুর্শিদাবাদ গমন করেন, এবং এই দুই স্থানে তাঁহারা অন্যান্য কাব্যরচনার সঙ্গে সঙ্গে ফারসী ও উরদূ ভাষায় মর্সীয়া কাব্যও রচনা করেন। অবশ্য কলিকাতায় অনেক পূর্বকাল হইতেই উরদূ ভাষায় মর্সীয়া-রচনা শুরু হইয়াছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লির শাসনকালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত করে। কোম্পানী বাংলা তথা ভারতের

---

১ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: মু. বা. সা, ১৯৫৭, ঢাকা, পৃ: ১২৯।

২ Titus, M. T.: Religious Quest of India, Oxford University Press. 1930. p 61.

ভাগ্য-বিধাতারূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার ফলে কলিকাতা সুবে-বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়। এই সময়ের পূর্বে ইংরেজ-কর্মচারী এবং হিন্দুস্তানী ছাত্রগণ ফারসী পড়িত। কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত করিয়া ইউরোপীয়গণ ফারসী ভাষা উঠাইয়া দিলেন এবং তৎস্থলে মূল উরদূ গ্রন্থ রচনার জন্য এবং অনেক মূল্যবান ফারসীগ্রন্থ উরদূ ভাষায় তর্‌জমা করাইবার প্রয়োজনে ভারতের দূর-অঞ্চল হইতে তাঁহারা কবি ও লেখকদের সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন[৩]। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তখন যে-সব কবি, সাহিত্যিক কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মর্সীয়া কাব্য-সাহিত্যের কবিও ছিলেন। মর্সীয়া কাব্যের অধিকাংশ কবি শী'য়া ছিলেন। কলিকাতায় মুহর্রম উপলক্ষে তাঁহারা কাব্যাদি রচনা করিতেন। এইরূপে দেখিতে দেখিতে লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর পরিবর্তে কলিকাতা মর্সীয়া সাহিত্যের কেন্দ্ররূপে পরিণত হইল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই লেখকগণের মধ্যে মীর মিস্‌কীনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মীর আবদুল্লাহ্‌ মিস্‌কীন কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি উরদূ সাহিত্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। মর্সীয়া কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। তিনি হযরত মুস্‌লিম এবং তাঁহার দুই পুত্রের শাহাদতের কাহিনী অবলম্বনে একখানি মর্সীয়া গ্রন্থ উরদূ ভাষায় রচনা করেন। গ্রন্থখানি সর্বসাধারণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত এবং সাদরে গৃহীত

---

৩ Ram Babu Saksena: European & Indo-European Poets of Urdu and Persian, Lucknow, 1941. p. 294.
হামিদ হাসান কাদ্‌রী: দাস্তানে তারিখ-ই-উরদূ। সিন্ধু সেণ্টজন্‌স কলেজ, আগ্রা, ১৯৪১, পৃঃ ৮৫।

হইয়াছিল ; উহার প্রথম সংস্করণ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়[৪]। মীর আবদুল্লাহ্ মিস্‌কীনের কথা বিখ্যাত পণ্ডিত ব্লুমহার্ড সাহেবও উল্লেখ করিয়াছেন ; এবং ডক্টর স্প্রেঙ্গার তাঁহার Catalogue—য়ে মীর মিস্‌কীনের মর্সীয়া রচনার কথা বলিয়াছেন[৫]। ব্লুমহার্ড বলেন, মীর আবদুল্লাহ্ (তাখা° মিস্‌কীন) ইমাম হুসৈনের খুল্লতাত ভ্রাতা হযরত মুস্‌লিম এবং তাঁহার পুত্রগণের মৃত্যু উপলক্ষে ৮১টি স্তবক বিশিষ্ট এক শোকগীতি (মর্সীয়া-ই-মিস্‌কীন) রচনা করেন। এতৎসঙ্গে এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করা হইয়াছিল। মিস্‌কীন ইমাম হাসান, হুসৈন এবং অন্যান্য শহীদের মৃত্যু সম্পর্কে মর্সীয়া রচনার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তৎরচিত মর্সীয়া মুহর্‌মের মিছিল-অনুষ্ঠানে পঠিত হয়[৬]।

৪ সৈয়দ মুহম্মদ : আরবাবে নাসির-ই-উর্দু। হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ১৯৩৭, পৃঃ ২৬১।

৫ Dr. A. Sprenger—Catalogue of the Arabic, Persian & Hindustani Mss. of the Libraries of the Kings of Oudh. Vol. I-1854. p. 622.

৬ 'An elegy on the death of Muslim and his sons, by Mir Abdullah, poetically surnamed Miskin accompanied by an English Translation. Miskin is wellknown as the author of several Marshiyas, or elegiac poems on the death of Hasan & Husain, and other Muhamedan martyrs, which are chanted during the procession of the Taziah at the annual celebration of the Moharram festival. This Marshiya is an elegy, in eighty one verses on the death of Muslim, the cousin to Husain, who was sent as a messenger to the people of Kufa and of his

মিস্‌কীন ভিন্ন আরও যাঁহাদের সংবাদ জানা যায়, তাঁহাদের মধ্যে সৈয়্যিদ হায়দর বক্‌স হায়দরী অন্যতম। ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্‌শী ছিলেন। তিনি گل مغفرت বা 'গুল-ই-মাগফিরাৎ' নামক গ্রন্থখানি ফারসী ভাষা হইতে উরদূতে তরজমা করেন। ইহার বিষয়বস্তু, হযরত রসূলের সময় হইতে কারবালার ঘটনা পর্যন্ত বিবরণ। সৈয়্যিদ সাহেব দিল্লী হইতে কলিকাতা আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি কলিকাতায় প্রকাশিত (১৮১৩) হয়[৭]। মুঘল আমলে ঢাকা শহরে শী'য়াগণের বসতি স্থাপিত হয়; ফলে ঢাকাতেও কয়েকখানি মর্সীয়া কাব্য রচিত হইয়াছিল। পারস্যের জগদ্বিখ্যাত কবি ফরদৌসীর 'শাহ্‌নামার' অনুকরণে সৈয়্যিদ গোলাম আলী আল্ মূসাবী নামক ঢাকার জনৈক কবি কারবালার মর্মবিদারক কাহিনী অবলম্বনে একখানি ফারসী কাব্য (১৮৪৬) রচনা করেন। তিনি শী'য়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন[৮]। ১৭৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সর্বশেষ নবাব মীর কাশিমের সহিত ইংরেজগণের কয়েকটি (কাটোয়া, গিরিয়া প্রভৃতি) ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মীর কাশিম পরাভূত হইয়া অযোধ্যার শাসনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ

---

two sons Mohammad and Ibrahim.' [J. F. Blumhardt: Catalogue of the Hindi, Punjabi & Hindustani Mss. in the Library of the British Museum-1899 (Hindustani Mss. No. 73, p. 39)]

৭ মুহম্মদ এহিয়া তালহা: সিয়ারুল মুসন্নিফিন। লাহোর, ১৯৪৮, পৃ: ৫৫।

৮ Catalogue of the Arabic & Persian Mss. in the Oriental Public Library of Bankipore—Vol. III, 1912, Calcutta p, 267.

করেন।[ক] ইহাতে ইংরেজগণ অযোধ্যার নবাবের প্রতি বিরক্ত হন। অযোধ্যার তদানীন্তন শাসনকর্তা নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্‌র আশ্রয়ে বহু কবির জীবিকা নির্বাহ হইত ; কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন বলিয়া ইংরেজগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অবকাশ পান নাই। ফলে, ইংরেজ সেনাপতি বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নবাবকে বন্দী করেন। পরে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন (১৮৫৬) করা হয়। এই সময়ে অযোধ্যার অন্তর্গত লক্ষ্ণৌ শহর হইতে মর্সীয়া-সাহিত্যের শী'য়া কবিগণ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। এই সকল কবির কতকাংশ নবাবের সঙ্গে কলিকাতায় (মাটিয়া বুরুজ অঞ্চল), কতক মুর্শিদাবাদে এবং কতক রামপুরের নওয়াব দরবারে আসেন ও তাঁহারা পুনরায় মর্সীয়া-সাহিত্যের চর্চা করিতে থাকেন। যে-কবিগণ মাটিয়া বুরুজে আসিয়া নবাব সাহেবের সঙ্গে মিলিত হন, তাঁহাদিগকে নবাব স্বয়ং সম্মানজনক খেতাব উপঢৌকন দেন। তিনি এই কবিগণকে سبعہ سیارہ অর্থাৎ 'সপ্তগ্রহ' নামে সম্বোধন করিতেন। এই কবিগণ[৯] :

১। ফতেহ-উদ্-দৌলা বক্সী-উল্ মুল্ক বার্ক ;
২। মাহ্‌তাব্-উদ্-দৌলা কাউকাব্-উল্-মুল্ক সিতারাজঙ্গ দারাক্‌শান ;
৩। নওয়াব মুহম্মদ তকি খান লক্ষ্ণৌবি—(তাখাং-সূলাত) ;
৪। মীর্যা আলী লক্ষ্ণৌবি—(তাখাº-বাহার) ;
৫। মীর্যা মসীতা—(তাখাº-তায়েস) ;

ক V. Smith : The Oxford History of India. 2nd. Edition. —1924. p, 500.

৯ আগা মুহম্মদ বাকের : তারীখ-ই-নজম ও নসরে উরদূ। লাহোর ১৯৪৫, পৃঃ ১১৬-১১৭ ; এবং Ram Babu Saksena : A History of Urdu Literature. Allahabad, 1940, p 172.

৬। মীর্যা মুজাফ্‌ফর আলী লক্ষ্ণৌবি—(তাখা° হুনার);

৭। বেলায়েত আলী কাশ্মীরি—(তাখা° সুরূর)।

ইঁহারা কাব্য ও কবিতার বহুল চর্চা করিতে লাগিলেন; এবং মর্সীয়া ধারার কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কেহ কেহ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। লক্ষ্ণৌ এবং কলিকাতা মাটিয়া বুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্‌র বিদ্যোৎসাহে আরও যাঁহারা মর্সীয়া কবিতা ও কাব্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সৈয়্যিদ আগা হুসৈন (তাখা°-আমানত), খাজা আরসাদ আলী খান (তাখা°-কালাক), মীর্যা আলী জান লক্ষ্ণৌবি (তাখা°-শাফাক), মীর্যা মাহ্‌দী আলী খান লক্ষ্ণৌবি (তাখা°-কবুল), আমীর আলী খান লক্ষ্ণৌবি (তাখা°-হেলাল) প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ[১০]। সৈয়্যিদ ইন্‌শা আল্লাহ্‌ খানের (মৃ° ১৮১৭) পিতা হাকিম মীর মাশা আল্লাহ্‌ খান এবং তদীয় পূর্বপুরুষগণ নযফ্‌ হইতে আগমন করিয়া দিল্লীতে বাস করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা দিল্লীর শাহী দরবারে স্থান লাভ করেন। ইন্‌শা আল্লাহ্‌ খানের পিতা দিল্লীর শাহী চিকিৎসক ছিলেন। দিল্লীর পতনের পর মাশা আল্লাহ্‌ খান মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসেন। ইতঃপূর্বেই মুর্শিদাবাদ সুবে-বাংলার রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। এখানে ইন্‌শা আল্লাহ্‌ খানের জন্ম হয়। তিনি কোন মর্সীয়া কাব্য রচনা করিয়া ছিলেন কিনা, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না[১১]। সোজ্‌ কবি-নামধারী সৈয়্যিদ মুহম্মদ মীর (১৭২১-১৭৯৮) দিল্লীর পতনের পর লক্ষ্ণৌ নাগরীতে আগমন করেন এবং নওয়াব আসফউদ্দৌলাহ্‌র পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুকাল অবস্থানের পর মুর্শিদাবাদ চলিয়া আসেন।

---

১০ আগা মুহম্মদ বাকের: পূর্বোক্ত, পৃ: ৮২।

১১ মীর্যা মুহম্মদ আশকারী: পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৯।

মুর্শিদাবাদ তখন বাংলার নবাবের অধীন। সেখানে কিছুকাল কাব্য-চর্চা করিয়া তিনি পুনরায় লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া যান। মস্‌নবী, রুবায়ী, মুখম্মস কবিতা ছাড়াও কবি সোজ্‌ করুণ রসাত্মক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে (সম্ভবতঃ মর্সীয়া) খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন[১২]।

ইতঃপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, মুঘল আমলে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং আরও দুই একটি অঞ্চলে শী'য়া শাসক ও আমীর-ওমরা শাসনকার্য উপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহারা শী'য়া কবি-সাহিত্যিককে তাঁহাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করিতে দ্বিধা করিতেন না। ফলে, কবিরা অন্যান্য বিষয়ে কাব্যাদি রচনার সঙ্গে সঙ্গে কারবালার বিষাদপূর্ণ ঘটনা অবলম্বনে কবিতা ও কাব্য রচনায় যত্নবান হইতেন। যে-সমস্ত কবি দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া জমা হইতেন, তাঁহারা নবাবের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য মর্সীয়া রচনার অগ্রণী হইতেন। বিখ্যাত লেখক খান বাহাদুর আবদুল গফুর খানের (তাখা০-নাসাখ) 'সুখ নে সুহারা' গ্রন্থে (প্রকা০ বাংলা ১২৯১) দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ হইতে মুর্শিদাবাদে আগত কবিগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, কবিগণের অধিকাংশই মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দ্দী ও তদীয় দৌহিত্র নবাব সিরাজদ্দৌলাহ্‌র আমলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়া কাব্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সকল কবির মর্সীয়া প্রধানতঃ ফারসী ও উরদূ ভাষায় রচিত।

বিখ্যাত ফারসী কাব্য 'মকতুল হুসৈন' বহু পূর্ববর্তী সময়ে লিখিত হয়। রচয়িতার নাম জানা নাই। ফারসীতে বিরচিত

---

১২ পূর্বোক্ত: পৃ: ১০৬ ও ১০৮ এবং ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল: উরদূ সাহিত্যের ইতিহাস। কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ: ৯৯-১০০।

এই "মকতুল হুসৈন" কাব্যের অনুভাবেই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন কোন কবি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় যত্নবান হন। ইহাদের মধ্যে মুহম্মদ খান, হায়াত মাহ্‌মুদ, ফকীর গরীবুল্লাহ, রাধা চরণ গোপ ও হামিদ অন্যতম। ফকীর গরীবুল্লাহ ও হামিদ তাঁহাদের কাব্য রচনার মূলে ফারসী কেতাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন[১৩]।

কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বহু উরদূ কাব্য ও কবিতা কারবালার করুণ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হয়। উরদূ ভাষাতেও মর্সীয়া কাব্য রচনার রেওয়াজ বহুকাল যাবৎ চলিয়াছিল। 'আনাসেরে শাহাদাতায়েন,' 'লতায়েফ আসরফি' এবং আবুল কাসিম মীর্যার 'জঙ্গনামা' উরদূ ভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ফারসী ও উরদূ

---

১৩ ফারসী কেতাব ছিল মোক্তাল হোছন।
তাহা দেখি কবিতায় করিনু রচন ॥
বচনের ঝুট সাচ্চা আমি নাহি ঠেকি।
কেতাবে যেমন আছে আমি তাহা লেখি ॥
* * * * *
রচিতে কবিতা যদি খাতা মুঝে হয়।
মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায় ॥
রচনার ঝুট সাচ্চা আমি নাহি জানি।
আসল কেতাব সার জানেন যে তিনি ॥
(গরীবুল্লাহ্ : জঙ্গনামা)

এবং
শাহা তামাছের চরণ প্রসাদে।
তাহান আজ্ঞায় তবে কহএ হামিদে ॥
মোক্তাল হছন এক কেতাব আছিল।
বাঙ্গালা করিতে তবে তান আজ্ঞা হৈল ॥
(হামিদ : সংগ্রাম হুসন)

মর্সীয়া কাব্যের ধর্মীয়বোধ ও প্রেরণা হইতেই বাংলা দেশের বহু মুসলমান কবি-সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় মর্সীয়া কাব্য রচনা করেন। এই সাহিত্য ধারা সম্পর্কে আবদুল কাদির বলেন ঃ

'ধর্মীয় পুস্তকাদি ছাড়া আর এক ধরণের পুঁথিতে উরদূ-ফারসীর আধিক্য দেখা যায়। সে সমস্ত পুঁথির অধিকাংশ রচিত হইয়াছে মুহর্রমের মর্মান্তিক ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া। এমাম হোসেনের নিদারুণ হত্যা-কাহিনীর ভিত্তিতে বাঙ্গালায় যে-বিরাট পুঁথি-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, আমি তাহার নামকরণ করিয়াছি 'মর্সীয়া সাহিত্য'। মহাজন পদাবলী, নাথ-গীতিকা, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্য-সাহিত্য প্রভৃতি যেমন উপাদান ও প্রকাশ-রূপের দিক দিয়া পরস্পর হইতে পৃথক, তেমনি বাঙ্গালার এই 'মর্সীয়া সাহিত্য' বিষয়বস্তু ও বাগ্‌ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র' [১৪]।

মর্সীয়া কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবিগণ চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলের শীয়া সুবাদার অথবা শাসন কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সাহায্য এবং উৎসাহ লাভ করিতেন বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য অঞ্চল মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থানরূপে পরিগণিত হইবার বহু পূর্বেই চট্টগ্রামে মুসলমানদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়; তখন হইতেই এখানে সমুদ্রগামী বণিক ও ধর্মপ্রচারক ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ফলে, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে যে-মুসলিম সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে তাহার মূলে চট্টগ্রামের অবদান অনেকখানি [১৫]। চট্টগ্রামের ন্যায় অন্যান্য কেন্দ্রস্থল এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহে ফারসী ও উরদূ ভাষায় কাব্য চর্চাও

---

১৪ মাসিক সওগাত, ফাল্গুন, ১৩৪৭ বাং, পৃঃ ৪৭০; এবং কাব্য মালঞ্চ-য়ের ভূমিকা হিসাবে সংযোজিত 'বাংলা কাব্যের ইতিহাস', মুসলিম ধারা, প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। আবদুল কাদির সম্পাদিত—কাব্য মালঞ্চ, ১ম, প্রকাশিত ১৯৪৫, পৃঃ ১৯।

১৫ ডক্টর সুকুমার সেন : ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৮ বাং, পৃঃ ৪৫।

যথেষ্ট হইত। অনেকক্ষেত্রে আরবী-ফারসী নবীশ বাঙালী, আরবী হরফে বাংলা কাব্য রচনা ও চর্চা করিতেন। মুহররমের সময়ে কবিগণের রচিত মর্সীয়া কাব্য বা কবিতা পাঠ করা হইত। বাংলা দেশের শীয়া শাসক বা নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় ইমামবাড়াগুলিতে মজলিশ-অনুষ্ঠান জাকজমকের সহিত প্রতিপালিত হইত। এ-কারণে, কারবালা-কাহিনী রাজধানী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলির জনসাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়া উঠে; এবং তাহাদের মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। কোন কারণে রাজ্যের শাসক ও কর্তৃপক্ষের রদ বদল হইলেও দেশের মুসলিম জনসাধারণ বংশ পরম্পরায় কারবালার করুণ ও মর্মস্পর্শী কাহিনীর প্রতি চিরদিনই একটা নাড়ির টান অনুভব করিয়া আসিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ধর্মীয় কারণে ইমাম হুসৈনের আত্মত্যাগ সম্পর্কিত কাহিনী মুসলিম নরনারীর নিকট চিরদিন গভীরভাবে শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে। দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলমানগণ হিন্দুগণের পুরাণ-পাঁচালী শুনিয়া সাহিত্য-রস-পিপাসা মিটাইয়াছেন; কিন্তু পরে তাঁহাদের সমাজ-মানসে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। তাঁহারা নিজেদের ঐতিহ্য-নির্ভর কাব্য-কাহিনী পাঠ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং এই প্রয়োজনেই তাগিদেই ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক সাহিত্যের সূত্রপাত। এই সাহিত্যের অন্যতম শাখা হিসাবেই বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য শাখার সৃষ্টি। কবিগণ মুসলিম ঐতিহ্য-নির্ভর কাহিনী গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কাব্যের কাঠামোর কোন পরিবর্তন করিলেন না। কাঠামো বাঙালী হিন্দু কবি-রচিত পুরাণ-পাঁচালীর ন্যায়ই রহিয়া গেল। মুসলমান কবিগণ পুরাণ-পাঁচালীর পারিপার্শ্বিক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তাঁহাদের রচিত সাহিত্যের মধ্যে দুইটি ধারা লক্ষ্য করা গেল:

প্রথম ধারা: সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে 'হরিবংশ' প্রভৃতির অনুসরণে 'নবী-বংশ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' 'পাণ্ডব-

বিজয়' প্রভৃতির অনুসরণে 'রসূল-বিজয়' 'মুহম্মদ-বিজয়', 'কাসাসুল আম্বিয়া' প্রভৃতি পয়গম্বরদের কাহিনী মূলক কাব্যাদি প্রণয়ন।

দ্বিতীয় ধারা : হযরত রসূলুল্লাহ্‌র পরবর্তী খলীফাগণের বিজয় অভিযানের বীরত্বব্যঞ্জক কথা ও ইমাম হুসেনের কারবালা যুদ্ধের করুণ কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া সাহিত্য প্রণয়ন।

দ্বিতীয় ধারার কাব্যগুলির সাধারণ নাম 'জঙ্গনামা'। জঙ্গনামার বিষয়বস্তু অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী। বাঙালী মুসলমানের নিকট এই কাব্যের আদর হইয়াছিল অত্যন্ত বেশী [১৬]। বস্তুতঃপক্ষে, এই জঙ্গনামা কাব্যগুলির (যাহাকে আমি 'বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি) মাধ্যমে বাঙালী মুসলমান তাঁহাদের প্রাণের কথা প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিলেন ও তাঁহারা ইহার মারফত অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিখিলেন। বাংলা মর্সীয়া কাব্যগুলি প্রধানতঃ অনুবাদ সাহিত্য হিসাবেই গড়িয়া উঠে। বাঙালী কবিগণ যদিও মূলতঃ ফারসী ও উরদূ কাব্যগুলির ভাব-কল্পনা ও ছায়া আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি এগুলির মধ্যে তাঁহাদের মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। ফলে, এই কাব্যগুলি এক প্রকার অভিনব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদূর আরব ও পারস্যের মানুষের কাহিনী কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া কবিগণ যে-বাগ্‌ভঙ্গি ও পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব ও উদ্ভট্ হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, বাঙালী কবিগণ মাটির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

বাংলা ভাষায় 'যয়নবের চৌতিশা' নামীয় একখানি মর্সীয়া কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর কবি শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌র

---

১৬ ডক্টর সুকুমার সেন : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪।

রচিত [১৭]। আপাততঃ অন্য কোন পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই কাব্য খানিকে মর্সীয়া সাহিত্যের 'প্রাচীনতম রচনা' হিসাবে গ্রহণ করা যায়। ইহাতে কারবালার বেদনা-করুণ কাহিনীর সহিত জড়িত ইমাম হুসৈনের আত্মীয়া বীবী যয়নবের বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি অধ্যাপক আলী আহ্‌মদ কর্তৃক আবিষ্কৃত ষোড়শ শতাব্দীর * কবি দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খানের রচিত 'জঙ্গনামা'র সংবাদ জানা গিয়াছে। পুঁথিখানির মাত্র কয়েকটি খণ্ডিত পাতা পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর পূর্ববর্ণিত চট্টগ্রামের লোকপ্রিয় কবি মুহম্মদ খান 'মোক্তাল হোসেন' (মকতূল হুসৈন) কাব্য রচনা (১৬৪৫) করেন। ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয় কাব্য। মুহম্মদ খানের এ-কাব্য এখনও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হয়। রংপুরের কবি হায়াৎ মাহ্‌মূদের 'জারী জঙ্গনামা' ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এবং পূর্ববঙ্গের সিলেটের অজ্ঞাত নামা কবি হামিদের 'সংগ্রাম হুসন' কাব্যের অনুলিপি হয় ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে। হয়ত কবি মূল কাব্য ইহার অনেক পূর্বেই রচনা করিয়াছিলেন। হায়াৎ মাহ্‌মুদ উত্তর বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠকবি। রংপুরের ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত বাগ্‌ দুয়ার পরগণাস্থিত ঝাড়্‌ বিশিলা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানী বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার যে-ধারার সূত্রপাত হয়, তাহাতে বহু কবি

---

১৭ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ঢাকা ১৯৫৭ পৃঃ ১১৩।

* অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত (ঢাকার বাঙ্‌লা একাডেমীর প্রকাশিত, ১৯৫৭) দৌলত উজীর বাহারাম খানের 'লায়লী মজনু' কাব্য-সংশ্লিষ্ট ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের 'কবি দৌলত উজীর বাহারাম খান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মর্সীয়া কাব্য রচনায় যত্নবান হইয়াছিলেন। এই ধারার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কবি ফকীর (বা শাহ্) গরীবুল্লাহ্ 'জঙ্গনামা' কাব্য প্রণয়ন করেন। ফকীর গরীবুল্লাহ্ ফারসী-উরদূ-হিন্দী শব্দ মিশ্রিত 'মুসলমানী বাংলা ভাষায়' এক নূতন ধরণের সাহিত্য রচনার অগ্রদূত। তৎপর উত্তর রাঢ়ের হিন্দু কবি রাধাচরণ গোপের 'ওফাৎ নামা' এবং ইমামএনের কেচ্ছা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাব্য দুইখানি পশ্চিম বঙ্গের বোলপুর শ্রীনিকেতনের সন্নিহিত লোহাগুড়ি গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুইখানি পুঁথিই খণ্ডিত।

অতঃপর, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের ভুরশুট কানপুর পরগণা হইতে মুন্শী জনাব আলীর 'শহীদে কারবালা', শৈখ মুহম্মদ মুনশীর 'শহীদে কারবালা' প্রকাশিত হয়। সাদ আলী ও আবদুল ওহাব কবিদ্বয়ের 'শহীদে কারবালা' এই কাব্যধারার উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মুসলমানী বাংলায় রচিত পুঁথির আদি কবি ফকীর গরীবুল্লাহ্ ফারসী-উরদূ-হিন্দী মিশ্রিত বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার যে-রীতি চালু করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমান সময়েও অনুসৃত হইতেছে। অতি আধুনিক কালের কবিদের মধ্যে রংপুরের মুহম্মদ ইস্হাক উদ্দীনের 'দাস্তান শহীদে কারবালা' এবং চট্টগ্রামের কাযী আমীনুল হকের 'জঙ্গে কারবালা'র নাম উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সিলেটের অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে এক প্রকার নাগরী লিপিতে বাংলা সাহিত্যের চর্চা হইত। দেব-নাগরী ভাষা হইতে ইহা ভিন্ন প্রকৃতির। ইহা প্রধানতঃ সিলেটের মুসলমানগণের মধ্যে চালু ছিল বলিয়া ইহার নাম 'সিলেটী নাগরী'। এই লিপিতে বাংলা কাব্যরচনার রীতি শুধু সিলেট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল; স্থানীয় মুসলমানরাই ছিলেন তাহার ধারক এবং পরিপোষক[১৮]। খুব সম্ভব,

১৮ 'In Sylhet a kind of modified Devanagari called 'Silet

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই লিপিতে কাব্যাদি রচনার রীতি চালু হয়[১৯]। নানা বিষয়ক কাব্যাদির মধ্যে মর্সীয়া ধারার কাব্য অন্যতম। সিলেটী নাগরী লিপিতে বাংলা ভাষায় একখানি 'জঙ্গনামা' কাব্য লেখেন ওয়াহিদ আলী নামক এক কবি *। ওয়াহিদ আলীর বাড়ি ছিল সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রী পরগণার ষোলঘর মৌজায়। তৎরচিত 'জঙ্গনামা' পাঁচ শত পৃষ্ঠার এক প্রকাণ্ড কাব্য।

এতদ্ব্যতীত আধুনিক কালের পাশ্চাত্ত্য আদর্শবাহী কবি-সাহিত্যিকগণ বহু কবিতা ও কাব্যাদি রচনা করিয়া বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবুল মা'আলী মুহম্মদ হামেদ আলী, মতীয়ুর রহমান খান, কায়কোবাদ, আবদুল বারী, আবদুল মুনায়েম, সৈয়্যিদ ইসমাঈল হুসৈন সিরাজী, আজীজুল হাকীম, মুহম্মদ ইবরাহিম প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কাযী নজরুল ইসলাম মুহর্রম ও কারবালা কাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের উপর ভিত্তি করিয়া অনেক কবিতা ও ইসলামী গান রচনা করিয়াছেন। ইংরেজ আমলের শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক মীর মুশার্রফ হুসৈনও বাংলা গদ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' প্রণয়ন করিয়া লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

Nagari' has a restricted use among the local Mussalmans. (Dr. Suniti Kumar Chatterjee : O. D. B. L, Val-I. pp. 234-35).

১৯. 'In the last quarter of nineteenth century books were printed in this script which was known as Sylhet Nagri.' (Dr. Sukumar Sen : History of Bengali Literature, 1960, p. 188).

* কাব্যখানি আমি সিলেটের জনাব গোলাম আকবর চৌধুরীর সৌজন্যে দেখিবার সুযোগ লাভ করি — লেখক।

প্রকৃত প্রস্তাবে, শুধু কাব্য বা কবিতা রচনার মধ্যেই কারবালার বিষাদময় ঘটনা ও কাহিনী সীমাবদ্ধ নহে; পল্লী সাহিত্যেও মর্সীয়া রচিত হইয়াছে এবং তাহা বহুকাল যাবৎ এদেশের পল্লী অঞ্চলসমূহে গীত হইয়া আসিতেছে। বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলগুলিতে বহু লোক-কবি কারবালা কাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষাদান্ত্য অংশ অবলম্বন করিয়া অসংখ্য পল্লী-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন; এবং তাহা বাংলা দেশের অগণিত আপামর সাধারণের অন্তরে বেদনা-করুণ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। কারবালা কাহিনীর বিশেষ বিশেষ অংশ অবলম্বনে রচিত এই পল্লী সঙ্গীতগুলির নাম 'জারী'। জারীগান ব্যতিরেকে 'বাংলা মর্সীয়া গজল' বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে[২০]। এই গজলের সুর ও তাল ইহার নিজস্ব। ইহা জারী গানের সুর ও তাল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বাংলা মর্সীয়া গজলের কবি খোন্দকার আবদুল কাদির নামক হুগলী জেলার ছোট পাণ্ডুয়ার এক অধিবাসী। তিনি অভিজাত বংশের সন্তান ছিলেন। এবং উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য এবং সঙ্গীত মুসলমানের ধর্মীয় পটভূমিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই 'ধর্মীয় পটভূমি' সম্পর্কে আলোকপাত করা যাইতেছে।

---

২০ বাংলা মর্সীয়া গজলের নমুনা বর্তমান গ্রন্থের ২য় খণ্ডের 'ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে' দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মীয় পটভূমি

১। শী'য়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

॥ সুন্নী ॥

আরব-দেশে হযরত মুহম্মদ (দঃ) ইসলাম-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইসলাম-ধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত হযরত রসূলের শিষ্যগণ 'মুসলমান' নামে সুপরিচিত। হযরতের জীবৎকালে মুসলমানগণের মধ্যে ধর্মমত লইয়া কোন প্রভেদ সৃষ্টি হয় নাই; কিন্তু তাঁহার ওফাতের কিছুকাল পরেই মুসলমানগণ প্রধানতঃ দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। এই দুই সম্প্রদায়ের একের নাম 'সুন্নী'; এবং অপর সম্প্রদায় 'শী'য়া' নামে পরিচিত। কুর'আন মুসলমানগণের ধর্মগ্রন্থ। তাঁহাদের ধর্মীয় নীতি-পদ্ধতি এবং ইহ-পরকাল সম্বন্ধীয় যাবতীয় নির্দেশ এই কুর'আনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি বিষয় ও ধর্মীয় সমস্যাদি সম্পর্কে কুর'আনে পরিষ্কার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না; অথচ রসূলুল্লাহ্ স্বীয় জীবনে সমস্যাদি সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ নীতি মানিয়া চলিতেন, বা মানিয়া না চলিলেও কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতির অনুমোদন করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপালিত বা অনুমোদিত রীতি-পদ্ধতিই সুন্না (সুন্নৎ) নামে পরিচিত[১]।

সুন্না দুই প্রকারের :

ক. বাচনিক (তত্ত্ববিষয়ক)

খ. ব্যবহারিক

আল্-কুর'আন হইতে যে-সব ধর্মীয় নীতি-পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেগুলি বাচনিক সুন্না। পক্ষান্তরে, রসূলুল্লাহ্ তাঁহার জীবৎকালে কতকগুলি প্রশ্ন ও সমস্যার চমৎকার সমাধান স্বয়ং ব্যবহারিক জীবনের কার্য বা উপদেশ দিয়া করিয়া গিয়াছেন। এই-গুলি পরে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়। রসূলের ব্যবহারিক জীবন হইতে প্রাপ্ত নীতিগুলি ব্যবহারিক সুন্না[২]।

রসূল-প্রদর্শিত এই সুন্নার অনুসারীগণ সুন্নী মুসলমান নামে কথিত হয়। হযরতের সুন্নাগুলি যে-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া

---

১ ক 'Sunnah literary means a way or rule or manner of acting or mode of life and hadith a saying conveyed to man either through hearing or through revelation.' (Moulana Muhammad Ali : The Religion of Islam-Lahore. 1950-p. 58.)

খ 'According to the usual explanations Muhammad's Sunna comprises his deeds, utterances and his unspoken approval (Takrir).' (Houtsma, Wensinck, Gibb ed. : Encyclopaedia of Islam-Vol. IV. 1934. p 555.)

২ Moulana Muhammad Ali : The Religion of Islam-Lahore. 1950 pp. 58-95.

Houtsma, Wensinck, Gibb ed : Encyclopaedia of Islam Vol. IV-1934. pp 555-56.

রাখা হইয়াছে, তাহার নাম হদীস্ * tradition [৩]। কুর'আনের ন্যায় হদীসও মুসলমানগণের নিকট বিশেষরূপে প্রচলিত এবং সমাদৃত। অতএব, সুন্নী মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি নিম্নরূপ[৪] :

ক। কুর'আন : (আল্লাহ্ তালার প্রেরিত বাণীর সমন্বয়ে লিপিবদ্ধ গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস)

খ। হদীস : (ঐতিহ্যগত প্রথা রসূলের নিকট হইতে প্রাপ্ত। ইহার প্রতি বিশ্বাস।)

গ। আল্লাহ্র প্রেরিত দূতগণের প্রতি বিশ্বাস :

ঘ। শেষ-বিচারের দিনের প্রতি বিশ্বাস :

ঙ। ইজ্মা-'উল্-উম্মৎ : (ইসলাম ধর্ম অনুসরণকারীগণের মধ্যে একতা।)

চ। কিয়াস (সিদ্ধান্ত)

---

* The Hadith embraces :

(a) All the words, counsels and oral precepts of the prophet ;

(b) His actions, works and daily practice ;

(c) His silence, implying a tacit approbation on his part of an individual committed by his disciples. (Syed Ameer Ali : The Spirit of Islam. 5th impression, 1949, p. 350.)

৩ James Hastings ed. : E. R. E.-1921. Vol. XII. p, 114.

৪ Mir Shahamat Ali : Takwiyatul Islam. Article XIV. J. R. A. S. vol. XIII, London, 1852. p. 367.

and Syed Ameer Ali : The Spirit of Islam. London, 5th impression, 1949, p. 350.

এতৎভিন্ন, সুন্নী মুসলমানগণ চারি খলীফার প্রতি বিশ্বাসী। কারণ তাহাদের মতে, জনসাধারণের হিতার্থের জন্যই যখন এইরূপ পদের আবশ্যক, তখন এই পদের অধিকারীকে রসূলের বংশধর হইতেই হইবে, এইরূপ নিয়মের অধীন না করিয়া সর্বসাধারণের বিবেচনাধীন করাই যুক্তিযুক্ত[৫]। সুতরাং ইসলাম ধর্মের প্রথাগত আইনানুসারে নির্বাচিত প্রথম তিন খলিফাও আইনতঃ ও ন্যায়তঃ মুসলমানগণের 'খলীফা' বা 'ইমাম'। ফলতঃ মুসলমানগণ হযরত রসূলের ওফাতের পর চারি খলীফা—আবু বকর, 'উমর, 'উসমান এবং আলীর প্রতি যেমন গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তেমনি 'আশারায়ে মুবশ্শরা'র* অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতিও সম্মান দেখায়। চারি খলীফা সহ এই দশজন ব্যক্তি রসূলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন[৬]। এই দশজনের পরে হযরত রসূলের পরিবারবর্গের কথা উল্লেখযোগ্য। সুন্নী মুসলমানগণ বার ইমামকে হযরতের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে; এবং সেই দৃষ্টিকোণ হইতে ইমামগণ স্মরণীয় এবং বরণীয়। কিন্তু তাহারা শী'য়াগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করে না। দ্বাদশ ইমাম, মাহ্দীক

৫ বিশ্বকোষ (একবিংশ ভাগ): কলিকাতা, ১৩১৭ বাং, পৃঃ ৭৬১।

* 'আশারায়ে মুবশ্শরা'র অর্থ: যে-দশজন ব্যক্তি সম্বন্ধে স্বর্গবাসী হওয়ার সুসংবাদ রসূলুল্লাহ তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই দিয়াছিলেন। এই দশ ব্যক্তি: চারি খলীফা (অর্থাৎ 'আবু বকর' 'উমর' 'উসমান ও 'আলী') ও তাল্হা, যুবায়র বিন্ আওয়াম, সা'দ বিন্ আবি 'উক্কাস, আবদুর রহমান বিন্ আওফ, আবু 'উবায়দা বিন্ যার্রাহ্ এবং সা'দ বিন্ যয়েদ।

৬ ক J. R. A. S. vol. XIII. 1852, p. 367.

খ Syed Ameer Ali: op. cit., p. 21.

ক ইমাম মাহ্দী: দ্বাদশ জন ইমামের মধ্যে হযরত আলী সর্বপ্রথম এবং মাহ্দী সর্বশেষ। মুসলমানগণ এই ইমামদিগকে অতিশয় সম্মানের

একদিন পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন, সুন্নীগণ ইহা বিশ্বাস করে ; কিন্তু তাহারা এ-কথা স্বীকার করে না যে, ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব ইতঃপূর্বেই হইয়াছে এবং তিনি অদৃশ্যভাবে লোক-চক্ষুর অগোচরে অবস্থান করিতে পারেন। বরং, তাহারা বলে যে, একদিন তাঁহার জন্ম হইবে এবং হযরত রসূলের প্রিয় কন্যা বীবী ফাতিমার বংশ হইতেই তিনি উদ্ভূত হইবেন[৭]।

সুন্নী সম্প্রদায় চারিটি প্রধান উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। হযরত রসূল কুর'আনের যে-সব বিধি-ব্যবস্থার ও প্রবাদ-জনশ্রুতির পরিষ্কার মীমাংসা করিয়া যান নাই, চারিজন ইমাম বা মুসলিম জগতের ধর্মগুরু সেই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং তাঁহাদের ভক্ত অনুসারে সুন্নী সম্প্রদায় চারিটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত—হানাফিয়া, মালেকী, সাফেঈ ও হম্বলী। উপসম্প্রদায়-গুলির নামকরণ ধর্মগুরুর নামানুসারে হইয়াছে[৮]।

চোখে দেখিয়া থাকেন। মাহ্দীর পিতা হাসান আস্কারী একাদশ ইমাম ছিলেন। ইনি বাগ্দাদের অন্তর্গত সরমানরাই নামক স্থানে ৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই শুক্রবার দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ভক্ত শীয়াগণ বিশ্বাস করে যে, মাহ্দীর মৃত্যু হয় নাই, তিনি কোথায়ও গোপনে লুকাইয়া আছেন। যখন যীশুখ্রীষ্ট দ্বিতীয়বার ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন মাহ্দী ইলিয়াসের সহিত আবার আসিয়া অবিশ্বাসীদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবেন। (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : চরিতাভিধান, ২য় সংস্করণ ১৩১৮ বাং, পৃঃ ৫০১।)

৭ J. R. A. S. Vol. XIII. 1852, p. 367.

৮ বিশ্বকোষ (একবিংশ ভাগ)। ১৩১৭, পৃঃ ৭৬১।
এবং Syed Ameer Ali : op. cit., p. 351.

'হানীফ্' শব্দের অর্থ সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি, অর্থাৎ ইস্‌লামধর্মের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তি। দ্বিতীয়তঃ, হযরত ইবরাহীমের পদাঙ্ক অনুসরণকারী এবং তৃতীয়তঃ, গোঁড়া বিশ্বাসী। 'হানাফী' মুসলমানগণ ইমাম আবু হানীফার অনুবর্তী। রসূলুল্লাহ্‌র জন্মের অব্যবহিত কাল পূর্বে কতকগুলি লোক প্রতিমা পূজায় আস্থা হারাইয়া একেশ্বরবাদী হইয়াছিলেন। তাঁহারা একেশ্বরবাদকে হযরত ইবরাহীমের প্রচারিত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এইজন্য তাঁহারা 'হানীফ' বলিয়া পরিচিত। 'হানীফ'-এর বহু বচন 'হুনফা' [৯]।

হযরতের ওফাতের পরে যাঁহারা চারিজন খলীফাকে তাঁহাদের যথার্থ উত্তরাধিকার বলিয়া মনে করে, অথবা ছয়খানি প্রামাণ্য দলিলরূপ গ্রন্থকে (কেতাবু সিত্তাহ্) গ্রহণ করে, বা যাঁহারা ইমাম আবু হানীফা প্রভৃতি চারিজন ধর্মনেতা কর্তৃক (Doctor of Jurisprudence)) প্রতিষ্ঠিত যে-কোন একজনের মতামতের অনুসারী, তাঁহারাই সুন্নী মুসলমান [১০]। ইমাম আবু হানীফার (সম্ভবতঃ হিজরী ৮০সন অথবা ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ) নামানুসারে 'হানাফিয়া' উপসম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। তিনি আবদুল মালিক বিন্ মারওয়ানের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত তাত্ত্বিক এবং পণ্ডিতব্যক্তি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি স্বদেশ কুফায় প্রত্যাবর্তন করিয়া শীয়া সম্প্রদায় সম্পর্কিত আইন ও ব্যবহারতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজে স্বাধীনভাবে আইন ও ধর্মীয় রীতি-পদ্ধতির প্রচলন করেন। হিজরী ১৫০ সনে তিনি দেহত্যাগ করেন।

---

৯ T. A. Brooks: Islam: A short study. Chapter XXV. Simla, 1911, p. 115.

১০ T. P. Hughes: A Dictionary of Islam, London. 1885. p 623.

ইমাম ইব্‌নে ইদরীস আস্‌ শাফেঈর নামানুসারে শাফেঈ উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব। ইমাম আবু হানিফা যে-বৎসর (হিজরী ১৫০ সন) মারা যান, সেই বৎসরে তিনি সিরিয়ার গাজা নামক স্থানে ভূমিষ্ঠ হন। খলীফা মামূনের শাসনকালে তিনি ২০৪ হিজরী সনে মিশরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি ফাতেমী বংশীয় ইমাম আলী ইব্‌নে মূসা-অর্‌ রেজার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গ্রন্থের গ্রন্থকার। ইমাম মালেক বিন্‌ আনাস্‌, মালেকী-উপসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। খলীফা হারুন-অর্‌-রশীদের শাসনকালে (হিজরী ১৭৯ সালে) তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি তাঁহার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আস্‌ শাফেঈ ছিলেন তাঁহার প্রধান শিষ্য। ইমাম আবু আব্‌দী ওয়াহ্‌ আহ্‌মদ ইব্‌নে হম্‌বলের নামানুসারে হমবল্‌-উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব। ইসলাম ধর্মের একেবারে প্রাথমিক যুগে তিনি ইসলাম ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে একজন উচ্চ শ্রেণীর সমালোচক ছিলেন। ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে (২৪১ হিজরী) পঁচাত্তর বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। খলীফা মামুন ও মুতাসীম বিল্লাহ্‌র শাসনকালে তিনি জীবিত ছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে গোঁড়ামীর জন্য তিনি খলীফাদ্বয়ের রোষ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন; তিনি দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়াছিলেন বলিয়াই খলীফা মামূন তাঁহার 'মতাজিলা' মতবাদ রাজ্য মধ্যে প্রচার করিতে সমর্থ হন নাই [১১]।

॥ শী'য়া ॥

শী'য়া (শীঅ'হ্‌) শব্দের অর্থ দল (Party) বা অনুসরণ-কারী[১] (followers) ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক যুগে রসূলুল্লাহ্‌র

---

১১ Syed Ameer Ali : op. cit., p 352.

১ (ক) M. T. Titus : R. Q. I. —Oxford University Press. 1930, p. 83.

অবর্তমানে হযরত আলীকে খলীফা মনোনয়নের ব্যাপার লইয়া তাঁহার অনুসরণকারী মুসলমানদের মধ্যে যে একটি বিশেষ দলের সৃষ্টি হয়, সেই দল শী'য়া নামে অভিহিত২। রসূলুল্লাহ্ ছিলেন একাধারে পয়গম্বর, রাজনীতিবিদ্ ও জননায়ক। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানবের ওফাতের পরে তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া মুসলমানগণের মধ্যে যে-প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে শী'য়া দলের উদ্ভব। এই শী'য়া দলের পূর্ণ নাম 'শী'য়া আহল-ই-বয়ত'। এই দলভুক্ত ব্যক্তিরা বলিল, হযরত আলী রসূলের একমাত্র কন্যা বীবী ফাতিমার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি খলীফা' বা 'ইমামে'র পদ অলঙ্কৃত করিবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। অতএব, ইসলাম ধর্মের প্রত্যুষ-যুগে শী'য়া শব্দটি যে-অর্থ দ্যোতনা

(খ) Syed Ameer Ali : The Spirit of Islam-London. 5th Edition 1949, pp. 122-123.

২ 'The name Shia is contracted from Shiat Ali, which means the party of Ali. The Shiat Ali were first the men of Iraq specially, as distinguished from the Syrians, the Shiat Muawin. Even after his death, Ali remained for the men of Iraq the symbol of their lost autocracy. Their Shiitism was no more than the expression of the feeling of hatred of the subdued province, especially the degraded capital Kufa, against the Umaiyids. The heads of the tribes and families of Kufa originally shared this feeling with the rest, but their responsible position compelled them to be circumspect'.

[J. Wellhausen : Arab kingdom and its fall. C. U. 1927. (Introduction) pp. 66-67.]

করিত, তাহা রাজনীতি-সম্পর্কিত[৩]। সুন্নী মুসলমানগণ গণভোট অনুসারে রসূলের পরে আবু বকর, ‘উমর, ‘উসমান এবং আলীকে যথাক্রমে ‘ইমাম’ বা ‘খলীফা’ পদের উত্তরাধিকারিত্ব প্রদান করিলেও শী’য়াগণ প্রথম তিন খলীফাকে ‘খলীফা’ বা ‘ইমাম’ বলিয়া স্বীকার করে না ; তাহাদের মতে, একমাত্র আলীই রসূলের পর মুসলমানগণের নেতৃত্ব গ্রহণের অধিকারী[৪]। তাহারা মনে করে, প্রথম তিন খলীফার মনোনয়ন অবৈধ ; কারণ, তাঁহাদের সঙ্গে রসূলের রক্তের কোন সম্পর্ক নাই ; অতএব, খলীফা বা ইমাম নিযুক্ত হইবার ন্যায়তঃ তাঁহাদের কোন অধিকার নাই[৫]। শী’য়াগণ এই প্রকার দাবী উত্থাপন করিলেও হযরত রসূল যে তাঁহার বংশধরগণকে মুসলিম জগতের ধর্মগুরুরূপে উত্তরাধিকার মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না। এতৎসত্ত্বেও শী’য়াগণ বলে, রসূলুল্লাহ্ সন্দেহাতীতরূপে আলী ও তাঁহার বংশধরদের উত্তরাধিকার মনোনীত করেন, ‘আল্‌ঘদির’ নামক স্থানে তাঁহার ঘোষণা হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়। তাছাড়া, অন্যান্য কতকগুলি স্থানেও আলীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করার কথা রসূল প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা দাবী জানায়[৬]।

---

৩ (i) T. A. Brooks : op. cit., pp 117-118.
(ii) James Hastings ed. : Encyclopaedia of Religion & Ethics, Vol XI. 1920, p. 453.
(iii) T. P. Hughes : op. cit., p. 572.

৪ এই মতবাদ (dogma) পরে সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে শী’য়াগণও খলীফা চতুষ্টয়কে মানিয়া লইয়াছিল।

৫ T. A. Brooks : op. cit. p. 118.

৬ James Hastings ed, : op. cit. ; p. 453.

প্রকৃতপক্ষে, রসূলুল্লাহ্‌ কোন উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া যান নাই। গণভোট অনুসারে আবু বকর মুসলিম-জগতের খলীফা বা ইমাম নির্বাচিত হন। হযরত ‘উমর, খলীফা আবু বকর কর্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৃতীয় খলীফার নির্বাচনের সময় হযরত আলীকে প্রথমে নির্বাচিত করা হয়; কিন্তু শর্ত ছিল যে, তিনি ধর্মগত নীতি অনুসারে ইসলাম ধর্মের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিবেন। শর্তের উত্তরে আলী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে দৃঢ়তার অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় তৎস্থলে ‘উসমান খলীফা নির্বাচিত হন। ইতঃপূর্বে বীবী ফাতিমা খলীফা আবু বকরের নিকট এই মর্মে এক দাবী উত্থাপন করেন যে, তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে হযরত রসূলের খেজুরের বাগানের দাবীদার*। খলীফা, বীবী ফাতিমার এই দাবী অগ্রাহ্য করিলে আলী-পরিবারের সকলেই অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর, ‘উসমান যখন খলীফা নির্বাচিত হইলেন, তখন আবদুর রহমান (নির্বাচন-ব্যাপারে যিনি মধ্যস্থতা করেন) হযরত আলীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি রসূলের নিকট-আত্মীয়তার সুযোগ লইয়া যেন নির্বাচন-দ্বন্দ্বে গুরুত্বলাভের চেষ্টা না করেন। ইহাতে হযরত আলীর পক্ষপাতী লোকের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তৎপর খলীফা ‘উসমানের শাসন-কার্যের দুর্বলতা ও অনুপযোগিতার সুযোগ লইয়া অনেকেই খলীফার বিপক্ষে দাঁড়াইল[৭]। তাঁহার হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করিয়া মুসলমানগণের মধ্যে দুইটি পৃথক ও শক্তিশালী শী'য়ার (দলের) উদ্ভব হয়। ইহাদের একটি হযরত আলীর শী'য়া এবং অপরটি মু'আবিয়ার। কিন্তু মু'আবিয়া যে-

---

* খেজুরের এই বাগানটি হযরত রসূল, যুদ্ধে পরাজিত অনেক শত্রুর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। শত্রুর পরাজয়ের পর এই বাগান বাজেয়াপ্ত হয়; এবং রসূলের অধিকারে আসে।

৭ James Hastings ed.: op. cit., pp. 453-454.

মূহূর্তে খলীফারূপে কুফার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তন্মুহূর্তে তিনি আর শী'য়া-দলপতি (Party Leader) রহিলেন না ; এবং তাঁহার শী'য়ারও (দলের) কোন অস্তিত্ব রহিল না। মু'আবিয়া তখন রাষ্ট্র-প্রধান হইলেন। এই সময়ে শী'য়া বলিতে শুধু আলীর শী'য়া (আলীর দল) অবশিষ্ট রহিল। আলীপন্থীগণ হযরত রসূলুল্লাহ্‌র পরিবারবর্গকে আইন-সঙ্গতরূপে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া অভিহিত করিল। মু'আবিয়ার সহিত আলীর বিবাদের সূত্রপাত হইতেই আলীর পক্ষপাতী ব্যক্তিদের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ মতবাদের সৃষ্টি হয়। এই মতবাদ অনুসারে আলী এবং তাঁহার বংশধরগণ ঐশ্বরিক শক্তির (Divine Right) অধিকারী ; এবং এই সূত্রে তাঁহারা বংশ-পরম্পরায় রসূলের উত্তরাধিকারী। সুতরাং শী'য়া বলিতে প্রথম দিকে 'রাজনীতিগত দল' বুঝাইলেও পরে 'ধর্মীয় দলকেই' বুঝাইয়া থাকে। এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। ইসলামে রাজনৈতিক মতবাদ প্রায় সব সময়ই ধর্মীয় মতবাদে পরিণত হইয়াছে [৮]। এতদ্ভিন্ন, এই মতবাদের পশ্চাতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিহিত আছে। হযরত রসূলের ওফাতের পরে, প্রথম তিন খলীফার আমলে নব-দীক্ষিত মুসলমান-গণের রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমানের সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা নামক ইমন্ দেশীয় জনৈক ইহুদী, মুসলমানগণের মধ্যে কলহ ও ভেদাভেদ সৃষ্টি করিবার অভি-লাষে ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিল ; এবং স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের আকাংক্ষায় সে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মতবাদ প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল [৯]। সে ইহুদী থাকা কালে নিজ সম্প্রদায়ের

---

৮ R. A. Nicholson : Literary History of the Arabs. Cambridge University, 1930, pp. 216 - 217.

৯ Ibid p. 215.

মধ্যে কলহ-বিবাদের সৃষ্টি করিত। ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সে খাঁটি মুসলমানরূপে নিজেকে পরিচিত করিতে চাহিল। কাজেই, আহল-ই-বয়তের দরদী সাজিয়া সে মুসলমানদের নির্দেশ দিল যে হযরত আলী, রসূলের অসমাপ্ত কর্ম সম্পাদনের জন্য তাঁহার 'অছিয়ত' করা ব্যক্তি, কিন্তু প্রথম তিন খলীফা রসূলের এই অছিয়ত করা (wasi) বাক্য গোপন করিয়া খলীফা হইয়াছেন ; এবং হযরত আলীর হক্ নষ্ট করিয়াছেন। ইব্‌ন সাবার এই মতবাদ প্রচারিত হইলে মুসলমানগণের মধ্যে প্রথম তিন খলীফা এবং হযরত আলীর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ বাধে। ইব্‌ন সাবা হযরত আলীর সম্বন্ধে গায়েবী খবর ও মোজেজার (অলৌকিক কার্য) কথা প্রচার করে ; আলীর অলৌকিক কার্যকলাপের কথা ঘোষণা করিয়া সে বলিল যে, আলী খুদাতালার শক্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন [১০]। ইব্‌ন সাবার মতানুসারে, পৃথিবীতে বহু পয়গম্বরের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং প্রত্যেক পয়গম্বরই তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তিকে অছিয়ত করিয়া গিয়াছেন। হযরত রসূল সর্বশেষ পয়গম্বর এবং হযরত আলী সর্বশেষ অছিয়ত করা ব্যক্তি। সুতরাং, রসূলুল্লাহ্‌র পরে আলী এবং আলীর পরে তাঁহার বংশধরগণ সর্বশ্রেষ্ঠ ; এই হিসাবে তাঁহারা খলীফা বা ইমাম পদলাভের অধিকারী। আবূ বকর, উমর ও 'উসমানের খলীফা পদ বেআইনী। আলীই যথার্থ খলীফা। ইব্‌ন সাবা হযরত আলীর পক্ষে এই প্রকার বহু যুক্তি উত্থাপন করিয়া মুসলমানদের বিভ্রান্ত করিতে থাকে। নিজের

---

১০ ক. আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহ্‌লবী রচিত 'তোওফায়ে এস্‌না আসারিয়া' গ্রন্থের উর্দূ তরজমা 'আয়নায়ে মজহাবে ইমামিয়া' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। কাশ্মীরি বাজার, লাহোর, ১৯২৯, পৃঃ ২-৩।

খ. R. A. Nicholson : op. cit., pp. 215-216.

মতবাদ প্রচার করিয়া সে হযরত আলীকে খুশী করিতে চেষ্টা করিলেও আলী তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কার করেন বলিয়া জানা যায়.[১১]। যাহা হউক, হযরত আলীর জীবৎকালেই শী'য়াগণের রাজনৈতিক মতবাদ ধর্মীয় মতবাদে পরিণত হয়। 'সাবাইয়া' সম্প্রদায় ধর্মীয় মতবাদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে[১২]। হযরত আলী, সিরিয়ার প্রাদেশিক শাসক মু'আবিয়ার সহিত খেলাফতির জন্য দ্বন্দ্ব উপলক্ষ করিয়া নিহত হন। অতঃপর, মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াযীদের কুফাবাসী সৈন্যবাহিনীর হস্তে আলী-পুত্র ইমাম হুসৈন শহীদ হন। আলীর পক্ষাবলম্বী কুফাবাসী অনেক শী'য়া ইয়াযীদের ভয়ে হুসৈনের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। তাহাদের অধিকাংশই পরে মুখতারের হস্তে নিহত হয়। যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা, এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে এবং পরে হযরত আলী ও আহল-ই-বয়তের অন্ধ ভক্তরূপে পরিগণিত হয়। হুসৈনের মৃত্যুর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কারবালায় তাঁহার মাযার (কবর)

---

১১ " ......according to Shahrastani he was banished by Ali for Saying, 'Thou art thou' (anta anta), i. e., 'Thou art God'—(Shahrastani, edited by Cureton, p. 132. I. 15) This refers to the doctrine taught by Ibn Saba and the extreme Shiites (Ghulat) who derive for him, that the Divine spirit which dwells in every prophet and passes successfully from one to another was transfused at Muhammad's death, into Ali and from Ali into his descendants who succeeded him in the Imamate." [R. A. Nicholson : Literary History of the Arabs — Cambridge University, 1930, p. 216.]

১২ R. A. Nicholson : op. cit., pp. 216 - 217.

শীয়াগণের তীর্থস্থান রূপে পরিণত হইয়াছিল[১৩]। শী'য়াগণ আলীর পরিবারভুক্ত ইমামগণের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করাকে তাহাদের ধর্মীয়-জীবনের অত্যাবশ্যকীয় কার্য বলিয়া মনে করে এবং তাহা হইলেই তাহাদের অন্যান্য শর্তগুলি আপনা আপনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই হিসাবে সমসাময়িক কালের ইমামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করিয়া যদি কোন শী'য়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে অবিশ্বাসী রূপে গণ্য হইবে [১৪]।

শী'য়াদের মতে, ইমামের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি হযরত আলীর পরিবারভুক্ত হইবেন। রসূলের সঙ্গে তাঁহার কেবল আত্মীয়তার যোগসূত্র থাকিলেই চলিবে না, অথবা তিনি কুরয়শ বংশজাত হইলেই হইবে না, তাঁহাকে রসূলের রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত হইতে হইবে; অর্থাৎ রসূলের কন্যা বীবী ফাতিমার সহিত আলীর বিবাহের ফলে আলী এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি বংশধরগণের উপর ইমাম পদ লাভের অধিকার ন্যস্ত হইয়াছে। এইজন্য আলী হইতে দ্বাদশ ইমাম মাহ্‌দী পর্যন্ত বারজন ব্যক্তি ছাড়া শী'য়াগণ অপর কাহারও আনুগত্য স্বীকার করে না। এই বারজন তাহাদের ইমাম। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ যেমন বিশ্বাস করে যে Messiah আবির্ভূত হইয়া কোন অজ্ঞাত কারণে অন্তর্ধান করিয়াছেন, তিনি পুনরাগমন করিবেন, তেমনি শী'য়াগণেরও ধারণা, দ্বাদশ ইমামের পুনরায় আবির্ভাব হইবে। তাহাদের মতে, ইমাম মাহ্‌দী ঐশ্বরিক শক্তিবলে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে পারেন; তিনি মরেন নাই, এবং ঐভাবে অবস্থানপূর্বক তিনি সব কার্য চালাইয়া যাইতেছেন। তিনি পৃথিবী ধ্বংসের প্রাক্কালে আবির্ভূত হইয়া

---

১৩ R. A. Nicholson : op. cit., p. 217.

১৪ Houtsma, Wensinck ed.: Encyclopaedia of Islam. Vol-IV. 1934, p. 350.

সকল অসাম্য ও ভেদাভেদ দূর করিবেন। ইমাম পুষ্পের ন্যায় নিষ্পাপ (মাসূম); কোন পাপ ও অন্যায় তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার উৎস, এবং আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক জগতের গুরু ও পথ-প্রদর্শক[১৫]। তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব দিতে পারেন। তিনি জ্ঞানে-গুণে তাঁহার সমসাময়িককালের সকল মানব হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি বিনয় ও নম্রতার আধার। তাঁহার ভক্তগণকে পরিচালিত করিবার জন্য তিনি যে-সব আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশ দিয়া থাকেন, তাহা নিজে কঠোরভাবে পালন করেন। তিনি নিজেই নিজের শিক্ষাদাতা ; এবং তাঁহার প্রার্থনা সব সময় আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হয়[১৬]। পার্থিব-জগতে তিনি শুধু হযরত রসূলের উত্তরাধিকারী নহেন, বরং তাঁহার মর্যাদা ও ক্ষমতারও সম্পূর্ণ অধিকারী। রসূলের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি আল্লাহ্‌তালার প্রেরিত বাণী (ওহি) সম্পর্কে মন্তব্য করিবার

---

১৫ (ক) Syed Ameer Ali : op. cit., pp. 124-126.
(খ) আবদুল আজিজ মোহাদ্দিস দেহ্‌লবী : পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১১।

১৬ 'One of the qualifications of an imam was never to be wanting in giving a ready answer to a question : nay, to know the nature of the quary before it was asked. He was superior in virtue and good habits to all the rest of the people of his time, and was also exceedingly polite and humble in his manners. Whatever orders were issued by him for the guidance of his followers, he followed them himself most rigidly. He had been taught learning by no one, and his prayers were alway acceptable to God.' (J. R. A. S. Vol. XIII, 1852, article XIV. p. 367.)

অধিকারী। তিনি নামে মাত্র মানব-দেহ ধারণ করেন ; এবং হযরত রসূল, হযরত আলীকে যে-'দিব্য জ্ঞান' প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আলীর মারফত তাঁহার মধ্যে সংক্রামিত হয়। তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে জটিল সমস্যাদির মীমাংসার ক্ষেত্রেও একমাত্র প্রতিনিধি। তাঁহার কার্যে অপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। সমাজ-অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সমস্যা সমাধানের জন্য যে রীতি-পদ্ধতি বাহির করে, তাহাতে ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ থাকা বিচিত্র নহে ; কিন্তু ইমামের রীতি-পদ্ধতি ত্রুটিশূন্য[১৭]।

ইসলাম-ধর্মের প্রাথমিক যুগের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে শী'য়া মতবাদ ও প্রভাব পৃথিবীর মুসলিম শাসিত বহু অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে ; এবং সময় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল শী'য়া সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা উপসম্প্রদায় ও শাখা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ঐতিহাসিক সারাস্তানী, মূল শী'য়া সম্প্রদায়কে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন[১৮]। যথা ঃ ক। ইস্‌নে আসারিয়া (ইমামিয়া) খ। জয়েদীয়া গ। ইস্‌মাঈলিয়া ঘ। কিসানিয়া ঙ। গলাত।

উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলি হযরত আলীকে কমবেশী অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করে। প্রধান প্রধান শী'য়া সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

প্রথমতঃ, ইস্‌নে আসারিয়া সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত শী'য়াগণ বার ইমামের প্রতি বিশ্বাসী*। এই জন্য ইহাদিগকে ইমামিয়াও বলা হয়। হযরত রসূলের পরে এই বারজন ইমাম পর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। ইমাম মাহ্‌দী এই সম্প্রদায়ভুক্ত

---

১৭ H. Lammens— Islam : Beliefs and institution (Eng. tr. from French by Sir E. Denison Ross.) London. 1st. Published in 1929. p. 147.

১৮ . Syed Ameer Ali ; op. cit., pp. 320-343.

* বার ইমামের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

শী'য়াগণের সর্বশেষ ইমাম। তাহাদের বিশ্বাস মাহ্‌দীর পুনরাবির্ভাব হইবে। তাঁহার আবির্ভাব হইলে বুঝিতে হইবে যে, পৃথিবীর শেষ দিন সমাগত; তিনি পৃথিবীতে সাত বৎসর রাজত্ব করিবেন[১৯]। দ্বাদশ ইমামের অন্তর্ধান-জনিত ঘটনা হইতে তাহারা একটি নূতন ধর্মমত গ্রহণ করে। ইহা 'শী'য়া-গায়েবা' অর্থাৎ সর্বশেষ ইমাম গায়েবী অবস্থায় (অদৃশ্যরূপে অবস্থান) থাকিয়া তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করেন[২০]।

দ্বিতীয়তঃ, যয়েদীয়া সম্প্রদায়। হযরত জয়নুল আবেদীনের তিরোভাবের পর তৎপুত্র মুহম্মদ বাকের ইমাম হন। অপর পুত্র ইমাম যয়েদ ধর্মকর্ম লইয়া বস্‌রা শহরেবাস করিতে থাকেন এবং বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু, উমাইয়া নরপতি হিসামের অধীনস্থ শাসনকর্তা য়ুসুফ বিন্'উমর আল্ সাখাফী, যয়েদের প্রতি অত্যাচার শুরু করিলে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়। রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য যয়েদ ইরাক ত্যাগ করিয়া সালেম উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে কয়েক হাজার শিষ্যসহ যুদ্ধ করিয়া তিনি 'উমাইয়া খলীফার অত্যাচার দমন করিবার চেষ্টা করিয়া নিহত হন। তাঁহার আত্মপ্রাণ উৎসর্গের পর বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। যয়েদের শিষ্যগণ 'যয়েদীয়া' নামে পরিচিত। ইস্‌নে আসারিয়া-সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত পঞ্চম ইমাম মুহম্মদ বাকেরের স্থলে যয়েদীয়া শী'য়াগণ মুহম্মদ যয়েদকে ইমাম বলিয়া গ্রহণ করে[২১]। তাহারা গোঁড়া শী'য়া নহে; তাহারা হযরত আলীর

---

১৯ Syed Ameer Ali: A short History of the Saracens. London. Reprinted in 1934. p, 295.

২০ H. Lammens: op. cit., p. 146.
Gibb & Kramers ed: S. E. I., 1953. p. 110.

২১ Houtsma, Wensinck etc. ed.: op. cit., p. 1193.

শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হইলেও অপরাপর তিন খলীফাকেও অভিসম্পাৎ করে না ; ইমাম ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে, তাহারা এ-কথাও স্বীকার করে না। অস্থায়ী বা সাময়িক বিবাহেও তাহাদের আস্থা নাই[২২]। ঐতিহাসিক সারাস্তানীর মতানুসারে যয়েদীয়া সম্প্রদায় চারিটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা ঃ যারুদিয়া, সুলায়মানিয়া, তাবারিয়া ও সালেহিয়া। যয়েদের প্রপৌত্র হইতে ইমামের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া এক দল অপর দল হইতে বিভিন্নতা সৃষ্টি করিয়াছে[২৩]। তৃতীয়তঃ, সাবাইয়া (Seveners) বা ইস্‌মাঈলিয়া সম্প্রদায়।

ষষ্ঠ ইমাম, জাফর আস্‌ সাদিকের মৃত্যু ঘটিলে মূল শী'য়া শাখা হইতে একটি দল তৎপুত্র ইসমাঈলকে কেন্দ্র করিয়া একটি ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করে। প্রধান শাখাভুক্ত শী'য়াগণ (ইস্‌নে আসারিয়া) ইসমাঈলকে অস্বীকার করিয়া দাবী জানায় যে, তাঁহার ভ্রাতা মুসা কাজিম প্রকৃতপক্ষে সপ্তম ইমাম। ইসমাঈলিয়া শী'য়াগণ হযরত আলী হইতে ইমাম ইসমাঈল পর্যন্ত সাতজন ইমামকে বিশ্বাস করে বলিয়া তাহাদের সম্প্রদায় 'সাবাইয়া' (সাধারণ নাম 'ইসমাঈলিয়া') নামে পরিচিত। তাহারা ইমাম ইসমাঈলের পর অপর কাহাকেও ইমাম বলিয়া স্বীকার করে না[২৪]।

প্রকৃতপক্ষে, শী'য়া সম্প্রদায় এবং তাহার শাখা-প্রশাখার বিবরণ জটিলতাপূর্ণ। আবদুল আজিজ দেহ্‌লবীর মতানুসারে মূল

Syed Ameer Ali: The Spirit of Islam, 5th Edition. 1949 pp. 320-321.

২২ Houtsma, Wensinck etc. ed.: op. cit., p. 1196.
H. Lammens: op. cit., p. 155.

২৩ Syed Ameer Ali: op. cit., p. 322.

২৪ ক. M. T. Titus: R. Q. I. 1930. pp. 84, 94-95.
খ. Gibb & Kramers ed.: S. E. I. 1953. p. 179.

শী'য়া সম্প্রদায় দুইটি প্রধান প্রশাখায় বিভক্ত। যথা ঃ

ক। শী'য়া-ই-সাবাইয়া বা তাবারিয়া

খ। শী'য়া-ই-গলাত[২৫]।

মূল শী'য়াগণ হযরত আলীকে অন্যান্য তিন খলীফা ও সাহাবাগণের উপরে স্থান দেয়। শী'য়া-ই-সাবাইয়া সম্প্রদায় তিনটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা ঃ কিসানিয়া* , যয়েদীয়া এবং ইমামিয়া। ইমামিয়া দল আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলে বিভক্ত। শী'য়া-ই-গলাত সম্প্রদায় হইতে অনেকগুলি উপদলের উদ্ভব হয়। তাহাদের মতামতের জন্য সুন্‌নীগণ, শী'য়াগণের এক প্রধান দলকে 'গলাত' (Extremist) নামে অভিহিত করে। এই শী'য়াগণের বিশ্বাস, হযরত আলী খুদাতালার শক্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহারা চরমপন্থী। ইহারা ইমামকে আল্লাহ্‌র অবতার বলিয়া মনে করে, এবং বিশ্বাস করে যে, আলী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী ইমামগণ মানবাকারে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ বিতরণ করিয়া থাকেন[২৬]। গলাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত উপসম্প্রদায়গুলি বর্তমানে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই উপসম্প্রদায়সমূহ ও তাহাদের

---

২৫ আবদুল আজিজ মহাদ্দিস দেহ্‌লবী ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬-৭

* 'Kaisaniya was a name first applied to the Kufa group of Shiites, the mawali, represented by Kaisan Abu Amra, whose interests were championed by Al-Mukhtar. The name was then extended to those who held the views which had considerable currency among the shiites led by Al-Mukhtar.' (Gibb & kramers ed : Shorter Encyclopaedia of Islam, 1953, p. 208.

২৬ '... extremists among the Shiah went so far as to consider the Imam, on account of this divine and luminous

বিশ্বাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। যাহা হউক, মূল শী'য়া-সম্প্রদায়কে নীচের ছকের সাহায্যে দেখানো হইল।
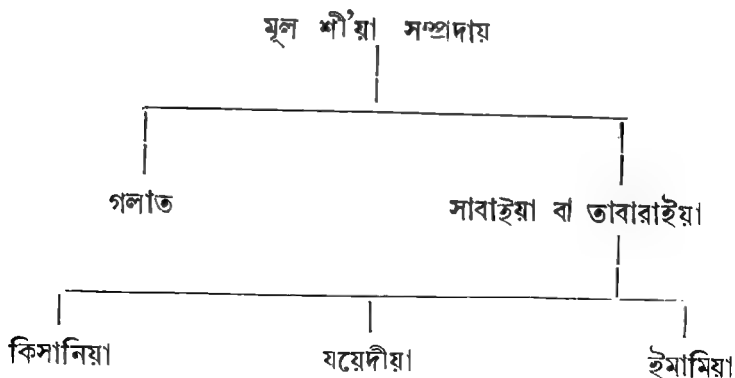
শী'য়া সম্প্রদায়ের মূলনীতি পাঁচটি প্রধান প্রধান বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা ঃ

১। আল্লাহ্‌র অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাসী হওয়া ;

২। তাঁহার ন্যায়-বিচারে আস্থাশীল হওয়া ;

৩। পয়গম্বরগণের ঐশ্বরিক দৌত্যের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া ; এবং হযরত রসূলকে তাহাদের পয়গম্বর বলিয়া মনে করা ;

৪। রসূলুল্লাহ্‌র পরে হযরত আলীকে একমাত্র খলীফা-রূপে বিশ্বাস করা।

---

essence, the incarnation of God himself. To them Ali and his descendant Imams constitute a continuous divine revelation in human form.' (P. K. Hitti : History of the Arabs, 5th Edition. 1951. pp. 247 - 248.)

৫। হযরত আলীর পরে তাঁহার বংশধরদের অর্থাৎ ইমাম হাসান হইতে ইমাম মাহ্‌দী পর্যন্ত দ্বাদশ ব্যক্তিকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করা[২৭]।

রাজনৈতিক কারণে মূল শীয়া সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত যতগুলি উপদল বা উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে, সেগুলি প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। যেগুলি এখনও অন্তর্হিত হইয়া যায় নাই, সেগুলি দ্রুত 'ইস্‌নে আসারিয়া' সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইতেছে। শীয়া বলিতে এই 'ইস্‌নে আসারিয়া' এবং 'ইসমাঈলিয়া' শীয়া সম্প্রদায়কেই বুঝায়। পারস্য, আরব, পশ্চিম আফ্রিকা এবং পাক-ভারতে এখন যে-সব শীয়া বসবাস করিতেছে, তাহাদের সকলেই এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত[২৮]।

২। ইমাম সম্পর্কে শীয়া-সুন্নীর ধর্মীয় পার্থক্য

'ইমাম' সম্পর্কে শীয়া-সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য বিদ্যমান। মোটামুটিভাবে এই পার্থক্যগুলি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। শীয়া মতানুসারে, 'ইমামের' অর্থ হযরত রসূলের উত্তরাধিকারী ; অর্থাৎ হযরতের অবর্তমানে মুসলিম জগতে, উত্তরাধিকারসূত্রে হযরত আলী, তদীয় পুত্র ইমাম হাসান, ইমাম হুসৈন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ 'ইমাম' পদ অলঙ্কৃত করিবার যোগ্য। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহাদের মতে 'ইমাম' শব্দের অর্থ 'খিলাফৎ'। কিন্তু সুন্নী সম্প্রদায়ে, ইমাম শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, ইসলামের ফিক্‌হ (Islamic Jurisprudence)

---

২৭ J. R. A. S. Vol. XIII. London 1852. article XIV. p. 367.

২৮ Syed Ameer Ali : op. cit., p. 350.

বা ধর্মীয়-বিধি আলোচনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আলিম ও ধর্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতকে ইমাম আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন: ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম শাফেঈ ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিও 'ইমাম' নামে অভিহিত হন। যেমন: ইমাম গাজ্জালী। তৃতীয়তঃ, নাফে এবং আসেম কেরায়াতের ইমাম। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে ইমাম ছিলেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং সুন্নী মতে, ইমাম অর্থে পণ্ডিত বা জ্ঞানবান ব্যক্তিকে বুঝায়।

শীয়া মতে, ইমাম লোকচক্ষুর অগোচরে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে পারেন এবং ঐভাবেই তিনি উপাসনা প্রভৃতি কার্য্যাদি পরিচালনা করেন। পক্ষান্তরে সুন্‌নীগণ বলে, ইহা অসম্ভব; কারণ ইমাম গুপ্তভাবে অবস্থান করিলে কাজ চলিতে পারে না। ইমামকে সর্বদা জন-সমাজে উপস্থিত থাকিতে হইবে[১]। সুন্নী মতানুসারে, নামায প্রভৃতি ধর্মীয়-কার্য সম্পাদনের জন্য ইমাম সশরীরে উপস্থিত থাকিবেন। যে-ক্ষেত্রে ধর্মীয়-কার্য বা উপাসনাদি সম্পাদন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না, সে-ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির দ্বারা কার্য সম্পাদিত হয়[২]। শীয়া মতে, ইমাম নিষ্পাপ (মাসূম) এবং ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে। পাপ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না[৩]। পক্ষান্তরে সুন্‌নীগণ বলে, ইমামের

---

১ ক, Syed Ameer Ali : The spirit of Islam. 5th Edition 1949. p. 126.

খ. J. R. A. S. - Vol. XIII. London. 1852, article XII. p. 367.

গ. আবদুল আজিজ মহাদ্দিস দেহ্‌লবী: পূর্বোক্ত, পৃ: ২১১।

২ Syed Ameer Ali : op. cit., p. 124.

৩ J. R. A. S. Vol. XIII. London, 1852, p. 367.

ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে। তিনি নিষ্পাপ হইতে পারেন না বা মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম হইবেন, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। স্বাধীন, প্রকৃতিস্থ, জ্ঞানী এবং পূর্ণ বয়স্ক যে-কোন মুসলমান ভোটাধিক্যে ইমাম নির্বাচিত হইতে পারেন[৪]।

শী'য়া মতে, ইমাম আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত হন ; কিন্তু সুন্নীগণ বলে, তাহা সম্ভবপর নহে। ইমাম সর্ব-সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন। শী'য়াগণের মত, নবুওতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ন্যায় ইমামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য। হযরত রসূলের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া যেমন প্রকৃত মুসলমানের পরিচায়ক, তেমনি ইমামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রকৃত শী'য়ার মূল ভিত্তি। সুন্নী মতে, যে-কোন উপযুক্ত ব্যক্তি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হইলে, তাঁহাকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই ; ফলে, নবুওতের ন্যায় ইমামের প্রতি বিশ্বাস অত্যাবশ্যকীয় নহে[৫]। শী'য়াগণ উত্তরাধিকার-সূত্রে ইমাম নির্বাচনে বিশ্বাসী হওয়ায় তাঁহাদের মতে হযরত রসূলের পর আলীই প্রকৃত ইমাম, পক্ষান্তরে সুন্নীগণ জনগণের ভোটাধিকারে ইমাম নির্বাচনে বিশ্বাসী। ইহাতে আবু বকর হইতে আলী পর্যন্ত চারিজন ব্যক্তি গণভোটের দ্বারা ইমাম বা খলীফা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। শী'য়া মতে, জনসাধারণের নির্বাচিত আবু বকর, 'উমর ও 'উস্মানের খিলাফৎ সম্পূর্ণ বেআইনী[৬]।

---

৪ Syed Ameer Ali : op. cit., pp. 126, 318-319,

৫ আবদুল আজিজ মহাদ্দিস দেহ্লবী : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৬।

৬ ক. T. P. Hughes : op. cit., pp. 572, 575.

খ. P. K. Hitti : History of the Arabs, 1951. p. 247.

গ Gibb & Kramers ed. : S. E. I. - 1953. p. 534.

যাহা হউক, ভারত ও বঙ্গদেশে শী'য়া-সুন্‌নী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধর্মীয় পার্থক্য বরাবরই ছিল। এতৎসত্ত্বেও শী'য়া সম্প্রদায় এদেশে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকে ; এবং তাহাদের ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া এতদ্দেশীয় সুন্‌নী মুসলমানের মনে স্বাভাবিক ধর্মবোধ ও অনুভূতি সর্বদা জাগ্রত থাকায় এবং কারবালায় ইমাম হুসৈনের শাহাদৎ সম্পর্কিত বিষাদাত্ম ও সরস কাহিনী সাহিত্য-রচনার উপযোগী হওয়ায় ভারত ও বঙ্গের ফারসী ও উরদূ ভাষার কবিদের ন্যায় বঙ্গীয় সুন্‌নী মুসলমান কবিগণও ইহাকে অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, বাংলা ভাষায় এক বিরাট মর্সীয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে ভারত ও বঙ্গদেশে শী'য়াগণের আগমন ও বসতি-স্থাপন সম্পর্কে আলোচিত হইবে।

৩। ভারত ও বঙ্গদেশে শী'য়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের আগমন ও বসতি স্থাপন

ভারতে মুঘল শাসনের বহু পূর্বে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে (১৩৪৭) দাক্ষিণাত্যে বাহ্‌মনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বাহ্‌মনী রাজ্যের সুলতানগণ সুন্‌নী মুসলমান ছিলেন। অতঃপর, ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫২৬) বাহ্‌মনী রাজ্যের পতন হইলে ইহা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয় ; এবং এই রাষ্ট্রগুলির শাসকবর্গ সকলেই শী'য়া মুসলমান হওয়ায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই সকল রাষ্ট্রে শী'য়া আধিপত্য বিস্তৃত হয়। মুঘলযুগে (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী) ভারতের নানা স্থানের ও বঙ্গদেশের জনসাধারণের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে ঈরানী আমীর, ওমরা, সৈনিক, কবি-সাহিত্যিক ও বণিকদের ধর্মীয় ভাব ও সংস্কৃতি

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। সম্রাট্ বাবুর, হুমায়ুন, আকবর প্রভৃতি মুঘল সম্রাটের আমলে দিল্লী ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলসমূহে শী'য়া মত ও ধর্মচর্চা ব্যাপকতা লাভ করে নাই বটে ; কিন্তু বহু ঈরাণী তাঁহাদের রাজদরবারে ও শাসন-কার্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকায় এদেশবাসী জনসাধারণের জীবন-ধারায় কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। তাহা ছাড়া, মুঘল সম্রাট্গণের মহানুভবতার গুণে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিভাবান পারস্য-দেশীয় কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিত হিন্দুস্তানে আসেন। সম্রাট্গণের দৌলতে অনেক শী'য়া রাজকর্মচারী জোতজমি ও জায়গীর-প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে থাকায় বহু অঞ্চলে শী'য়া-ধর্ম প্রসারিত হয়[১]। সম্রাট্ হুমায়ুন শেরশাহ্‌র নিকট পরাজিত হইয়া ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে ঈরাণে যান, এবং সেখানে শী'য়া নরপতি শাহ্‌ তাহ্‌মাস্‌পের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। হিন্দুস্তানে শী'য়া-ধর্ম ব্যাপকরূপে প্রচারের জন্য তাহ্‌মাস্‌প অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে শী'য়া-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় সেখানে শী'য়া প্রভাব ও প্রতিপত্তি যেমন সুদৃঢ় হইয়াছিল, তদ্রূপ উত্তরভারতে হইতে পারে নাই ; কারণ বাবুর, হুমায়ুন প্রভৃতি সম্রাট্গণ সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের সঙ্গে ঈরাণী সাফাবী বংশীয় শী'য়া নরপতিগণের সদ্ভাব ছিল না। যাহা হউক, শাহ্‌ তাহ্‌মাস্‌প

---

১ Badayuni mentions one hundred & seventy who had mostly born in Persia. Shibli says that fifty one came in Akbar's time and Sprenger supplies a long list. Most of these, if not all, were undoubtedly shiahs. In many cases, emperors gave grants of land to their Government officers, and in this way Shiat communities have been established in many places. (M. T. Titus : The Religious Quest of India, 1930. p. 91), and E. G. Browne : A Literary History of Persia, Vol. IV. 1953. p. 165.

সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া হুমায়ূনকে শী'য়া মতবাদে দীক্ষিত করিবার জন্য চাপ দিলেন। হুমায়ূন প্রথমে শীয়া-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেও নিজের জীবনাশঙ্কায় পরে স্বীকার করেন[২]। ইহাতে তাহ্‌মাস্‌প খুশী হইয়া মুঘল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তৃতীয় পুত্র মীর্যা মুরাদের তত্ত্বাবধানে বার হাজার সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া হুমায়ূনকে সাহায্য করেন; এবং সম্রাটের দেহরক্ষী হিসাবে তিন শত যোদ্ধাকে (কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ছয় শত বলিয়া প্রকাশ) তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করেন[৩]। এই সমস্ত অশ্বারোহী ও দেহরক্ষীর প্রায় সকলেই ছিল শী'য়া। হিন্দুস্তানে আসিয়া সম্রাটের রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার পর এই সৈন্যদলের অধিকাংশই দেশে ফিরিয়া যায় নাই; বরং সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে তাহারা দিল্লী এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকে। ফলে, তাঁহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবধারা এদেশবাসী

---

২ ... at this time the Shah's bigotry again manifested itself and he bluntly demanded that Humayun should embrace the Shiah beliefs, otherwise he would have him burnt to ashes with the firewood which had been collected for his entertainment. This at first the Prince stoutly refused to do ··· the Shah (Tahmasp) replied that he must either accept the Shiah tenets or suffer the consequences of refusal. Seeing that he was at the mercy of a man who would not scruple to push his advantage to the uttermost to gain his ends, Humayun agreed to comply. (Ishwari Proshad: The life & time of Humayun. 1955. p. 230.)

also - Elphinstone: History of India, 5th impression, 1866. p. 464.

৩ Ishwari Proshad: The life and time of Humayun, 1955. p. 235.

জনগণের ভাবধারার সঙ্গে মিশিয়া যায়। হুমায়ূনের পরে অন্যান্য মুঘল সম্রাট্গণের সামাজিক ও ধর্মীয় ঔদার্য অধিক মাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লইয়া দেখা দিল। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে দিল্লীর মুঘল শাসকবর্গের সঙ্গে ঈরাণের সাফাবী বংশীয় নরপতিগণের সদ্ভাব না থাকিলেও সম্রাট্ আকবর ও জাহাঁগীর পূর্ববর্তী আরব, তুর্কী ও আফগান শাসকদের ন্যায় গোঁড়া ছিলেন না[৪]। কাজেই পার্ষদ, সভাসদ, আমীর-ওমরা প্রভৃতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শী'য়াধর্মভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও মুঘল বাদশাহ্গণ ইহাদিগকে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিতেন। বিশেষতঃ ঈরাণের সাফাবী বংশীয় নরপতির আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভারতের সুন্নী সম্রাট্গণের আত্মীয়-স্বজনের বিবাহ-বন্ধন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতের সহিত ঈরাণের যোগাযোগ এবং অন্যান্য কারণে এত অধিক সংখ্যক শী'য়া নরনারী মুঘল শাসিত ভারত ও বঙ্গদেশে আসিতে আরম্ভ করিল যে, তাহার ফল সর্বক্ষেত্রে সুদূর-প্রসারী হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে, সম্রাট্ জাহাঁগীর (১৬০৫-২৭) ও সম্রাট্ শাহ্জাহানের (১৬২৮-৫৮) শাসনকালে শী'য়া-ধর্ম ব্যাপকরূপে ভারত ও বাংলা দেশের অভ্যন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। যে-সকল কারণে মুঘল শাসনের মাত্র এক শতাব্দী কালের মধ্যে শী'য়া ধর্ম ভারত ও বঙ্গদেশের সর্বত্র অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলির বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

(১) বিবাহ-বন্ধন ঃ

ক. পারস্যের সাফাবী বংশীয় শী'য়া নরপতিগণের আত্মীয়-স্বজনের সহিত মুঘল সম্রাট্গণের আত্মীয়-স্বজনের বিবাহ-বন্ধন-

---

৪ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : মু. বা. সা. ১ম প্রকাশ, ১৯৫৭, পৃঃ ১২৯। J. N. Sarkar, Sir. : A short History of Aurangzib (1618-1707) Calcutta 1930, pp. 114-115.

জনিত সম্পর্কের ফলে শী'য়া প্রভাব ভারতের রাজধানী ও অন্যান্য প্রদেশে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। বাংলাদেশে ইহার প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে। বাংলা দেশের কয়েকটি সহরকেন্দ্রিক স্থানে (ঢাকা, রাজমহল ও পরে মুর্শিদাবাদ) শী'য়া মতবাদ প্রচারিত হয়; এবং স্থানগুলি শী'য়াগণের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। একটি উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করিব। ভারত ও ঈরাণের বাদ্‌শাহ্‌গণের বংশ-লতিকা সহযোগে তাঁহাদের পারস্পরিক যোগাযোগ দেখান হইল।
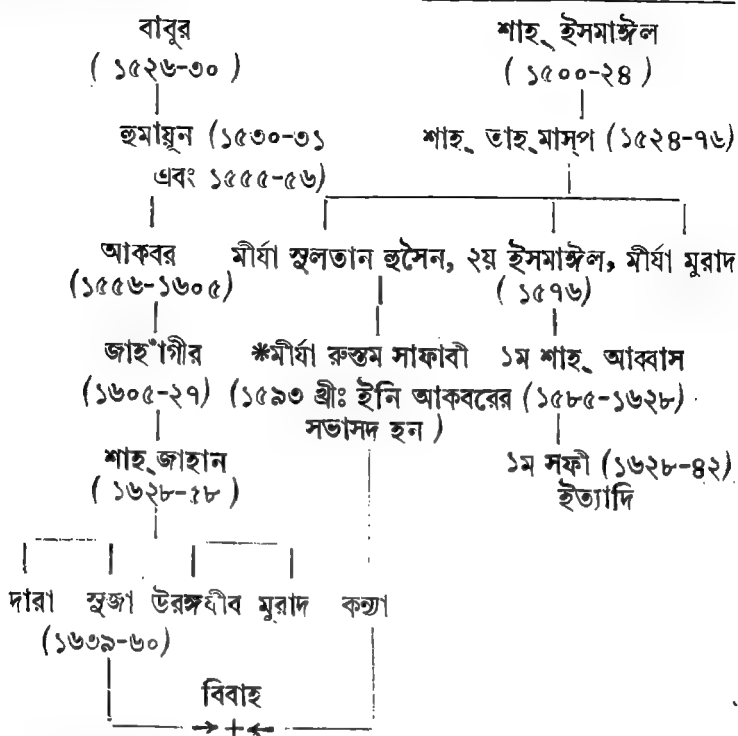
* 'Mirza Rostom Safavi of Kandahar was the son of Mirza

উপরোক্ত দুইটি পৃথক রাজ-বংশের বংশ-লতিকা দ্বারা দেখান হইল যে, সুলতান সুজা কান্দাহারের রুস্তম মীর্যার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রুস্তম মীর্যা, মীর্যা সুলতান হুসেনের পুত্র এবং মীর্যা সুলতান হুসৈন, শাহ্ ইস্‌মাঈল সাফাবীর পৌত্র ছিলেন। রুস্তম মীর্যা (১৫৯৩) ভারত-সম্রাট্ আকবরের সভাসদ্‌রূপে সমাদৃত হন[৫]। শাহ্‌জাদা সুজা সুবে-বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুবাদার হিসাবে তাঁহার সুদীর্ঘ কার্যকালের মধ্যে (১৬৩৯-৬০) তিনি অল্প কয়েক বৎসর মাত্র (১৬৪৭-৪৮ ও ১৬৫২) অনুপস্থিত ছিলেন এবং এই সময়ে ইতেকাত খান অস্থায়ীভাবে বাংলার শাসন কার্য পরিচালনা করেন[৬]। সুবে-বাংলার সুবাদার, সুলতান সুজার পত্নী শী'য়া-ধর্মভুক্ত ঈরাণের শাহ্ ইসমাঈলের বংশধর হওয়ায় সুজার উপরে শী'য়া প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। সুবিখ্যাত ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ার 'Travels in the Mughal Empire (1656-68 A. D.)' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, সুলতান সুজা শী'য়া ধর্মভুক্ত ছিলেন। তাঁহার শী'য়া ধর্ম-গ্রহণের কারণ রাজনৈতিক। তখন মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ আমীর-উমরা শী'য়া ধর্মভুক্ত হওয়ায়

Sultan Hussain, the grandson of Shah Ismail, king of Persia. He became a court-noble in the court of Akbar in 1593.' (T. W. Beale: Oriental Biographical Dictionary - Edited by A. S. B. Calcutta, 1881, p. 178)

৫ T. W. Beale: The Oriental Biographical Dictionary, Edited by A. S. B-1881. Calcutta. p. 178.

এবং নওয়াব সামসোদ্দৌলা শাহ্ নওয়াজ খান: মাসিরুল ওমরা - ৩য় খণ্ড, সম্পাদনা— এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৮৯১, পৃ: ২৯৬।

৬ J. N. Sarker, Sir. ed.: History of Bengal. Vol. II D. U. 1948. p. 229.

মুঘল রাজ-দরবারে তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল বেশী ; এবং তাঁহাদের মারফত সুলতান সুজার কার্যোদ্ধার হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিত [৭]। কাজেই, সুজার সুবাদার থাকা কালে বাংলা দেশে যে-সকল আমলা ও কর্মচারী বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই পারস্য দেশীয় শী'য়া ছিলেন। এই সকল আমলা সম্ভবতঃ সোজা সমুদ্রপথে বাংলায় আসেন ; কারণ মুস্লিম শাসন-আমলে সমুদ্রপথ বাংলা ও ঈরাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিল[৮]। সে যাহা হউক, বিবাহ-বন্ধনের মারফত বাংলা দেশে শী'য়া-ধর্ম প্রসারিত হয় ; এবং তাহা ক্রমে ক্রমে ব্যাপকতা লাভ করে।

খ. কাসেম খান জুবাইনী (১৬২৮–৩২) বাংলার সুবাদারগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি সুবাদার ইস্‌লাম খানের শাসন কালে (১৬০৮–১৩) সর্বপ্রথম বাংলায় আসেন। তখন তিনি ইস্‌লাম খানের অধীনস্থ খাজাঞ্চী ছিলেন। পরে নিজ কর্মদক্ষতায় সুবাদার নিযুক্ত হন[৯]। জুবাইনী এবং তাঁহার পূর্ববর্তী বাংলার তিনজন সুবাদার মহব্বত খান (১৬২৫-২৬), তদীয় পুত্র খান আজাদ খান (প্রকৃত নাম ঃ মীর্যা আমানুল্লা খান, ইনি অস্থায়ীভাবে কার্য করেন); এবং ফিদাই খান ওরফে মীর্যা হেদায়েত উল্লাহ খানও (১৬২৭-২৮) শী'য়া ছিলেন। কাশেম খান জুবাইনী সুবাদার নিযুক্ত হইয়া (১৬২৮) বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিলে, বাংলা দেশের শাসন কার্যে দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি শী'য়া সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের অধিকারে আসে। শী'য়া মতাবলম্বী

---

৭ বিনয় ঘোষ ঃ বাদশাহী আমল ; [ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত (Travels in the Mughal Empire-1656-68 A. D.) অবলম্বনে]। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৩ বাং পৃঃ ২৩।

৮ J. N. Sarkar, Sir ed. : op. cit., p. 335.

৯ নওয়াব সামসোদ্দৌলা শাহ্ নওয়াজ খান ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮।

ঈরাণের মীর্যা গিয়াস বেগ ভাগ্যান্বেষণে সপরিবারে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসেন। সম্রাট্ আকবর গিয়াস বেগের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেন। তাঁহার খ্যাতনাম্নী কন্যা, সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কনিষ্ঠা ভগ্নী মনিজা বেগমের সহিত কাশেম খান জুবাইনীর বিবাহ হয়[১০]। সুতরাং সম্পর্কের দিক দিয়া কাশেম খান জুবাইনী সম্রাট্ জাহাঁগীরের নিকট-আত্মীয় ছিলেন। কাসেম খান স্বীয় পত্নীর প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য বাংলা দেশে শী'য়া ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন; ইহাতে সম্রাট্ জাহাঁগীর বা শাহ্ জাহানের নিকট হইতে তিনি কোন প্রতিবন্ধক পান নাই। বিশেষতঃ, সম্রাট জাহাঁগীরের রাজসভায় শী'য়া সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হইয়াছিল। মীর্যা জাফর বেগ (উপাধিঃ আসফ্ খান) নামক এক ব্যক্তি সম্রাটের রাজ-দরবারের প্রধান-মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মীর্যা বদিউজ্জামান। ইতঃপূর্বেই বাংলা দেশে শী'য়া-ধর্ম সমাজ-অঙ্গে গভীরভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে ঢাকার শী'য়া সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল 'হুসৈনী দালান'-য়ের কথা উল্লেখ করিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 'হুসৈনী দালান' সম্পর্কে লিখিতে গিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ইহাকে শী'য়াগণের একটি ধর্মীয় তাজীয়াখানা না বলিয়া চকের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি সুন্দর মস্‌জিদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; (History of Bengal, Vol II D. U. 1948, edited by Sir J. N. Sarkar. p. 390) । টেলর্ সাহেবও ইহাকে মুসলমানদের একটি উপাসনাগৃহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; (Topography & Statistics of Dacca, Calcutta 1840. pp. 90-91)[১১]।

---

১০ J. N. Sarker, Sir ed, : op. cit., p. 229.

১১ যদুনাথ সরকার ও টেলর্ সাহেবের মত গ্রহণযোগ্য নহে; কারণ, হুসৈনী দালান একটি 'মস্‌জিদ' বা 'মুসলমানগণের উপাসনাগৃহ' নহে

হুসৈনী দালানের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠার তারিখ লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান ১২। কিন্তু হুসৈনী দালানের গাত্রদেশে উৎকীর্ণ ফারসী লিপি, সকল সন্দেহ নিরসন করিতেছে। এই ফারসী লিপি হইতে জানা যায় যে, এই 'মাতমসারা' (ইমামবাড়া) ১০৫২ হিজরী সনে অর্থাৎ ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে[১৩] মীর মুরাদ কর্তৃক নির্মিত

এবং তাহা চকের উত্তর দিকেও অবস্থিত নহে। প্রকৃতপক্ষে, 'হুসৈনী দালান' শীয়া মুসলমানদের একটি ধর্মীয় তাজীয়াখানা। ঢাকার বর্তমান সেণ্ট্রাল জেলখানার সন্নিকট হইতে শ্যার নাজিম উদ্দীন রোড্ ধরিয়া রমনা অভিমুখে অগ্রসর হইলে রেলওয়ে লাইন সম্মুখে পড়ে। এইখানে একটি ছোট রাস্তা 'হুসৈনী দালান রাস্তা' নামে পরিচিত। এই রাস্তা ধরিয়া পশ্চিম দিকে কিছুটা পথ অতিক্রম করিলেই হুসৈনী দালান দেখিতে পাওয়া যায়: (Dr. A. H. Dani : Dacca Published at Dacca. 1956. pp. 102-103)।

১২ হাকীম হাবিবুর রহমান, মীর মুরাদকে প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করেন না, তবে তাঁহার ধারণা, কোন এক অনির্দিষ্ট সময় হইতে একটি ক্ষুদ্র তাজীয়াখানার অস্তিত্ব ছিল। (Dr. A. H. Dani : Dacca Published at Dacca 1956. p. 103)। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার হুসৈনী-দালানের প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে করেন, (History of Bengali. Vol. II. D. U. 1948. p. 340) । বিখ্যাত মনীষী টেলর সাহেবের মতে সুবাদার সুলতান মুহম্মদ আযমের শাসনকালে ১৬৭৮-৭৯ (?) খ্রীষ্টাব্দে মীর মুরাদ নামক এক দারোগা কর্তৃক হুসৈনী দালান নির্মিত হয়। (Topography & statistics of Dacca, Calcutta 1840. pp. 90-91.) যদুনাথ সরকার ও টেলর্ সাহেবের মত যে স্বকপোলকল্পিত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

১৩ হিজরী ১০৫২ সন হইলে ইংরেজী ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। (H. N. Wright : Catalogue of the coins in Indian Museum, Calcutta. Vol III, Oxford. 1908. p. 353.)

হইয়াছে [১৪]। নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুর (মৃ০ ১৮২৩) ক্ষুদ্র তাজীয়াখানাকে বর্তমানের সুরম্য ইমামবাড়ায় পরিণত করেন। 'তাজকিরা-ই-নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুর' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 'নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুর 'ঢাকার বিবরণ' পুস্তকে লিখিয়াছেন, মীর মুরাদ একজন সম্ভ্রান্ত সৈয়্যিদ এবং বাদশাহ্‌র শাহী ইঞ্জিনিয়র ছিলেন।'

মূল ফারসী অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

میر مراد کہ از اجلہ و سادات و میر عمارت بادشاہی بود [১৫]

এখানে میر عمارت কথাটি লক্ষণীয়। ইহার অর্থ 'ইঞ্জিনিয়র' [১৬]। বস্তুতঃ তিনি একজন বিশিষ্ট সৈয়্যিদ এবং সম্রাটের শাহী ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। সুবিখ্যাত 'মাসিরুল ওমরা' গ্রন্থেও মীর মুরাদের সম্পর্কে লিখিত আছে যে, তিনি জুবিনের একজন সম্ভ্রান্ত সৈয়্যিদ ছিলেন। তিনি বহুকাল যাবৎ দাক্ষিণাত্যে বসবাস করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে 'মীর মুরাদ দাক্ষিণী' নামে অভিহিত করা হইত [১৭]। বাংলায় সুবাদার কাসিম খান জুবাইনীর সহিত মীর মুরাদের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকাও বিচিত্র নহে। কারণ বাংলা দেশে জুবাইনীর সুবাদারীর কার্যকাল শেষ হইলে তাহার মাত্র দশ বৎসর পরে (সুলতান সুজার সুবাদারীর সময়ে) ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে মীর মুরাদ

---

১৪ মূল ফারসী লিপি ঃ

ساخت این ماتم سرا سید مراد
در سن پنجاہ و دو بریک ہزار

১৫ সৈয়্যিদ আবদুল গনি ওরফে হামিদ মীর ঃ তাজ্‌কিরা-ই-নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুর। ঢা. বি. লাইব্রেরীতে রক্ষিত উর্দূ পাণ্ডুলিপি। কাজেম উদ্দীন সিদ্দিকী কর্তৃক সংগৃহীত; পৃঃ ৪১।

১৬ A comprehensive Steingass's Persian - English Dictionary, 1930. p. 1360,

১৭ নওয়াব সামসোদ্দৌলা শাহ্ নওয়াজ খান ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮।

'হুসৈনী দালান' প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান সুজার সুবাদারীর বহু পূর্বকাল হইতে ঢাকাস্থ শী'য়া সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারীর সংখ্যাধিক্য হেতু এই প্রকার একটি তাজিয়াখানার পত্তন সম্ভবপর হইয়াছিল। হুসৈনী দালানের প্রাথমিক নাম ছিল 'দালানে মোকাদ্দেস হুসৈনী' অর্থাৎ পবিত্র হুসৈনী দালান [১৮]। যাহা হউক, হুসৈনী দালানকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকার পরবর্তী শী'য়া নবাব ও নায়েবগণ জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার মানসে মুহর্রমের সময় জাকজমকের সহিত মিছিল বাহির করিতেন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিতেন।

(২) রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা ঃ

ক. এদেশে শী'য়া মুসলমানগণের আগমন ও বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে ইহাকেও একটি অন্যতম কারণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। সম্রাট্ জাহাঁগীরের রাজত্বকালে (১৬০৫-২৭) সুবাদার ইস্‌লাম খান (১৬০৮-১৩) বাংলা দেশে মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে পত্তন করেন। তিনি পাঠান, আরাকানী মগ এবং পর্তুগীজ দস্যুদের দমন করিয়া বাংলা দেশে শৃংখলা ফিরাইয়া আনেন। তিনি রাজমহল হইতে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন এবং ঢাকার নামকরণ করেন 'জাহাঁগীর নগর' [১৯]। ইস্‌লাম খাঁর পরে কয়েকজন শী'য়া সুবাদার রাজধানী ঢাকায় শাসনকার্যের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন ঢাকায় আসিতেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে বহু লোক-লস্কর এবং রাজকর্মচারীও আগমন করিত। এই লোক-লস্কর এবং রাজকর্মচারীদের মধ্যে শী'য়া মুসলমানও যথেষ্ট

---

১৮ সৈয়্যিদ আবদুল গনী ওরফে হামিদ মীর ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯ ও ৪১।

১৯ হাকিম হবিবুর রহমান ঃ ঢাকা আজ্‌ সে পঁচাশ বরস্‌ পহ্‌লে। লাহোর, ১৯৪৯, পৃঃ ১০।
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ঃ মু. বা. সা. ১৯৫৭, ঢাকা পৃঃ ১২২।

থাকিত। তাহারা ঢাকায় আসিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করার ফলে ঢাকার জনসাধারণের মধ্যে বহু লোক শী'য়া মত ও রাজনীতি গ্রহণ করে। তৎকালে শী'য়াগণের প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে ঢাকার বহু স্থানের নামকরণ তাহাদের নামানুসারে হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ মুঘলটুলি, মীর্যা মান্না দেউড়ী, আগা নওয়াব দেউড়ী, আগা সাদেক রোড্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

খ. সম্রাট্ ঔরঙ্গযীবের রাজত্বের শেষভাগে বাদশাহ্‌র পৌত্র আযীমু-শ্-শান্ (১৬৯৭-১৭১২) যখন ঢাকার সুবাদার, তখন মুর্শিদকুলী খান বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। তিনি কয়েক বৎসর (১৭০৩-১৭) বাংলার নায়েব-সুবাদারও ছিলেন। নানা কারণে সুবাদার আযীমু-শ্-শানের সহিত দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁর বিবাদ বাধিলে ঢাকা হইতে দেওয়ানী কার্যভার মক্‌সুদাবাদে (১৭০৪) স্থানান্তরিত হইল। সুবাদারের পদ হইতে আযীমু-শ্-শান অপসারিত হইলে বাংলার রাজধানীও মক্‌সুদাবাদে স্থানান্তরিত হইল; এবং মুর্শিদকুলী খাঁর নামানুসারে মক্‌সুদাবাদের নাম 'মুর্শিদাবাদ' রাখা হইল[২০]। ইহার কিছু পূর্বকাল হইতে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঈরাণের সাফাবী রাজবংশীয় নরপতিগণ শাসনের নামে প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাইতে থাকিলে সেখানে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে, ঈরাণের বহু সুসন্তানের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠে। এই সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের সহিত পাশ্চাত্যদেশের নৌচলাচলের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। কাজেই, ঈরাণের কিছু সংখ্যক গন্যমান্য শী'য়া মুসলমান দিল্লীর সম্রাট্ অথবা দাক্ষিণাত্যের গোলকুণ্ডা ও বীজাপুরের

---

২০ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৫।
Pakistan Quarterly. Vol. VIII. No 2. Summer, 1958, pp. 20-24.

সুলতানদের রাজদরবারে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, এবং বহু সংখ্যক লোক সোজা মুর্শিদাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মুর্শিদকুলী খাঁর চৌদ্দজন আত্মীয় ঈরাণের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; মুর্শিদকুলী খাঁর অনুরোধে বাদশাহ্ ত াহাদের প্রত্যেকের জন্য বাংলার মন্সব্দারের পদ অনুমোদন করেন[২১]। এই সময়ে ঈরাণ হইতে অধিকাংশ শী'য়া ভারতে প্রবেশ করিলেও তাহারা উত্তর ভারতের অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন না করিয়া সোজাসুজি বাংলা দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার কারণ ছিল। বন্দর আব্বাস অথবা বস্রা হইতে হুগলীতে যাতায়াতের পথ ও খরচা অত্যন্ত কম থাকায়, বাংলা দেশে বসতি স্থাপনের জন্য তাহারা প্রলুব্ধ হইল। আবার কেহবা আফগানিস্তানের গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া এবং কেহবা সুরাট বন্দর দিয়া আসিয়া ভারতে বসতি স্থাপন করিল। অতঃপর, মুর্শিদাবাদের সুবাদার মুর্শিদকুলী খান (অন্য নাম মীর্যা মুহম্মদ হাদী) শী'য়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া ঈরাণের শী'য়াগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। ইহার ফলে, স্বভাবতঃই ঈরাণের সকল শ্রেণীর শী'য়া নরনারী, পণ্ডিত, ডাক্তার কবিরাজ, ব্যবসায়ী ও বণিক বিপুল সংখ্যায় রাজধানী মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল এবং সুবাদার মুর্শিদকুলী খান শী'য়া ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও উন্নতি বিধানার্থে এই সমস্ত দেশত্যাগী ব্যক্তিকে সাদরে গ্রহণ করিলেন[২২]। বাংলায় মুর্শিদকুলী খান যে-শী'য়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা বহু দিন পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-২৭), সুজা উদ্‌দীন (১৭২৭-৩৯), সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০),

---

২১ J. N. Sarkar, Sir, ed.: op. cit., pp. 224-225.
M. T. Titus: R. Q. I. 1930. p. 91.

২২ J. N. Sarkar, Sir, ed.: op. cit, pp. 223-225.

[আলীবর্দি খান* (১৭৪০-৫৬), এবং মীর্যা মুহম্মদ সিরাজদ্দৌলা* (১৭৫৬-৫৭)]—এই কয়জন সুবাদার (১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে দিল্লীর মুঘল শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ায়, অর্ধ-স্বাধীন সুবাদারগণ অসীম ক্ষমতাদ্যোতক 'নবাব' উপাধি ব্যবহার করিতে শুরু করেন ; মুর্শিদকুলী খান তাঁহার সুবাদারীর সময় হইতে বাংলার 'নবাব' হইলেন) শী'য়া সম্প্রাদায়ভুক্ত ছিলেন ; ফলে, বাংলা দেশের মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয়ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন দেখা দিল, এবং রাজধানী মুর্শিদাবাদ বাংলার শী'য়া সম্প্রদায়ের একটি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে পরিণত হইল। আলীবর্দি খান, নবাব সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া (১৭৪০) বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হইলেন এবং দিল্লীর বাদশাহ্ মুহম্মদ শাহ্‌কে বহু খেলাৎ ও উপঢৌকন দিয়া এবং নবাবী সনদ গ্রহণ করিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। আলীবর্দির প্রকৃত নাম মীর্যা মুহম্মদ আলী ; তাঁহার পিতার নাম মীর্যা মুহম্মদ। আলীবর্দির পরে তদীয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা নবাব হন। রাজধানী মুর্শিদাবাদে এই সকল নবাবের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে নবাব-প্রাসাদের সংলগ্ন স্থানে 'শী'য়া-ইমামবাড়া' প্রতিষ্ঠিত হয় [ক]।

---

* আলীবর্দি খান এবং সিরাজদ্দৌলা শী'য়া ছিলেন, সে বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়ায়, বিশেষ করিয়া তাঁহাদের শী'য়া আচার-পদ্ধতি অনুশীলনের প্রমাণ থাকায় তাঁহারা শী'য়া মতবাদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার আলীবর্দি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি অতি হীনাবস্থায় ভাগ্যান্বেষণে পারস্য হইতে সপরিবারে ভারতে আগমন করেন এবং উড়িষ্যাতে উপস্থিত হইয়া, মাত্র একশত টাকা বেতনে চাকুরী শুরু করেন। (History of Bengal. Vol-II. D. U. 1948. p. 468,)

ক. এখানে মুহর্রম মাসের প্রথম দশ দিন মহা আড়ম্বরের সহিত শী'য়া অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয় ; এবং সমস্ত খরচ রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়।

সুবে-বাংলার রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে অপসারিত হইলেও ঢাকার গুরুত্ব কমে নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা দেশের দেওয়ানীভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পর কোম্পানীর পেন্সন-ভোগী ঢাকার চারিজন নায়েব নাযিম** নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকে গোঁড়া শী'য়া ছিলেন এবং তাঁহাদের বিবাহ প্রভৃতি কার্য লক্ষ্ণৌর নবাব-পরিবারের সহিত সম্পন্ন হইত। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ঢাকায় শী'য়া-ধর্মের তৎপরতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(৩) ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হওয়ায় শী'য়াগণের ভারত ও বঙ্গে আগমন ঃ

জাফর খান অনুভব করিতেন যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপরেই দেশের প্রকৃত উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। কাজেই, তিনি সর্বশ্রেণীর ব্যবসায়ী এবং বণিককে সুযোগ সুবিধা দিতেন। ঈরাণ হইতে আগত শী'য়া ব্যবসায়ীদের সুবিধার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য বেশী ছিল বলিয়া তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাঁহাদের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিন তাহাদের উপর হইতে সর্বপ্রকারের কর রহিত করেন ; কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নামে মাত্র একটা কর তিনি ধার্য করিয়াছিলেন। ইহাতেও যাহাতে তাহাদের কোন অসুবিধা না ঘটে, সেদিকে তিনি বিশেষ নজর দেন। ক্রমে ক্রমে হুগলী বন্দর ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে পরিণত হইল। অনেক ধনী বণিক ঐ-অঞ্চলে বাস করিত ; মালপত্র আমদানী-রপ্তানীর জন্য তাহাদের যে নিজস্ব জাহাজ ছিল,

** ইঁহারা যথাক্রমে ঃ নবাব নসরৎজঙ্গ, নবাব সামসোদ্দৌলা, নবাব কমরুদ্দৌলা এবং নবাব গয়জুদ্ দীন হায়দর।

তাহাতে করিয়া আরব, পারস্য এবং বিদেশের অন্যান্য অঞ্চলে তাহারা বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, মুর্শিদাবাদ শী'য়াগণের প্রধান কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিবার পূর্বেই হুগলী তাহাদের একটা কলোনীতে পরিণত হইল; এবং তাহা শী'য়াগণের ধর্মালোচনার পীঠস্থান রূপে নির্দিষ্ট হইল। অবশ্য পরবর্তী কালে হুগ্‌লী রাজনৈতিক রাজধানী হিসাবে ঈরাণী বাস্তুত্যাগীদের নিকট গৃহীত হয়। শুধু যে শী'য়া মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তি আসিয়াই এখানে বসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন তাহা নহে, অনেক ঈরাণী চিকিৎসক ও আতর-সুর্মা বিক্রেতা বণিকেরাও আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তদানীন্তনকালে কলিকাতা, হুগ্‌লী এবং হুগ্‌লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে এতদ্দেশীয় বহু ধনী জমিদারের বসতি ছিল। তৎকালে এশিয়ার সমগ্র পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ঈরাণ ও আরব দেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকায় তাঁহারা ঈরাণ ও আরব দেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় ঈরাণের সাফাবী রাজবংশের পতনের পর আফগান শাসকবর্গের রাজত্বকাল, নাদির শাহ্‌র শাসনকাল এবং নাদিরের হত্যার (১৭৪৭) অব্যবহিত পরে যে-অরাজকতার সূত্রপাত হইল, তাহার ফলে বাস্তুত্যাগী ঈরাণীগণ পারস্য হইতে ভারতের দিকে [বিশেষতঃ বাংলা দেশে, কারণ মুর্শিদাবাদে একটি শী'য়া রাজবংশের পত্তন হইয়াছিল] আসিতে থাকে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল হাসান গুলিস্তানী ('মুয্‌মিল-উত্‌-তারিখ বাদ্‌ আজ্‌নাদিরিয়া' গ্রন্থের লেখক) এই সকল বাস্তুত্যাগী ঈরাণীর অন্যতম ছিলেন। তিনি ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। তাঁহার খুল্লতাত ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে বাংলায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন[২৩]।

২৩ J. N. Sarkar, Sir, ed.: op. cit. p. 419.

(৪) দানপত্র করা বা যৌতুক দান ঃ

পাক-ভারত ও বঙ্গে শী'য়া-ধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ কার্যধারা উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানের শী'য়াগণ দূরাঞ্চলের কোন আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটায় ঐ স্থানের কোন সুন্নী মুসলমানকে শী'য়া ধর্মে দীক্ষিত করিয়া মৃত শী'য়ার যাবতীয় সম্পত্তি তাহাকে প্রদান পূর্বক দানপত্র লিখিয়া দিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বাংলা দেশের সিলেট জেলার (লংলা পরগণা) জনৈক শী'য়ার মৃত্যু ঘটিলে সেখানকার অধিবাসী সুন্নী মুসলমান মরহুম আলী আমজাদ খানকে শী'য়া ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার নামে সমস্ত সম্পত্তি দান করা হয়। সেই সময় হইতে সিলেটের লংলা পরগণায় একটি শী'য়া জমিদার পরিবারের উদ্ভব হইয়াছে। মরহুম আলী আমজাদ খান এই শী'য়া জমিদার-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। সিলেট জেলায় এই শী'য়া জমিদারের উত্তর-পুরুষ এখনও বর্তমান আছেন।

৪। পারস্যের শাসক এবং শী'য়া দরবেশগণের প্রভাব

ভারতে বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহে শী'য়া রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঈরাণদেশীয় শাসক ও দরবেশগণের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যথার্থ বলিতে কি, তাঁহাদের কর্মতৎপরতার জন্যই শী'য়া ধর্ম ধীরে ধীরে ভারতে প্রচারিত হয়; এবং শী'য়া রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা হয়। পারস্যের সাফাবী বংশীয় নরপতিগণ দক্ষিণ ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন এবং সেগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ-ভাবে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে বাহ্‌মনী রাজবংশের পত্তন হইয়াছিল। এই রাজবংশের মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন সুন্নী মুসলমান। কিন্তু নবম শাসক,

প্রথম আহ্মদ শাহ্ বাহ্মনী শী'য়া ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার দীক্ষা-গ্রহণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, পারস্যের শী'য়া দরবেশ শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্‌র প্রভাব তাঁহার উপর বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। শী'য়া-শাসক হিসাবে প্রথম আহমদ শাহ্ সর্বপ্রথম ভারতে শাসনকার্য (১৪২২-১৪৩৬) পরিচালনা করেন। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন এক সময়ে তিনি শী'য়া-ধর্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্মমত-পরিবর্তন তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। ইহার পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক কারণ ছিল না। কেননা, সুলতান নিজে শী'য়া ধর্মে দীক্ষিত হইলেও জনসাধারণের মধ্যে তাহা প্রসারের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই, অথবা এই ধর্ম গ্রহণের জন্য তাহাদের উপর কোন চাপও দেন নাই[১]।

আহমদ শাহ্ নিজে গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধু, সজ্জন ব্যক্তি ও দরবেশকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। তিনি দক্ষিণ পারস্যের অন্তর্গত কারমানের সন্নিকটবর্তী 'মাহান' নামক স্থানের বিখ্যাত শী'য়া দরবেশ শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্‌র কথা শুনিতে পাইয়া তাঁহার নিকট একটি ধর্মীয় মিশন প্রেরণ করেন। এই মিশনে শৈখ হাবীবউল্লাহ্ জুনাইদী, কুম্ অঞ্চলের মীর শাম্‌সুদ্‌দীন এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি ছিলেন। মিশন তথায় উপস্থিত হইয়া দরবেশকে (শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্‌কে) জানাইল যে, দাক্ষিণাত্যের সুলতান প্রথম আহমদ শাহ্ তাঁহার মুরীদ্ (শিষ্য) হইতে চান। দরবেশ, সুলতানের অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং সুলতানের মিশনের উত্তরে তিনি অন্যতম শিষ্য 'কারমান'-য়ের অধিবাসী মুল্লা কুতুবউদ্‌দীনকে 'উপাধি' ও 'উপঢৌকন' সহ প্রেরণ করেন। সুলতান আহমদ শাহ্, মুল্লাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতে সুলতান

---

১ M. T. Titus: R. Q. I. Oxford University Press, 1930, p. 85.

নামাযের খুৎবায় এবং সরকারী দলিলপত্রে দরবেশ-প্রদত্ত উপাধি ব্যবহার করিতে শুরু করেন [২]।

অতঃপর, আহমদ শাহ্ 'সামনান' নামক স্থানের অধিবাসী খাজা ইমাদ্ উদ্দীন এবং গুলবর্গার সাইফ উল্লাহ্‌র মারফত দ্বিতীয় মিশন পাঠান। এবারে সুলতানের অনুরোধ ছিল, দরবেশ তাঁহার কোন পুত্রকে ভারতে পাঠাইলে তিনি তাঁহার পিতার প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মগুরুর কার্য করিবেন। তদনুসারে শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্ একমাত্র পুত্র খলীল উল্লাহ্‌কে না পাঠাইয়া তৎপরিবর্তে তদীয় দৌহিত্র মীর নুর উল্লাহ্‌কে প্রেরণ করিলেন। নুরউল্লাহ্ বাহ্‌মনী রাজ্যের রাজধানীতে রাজোচিত সম্মানে সম্বর্ধিত হন। সুলতান তাঁহাকে 'মালীক-উল্-মাসায়িক' (শৈখগণের বাদ্শাহ্) উপাধি দিলেন। আহমদ শাহ্ তাঁহাকে যে-স্থানে সাদরে গ্রহণ করেন, সেই স্থানের নামকরণ হইল 'নিয়ামতাবাদ'। সেখানে একটি মস্জিদ নির্মিত হয়, এবং সুলতান তাঁহার এক কন্যার সহিত নুরউল্লাহ্‌র বিবাহ দেন। ১৪৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্‌র মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র খলীল উল্লাহ্ নিজের অপর দুই পুত্র শাহ্ হাবীব উল্লাহ্ গাজী ও শাহ্ মুহীব উল্লাহ্ সমভিব্যহারে ভারত পরিদর্শনে যান। খুব সম্ভব খলীল উল্লাহ্ মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিদারে বাস করেন। হাবীব উল্লাহ্ ও মুহীব উল্লাহ্ সম্ভবতঃ স্থায়িভাবে ভারতেই বাস করিয়াছিলেন। সুলতান আহমদ শাহ্‌র পরিবারে তাঁহাদের দুই জনের বিবাহ হয় [৩]।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাহ্‌মনী রাজ্যের পতন হইলে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে। এই রাষ্ট্রগুলির

---

২ Walseley Haig : The Religion of Ahmed Shah Bahmani, J. R. A. S. 1924 - pp· 74-77.

৩ Ibid : p. 77.

মধ্যে বীজাপুর, আহ্‌মদ নগর ও গোলকুণ্ডা নামক তিনটি বড় রাষ্ট্র এবং বেরার ও বিদার নামক দুইটি ছোট রাষ্ট্রও ছিল। ইউসুফ আদিল শাহ্ বীজাপুরে আদিল শাহী রাজ বংশের এবং সুলতান কুলী কুতুব শাহ্ গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী রাজবংশের পত্তন করেন। ইহারা দুই জনেই শী'য়া ছিলেন। ইউসুফ আদিল শাহ্ প্রথম জীবনে পারস্যে বাস করেন এবং সেখানেই শী'য়া ধর্মগুরু শৈখ শফীর এক শিষ্যের নিকট শী'য়া ধর্ম গ্রহণ করেন [৪]। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই (১৪৯০) শী'য়া-ধর্মকে রাষ্ট্রের একমাত্র ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার পুত্রও ছিলেন পিতার ন্যায় গোঁড়া শী'য়া। আহ্‌মদ নগরে নিযাম শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুন্নী মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তৎপুত্র বুরহান প্রথম নিযাম শাহ্ (রা° কা° ১৫০৮-১৫৫৪) সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই খোলাখুলিভাবে শী'য়াধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং উহাকে রাষ্ট্রের একমাত্র ধর্ম বলিয়া নির্দেশ দিলেন। রাষ্ট্রের গোঁড়া সুন্নী মুসলমান প্রজাগণ সুলতানকে বাধা প্রদান করিলেও তাহাদের প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সুলতান শী'য়া ধর্মমত প্রচার করিয়া রাজ্যের প্রায় সমস্ত নর-নারীকে স্বমতে আনিতে সমর্থ হন। আহ্‌মদ নগর সহজেই শী'য়া রাজ্যরূপে পরিণত হয় [৫]।

বুরহান নিযামশাহ্ বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার ধর্মমত পরিবর্তনের পশ্চাতে যে-শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল, তাহার

৪ Najmul Ghani : Madhahib-ul-Islam. Lucknow. 1924. p. 438 f.
Elphinstone : History of India, 5th Edition, 1866. pp. 756-757.

৫ Elphinstone : op. cit., pp. 757-758.
W. Ivanow : A forgotten branch of Ismailies. (J. R. A. S. 1838) p. 57.

প্রভাবে বুরহান নিযাম শাহ্‌র ব্যক্তিগত, রাজনীতিগত ও ধর্মীয়-জীবনের ধারার পরিবর্তন ঘটে। পারস্যের সাফাবী বাদশাহ্‌গণ ভারতীয় রাজনীতি ও ধর্মীয় ব্যাপারে বরাবরই আগ্রহশীল ছিলেন। তথাপি, বুরহান নিযাম শাহ্‌র ধর্ম ও নীতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পারস্যের শী'য়া দরবেশ শাহ্ তাহিরের (অন্য নাম: 'দাকানী' ও 'হুসাইনী') কার্যকলাপই প্রধানতঃ দায়ী। শাহ্ তাহির ধর্মশাস্ত্র-বিদ্ মহাপণ্ডিত, দার্শনিক, কবি ও রাজনীতিবিদ্ ছিলেন[৬]। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার মতানুসারে, তাঁহার পূর্বপুরুষ কুযুরু প্রদেশে গিলান নামক স্থানের নিকটবর্তী 'খুন্দ' গ্রামে (কাহারও মতে 'খোয়ান্দ') বাস করিতেন। তিনিও প্রথমে পারস্যেই বসবাস করেন; কিন্তু ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্বে শাহ্ তাহিরের জীবনে বিচিত্র ঘটনা ঘটে। তাঁহার পরিবারবর্গ বহু পূর্ব হইতেই জন-সাধারণ ও শাসককুলের ভক্তিশ্রদ্ধা পাইতেন। উত্তরাধিকার-সূত্রেই শাহ্ তাহির 'পীর'পদে বৃত হন্। কিন্তু শাহ্ ইসমাঈল, সাফাবী রাজবংশের পত্তন করিয়া রাজনীতির ন্যায় ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করেন, এবং শাহ্ তাহিরের প্রতি তিনি হিংসাত্মক মনোভাব পোষণ করিতে থাকেন। ইহাতে ঈরাণের রাজসভায় শাহ্ তাহিরের শিষ্যমণ্ডলী বাদশাহ্‌র মনোভাবের প্রতিবাদ জানাইলে শাহ্ তাহির উত্তর-পূর্ব ইস্পাহানের নিকটবর্তী 'কাশান' নামক স্থানে বসবাসের অনুমতি পান। তিনি ঐস্থানে বাস করিবার সময় সেখানকার বিখ্যাত মাদ্রাসায় শী'য়া ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দিতে থাকেন। তাঁহার অদ্ভুত জনপ্রিয়তা দেখিয়া একদল লোক তাঁহার শত্রুতা করিতে থাকে; তাহারা বাদশাহ্‌কে জানায় যে, তাহির শী'য়া ধর্ম-বিরোধী মতবাদ প্রচার করিতেছেন। ইহাতে

৬ W. Ivanow: op. cit., p. 57.

বাদশাহ্ তাঁহাকে হত্যার নির্দেশ দিলে তিনি পলায়ন করিয়া সমুদ্র-পথে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন এবং 'গোয়া' নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি প্রথমে বীজাপুরের আদিল শাহ্‌র রাজসভায় এবং পরে আহ্‌মদ নগরে (১৫২২) আগমন করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি আহ্‌মদ নগরে বাস করিয়াছিলেন। তিনি বুরহান নিযাম শাহ্‌র রাজসভায় আঠার বৎসর গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য করেন। রাজকার্যের সুযোগে তিনি যেভাবে শী'য়া ধর্মনীতি প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা পারস্যের বাদশাহ্ তাহ্‌মাস্পের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। বাদশাহ্ তাঁহার কার্যের পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে বহু মূল্যবান যৌতুকাদি ও খেলাত উপহার দেন (১৫৪৩)। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ কারবালায় সমাহিত করা হয়। তাঁহার পুত্র শাহ্ রফী উদ্দীন হুসৈন, শাহ্ আবূ তালিব এবং শাহ্ আবূ হাসান নিযামশাহী ও আদিলশাহী সুলতানগণের রাজসভায় কার্যোপলক্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; রাজকার্যের মধ্যেও তাঁহারা শী'য়া আচার-পদ্ধতি চালু করিয়াছিলেন [৭]।

গোলকুণ্ডার সুলতান কুলী কুতুব শাহ্ নির্বিঘ্নে শী'য়া রাষ্ট্র ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা (১৫১২) করেন। সুলতান গোলকুণ্ডার আট মাইল দূরে এক নগর পত্তন করিয়া নামকরণ করেন 'ভাগ্যনগর' (পরে হায়দরাবাদ)। তিনটি বড় রাষ্ট্র শী'য়া সুলতানদের দ্বারা শাসিত হওয়ায় প্রতিবেশী ক্ষুদ্র বেরার ও বিদারও তাহাদের প্রভাব-মুক্ত হইতে পারে নাই। ফলে, দাক্ষিণাত্যের সমগ্র অঞ্চল জুড়িয়া শী'য়াধর্ম একচ্ছত্ররূপে বিস্তৃত হয় [৮]। ইরাক ও পারস্যের

---

৭ Ibid: pp. 59-63.

৮ ক. Wolseley Haig: op. cit., p. 80.

খ. M. T. Titus: R. Q. I. 1930.: p. 86.

গ. Elphinstone: op. cit., pp. 758-759.

বহু শী'য়া কবি ও পণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে মীর মুহম্মদ মুমীন আস্‌তারাবাদী ও মীর জুম্‌লার নাম স্মরণীয়। শী'য়াধর্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাঁহারা প্রাণপণে খাটিতেন। সুলতান স্বয়ং 'কারবালা ট্রাজেডি' সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী ভাষায় মর্সীয়া লিখিতেন [৯]।

ঈরাণের সাফাবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্‌ ইসমাঈল (১৫০০-২৪)। প্রথম মুঘল সম্রাট্‌ বাবুরের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল [১০]। ঈরাণে সাফাবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সময়ে, ভারতের দাক্ষিণাত্যে বাহ্‌মনীরাজ্যের পতনের পর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয়। ঈরাণ ও ভারত দুইটি পৃথক দেশ হইলেও এই সময়ে ইহাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। ঈরাণ ও ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির শাসকগণ শী'য়া ধর্মাবলম্বী ছিলেন। শাহ্‌ ইসমাঈল ভারতে শী'য়াধর্ম প্রচারকল্পে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ভারত একটি বিরাট ও উন্নতশীল দেশ। সুতরাং, সেখানকার ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্যগুলির শাসক ও সভাসদ্‌গণকে নানাবিধ মূল্যবান্‌ যৌতুক উপহার পাঠাইয়া তিনি তাঁহাদের অন্তর জয় করিবার চেষ্টা করিতেন। দ্বিতীয় মুজাফ্‌ফর শাহ্‌ (প্রকৃত নাম: খলীল খান) নামক এক সুলতান ভারতের অন্তর্গত গুজরাটের আহ্‌মদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ (১৫১১) করিলে শাহ্‌ ইসমাঈল, মীর ইবরাহীম খান নামক এক রাজদূত মারফত তাঁহাকে বহু মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়া অভিনন্দন জানান [১১]।

---

৯ Ram Babu Saksena : A History of Urdu literature. Allahabad. 1940, p. 34-35.

১০ S. Lane Poole : The Mohamedan Dynasty. 1925. p. 257.

১১ Ali Ahmed Khan : Mirat-i-Ahamadi (tran. James Bird : History of Gujrat-1885) p. 219.

শাহ্ ইস্মাঈলের মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র শাহ্ তাহ্মাস্প (১৫১৪-৭৬) পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন :

ভারতে শী'য়া রাজ্য স্থাপন এবং শী'য়াপ্রভাব বিস্তারকল্পে শাহ্ তাহ্মাস্পও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে শী'য়া রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় সেখানকার রাজন্যবর্গের সহিত ঈরাণী নরপতির আন্তরিক যোগসূত্র সুদৃঢ় হয়। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির শী'য়া নৃপতিগণও বাদশাহ তাহমাস্পের সন্তুষ্টি-বিধানার্থে ঈরাণ রাজদরবারে ঘন ঘন মূল্যবান উপঢৌকনাদি পাঠাইতেন ; এবং তাঁহারা পারস্যের বাদশাহের বন্ধুত্ব, সহানুভূতি এবং প্রীতি কামনা করিয়া তাঁহাকে খুশী করিতেন। আহ্মদ নগরের নিযাম শাহ্, হায়দরাবাদ ও গোলকুণ্ডার কুতুবশাহ্ এবং বীজাপুরের আলী আদিল শাহ্ বাদশাহ্কে এই সব খেলাত এবং উপঢৌকনাদি প্রেরণ করেন। বীজাপুরের সুলতান আলী আদিল শাহ্ রাজ্যের প্রজাবৃন্দকে শী'য়া-ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রের মসজিদগুলিতে পারস্যের বাদশাহ্র নামে খুৎবা পড়িবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। শাহ্ তাহ্মাস্প এ-সব দেখিয়া শুনিয়া এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনিও দূতগণের মারফত অনেক মূল্যবান যৌতুক এবং উপঢৌকন সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন [১২]।

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহের মধ্যে শী'য়াধর্ম উত্তরোত্তর প্রসারিত হওয়ায় শাহ্ তাহ্মাস্প উত্তর ভারতের দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে শী'য়াধর্ম ও মতবাদ প্রচারের জন্য আশা পোষণ করিতেন। সুযোগও আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্রাট্ হুমায়ুন পাঠান শের শাহ্র হস্তে পরাজিত (১৫৪৪) হইয়া ঈরাণের শাহ্র আশ্রয় গ্রহণে

১২ M. T. Titus: R. Q. I., Oxford University Press, 1930, p. 86.

বাধ্য হইলে শাহ্ তাহ্মাস্প তাঁহাকে শীয়াধর্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করেন, এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে (পৃঃ ৬১-৬৬) আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, শাহ্ তাহ্মাস্প একজন চতুর ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তিনি সমগ্র ঈরাণে যেমন শী'য়া রাজ্য স্থাপন করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তেমনি শী'য়াধর্ম প্রচার করিয়া বা শী'য়া রাজ্য স্থাপন করিয়া উত্তর ভারতেও নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা পোষণ করিতেন, এই উদ্দেশ্যে বাদশাহ্ সম্রাট্কে চাপ দিলেন। হুমায়ুন শী'য়া ধর্মমত গ্রহণে ক্রমাগত অস্বীকৃতি জানাইলে শাহ্ তাহ্মাস্প সর্বশেষে তিনখানি কাগজসহ একজন কার্যীকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। হুমায়ুন তিনখানি কাগজের মধ্য হইতে বিশেষ বিবেচনার সহিত যে-খানি গ্রহণ করিলেন তাহা শী'য়া ধর্মবিশ্বাসের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যমূলক। তিনি ভারতে ফিরিয়া গিয়াও শী'য়াধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করিবেন, তদ্বিষয়েও উহাতে স্বীকারোক্তি ছিল। উত্তর-পশ্চিম পারস্যের অন্তর্গত "আরদাবিল্" নামক স্থানের বিখ্যাত শী'য়া দরবেশ শৈখ সফীর মাযার শরীফ জিয়ারত করিতে দেখিয়া মনে হয় যে, হুমায়ুন সুন্নী-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শী'য়াধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন [১৩]। কিন্তু ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া হুমায়ুন

---

১৩ Humayun himself professed to have been converted appears from a pilgrimage which he made to the tomb of Shaikh Safi at Ardebil as a mark of respect not very consistent with the character of a professed Sunni." (Elphinstone : History of India - 5th Edition 1866. p. 465.)

তাহ্‌মাস্‌পের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করেন নাই ; এবং মৃত্যুকালে তিনি প্রকৃত সুন্‌নী মুসলমানরূপে দেহত্যাগ করেন[১৪]।

বাদশাহ্‌ তাহ্‌মাস্‌পের অন্যতম আমীর বৈরাম খাঁ শী'য়া ছিলেন। তিনি হুমায়ুনের সঙ্গে পারস্য হইতে দিল্লীর রাজদরবারে আগমন করেন। বৈরাম খাঁ বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার জন্য হুমায়ুনের অন্যতম সভাসদ্‌ ও কর্মচারীরূপে পরিগণিত হন। তাঁহার মারফত পারস্যের শাহ্‌র সহিত মুঘল সম্রাটের সংবাদ বিনিময় হইত ; কাজেই তাহ্‌মাস্‌প বৈরামকে বিশেষ সুনজরে দেখিতেন। কান্দাহার বিজিত হইয়া পারস্যের শাসনাধীন হইলে ইহা শাসনের জন্য বাদশাহ্‌ বৈরাম খাঁকে উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে 'আমীর' মনোনীত করেন[১৫]। মুঘল রাজদরবারেও অবস্থানকালে সম্রাট্‌ হুমায়ুন শী'য়া বৈরামের কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রিয়পুত্র বালক আকবরের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন-সংগঠনের জন্য তাঁহাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে আকবর দিল্লীর সম্রাট্‌ হইয়া তাঁহাকে অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত করেন[১৬]। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ (১৫৫৬) করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল অল্প। কাজেই, বৈরাম খাঁ আকবরের রাজ-প্রতিনিধিরূপে (Regent) শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। বৈরাম খাঁ ১৫৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শেখ গদাই নামক জনৈক গোঁড়া

---

১৪ Ishwari Proshad : The life & time of Humayun, 1st Edition, 1955. pp, 228-30, 235.
M. T. Titus : op. cit., p. 87.

১৫ F. w. Buckler : A new Interpretation of Akbar's infallibility Decree. J. R. A. S. — 1924. p. 600.

১৬ M. T. Titus : op. cit., pp. 87-88.

শী'য়াকে প্রধান বিচারপতি ও সদরে সুদুর (Head of the Islamic Religion) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এজন্য রাজদরবারের সুন্নী আমীর-ওমরা বৈরাম খাঁর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। আকবরের জননী হামিদাবানু নিজেও শী'য়া ছিলেন। বৈরাম রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য পরিচালনার সময় মুঘল হারেমের মহিলাদের জন্য অর্থ ও টাকাকড়ি কম করিয়া বরাদ্দ করিতেন। কাজেই, হামিদাবানু স্বয়ং শী'য়াধর্মভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বৈরামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন[১৭]।

হুমায়ুনের পারস্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে বৈরামের পতন পর্যন্ত, মুঘল রাজসভার গোঁড়া সুন্নী আলেমগণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য একটা অশোভন দূরত্ব সব সময় বজায় রাখিয়া চলিতেন। আকবরের বাল্যজীবনের উপর শী'য়া বৈরাম খাঁর প্রভাবের মারফত যে তাঁহার (আকবরের) ধর্ম-বিশ্বাস অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আকবর অবশ্য শী'য়াধর্মকে কখনই প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি, পারস্যের আমীর শী'য়া বৈরাম খাঁর প্রভাব দিল্লীর মুঘল দরবারে বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। অতএব, সমগ্রভাবে বলা চলে যে, পারস্য দেশীয় শাসক, আমীর, ওমরা এবং দরবেশগণের প্রভাব ভারতের সুন্নী মুস্‌লিম সম্প্রদায়কে অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল; এমনকি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে পারস্য তথা ভারতের শী'য়া ধর্মের প্রতি গোপন আনুগত্য স্বীকার করিতে দেখা যায়[১৮]।

---

১৭ V. A. Smith: Akbar the great Mughal. Oxford, 2nd. Edition, (Revised) 1926. pp. 41-43.

১৮ M. T. Titus: op. cit, p. 88.

৫। ভারতে শী'য়া ধর্মের বিকাশ

ভারতে শী'য়াধর্মের বিকাশ প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে সাধিত হয়। **প্রথমতঃ**, ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির শাসক ও আমীরগণ শী'য়াধর্ম প্রচার এবং রাজ্য বিস্তারে তৎপর হন। এবং **দ্বিতীয়তঃ**, শী'য়াধর্ম প্রচারকগণও শী'য়াধর্মপ্রচারে বিশেষভাবে অগ্রণী হন।

ক. দেশীয় রাজ্যের শাসকগণের কর্মপ্রচেষ্টা

ভারতে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে শী'য়াধর্মের যে-উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে দেশীয় রাজ্যগুলির শাসক ও আমীর-ওমরার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা। এই রাজ্যগুলির মধ্যে অযোধ্যা (বিশেষতঃ লক্ষ্ণৌ), রামপুর, ফয়জাবাদ প্রভৃতি প্রধান। সাদত খান নামক খুরাসানের এক শী'য়া বণিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিল্লী আগমন করেন এবং স্বীয় কর্মনৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তাগুণে সৈনিক ও যুদ্ধবিশারদরূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। দিল্লীর তৎকালীন বাদশাহ্ তাঁহার কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যা প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। অবশেষে সাদত খান দিল্লীর বাদশাহ্‌র অযোগ্যতার সুযোগ লাভ করিয়া অযোধ্যায় শী'য়া রাজবংশের পত্তন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নরপতি-গণের উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করায় লক্ষ্ণৌ-নগরী ভারতের শী'য়াধর্মের পীঠস্থানরূপে পরিণত হয়, এবং অযোধ্যারাজ ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠেন [১]। গাযী উদ্‌দীন হায়দরের শাসনকালে

---

১ M. T. Titus : R. Q. I. Oxford university Press. 1930. p. 88. এবং ম্যাকান্সি ওয়ালেস : তারীখ-ই-উর্দূ। লক্ষ্ণৌ, ১৮৯৩, পৃঃ ৩৫-৪০।

দিল্লীর বাদশাহ্‌কে নিয়মিত যৌতুকাদি ও কর দেওয়ার প্রথা বন্ধ করা হয়। অযোধ্যার প্রথম নবাব প্রদেশের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া দিল্লীর শাসকের নামে প্রচলিত মুদ্রা রহিত করিলেন এবং নিজের নাম মোহরাঙ্কিত করিয়া তাহা দেশের মধ্যে চালু করিলেন[২]। প্রথমে ফয়জাবাদ এবং পরে লক্ষ্ণৌনগরী অযোধ্যার রাজধানীরূপে নির্দিষ্ট হয়। ফয়জাবাদ নবাব সুজাউদ্দৌলার সময়ের রাজধানী ছিল। দিল্লী হইতে বহু কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পী এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতঃপর, হিজরী ১১৯৫ সালে নবাব আসফউদ্দৌলা লক্ষ্ণৌতে রাজধানী সরাইয়া লইলে ইহা সমগ্র অযোধ্যার কেন্দ্রস্থলরূপে নির্দিষ্ট হইল। দিল্লীর তাইমুর বংশীয় মুঘল নরপতিগণের পতন হইলে, অযোধ্যার শী'য়া নবাবগণ ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন; এবং এই উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। দিল্লীর খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকগণ লক্ষ্ণৌর নবাব-দরবারে নবাব-গণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলেন। সুতরাং দিল্লীর পতনের ফলে লক্ষ্ণৌর লাভ হইল অনেক। কবি-সাহিত্যিকগণ এখানে সম্বর্ধিত হইলেন এবং তাঁহারা জায়গীর, সম্মান, অর্থ, পেনসন এবং পুরস্কার পাইয়া সাধনার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করিলেন। এ গুলির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। নবাব আসফউদ্দৌলা সঙ্গীতের একজন উৎকৃষ্ট সমজদার ছিলেন। রাজ্যের ধর্ম ছিল শী'য়া; কাজেই, সঙ্গীত-চর্চার ক্ষেত্রে রাজ্যের উলামা এবং ধর্মনেতাগণের উৎসাহ পাওয়া যায় নাই। রাজ্যের

---

২ Mrs. Meer Hasan Ali : Observations on the Mussulmans of India Vol. II. London. 1832. p. 152.

শাসনকর্তার উৎসাহ ও মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবণতাবশতঃ সঙ্গীতের অনুশীলনও যথারীতি হইতে থাকে; এবং তাহা লক্ষ্ণৌর জন-সাধারণের মধ্যে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করে। কারবালায় ইমাম হুসৈন-হত্যার মর্মবিদারক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বহু কবি যথেষ্ট সংখ্যক মর্সীয়া কবিতা রচনা করিতে থাকেন। এগুলি সময়ে সময়ে আবৃত্তি করা হইত। লক্ষ্ণৌর সঙ্গীত-শিল্পীগণ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া সঙ্গীতকে অধিকতর জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মর্সীয়াকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং সে ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন। শী'য়াধর্ম এবং সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌর বিদ্যোৎসাহী শাসক নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্‌র ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ[৩]।

লক্ষ্ণৌর ন্যায় মাহ্‌মুদাবাদ ও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলির রাজা-মহারাজাগণ বংশপরম্পরায় এখনও শী'য়া ধর্মবিশ্বাসের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। এই সব অঞ্চলে বহু পূর্বকাল হইতে শী'য়া ধর্ম ও মতবাদ প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকেরা দিল্লীর বাদশাহ্‌র দুর্বলতার সুযোগে যতই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন, শী'য়া আইনকানুন, বিশ্বাস, ধর্মবোধ রীতিনীতি ততই সুদৃঢ় হইতে থাকে। ফলে, লক্ষ্ণৌর মত এই সকল স্থানেও স্থানীয় শাসকের নিজস্ব ধর্ম, রীতিনীতি জনসাধারণ গ্রহণ করিতে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে, ইহার বহু পূর্বকাল হইতে ভারতে শী'য়াধর্ম খুবই ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। রামপুর ও মুর্শিদাবাদের নবাবগণ শী'য়াপন্থী ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সক্রিয়

---

৩ Ram Babu Saksena: A History of Urdu Literature. Allahabad, 1940. pp. 98-99.

সাহায্য এবং সহযোগিতা দ্বারা শী'য়া-ধর্মপ্রচারের জন্য জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান করিতেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে, শী'য়া শাসকগণের প্রভাব এমন গভীরভাবে অনুভূত হইয়াছিল যে, তাঁহাদের রাজদরবারের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং তাঁহাদের শাসন ক্ষমতার প্রভাবে প্রভাবিত স্থানসমূহে ইহা ব্যাপকরূপে প্রসারিত হয়। অযোধ্যার প্রতি একথা বিশেষভাবে খাটে। বহু অনুসন্ধানের মারফত জানিতে পারা গিয়াছে যে, অযোধ্যা নগরীতে মূল সুন্নী মুসলমানের ভিতর হইতেই বহু লোক শী'য়াধর্মে দীক্ষিত হয়; কারণ, শী'য়া শাসক এবং নরপতিগণ স্বভাবতঃই অন্য ধর্মের লোকজন অপেক্ষা শী'য়া জনসাধারণকে অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। ব্যক্তিগত লাভ এবং উন্নতির কথা ভাবিয়াই সুন্নী জনসাধারণ শী'য়াধর্মের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িত। অযোধ্যায় আজ যে এত শী'য়া মুসলমান দেখা যায় তাহার কারণ, বিগত দুই শতাব্দীকাল যাবৎ সেখানকার শী'য়া শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বংশ-পরম্পরায় জনসাধারণকে নানা ব্যাপারে উৎসাহ দান। রামপুরের শাসকগণও লক্ষ্ণৌর দেখাদেখি শী'য়াধর্মভুক্ত মুসলমানগণকে অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন[৪]। নবাব আলী মুহম্মদ খান, রামপুরনগর ও রামপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনিও শী'য়া ছিলেন। তাঁহার পুত্র নবাব ফয়েজুল্লাহ্ খান এবং অন্যান্য নবাবগণের মধ্যে নবাব সৈয়্যিদ মুহম্মদ খান বাহাদুর, হাযী ঘুলাম মুহম্মদ বাহাদুর, আহ্মদ আলী খান বাহাদুর, নবাব মুহম্মদ সৈয়্যিদ খান বাহাদুর ও নবাব সৈয়্যিদ ইউসুফ আলী খান শী'য়াধর্ম ও সাহিত্য-শিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন। ভারত এবং অন্যান্য স্থান হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য এবং শিল্প সম্পর্কীয়

---

৪ M. T. Titus : op. cit., pp. 88-89.

এত গ্রন্থ রামপুরের নবাবগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগৃহীত হইয়াছে যে, তাহা যথার্থই এক স্মরণীয় বিষয়। বহু খ্যাতনামা লেখকের লিখিত বহু ফারসী, উরদূ পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত যত্নের সহিত রামপুরের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হইয়াছে। রামপুরের শাসকগণের সাহায্য এবং সহায়তার ফলে রামপুরেও শী'য়াধর্ম প্রাধান্য লাভ করে; আর তাহাতে শী'য়া রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়[৫]।

খ. শী'য়া ধর্ম-প্রচারকগণের কর্মতৎপরতা।

পাক-ভারতে শী'য়াধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে শী'য়া ধর্মপ্রচারক ও মিশনারীদের অবদান কম নহে। বস্তুতঃপক্ষে, বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন প্রচারকের চেষ্টা এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলে পাক-ভারতে শী'য়াধর্ম প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাক-ভারতের সিন্ধুতে কারমিথান নামক এক শী'য়া সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করে। শী'য়া সম্প্রদায়ের প্রধান শাখা ইস্‌নে আসারিয়ার (Twelvers) ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের মৃত্যু ঘটিলে ঐ সম্প্রদায়-ভুক্ত শী'য়াগণ জাফর সাদিকের পুত্র ইস্‌মাঈলকে অস্বীকার করে এবং তৎস্থলে মূসা কাযিমকে ইমামরূপে গ্রহণ করে। অতএব, ইস্‌নে আসারিয়া শী'য়াগণের সপ্তম ইমাম মূসা কাযিম। অত্যাচার নির্যাতনের ভয়ে ভীত হইয়া ইস্‌মাঈলের পুত্রগণ মদীনা পরিত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় আগমন করেন এবং সিরিয়া হইতে ইসমাঈলের পৌত্র এবং উত্তরাধিকারীগণ ইস্‌মাঈলিয়া শী'য়াধর্মের গূঢ় রহস্যবাদ ('বাতিনী') প্রচারের জন্য মিশনারী দল প্রেরণ করেন। এই

৫ 'A Visit to the Rampur State Library' by Dr. S. M. Imamuddin (Islamic culture 1947-Vol. XXI-p. 361.)

ধর্মপ্রচারকগণের এক ব্যক্তির পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্নে মরমুন সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের নেতারূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন[৬]। কার্মাথ নামক এক মিশনারীর নামানুসারে ইস্মাঈলিয়া সম্প্রদায়ের একটি উপশাখার উদ্ভব। ইহারা যেহেতু কারমাথের মতানুসারী, সেইহেতু ইস্মাঈলিয়ার অন্তর্ভুক্ত উপসম্প্রদায়ের নাম 'কারমিথান'। কারমিথানগণ পাক-ভারতে শী'য়াধর্ম প্রচারের অগ্রদূত। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাহারা সিন্ধু নামক স্থানে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করে। রাজনৈতিক বিদ্রোহের ফলে তাহারা ইরাক ও মিশর হইতে বহিষ্কৃত হয়, এবং আশ্রয়ের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভারতের সিন্ধু প্রদেশে আগমন করে। ইহাদের অপর একটি দল বাহেরাইনের 'আল্ আশা' নামক স্থান হইতে আগমন করিয়া মুলতানে রাষ্ট্র স্থাপন করে[৭]। মুলতান ব্যতীত সিন্ধুর অন্যান্য স্থানেও এই শী'য়াগণের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর যাবৎ যেখানে আরবীয়গণের প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, সেখানে একাদশ শতাব্দীতে গজনীর সুলতান মাহ্মূদ এক আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি 'মনসূরিয়া' নামক স্থানের কারমিথান শী'য়া সম্প্রদায়ভুক্ত যুবরাজ আবুল ফতেহ্ লোদীকে বরখাস্ত করিয়া তৎস্থলে একজন সুন্নী মুসলমানকে নিযুক্ত করেন[৮]। তাঁহার (সুলতান মাহ্মূদ) ইচ্ছাক্রমে তাঁহার অনুচরগণ মুলতানের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি ধ্বংস করিয়া, মন্দিরের পুরোহিতকে হত্যা করিয়া

---

৬ M. T. Titus : op. cit., p. 95.

৭ Ibid : p. 95

৮ E. D. : The History of India as told by its own Historian. I, p. 459.

এবং M. T. Titus : op. cit., pp. 95-96.

মন্দিরকে মস্‌জিদে পরিণত করিল। সুলতান মাহ্‌মূদ একাদশ শতকে এই কারমিথান শী'য়াগণকে ধ্বংস করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের প্রচারকার্য কোন উপায়েই বন্ধ করা যায় নাই। ইহার ফলে, মুহম্মদ ঘোরী আর একবার (১১৭৫) মুলতানকে তাহাদের আওতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। মুহম্মদ ঘোরী সুন্‌নী মুসলমান ছিলেন। তাঁহার কর্মতৎপরতায় সিন্ধু ও মুলতানের পতন হইলেও কারমিথান ইস্‌মাঈলিয়াদের ধ্বংস করা যায় নাই। তবে মুহম্মদ ঘোরীর শাসন-কালে এই সব শী'য়ার কর্মতৎপরতা অনেকখানি ব্যাহত হয়। সুলতান মুহম্মদ ঘোরী স্বয়ং জনৈক শী'য়ার হস্তে নিহত হন। সুলতানা রাজিয়ার অল্পকাল (১২৩৭) রাজত্বের মধ্যে ইস্‌মাঈলিয়া শী'য়াগণ দিল্লীর দাঙ্গা-হাঙ্গামার সহিত জড়িত হইয়া পড়ে। এই সময়েই শী'য়াগণকে নির্মূল করিবার জন্য সুন্‌নী মুসলমানগণ দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। ইহার পর হইতে কারমিথানগণের ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টা সম্পর্কে কোথাও কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা সম্পর্কে জনৈক মুসলমান ঐতি-হাসিকের * মত উদ্ধৃত করিয়া ডক্টর এম, টি, টাইটাস বলেন, পাণ্ডিত্যের মিথ্যা ভান করিয়া নূরতুর্ক নামক এক ব্যক্তি হিন্দুস্তানের কারমিথানদের মারফত বহু সুন্‌নী মুসলমানকে বিপথগামী করিয়া-ছিলেন। তাহারা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থান হইতে (অর্থাৎ গুজরাট, সিন্ধু, রাজধানী দিল্লীর চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং গঙ্গা-যমুনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল) বহু সংখ্যায় আসিয়া তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইত। তাহারা সকলে দিল্লীতে তাঁহার (নূরতুর্কের) নেতৃত্বে প্রকাশ্যভাবে সুন্‌নী জনসাধারণের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিতে থাকে। নূরতুর্ক প্রচার করিতেন যে, সুন্‌নী পণ্ডিতগণ হযরত আলীর শত্রু।

* Minhaj as Siraj : E. D. II 335f.

তিনি আবূ হানিফা ও সাফেঈর মতবাদ অনুসারী সুন্‌নী মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাধারণ ব্যক্তিগণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন। শেষে ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের এক শুক্রবারে দিল্লীর জামে মস্‌জিদে নামাজরত মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হইলে বহু সুন্‌নী মুসলমান মারা যান। ইহার ফলে, কারমিথান শী'য়া এবং সুন্‌নী-ধর্মবিরোধী ব্যক্তিগণকে ধ্বংস করিয়া শী'য়া-সুন্‌নীর দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রশমিত করা হয় [৯]।

দিল্লীর দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে কারমিথানদের দমন করা গেল সত্য, কিন্তু গোঁড়া শী'য়াগণের মতবাদকে একেবারে মুছিয়া ফেলা সহজসাধ্য হইল না। ইহাতে পরবর্তীকালে শী'য়াগণ নানাভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার চেষ্টা করে।

ভারতের ইস্‌মাঈলিয়া (বা কারমিথান) শী'য়াগণের সহিত অন্যান্য স্থানের বাস্তুত্যাগী শী'য়াগণের যোগাযোগ ছিল। তাহারা তাহাদের ধর্মমত প্রচারের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিত না; ইহাতে ভারতের অনেক হিন্দু ও সুননী মুসলমান শী'য়া ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ইলিয়টের বর্ণনায় এ-বিষয়ে উল্লেখ আছে [১০]।

দ্বাদশ শতাব্দীতে নুর উদ্‌দীন নামক এক ইস্‌মাঈলিয়া ধর্মপ্রচারকের সংবাদ জানা যায়। ইনি সাধারণতঃ 'নুর সওদাগর' নামে পরিচিত ছিলেন। পারস্যের 'আলামত' নামক স্থান হইতে তিনি গুজরাটে আসেন। তখন গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন 'সিদ্ধরাজ' (১০৯৪-১১৪৩) নামক জনৈক হিন্দু রাজা। নূরউদ্‌দীন ইস্‌মাঈলিয়া শী'য়া ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার কর্মতৎপরতায় 'কান্‌বিজ', 'খারওয়াজ', এবং

---

৯ M.T. Titus : op cit., p. 96.

১০ E. D. : op cit, p. 491.

'করিজ' নামক নিম্নজাতীয় তিনশ্রেণীর লোকের মধ্যে শীঁয়াধর্মের প্রচারকার্য সন্তোষজনকরূপে চলিয়াছিল। কাজেই, ইস্‌মাঈলিয়া শীঁয়াগণের মতানুসারে নূরউদ্‌দীন শীঁয়া ধর্মপ্রচারেরক্ষেত্রে প্রথম মিশনারী [১১]।

ইস্‌মাঈলিয়া শীঁয়াগণ বোম্বাই (বিশেষতঃ গুজরাট অঞ্চল) ও বরোদা অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করিতে শুরু করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বোম্বাই ও গুজরাটের হিন্দু ব্যবসায়ী এবং বেনিয়াগণের প্রসিদ্ধি অত্যন্ত বেশী ছিল। তাহারা তৎকালে আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইত। ঈরাণ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ইস্‌মাঈলিয়া শীঁয়াগণ পশ্চিম-ভারতে আগমন করিয়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। বোম্বাই ও গুজরাটের হিন্দু-ব্যবসায়ীগণ ইস্‌মাঈলিয়া শীঁয়াধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলে, তাহাদের সম্প্রদায়ের নূতন নামকরণ হইল 'বোহারা'। 'বোহারা' শব্দটি গুজরাটী 'বোহর্‌বু' হইতে উদ্ভূত [১২]। 'বোহর্‌বু' অর্থ 'ব্যবসায়'; সুতরাং বোহারার মানে দাঁড়ায় 'ব্যবসায়ী'। বোহারা-শীঁয়াগণের অধিকাংশই হিন্দুধর্ম এবং অবশিষ্টাংশ অন্যান্য ধর্ম হইতে দীক্ষা গ্রহণ করে।

পাক-ভারতে এই নূতন শীঁয়া-ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কে প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতবিরোধ আছে। কেহ কেহ বলেন, আবদুল্লাহ্‌ নামক এক ব্যক্তি ১০৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ইমন্‌' দেশ হইতে ভারতের কাম্ব (Cambay) নামক স্থানে অবতরণ করিয়া

---

১১ T. W. Arnold, Sir: The Preaching of Islam, West Minster, 1896, p. 275.

১২ গুজরাটী 'বোহর্‌বু' শব্দটি আরবী 'বাহারিয়া' হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। 'বাহারিয়া' - র অর্থ = যাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রে যাতায়াত করে অর্থাৎ ব্যবসায়ী।

ইস্‌মাঈলিয়া ধর্মমত প্রচার করিতে থাকেন। আবার অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মুহম্মদ আলী নামক জনৈক ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই শী'য়াধর্ম প্রচারের গৌরব অর্জন করেন। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহাকে ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাম্ব নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। তাঁহার কবরগাহ্‌ এখনও শী'য়াগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দর্শন করিয়া থাকে। যাহা হউক, হিন্দু রাজা ও শাসকের রাজত্বকালে ইস্‌মাঈলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত প্রচারকগণ নির্বিবাদে শী'য়াধর্ম প্রচারের কার্য চালাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের কার্যে হিন্দু রাজাগণ কোন প্রকার বাধা ও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেন নাই। কেবল সুন্‌নী বাদশাহ্‌ ও শাসককুলের নিকট হইতে (১৩৯৬-১৫৭২) তাহাদিগকে প্রবল বাধা ও অত্যাচারের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল [১৩]।

ইস্‌মাঈলিয়া শী'য়ার অন্তর্ভুক্ত পাক-ভারতে আর এক শ্রেণীর শী'য়া আছে। তাহারা খোজা শী'য়া। পারস্যের অন্তর্গত 'আলামত' নামক স্থানে তাহাদের পূর্বপুরুষের বাসস্থান ছিল। পাক-ভারতের পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাথিওয়ার, বোম্বাই ও পুণা অঞ্চলে খোজাগণ বসতি স্থাপন করে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, খোজাগণ পাক-ভারতে তাহাদের ধর্মপ্রচারের পরিচয়-স্বরূপ যে-ঘটনাটি সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, নূরউদ্দীন বা নূর সওদাগর ভারতে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম মিশনারী। তাঁহার প্রচেষ্টায় গুজরাটে সার্থকভাবে শী'য়া ধর্মপ্রচারের কাজ চলিয়াছিল [১৪]। দ্বিতীয় মিশনারী সম্পর্কে বলা হয় যে, শামসুদ্দীন নামক এক শী'য়া ইরাক হইতে পাক-ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেন; এবং মুলতান হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে 'উচ্‌' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। সদরউদ্দীন তৃতীয় মিশনারী দলের নেতা ছিলেন।

---

১৩ M. T Titus : op. cit., pp. 97-98.

১৪ Ibid : pp 43 & 101.

পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খুরাসান হইতে সিন্ধু আগমন করেন এবং 'উচ্' (সিন্ধু) নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। বাহ্ওয়ালপুর রাজ্যের অন্তর্গত 'ত্রিন্দা-জর্জেস' নামক স্থানে খোজাগণ তাঁহাকে কবর দেয় এবং সেখানে সমাধি-স্তম্ভ নির্মাণ করে। খোজাগণের অধিকাংশই হিন্দুধর্ম হইতে দীক্ষিত হয়। পাক-ভারতের খোজাগণ পাঞ্জাবী খোজা এবং আগাখান-ই-খোজা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ভারতের বোম্বাই ব্যতীত পৃথিবীর আরও কতকগুলি স্থানে আগাখান-ই-খোজাগণের বসতি স্থাপিত হইয়াছে [১৫]।

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে দিল্লীর সুলতান তৃতীয় ফিরূয শাহ্‌র রাজত্বকালে শী'য়া ধর্মপ্রচারকগণ সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে তাহারা যে কি প্রকারে প্রচারকার্য চালাইয়াছিল এবং সুলতান যে কিভাবে তাহাদের কার্যতৎপরতা দমন করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

'কিছু সংখ্যক শী'য়া অত্যন্ত কর্মতৎপর হইয়া উঠিল। তাহারা তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে পুস্তক ও পুস্তিকা রচনা করিল এবং সভা-সমিতি করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে হযরত আবূ বকর ও হযরত 'উস্‌মান সম্বন্ধে কটূক্তি ও নিন্দাবাদ প্রচার করিতে লাগিল। যেসব শী'য়া এইরূপ কার্য করিয়াছিল, অথবা যাহারা এই সব শী'য়ার অনুবর্তী হইয়াছিল, আমি তাহাদের সকলকে ধৃত করিয়া কঠোর শাস্তি দিলাম' [১৬]।

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'রওশনিয়া' উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। রওশনিয়া* সম্প্রদায়

---

১৫ Ibid : pp 101 -102.

১৬ Dr. N.B. Roy: "The victories of Sultan Firoz Shah of Tughluq Dynasty" (Eng. tran. of Futuhat-i-Shahi), Islamic Culture. 1941, Vol. XV. p. 454

* ইহারা শী'য়া কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ আছে।

মূল ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়েরই একটি শাখা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'বায়াযীদ' নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার উপাধি ছিল 'পীর রওশন', এই-জন্য তাঁহার অনুগামিগণকে 'রওশনিয়া' নামে অভিহিত করা হয়। বায়াযীদ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের জলন্ধরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী দ্রুত শক্তিশালী হইয়া উঠে, এবং তাহারা খাইবার ও সুলেমান পর্বতের নিকট রাষ্ট্র স্থাপন করে। তাহাদের আকস্মিক আবির্ভাব এবং কর্মতৎপরতায় সম্রাট্ আকবর বিচলিত হন। অবশেষে রওশনিয়াদের দমনের জন্য তিনি ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে একদল ফৌজ প্রেরণ করিলে রওশনিয়াদের প্রচারকার্য বন্ধ হইয়া যায়[১৭]।

ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে আরও তিনজন মিশনারী ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাস্পিয়ান সাগরের নিকটবর্তী 'গিলান' নামক স্থান হইতে আসেন। হাকীম আবুল ফতেহ্, হাকীম হুমায়ূন এবং হাকীম হুমান—তিনভ্রাতা এই মিশনের পুরাভাগে ছিলেন। এতদ্ব্যতীত, আরও একজন মিশনারীর খবর জানা যায়। তাঁহার নাম ঃ মুল্লাহ্ মুহম্মদ ইয়াযদী। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক বদাউনী বলেন ঃ তাঁহারা সকলে বাদশাহ্‌র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নানা ব্যাপারে বাদশাহ্‌র স্তাবকতা করিতেন। আকবর যখনই ধর্মমতের পরিবর্তন সাধন করিতেন, তখন তাঁহারাও এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতেন। আবার তাঁহারা হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) বিশ্বস্ত সাহাবাদের বিরুদ্ধে অশ্লীল উক্তিও করিতেন। তাঁহাদের এই সব কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল, কোনক্রমে বাদশাহ্‌কে শী'য়াধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা[১৮]।

---

১৭ Elphinstone: History of India. 5th Edition. 1866-p.517. and M.T. Titus: op. cit., p. 105.

১৮ M.T. Titus: op. cit., p. 89.

হাকীম আবুল ফতেহ্ ভারতে আগত যে-শীয়া পণ্ডিত এবং ধর্মশাস্ত্রবিশারদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম সৈয়্যিদ নূর উল্লাহ্ বিন্ আল্ হুসাইনী আল্ মারাসী সুস্তারী। তিনি ইস্নে আসারিয়া শীয়া সম্প্রদায়ের নিকট 'শহীদ সালিত' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে সৈয়্যিদ নূরউল্লাহ্ পারস্যের অন্তর্গত সুস্তার নামক স্থান হইতে (১৫৮৭) ভারতে আসেন। হাকীম আবুল ফতেহ্ জিলানীর সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট খাতির ছিল, এবং প্রধানতঃ তাঁহারই অনুমোদনক্রমে দিল্লীর সম্রাট্, সৈয়্যিদ নূরউল্লাহ্‌কে লাহোরে কাযীর পদ প্রদান করেন। নূরউল্লাহ্ এই শর্তাধীনে কাযীর পদ গ্রহণ করেন যে, বিচারকালে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময়ে তিনি সুন্নী ধর্মমতের চারিটি নীতি-পদ্ধতির যে-কোন একটি দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

সম্রাট্ আকবরের রাজসভার গোঁড়া আলেমগণ ধর্মশাস্ত্রের ব্যাপারে তাঁহাকে একজন সাংঘাতিক ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ করিতেন। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা সব সময় তাঁহাকে পাহারা দিতেন। সৈয়্যিদ নূরউল্লাহ্ কাযীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রকৃত জ্ঞানী ও সাধক ছিলেন। তাই, সরকারী-কার্যের ফাঁকে ফাঁকে তিনি যখনই একটু অবসর পাইতেন, তখনই শীয়াধর্মমতের স্বপক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনা করিতেন। এ-গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পুস্তক 'মজলিশ্-উল্-মুমেনিন্' ফার্সী ভাষায় রচিত। তিনি ইহা ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অবস্থানকালে লিখিয়া সমাপ্ত করেন। কথিত আছে, এই গ্রন্থখানি সম্রাট্ জাহাঁগীরের রাজসভার জনৈক আলেম কর্তৃক নিযুক্ত কোন এক ব্যক্তির দ্বারা অনুলিখিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপার জানাজানি হইয়া গেলে, রাজদ্রোহের

অভিযোগে কাযী সাহেবকে হত্যা করা হয়। সৈয়্যিদ নুরউল্লাহ্ স্বীয় ধর্মবিশ্বাসের জন্য ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। আগ্রায় তাঁহার কবরগাহ্ আজিও শী'য়াপন্থী ভক্তগণের নিকট তীর্থস্থানের ন্যায় পবিত্র[১৯]।

ফলতঃ, বাংলা তথা ভারতের শী'য়াধর্মের বিকাশের ক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যগুলির শী'য়া শাসক ও ধর্মপ্রচারকগণের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। তাঁহাদের সকলের কর্মতৎপরতা এবং যত্নের ফলে ভারতে শী'য়াধর্ম সম্প্রসারিত হয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে 'মুহর্রমের ঐতিহাসিক তথ্য' আলোচিত হইবে।

---

১৯ M.T. Titus: op. cit., pp 89-,90.
and Mirza Md. Hadi: Shahid Thalith. Lucknow. 1925. 15ff.

ভূ ম ধ্য
সা গ র
আলেপ্পো
সিফ্ফিন
মসুল
সি রি য়া
দামাস্কাস
ফোরাত নদ
রা
ক
কারবালা
কুফা
নেজাফ
ফুস্তাত
আ
সাকাকে
তাবুক
র
বারাইদা
মদিনা
ব
লো
হি
ত
জেদ্দা
মক্কা
তায়েফ
সা
গ
র
আবহা
নাজরান
এডেন
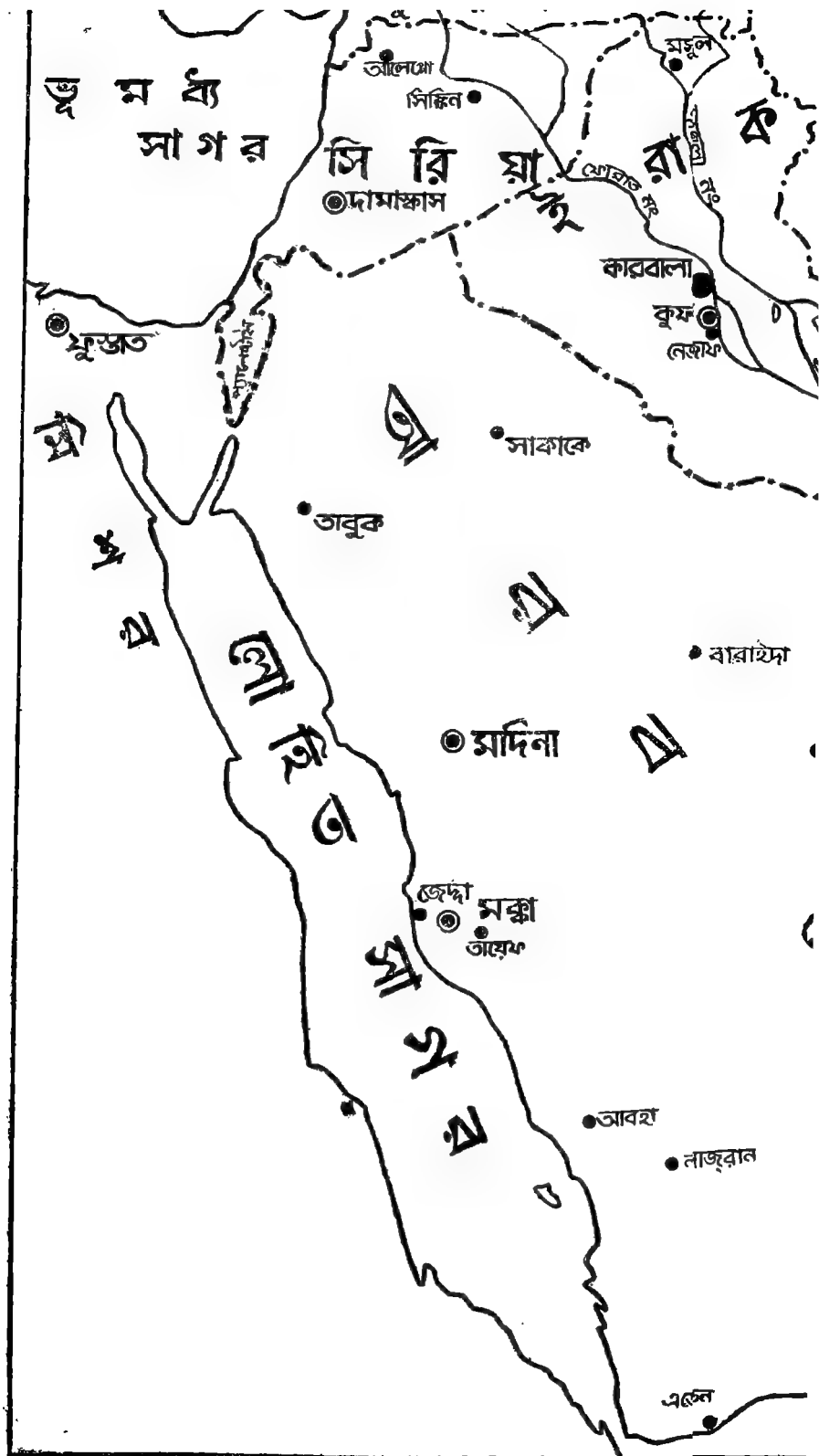
আরব দেশ
কারবালা সহ
মাইল
১০০ ৫০ ০ ১০০
পারস্য উপসাগর
সারজা
রিয়াদ
হাউতা
আদম
সালালা
সাইউন
আরব সাগর

তৃতীয় অধ্যায়

মুহর্রমের ঐতিহাসিক তথ্য

১। (ক) মূলসূত্র : কুরয়শ বংশ

এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত (পশ্চিমে) সাগর-উপসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম 'আরব'। এই বিস্তৃত ভূভাগের অধিকাংশ স্থান শস্যশ্রীবর্জিত, জনশূন্য এবং অগ্নিতপ্ত। কোথাও কোথাও শ্যামস্নিগ্ধ বৃক্ষলতায়পূর্ণ মরুদ্যান শোভা পাইতেছে বটে; কিন্তু আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক। উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি, পূর্বে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর এই দেশটির চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। এই বিরাট ভূভাগটি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা প্রদেশে বিভক্ত। এই প্রদেশগুলির জলবায়ু ও মাটি বিভিন্ন প্রকারের। অধিবাসিগণের দৈহিকগঠনের ক্ষেত্রেও কম বেশী তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আরবের উত্তরাঞ্চল পাহাড়ময়। তারপরই মূল হিজায অঞ্চল। এখানেই সুবিখ্যাত মদীনা নগরী অবস্থিত। মদীনার প্রাচীন নাম ইয়াস্‌রেব্‌। মূল হিজাযের দক্ষিণভাগে মক্কা শহর এবং জেদ্দা বন্দর অবস্থিত। মক্কা মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদের (দঃ) জন্মস্থান। জেদ্দা

হজ্‌যাত্রীদের অবতরণের বন্দর এই উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইয়ামেন অবস্থিত। সাধারণতঃ ইয়ামেন বলিলে আরবের দক্ষিণ দিকটাই বুঝায়। দক্ষিণ-পূর্বকোণে ওমান। হিজাযের পাহাড়গুলির পূর্ব-প্রান্তে নেজাদ নামক বিরাট মালভূমি। এই মালভূমি মধ্য আরবের সমগ্র স্থান অধিকার করিয়া আছে। লোহিত সাগরের উপকূল হইতে মক্কার দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ মাইল। আরবের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় মক্কার গুরুত্ব এবং প্রসিদ্ধি অত্যন্ত বেশী। এই প্রসিদ্ধির মূলে অনেকগুলি কারণ বর্তমান। পূর্বপুরুষ হযরত ইব্‌রাহীম মক্কায় কাবাগৃহের প্রতিষ্ঠা করেন*। ইহার ফলে এই স্থানটি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আরবের কেন্দ্রস্থল-রূপে গুরুত্ব লাভ করে। হযরত মুহম্মদের (দঃ) জন্মের পূর্বে আরবের প্রদেশগুলি বিভিন্ন বৈদেশিক শাসকদ্বারা শাসিত হইত, কিন্তু মক্কা কোনদিন বৈদেশিক শক্তিদ্বারা বিজিত হয় নাই। প্রাচীনকাল হইতে মক্কা শুধু ধর্মীয় কেন্দ্ররূপেই প্রসিদ্ধি অর্জন করে নাই, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পৃথিবীর বহু জাতির লুব্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আরবের বণিক এবং সওদাগর-গণ অম্লান খ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হন। ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্যই আরবের বণিকগণ অত্যল্প কালের মধ্যে ধন-সম্পদে সচ্ছল ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। তাহারা বাণিজ্য-ব্যপদেশে বহু মূল্যবান দ্রব্য ও উপকরণাদি পারস্য এবং বাইজানটাইন রাজ্যে সারি সারি উষ্ট্রের কাফেলা বোঝাই করিয়া লইয়া যাইত

* 'Built by Abraham, that 'Saturnian father of the tribes' in the remotest antiquity, the Kaaba ever remained the holiest and most sacred of the temples of the nation.' (Syed Ameer Ali : The Spirit of Islam, London 1949, 5th Impression, p. Introduction lXIV)

তদানীন্তন আরবের অধিবাসীদের নৃত্যগীত ও জুয়াখেলার নেশা ছিল। উচ্চ ভদ্র এবং অভিজাত সমাজে এক ধরণের নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক নৃত্যগীত ও সঙ্গীত উৎসবে আনন্দের যোগান দিত। এতৎ-সত্ত্বেও, সমাজে তাহাদের সম্মান ছিল[১]। আরবের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রদায়গত রেষারেষি এবং দলাদলির অন্ত ছিল না। ধর্মীয় এবং জাতিগত পার্থক্য ও বিভিন্নতা হইতে আরবের উপজাতিগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ বাধিত। এই দ্বন্দ্বের ফলে ব্যাবিলনিয়ান, গ্রীক, পারসিক এবং আবিসিনিয়ান প্রভৃতি জাতি মক্কা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশগুলির সর্বময় কর্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আবিসিনিয়াবাসীরা হিজায আক্রমণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হয়, কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের গর্ব হিজায আক্রমণের পূর্বেই চূর্ণ হইয়া যায়। আবিসিনিয়াবাসীর মক্কা-বিজয় পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়া এবং মক্কার সম্মান বজায় রাখার মূলে আরবদেশের মহান্ পয়গম্বর হযরত মুহম্মদের (দঃ) পূর্বপুরুষ আবদুল মুত্তালিবের দেশপ্রেম এবং শাণিত বুদ্ধিই প্রধানতঃ দায়ী[২]।

প্রাচীন আরবের যতটুকু সংবাদ জানা যায়, তাহা মহাগ্রন্থ কুরআন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই আরবের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে কুরয়শগণ কি বংশগৌরব, কি আভিজাত্য, কি ব্যবসায়-বাণিজ্য—সব দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠ ছিল। কুরয়শগণের পূর্ব-পুরুষের নাম ফিহ্‌র কুরয়শ ; তিনি ৩০০ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন[২]। তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ নানা শাখায় বিভক্ত

---

১ Syed Ameer Ali : The Spirit of Islam. London, 1949. p. Introduction IXV

২ Ibid : pp. Introduction. IXVII — IXVIII.

হইয়া মক্কা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ৫০০ অব্দে ফিহ্‌র কুরয়শের অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ প্রসিদ্ধ কুশাই তাঁহার কর্মক্ষমতা এবং বিদ্যাবুদ্ধির বলে মক্কা এবং সমগ্র হিজাযের কর্তৃত্ব লাভ করেন। কর্তৃত্ব লাভ করিয়া তিনি মক্কার বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি একটি অখণ্ড অংশে পরিণত করেন। তিনি কাবাঘরের সংস্কার সাধন এবং মক্কা ও হিজাযের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতি বিধান করিয়া স্বয়ং গৌরবে বিভূষিত হন। বস্তুতঃপক্ষে, কাবাঘর অবস্থিত থাকায় মক্কা নগরী তীর্থস্থানে পরিণত হয়; এবং কাবার সেবায়েত ও রক্ষকরূপে কুরয়শগণের মর্যাদা সর্বাধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জনপ্রিয় কুশাই মক্কার জনসাধারণের হিতার্থে কয়েকটি বিষয়ের * প্রচলন করেন। ফলতঃ, সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিষয়ে বিধি-সঙ্গত রীতি-পদ্ধতি প্রচলন করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুরয়শ বংশের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে কুশাই ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের বন্ধন-সূত্র গ্রথিত করেন[৪]। ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে কুশাইয়ের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুদ্দার বিনা বাধায়

---

৩ 'Fihr, surnamed Koreish, a descendant of Ma'add, who flourished in the third century, was the ancestor of the tribe which gave to Arabia her Prophet and Lagislator.' (Syed Ameer Ali : The Spirit of Islam. London. 1949. p. 2)

৪ ক Hamadani: Ali the Man (Bk 1), Batala, The Punjab (India) First Edition, 1935. pp. 7-8.

খ Syed Ameer Ali : The Spirit of Islam. London. 1949. pp. 3-4.

* বিষয়গুলি নিম্ন প্রকার :-

ক দারুন নাদ্‌ওয়া — নাগরিকগণের দরবার গৃহে সভাপতিত্ব।

পিতার গৌরবজনক পদ লাভ করেন ; কিন্তু আবদুদ্দারের মৃত্যু ঘটিলে তদীয় পুত্র ও পৌত্রাদির সঙ্গে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'আব্দ মানাফের পুত্রগণের মধ্যে ভয়ানক গৃহবিবাদ বাধিল। মানাফের পুত্রগণ বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় তাহারা মক্কার কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল। মক্কার বিভিন্ন গোষ্ঠী কুশাই বংশের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শাখার কোন না কোন দিকে যোগদান করিয়া এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করে ; কিন্তু এক আপোষ মীমাংসার দরুণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। মীমাংসায় স্থিরীকৃত হইল যে, 'আব্দ মানাফের পুত্র আব্দ শাম্‌সের উপর 'সিকায়া' ও 'রিফাদার' দায়িত্বভার অর্পিত হইবে ; পক্ষান্তরে 'হিজাবা', 'নাদোয়া' এবং 'লিওয়ার' দায়িত্ব আবদুদ্দারের পুত্রগণ পাইবে। আব্দ শাম্‌স দরিদ্র ছিলেন। কাজেই, তাঁহার উপর অর্পিত সমস্ত দায়িত্বভার তিনি তদীয় ভ্রাতা হাশিমকে প্রদান করিলেন। বুদ্ধিমান হাশিম কাবাতীর্থের প্রধান প্রধান আয়ের অধিকারী হইয়া এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া অবস্থার উন্নতিবিধান করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবুদ্ধি এবং প্রতিপত্তিবলে তিনি রাজোচিত সম্মানের অধিকারী হন। পক্ষান্তরে, আবদুদ্দার বংশধরগণের হস্তে সামরিক অধিকার ন্যস্ত ছিল। এতৎসত্ত্বেও, তাঁহারা অবস্থার উন্নতিবিধান না করায় শক্তিহীন হইয়া পড়িল এবং হাশিমীবংশীয় ব্যক্তিগণের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতে লাগিল। বিখ্যাত বীর তাল্‌হা পরবর্তীকালের বদর যুদ্ধে হযরত রসুল এবং বনী হাশিমদের বিপক্ষে পরিচালিত কুরয়শ বাহিনীর পতাকাধারী ছিলেন। তাল্‌হা আবদুদ্দার-বংশের উত্তর পুরুষ। মানাফ

খ লিওয়া—যুদ্ধকালে যুদ্ধের পতাকা পতাকাবাহীর হস্তে প্রদান।

গ সিকায়া ও রিফাদা—মক্কায় হজ্ উপলক্ষে সমাগত যাত্রীদের জন্য খাদ্য এবং পানীয় সরবরাহ।

ঘ হিজাবা — কাবাগৃহের চাবি সংরক্ষণ।

ঙ কিয়াদা—যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা এবং সমরসজ্জা।

বংশধরগণ মক্কার সমস্ত কার্যে সর্বেসর্বা ছিলেন ; কিন্তু তাহাদের মধ্যেও বিবাদ বাধে। হাশিমের উন্নতিতে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র (আব্দ শাম্‌সের পুত্র) 'উমাইয়া অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং এক সময় পিতৃব্য হাশিমকে যুদ্ধের আহ্বান জানাইলেন। খোজাআ গোত্রের জনৈক গণক বিতর্কের রায় প্রদান করিবেন স্থিরীকৃত হইল। যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি বিজয়ী ব্যক্তিকে পঞ্চাশটি উষ্ট্র প্রদান করিবেন, এবং দশ বৎসর নির্বাসিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন। হাশিম ও 'উমাইয়ার মধ্যে বিতর্ক হইল। বিচারক 'উমাইয়াকে পরাজিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। 'উমাইয়া পঞ্চাশটি উষ্ট্র প্রদান করিয়া সিরিয়ায় নির্বাসিত হইলেন। এই ঘটনা হইতে বনী হাশিম ও বনী 'উমাইয়ার মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়[৫]। ৫১০ খ্রীষ্টাব্দে হাশিম একমাত্র পুত্র রাখিয়া মারা যান। হাশিমপুত্র শায়্‌বা তখন নাবালক ; কাজেই, মক্কার সমাগত যাত্রিগণের জন্য 'সিকায়া' ও 'রিফাদার' দায়িত্ব হাশিমের কনিষ্ঠভ্রাতা মুত্তালিবের উপর গিয়া পড়ে। মুত্তালিব শায়বাকে মক্কায় নিজের কাছে আনিয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। মক্কাবাসিগণ শায়বাকে মুত্তালিবের 'ক্রীতদাস' মনে করিত ; এজন্য তাহারা তাঁহার নূতন নামকরণ করিল 'আবদুল মুত্তালিব' অর্থাৎ 'মুত্তালিবের দাস'। মুত্তালিব ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র (হাশিমপুত্র) আবদুল মুত্তালিব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। অসামান্য চরিত্রবল এবং বুদ্ধিমত্তাগুণে ইনি বহুকাল মক্কা শাসন করিয়াছিলেন। তদানীন্তন মক্কার দশটি প্রধান গোষ্ঠীর দলপতিগণের সাহায্য এবং সহায়তায় আবদুল মুত্তালিব শাসনকার্য অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত

---

৫ মওলনা আজাদ রচিত 'ইনসানিয়াত মওতকে দরওয়াজে পর' গ্রন্থের বাংলা তরজমা : 'জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ' : মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃঃ ৪৮।

পরিচালনা করেন [৬]। তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণ বহুকাল পর্যন্ত মক্কা ও আরবের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা ছিলেন। তাঁহার পৌত্রই মহানবী হযরত মুহম্মদ (দঃ)। তিনি ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার করিয়া আরবের এক অনুন্নত জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। ফলে, রণদুর্বার মুসলমানগণ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়ে, এবং শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া পৃথিবীর মানুষ স্তম্ভিত হইয়া যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, 'উমাইয়া পিতৃব্য হাশিমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়া নির্বাসিত হয়; ইহার ফলে তাঁহার ক্রোধানল পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রজ্বলিত হয়। হাশিম 'উমাইয়ার গৃহবিবাদের জের তাঁহাদের পরবর্তী পুরুষগণের মধ্যেও চলিতে থাকে। কারবালার ভয়াবহ যুদ্ধ হাশিম 'উমাইয়ার দ্বন্দ্ব ও গৃহবিবাদের পরিণত ফল। আবতুল মুত্তালিবের দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে আব্বাস, হামযা, আবদুল্লাহ্ এবং আবু তালিব ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত। কনিষ্ঠ আবদুল্লাহ্‌র পুত্র জগৎবরেণ্য হযরত মুহম্মদ (দঃ) এবং আবু তালিবের পুত্র ও রসূল-দুহিতা বীবী ফাতিমার স্বামী হযরত আলী। এই বংশের বৈশিষ্ট্য শান্তিপ্রিয়তা; পক্ষান্তরে বনী উমাইয়াগণ রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

'উমাইয়ার মৃত্যুর পর তৎপুত্র হারেব, হাশিমপুত্র আবদুল মুত্তালিবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় এবং পরাজিত হইয়া মুত্তালিব-গোষ্ঠীর সংশ্রব বর্জন করে। হারেবের পুত্র আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে 'উমাইয়া বংশধরগণ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং তাহারা বনী হাশিমদের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এইভাবে বিদ্বেষের অনলশিখা বংশানুক্রমে উমাইয়াদের ভিতর সংক্রামিত হয়। ফলে,

৬ ক Syed Ameer Ali: The Spirit of Islam. London. 1949. pp 4-5.

খ Hamadani: Ali The Man. (Bk. I), 1935. pp. 9-11.

মানাফ-বংশ দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শাখায় বিভক্ত হয়। নিম্নে মানাফ বংশ তথা কুরয়্শ-বংশের বংশলতিকা ৭ প্রদত্ত হইল ঃ
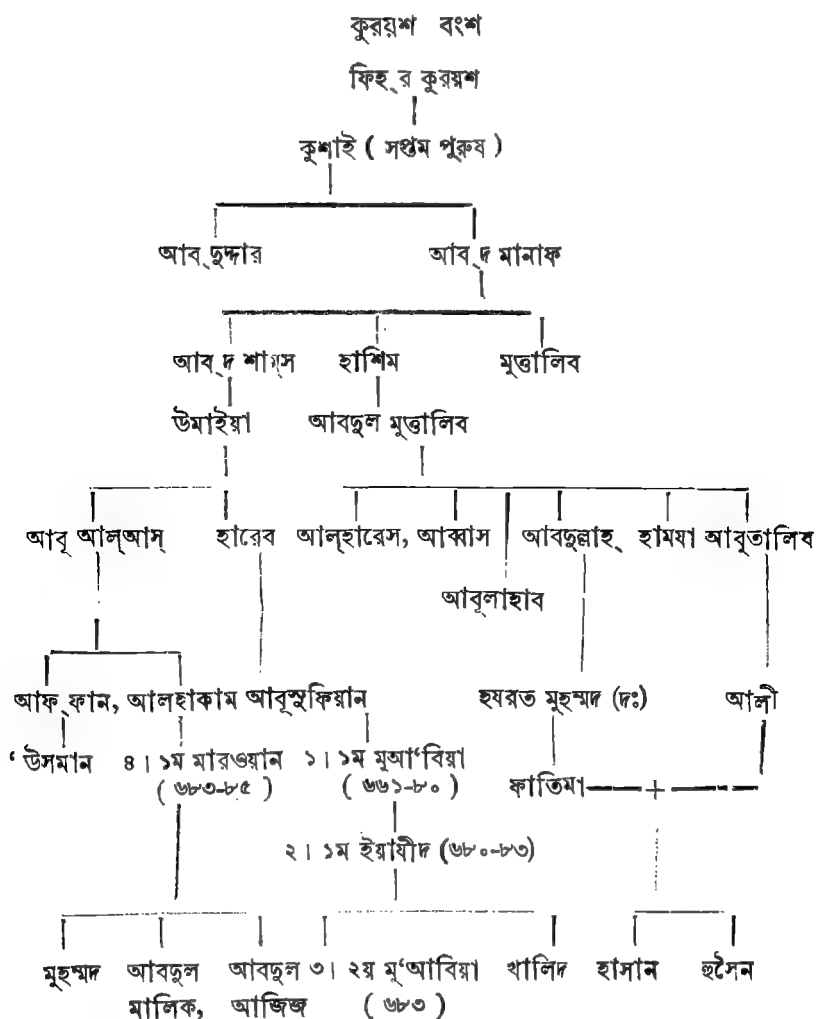
৭ Collected from :
P. K. Hitti : History of The Arabs. London. 1951. p. 190.
E. G. Browne : The Literary History of Persia. London. 1902. p. 214.

বনী 'উমাইয়া ও বনী হাশিমের বংশতালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, 'উমাইয়া পিতৃব্য হাশিমের সহিত সংঘর্ষ করিয়াছেন, আবূ সুফিয়ান হযরত রসূলুল্লাহ্‌র সহিত লড়াই করিয়াছেন, আমীর মুআ'বিয়া ও হযরত আলীর মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছে। ইয়াযীদ হযরত ইমাম হুসৈনকে শহীদ করিয়াছেন [৮]।

১। খ. হযরত মুহম্মদ (দঃ) ও ইসলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি, মানাফ বংশের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শাখার মধ্যে বিদ্বেষের বহ্নিশিখা বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া তাহাদের জীবনধারাকে অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে [৯] মুত্তালিবের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্‌র একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই পুত্র-সন্তানই ইতিহাসখ্যাত হযরত মুহম্মদ (দঃ)। হযরতের পূর্বপুরুষের নাম ফিহ্‌র কুরয়শ। কাজেই, তিনি কুরয়শ বংশজাত ছিলেন। পুরাতন কুরয়শ বংশ কালক্রমে কতকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়। এই শাখাগুলির মধ্যে বনী হাশিম এবং বনী 'উমাইয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। নবীজী হাশিম বংশীয় ছিলেন। তিনি যে-বৎসর ভূমিষ্ঠ হন, সেই বৎসর আবি-সিনিয়ার সম্রাট্‌ কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামেনের শাসক আবরাহা বহু সৈন্য-সামন্ত লইয়া মক্কা আক্রমণ করিলেও নানা কারণে পরাজিত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। জন্মের পর অল্প কিছুদিন

---

৮ মওলানা আজাদ : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫০।

৯ সৈয়্যিদ আমীর আলী এই মত পোষণ করেন। (A Short History of the Saracens, London, 1949 p. 7. fn.) কিন্তু হযরতের জন্মের তারিখ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ বর্তমান।

হযরত, হালিমা নাম্নী এক ধাত্রীর নিকট লালিত পালিত হন। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই পিতা আব্দুল্লাহ্‌র মৃত্যু ঘটে এবং মাত্র ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে জননী আমিনাও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে শিশু মুহম্মদের (দঃ) লালন পালনের দায়িত্ব প্রথমে পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব এবং পরে পিতৃব্য আবু তালিবের উপর পড়ে। সুতরাং আবু তালিবের গৃহেই পিতৃমাতৃহীন শিশু মুহম্মদের (দঃ) বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়[১০]। অতঃপর, জীবনের ৬৩ বৎসরকাল নানা বাধাবিঘ্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তিনি সমগ্র আরবদেশে ইস্‌লাম-ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার প্রচারিত এই নূতন-ধর্মে দীক্ষিত মুসলমানগণ হযরতের নীতি-নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হইয়া এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইল। তাঁহারা দুর্বার গতিতে রোমক গ্রীক সভ্যতা নিশ্চিহ্ন করিয়া তৎস্থলে এক নূতন সভ্যতা বিস্তৃত করিলেন[১১]।

এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাদেশের বহু স্থানে ইসলামধর্মের বাণী ছড়াইয়া পড়িল। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন (হিজরী ১১ সালের ১২ই রবিয়ল আউয়াল) সোমবার ইসলাম জগতের ধর্মগুরু নবীজীর ওফাৎ লাভ হয়[১২]।

২। ক. অন্তর্বিপ্লব।

হযরত রসূলের ওফাতের পর তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া মুসলমানগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। তাঁহার জীবদ্দশায়

---

১০ Stanley Lane Poole: 'Glimses of Islam' - The Islamic Literature. October. 1956. pp. 51-52.

১১ Ibid - p. 59.

১২ Syed Ameer Ali : The Spirit of Islam. London-1949. p. 117.

মক্কা-মদীনায় যে-মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, হযরত ছিলেন তাহার ব্যবস্থাপক, শাসক, রাষ্ট্রনায়ক এবং ধর্মগুরু। সুতরাং তাঁহার অবর্তমানে নবগঠিত রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। রসূলের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। তিনি নিজে অপর কাহাকেও খলীফা মনোনীত করিয়া যান নাই[১]। ফলে, আনসার এবং মুহাজিরগণের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলিল। হযরত রসূল কুরয়শ বংশীয় ছিলেন এবং মুহাজিরগণই সর্বপ্রথম ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহারা বলিলেন, উত্তরাধিকার তাঁহাদের ভিতর হইতে মনোনীত করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, আনসারগণ জানাইলেন যে, তাঁহারাই হযরতকে মদীনায় আশ্রয় দিয়া ধর্ম-প্রচারের জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন; অতএব এ-পদের জন্য তাহাদের দাবীই অগ্রগণ্য। শেষে বিজ্ঞ আবূ বকরের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিবলে আন্সার মুহাজিরীনের মধ্যে এক আপোষ মীমাংসা হইল[২]। কিন্তু মুসলমানগণের এক দল বলিলেন যে, ভোটের দ্বারা যোগ্যতম ব্যক্তিকে হযরতের খলীফা নির্বাচিত করা হোক্। অপর দল প্রস্তাব দিল যে, মুসলিম-জগতের খলীফা মনোনয়নের ব্যাপারে নির্বাচনের আবশ্যকতা নাই। যাহা হউক, এই ঝগ্ড়া-বিবাদ নিষ্পত্তির কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া প্রথমে 'উমর ও আবূ 'উবায়দা কুরয়শদের মধ্যে প্রবীণ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ আবূ বকরের হস্তে বয়'অত্ * হইলেন। অন্যান্যরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। এইভাবে আবূ বকরকে

---

১ P.K. Hitti : History of the Arabs. London. 1951. 5th Edtion. p. 137.

২ S. Khuda Bakhsh : A History of Islamic peoples. C. U. 1914. p. 47.

P. K. Hitti : op. cit., p. 140

* বয়'অত—হাতে হাত দিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া।

সকলে মুসলিম-জাহানের খলীফারূপে স্বীকার করিলেন [৩]। গৃহ-বিবাদ বন্ধ হইল ; কিন্তু এই নির্বাচনে সকল দল সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

হযরত রসূলের প্রিয় জামাতা এবং বীবী ফাতিমার সর্ব-গুণান্বিত স্বামী হযরত আলী নির্বাচনীস্থলে উপস্থিত ছিলেন না **। সম্ভবতঃ আলী কয়েকমাস পর নব-নির্বাচিত খলীফার বশ্যতা স্বীকার করেন [৪]

---

৩ ক Moulana Mohammad Ali : Early Caliphate. Lahore, India-Ist Edition. 1932. pp. 18-19.

খ S. Ockley : History of Saracens. London, 5th Edition. 1848.pp. 80-81.

গ Muir : The Caliphate, 3rd Edition, 1898. pp. 3-4.

** 'Ali held himself apart in proud and indignant reserve until the death of Fatimah which happened in the course of several months". (Hamadani ; Ali the Man-Bk. I. Ist Edition. 1935. p. 224.)

৪ মওলানা মুহম্মদ আলী বলেন, আবূবকরের হস্তে বয়'অত্ হওয়া সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী দুইটি মত প্রচলিত। কাহারও মতে, হযরত আলী ছয় মাস পরে নব-নির্বাচিত খলীফার বশ্যতা স্বীকার করেন। কেহ বলেন, তিনি নির্বাচনের দিনই দ্বিধাহীনচিত্তে আবূবকরের হস্তে বয়'অত হন। ছয় মাসের মধ্যে বয়'অত না হওয়া সম্পর্কে মওলানা সাহেব বলেন, রসূলুল্লাহ্‌র ওফাতের পরে সম্ভবতঃ তদীয়-কন্যা বীবী ফাতিমা পৈত্রিক সম্পত্তির কিছু অংশ দাবী করিলে খলীফা আবূবকর তাহা সরাসরি অগ্রাহ্য করেন। ইহাতে তিনি মর্মবেদনায় কাতর হন্ এবং কয়েক মাস পরেই পরলোক গমন করেন। পত্নী জীবিত থাকা পর্যন্ত এই ছয়মাসকাল আলী পত্নীর দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং খলীফার বশ্যতা

হযরতের ওফাতের সংবাদ বিদ্যুৎবেগে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে মদীনার কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে কতিপয় সম্প্রদায় মাথা চাড়া দেয়। এক সম্প্রদায় হইতে অন্য সম্প্রদায়ে বিদ্রোহ প্রসারিত হইল। হযরতের অসীম ব্যক্তিত্ব, অদম্য কর্মস্পৃহা, দৃঢ় মনোবল এবং গভীর মহাপ্রাণতার নিকট দুর্দান্ত আরববাসী বশ্যতা স্বীকার করিয়া একটি শিষ্ট ও স্বাধীনজাতি হিসাবে গড়িয়া উঠে [৫]। তাঁহার ওফাতের পর তাহারা কিছুতেই খলীফার বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিল না। রসূলুল্লাহ্‌র বিরাট সাফল্য দেখিয়া কতকগুলি ধোঁকাবাজ লোক পয়গম্বরী দাবী উত্থাপন করিয়া আরবের বিভিন্ন

অস্বীকার করেন। নব-নির্বাচিত খলীফার শাসনকার্যের কয়েক মাস পরে, মদীনা শত্রুগণের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আলী খলীফার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ান এবং তাঁহার আদেশানুসারে তিনি শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। (Moulana Mohammad Ali : Early Caliphate, Lahore 1933, pp. 23-24) ঐতিহাসিক মুয়রও এ-সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। তাঁহার মতে, আলী সম্ভবতঃ ছয়মাস কাল খলীফার বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। বীবী ফাতিমার মনোবেদনার জন্য আলী ছয়মাস কাল খলীফার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকেন ; ইহার ফলে শীয়াগণের ধারণা হয় যে, আলী স্বয়ং খলীফা-পদপ্রার্থী ছিলেন। (Muir : The Caliphate, 3rd Edition. 1898. p. 5.) সৈয়্যিদ খুদা বখ্‌শ বলেন, নির্বাচনের সময় হযরত আলী, বীবী 'আইশার গৃহে রসূলুল্লাহ্‌র দাফন কাফন কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই, পরে তিনি প্রতিবাদ জানাইলেও তাহা কার্যকর হয় নাই।' (A History of Islamic people. c.u.1914. p.48) হামাদানী বলেন, নির্বাচনীস্থলে আলী উপস্থিত থাকিলে সর্বসম্মতিক্রমে খলীফা নিযুক্ত হইতেন। (Hamadani : Ali the Man, (Bk. I) First Edition 1935. p. 174)

৫ Syed Ameer Ali : The Spirit of Islam. London. 1949, pp. 118-121.

স্থানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। সৌভাগ্যের বিষয়, খলীফা আবূ বকর খিলাফতের প্রথম বৎসরেই এই সকল বিদ্রোহ অত্যন্ত কঠোর হস্তে দমন করিয়া দেশে শান্তি ও শৃংখলা ফিরাইয়া আনেন [৬]। তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ কার্যে শৃংখলাবিধান করিয়া পারস্য এবং সিরিয়া-সীমান্তকে শক্তিশালী করেন। ফলে, রোম এবং পারস্যের শাসকের সঙ্গে মুসলমানদের বিবাদ ও যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ 'আমর ইব্‌নুল্‌'আস্‌, খালিদ বিন্ অলিদ্, আবূ 'উবায়দা, দেরার প্রভৃতি বীর সেনানীগণের নেতৃত্বে বহুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল [৭]। দিকে দিকে মুসলিম-বাহিনী নূতন নূতন দেশ জয় করিয়া মুসলিম-সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিলেন। খলীফা আবূ বকর দুই বৎসর চারিমাস রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রধান প্রধান নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণের সম্মতি এবং পরামর্শ গ্রহণ করিয়া হযরত 'উমরের স্কন্ধে খিলাফতের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন [৮]। এই সময়ে আলীর স্বপক্ষীয় একটি দল গঠিত হইয়াছিল, আবূ বকরের মৃত্যুর পর স্বয়ং আলী এবং তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি (আলী) এইবার খলীফা মনোনীত হইবেন। কিন্তু তাহা না হওয়ায় আলীর দলভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল, এবং এই অসন্তোষ ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতে লাগিল। খলীফা 'উমরের রাজত্বকাল মুসলিম সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে এক স্বর্ণযুগের সূচনা

৬ Muir: The Caliphate. London. 3rd. Edition 1899. pp. 20-26, 39.

৭ ক. Ibid: p. 43.

খ. Moulana Mohammad Ali: Early Caliphate, Lahore India, 1st Edition-1932, p. 49.

৮ মওলানা আজাদ: 'ইনসানিয়াত মউত কে দরওয়াজে পর' গ্রন্থের বাংলা তর্জমা। (অনুবাদক: মুহি উদ্দীন খান) ঢাকা, ১৯৫৯, পৃ: ২৮-৩১।

করে। কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা, সূক্ষ্মবিচারবুদ্ধি এবং অসীম কর্মক্ষমতার জন্য তিনি ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয়[৯]। তিনি শত্রুর প্রতি বজ্রের ন্যায় কঠোর এবং দীনদুঃখী ও বেদনাপীড়িতের প্রতি কুসুমের ন্যায় কোমল ছিলেন। আরব জাতির ন্যায় দুর্দান্ত জাতিকে বশে আনিবার জন্য তাঁহার ন্যায় শক্তিমান শাসকের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। তাঁহার জন্যই মরুবাসী আরবজাতি মাথা তুলিতে সাহস পায় নাই। শত্রু দমন করিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসাধারণ। ইহা তাঁহার আল্লাহ্-প্রদত্ত গুণ। হযরতের জীবনযাত্রা প্রণালী 'উমর অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। অনেক সময় গভীর নিশীথে নিদ্রা পরিহার করিয়া তিনি একাকী নগরের পথে পথে ভ্রমণ করিতেন, এবং দীনদুঃখী ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করিতেন। যে-কোন শ্রেণীর প্রজা সহজেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সুখ-দুঃখ নিবেদন করিতে পারিত[১০]। হিজরী ২৩ সনে মুসলমানগণ সাজেস্তান, মাক্‌রান, ইস্পাহান প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া লইলেন। এই সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রের আয়তন মিশর হইতে বেলুচিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 'উমর হযরত রসূলের আদেশ অনুযায়ী ধর্মীয়-জীবনে এমন কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন করেন, যাহাতে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ ধীরে ধীরে দুর্বল ও কৃশ হইয়া পড়িল[১১]। দশ বৎসর পাঁচ মাস খিলাফতের গুরু দায়িত্ব বহন করিবার পর ধর্মনিষ্ঠ খলীফা 'উমর মস্‌জিদে নামাজ পড়িবার সময় ফিরূজ নামক পারস্য-দেশীয় এক গোলাম ঘাতকের হস্তে মারাত্মকরূপে জখম হন; এবং তিন দিন পরেই মানবলীলা

---

৯ Syed Ameer Ali: A Short History of the Saracens. London 1934. p. 27.

১০ Ibid. pp. 43-44.

১১ মওলানা আজাদ (অনুদিত: মুহিউদ্দীন খান): পূর্বোক্ত, পৃ: ৪২।

সম্বরণ করেন [১২]। মৃত্যুর পূর্বে 'উমর, আবূ বকরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন না ; 'উমর স্বয়ং খলীফা মনোনীত না করিয়া নির্বাচনের ভার ছয়জন প্রবীণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উপর অর্থাৎ ইব্‌ন আবূ তালিব, 'উস্‌মান ইব্‌ন আফ্‌ফান, যুবায়র ইব্‌ন আল্‌ আবাম, সাদ ইব্‌ন আবি ওক্কাস, তাল্‌হা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ-এর উপর প্রদান করিলেন। কিন্তু শর্ত হইল, ছয়জনের মধ্য হইতে একজনকে তাঁহারাই নির্বাচিত করিবেন। কয়েকদিন পর্যন্ত দরবার ও সভাস্থলে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল। অবশেষে আলী ও 'উস্‌মানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইল ; এবং আবদুর রহমানের মধ্যস্থতায় 'উস্‌মান তৃতীয় খলীফা পদে নির্বাচিত হইলেন * [১৩] মদীনার বনী উমাইয়াগণ শক্তিশালী

---

১২ ক. R. A. Nicholson : A Literary History of the Arabs. Cambridge University 1930. p. 189.

খ. S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 65.

গ. মওলানা আজাদ (অনূদিত : মুহি উদ্‌দীন খান) : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২-৪৩।

* 'উস্‌মানের নির্বাচনের পূর্বে আবদুর রহমান, আলীকে শর্তাধীনে খলীফার মনোনয়ন দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই শর্ত মানিতে রাজী হন নাই। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক হামাদানী বলেন, 'Ali was offered the Caliphate if he would follow the Book, the Sunnah and the precedents of the first two Caliphs. He promised to follow (the spirit of) the first two items according to his lights and on his refusing to fetter his judgement by promising more, the proposer passed on the office to the consenting Othman.' [Syed Bashir Ahmed Hamadani : Ali the Man (Bk. I) Batala (The Punjab, India) Dec' 1943. p. Preface ii.]

১৩ ক. Hitti. : op. cit., p. 174.

খ. Husein Rofe : The struggle for leadership in the early Caliphate. The Islamic Literature 1957/ May. p. 6.

হইয়া উঠিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে তাঁহারা বনী হাশিমদের প্রতি যে-বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার ফলে বনী উমাইয়াগণ হযরত আলীর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের সাহায্য এবং সহানুভূতির ফলে ‘উমাইয়া বংশধর ‘উস্‌মান, আলীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিলেন [১৪]। নির্বাচনে ভারপ্রাপ্ত পাঁচ জনের মধ্যে সম্ভবতঃ কাহারও আলীর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। কাজেই, তাঁহারা আলীকে নির্বাচিত না করিয়া ‘উমাইয়া বংশের ‘উস্‌মানকে খলীফা মনোনীত করিলেন। ‘উস্‌মান নিজে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু, তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়ায় তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল না; ব্যক্তিত্বেরও অভাব ছিল। এ-কারণে, তিনি তাঁহার জ্ঞাতিগোষ্ঠী বনী উমাইয়াদের হস্তের ক্রীড়নক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগ লাভ করিয়া বনী উমাইয়াগণ নিজেদের খেয়াল-খুশী মাফিক কাজ করিতে লাগিলেন। ‘উস্‌মানের খুল্লতাত ভ্রাতা মারওয়ান (বা মেরুয়া) খলীফার মুন্সী অর্থাৎ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। মারওয়ান ছিলেন অত্যন্ত অসৎ প্রকৃতির মানুষ। তাঁহার কূটনীতির জন্য সরলমতি ‘উসমান বারংবার ভ্রমে পতিত হইলেন এবং তাঁহারই পরামর্শক্রমে খলীফা ক্রমশঃ জনসাধারণের অপ্রিয়ভাজন হইয়া উঠিলেন [১৪ক]। পক্ষান্তরে, আলী ছিলেন মহানুভব এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তিনি খলীফা-নির্বাচনের দ্বন্দ্বে পরাজিত হইলেও নূতন খলীফাকে সর্বকার্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ‘উসমানের পূর্ববর্তী দুই খলীফার শাসনকার্যের দৃঢ়তায়

গ. মওলানা আজাদ (অনূদিত: মুহি উদ্দীন খান): পূর্বোক্ত পৃঃ ৪২।

১৪ Syed Ameer Ali: op. cit., pp. 45 - 46.

১৪ক. Ibid. p. 46.

দুর্দান্ত আরববাসী মাথা তুলিতে সাহস পায় নাই ; কিন্তু দুর্বলচেতা 'উসমানের খিলাফৎকালে তাহারা অশান্ত এবং দুর্বার হইয়া উঠিল। তাহারা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে মুসলমান ও নব-দীক্ষিত মুসলমানগণের একতার মধ্যে ফাটল ধরাইল। তাঁহার কুশাসনের জন্যই বনী হাশিম ও বনী 'উমাইয়াগণের সুপ্ত শত্রুতা পুনর্বার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, এবং তাহা পরবর্তী এক শত বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। তাহারা রসূলের বিরাট্ ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে তাহাদের শত্রুতা কিছুকালের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিল মাত্র[১৫]। 'উসমান খলীফা নির্বাচিত হইয়াই 'উমরের নিয়োজিত কর্মদক্ষ প্রাদেশিক শাসকদের অপসারিত করিলেন ; এবং তৎস্থলে স্বীয়-বংশের লোক-জনকে যোগ্যতার বিচার না করিয়া নিযুক্ত করিলেন[১৬]।

এই সকল অকর্মণ্য-ব্যক্তির অত্যাচারে প্রদেশগুলির মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইল। নূতন শাসকদের অত্যাচারে বিপর্যস্ত হইলেও প্রথম ছয় বৎসর জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে নাই। কিন্তু শেষে তাহারা অধৈর্য হইয়া উঠিল। 'উমাইয়া গভর্ণরগণ মুসলিম সাম্রাজ্যের ধনরত্ন লুটিয়া লইল এবং তাহাদের অত্যাচারে সকলে জর্জরিত হইয়া উঠিল। রাজধানী মদীনায় খলীফার নিকট এইসব কথা প্রায়ই গিয়া পৌঁছিত ; আলী বহুবার

---

১৫ Ibid. p. 46.

১৬ Ibid. pp. 46, 59

J. Wellhausen : The Arab kingdom and its fall. tr. Margaret Grahaam Weir, C. U. 1927. pp. 41 - 42 (Introduction)

S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 68.

Do : The Arab civilization. 2nd. Edition. 1943. pp. 55 - 56.

খলীফাকে এ সম্পর্কে জানাইয়াছেন, কিন্তু মারওয়ানের চক্রান্তে খলীফা অভিযোগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। প্রজাগণ বারংবার খলীফার শরণাপন্ন হইয়া ব্যর্থ হইলে খলীফার বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ আসন্ন হইল [১৭]। প্রজাবিদ্রোহের সঙ্গে আরও কতিপয় কারণ যুক্ত হওয়ায় দেশব্যাপী সমস্ত লোক ক্ষেপিয়া গেল। 'উসমানের দুর্বলতার সুযোগ লাভ করিয়া কতকগুলি লোক (আশ্‌তার নাখয়ী নামক জনৈক অনারব এবং আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাবা * নামক অপর একজন নবদীক্ষিত মুসলমান) কুফা, বস্‌রা এবং মিশরে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হইল। তাহারা খলীফা 'উসমান এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপপ্রচার করিয়া দেশের জনগণের মন বিষাইয়া তুলিল [১৮]। ইব্‌ন সাবা, হযরত আলী ও আহ্‌ল-ই-বয়তের দরদী সাজিয়া তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে থাকে। ফলে, তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বহু মুসলমান তাহার মতানুসারী হয় এবং খলীফা 'উসমানকে উচ্ছেদ

---

১৭ Syed Ameer Ali : op. cit, pp. 47 - 48.

* আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাবা : খলীফা 'উসমানের সময়ে এই লোকটি ইহুদী ছিল। তখন তাহার নাম ছিল ইব্‌ন সওদা। কিন্তু পরে নাম-মাত্র মুসলমান হইয়া আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাবা নাম গ্রহণ করিল। সে 'উসমানের বিরুদ্ধে বিপ্লবী দল সৃষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর হয়। সে সর্ব্বপ্রথমে বস্‌রা নগরীতে হাকীম ইব্‌ন জাবিল্লাহ্‌ আব্দি নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে অবস্থান করে। সে হযরত আলী ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি পক্ষপাতমূলক কথা এবং হযরত 'উসমানের বিরুদ্ধে দুর্নাম ও অপবাদ প্রচার করিতে থাকে। অতঃপর সে কুফা হইতে সিরিয়া যায়। (ইমাদ উদ্দীন ইব্‌ন কাছির : আল্‌বেদায়া ওয়ান নিহায়া। ৯ম খণ্ড, মিশর, ১৯৩২, পৃঃ ১৬৭-১৬৮)

১৮ মওলানা আজাদ (অনূদিত : মুহিউদ্দীন খান) : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩-৫৪

করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ইব্‌ন সাবার মতে হযরত আলী হযরত রসূলের অছিয়ত করা ব্যক্তি। অতএব, তিনিই রসূলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ইব্‌ন সাবার শিষ্যমণ্ডলী ইরাক, আজারবাইজান ও অন্যান্য স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার মতবাদ প্রচার করিতে থাকে [১৯]। এই বিপ্লবী প্রচারণা এতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল যে, মুহম্মদ ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা এবং মুহম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরের মত মানুষও অপপ্রচারকারীদের দলে ভিড়িয়া গেলেন [২০]। অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিলে মিশরের এক বিদ্রোহী প্রতিনিধিদল (মালিক উশ্‌তুর ইহাদের দলপতি) মদীনায় খলীফার নিকট আসিল। তাহারা প্রাদেশিক গভর্ণরদের কুশাসনের প্রতিকার প্রার্থনা করিল এবং মিশরের অত্যাচারী শাসক, খলীফার দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবি সারাহ্‌কে অনতিবিলম্বে শাসনকর্তৃত্বের পদ হইতে অপসারিত করিয়া তৎস্থলে তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি মুহম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরকে নিয়োগ করিবার জন্য খলীফাকে চাপ দিল। খলীফা তাহাদের নির্দেশ পালন করিলেন [২১]। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, মুহম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর এবং তাঁহার সহচরগণ মারওয়ানের জালকরা একখানি চিঠি পথের মধ্যে ধরিয়া ফেলিলেন। এই চিঠিতে তাহাদের প্রতি মৃত্যু-আজ্ঞা এবং খলীফার শীলমোহর অঙ্কিত ছিল। প্রতিনিধিদল ক্রুদ্ধ হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া খলীফার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিল।

---

১৯ আবদুল আজিজ মহাদ্দিস দেহ্‌লবী রচিত 'তোওফায়ে এস্‌না আসারিয়া' নামক গ্রন্থের উরদু তরজমা 'আয়নায়ে মজাহাবে ইমামিয়া'। ১৯২৯, লাহোর, পৃঃ ২ - ৩।

২০ মওলানা আজাদ : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪।

২১ J. Wellhausen : op. cit., pp. 47 - 48 (Introduction)
S. Khuda Bakhsh : op. cit., pp. 72 - 73.

অচিরেই প্রমাণিত হইল যে, ক্রূরবুদ্ধি মারওয়ান চিঠি জাল করিয়াছেন। বিদ্রোহীদল মারওয়ানকে তাহাদের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য খলীফাকে অনুরোধ করিল। কিন্তু, মারওয়ানের জীবনাশঙ্কায় 'উসমান তাহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। মারওয়ানকে তাহাদের হস্তে অর্পণ করিলে অবস্থা বেশীদূর গড়াইত না। কিন্তু, উপায়ান্তর না দেখিয়া বিদ্রোহীদল খলীফার গৃহ অবরোধ করিয়া রাখিল। তাহারা খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিল। খলীফার আত্মীয়-স্বজন এবং উমাইয়াগণ বৃদ্ধ খলীফাকে পরিত্যাগ করিয়া সিরিয়ার শক্তিশালী শাসক মু'আবিয়ার নিকট আশ্রয় লইল। 'উসমানের এই বিপদে হযরত আলী, তাঁহার পুত্রগণ এবং অন্যান্য রক্ষক অত্যন্ত সাহসের সহিত বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন *। অবশেষে সমস্ত প্রতিরোধ উপেক্ষা করিয়া

---

* হযরত আলী খলীফা 'উসমানের প্রতিরোধকারী দলে ছিলেন কিনা, তৎসম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। সৈয়্যিদ আমীর আলীর মতে, হযরত আলী খলীফার জীবনরক্ষার্থে বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন ; প্রধানতঃ তাহারই বীরত্বের জন্য বিদ্রোহীদল সহজে সফলকাম হইতে পারে নাই। এ সম্পর্কে সৈয়্যিদ আমীর আলীর মন্তব্য : 'At this hour of peril, the Ommeyades deserted the old chief and fled towards Syria, where their kinsman Muawiyah was governor. But Osman was bravely defended by Ali and his sons and dependents, and the insurgents had great difficulty in making any impression on the defenders.' (A Short History of the Saracens. 1951. p. 48.) কিন্তু ঐতিহাসিক নিকলসন্ হযরত আলী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁহার মতানুসারে বুঝা যায়, আলী বিদ্রোহী দলের বিপক্ষে

বিদ্রোহীদলের দুই তিনজন লোক খলীফার বাসগৃহের দেওয়াল লংঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। 'উসমান তখন কুর'আন পাঠ করিতে-ছিলেন। ঐ-অবস্থাতেই দুরাত্মাগণ তাঁহাকে সাংঘাতিকরূপে জখম করিয়া নিহত করিল (১৭ই জুন, ৬৫৬ খ্রীঃ)[২২]। তাঁহার পত্নী

প্রতিরোধকারী দলে খলীফার জীবনরক্ষার্থে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আরও বলেন 'উসমানহত্যার ব্যাপারে অনেকে যে সন্দেহ পোষণ করেন যে, আলী বিদ্রোহীদলে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য নহে। নিকলসনের মতানুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হযরত আলী 'উসমান-হত্যা কালে বিদ্রোহী দলের আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে উপস্থিত ছিলেন না, বরং তিনি দূরান্তরালে অবস্থান করিয়া-ছিলেন। তাঁহার মনের দুর্বলতাই ইহার কারণ। নিকলসন বলেন: 'Ali, the Prophet's cousin and son-in-law, who had hitherto remained in the background was now made Caliph. Although the suspicion that he was in the League with the murders may be put aside, he showed culpable weakness in living Uthman to his fate without an effort to save him.' (A Literary History of the Arabs - Cambridge 1930, p. 191.) J. Wellhausen নিকলসনের সঙ্গে একমত। কারণ তিনিও বলেন, হযরত আলীকে 'উসমান-হত্যার ব্যাপারে যে দোষারোপ করা হয়, তাহার কারণ আলী 'উসমানের জীবনরক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার উক্তি: 'In reality they did nothing to stem the course of events, in the hope that things would work out to their advantage in the end.' (Arab kingdom and its Fall., C. U. 1937, p. 49. introduction.)

২২ ক. Syed Ameer Ali: op. cit., p. 48.

বীবী নায়িলা স্বামীকে রক্ষা করিতে গিয়া আহত হন। শত্রুগণের তরবারীর আঘাতে তাঁহার হস্তের কয়েকটি আঙ্গুল ছিন্ন হয় [২৩]। এইভাবে ইসলামের ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় সংযোজিত হইল।

২। খ. জঙ্গে জমল এবং জঙ্গে সিফ্‌ফিন

॥ জঙ্গে জমল ॥

তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমানের শোচনীয় মৃত্যুর পর মদীনায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হইল। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র বাসনা লইয়া মক্কায় গমন করিলেন। মদীনার এক নাগরিক বীবী নায়িলার রক্তরঞ্জিত ছিন্ন আঙ্গুল 'উসমানের রক্তসিক্ত জামার সহিত জড়াইয়া দামেস্কে গিয়া উপস্থিত হইল * [২৪]। মদীনার নেতাগণের মধ্যে দলাদলি ও রেষারেষির অন্ত ছিল না।

খ. Nicholson : A Literary History of the Arabs, Cambridge University. 1930. 2nd Edition, p. 190.

গ. S. Khuda Bakhsh ; op. cit, pp. 73-74.

ঘ. J. Wellhausen : op. cit., pp. 48-50.

ঙ. মওলানা আজাদ : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭-৬৫।

২৩ P. K. Hitti : op. cit., p. 178.

Muir : The Caliphate. London. 2nd. Edition. 1891. pp. 234-237.

* ছিন্ন আঙ্গুল এবং জামা কে বা কাহারা মু'আবিয়ার নিকট পৌছাইয়া দিয়াছিল, তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে।

২৪ ক. J. Wellhausen : Ibid. p. 75.

খ. Muir : Ibid. p. 234.

কাজেই ‘উসমানের পর খিলাফৎ গ্রহণের জন্য কেহই অগ্রসর হইলেন না। মদীনাবাসী মুসলমানগণ এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে হযরত আলীর কথা স্মরণ করিলেন। আলী বিনীতভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন যে, তাল্‌হা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ অথবা যুবায়র ইব্‌ন আল্ আবাম-এর মধ্যে কেহ খলীফা নিযুক্ত হইলে তিনি সানন্দে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাল্‌হা এবং যুবায়র স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে ‘উস্‌মান-হত্যার ছয় দিন পর বন্ধু-বান্ধবের সনির্বন্ধ অনুরোধে আলী খলীফার পদ গ্রহণে রাজী হইলেন। যুবায়র ও তাল্‌হা সর্বপ্রথমে আলীর হস্ত চুম্বন করিয়া তাঁহার বয়’অত (বশ্যতা) স্বীকার করিলেন [২৫]। অন্যান্য সকলে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। অতঃপর, হযরত আলী মস্‌জিদে গিয়া তাঁহার দীর্ঘ ধনুকে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার হস্তে বয়’অত হইতে লাগিল [২৬]। কিন্তু, পরে কার্যকালে যুবায়র এবং তাল্‌হা, আলীকে কোন প্রকার সাহায্য করেন নাই। বরং, অল্প দিনের মধ্যেই আলীর বিরুদ্ধে তাঁহারা অস্ত্রধারণ করেন। তখন তাঁহারা বলিলেন, বিদ্রোহীদের ভয়েই ইতঃপূর্বে তাঁহারা আলীকে সমর্থন জানাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন [২৭]। এই সময়ে ইসলামের যে-দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, আলীরও তাহা এড়াইবার ক্ষমতা ছিল না। ঘরে-বাইরে সর্বত্র বিশৃংখলা; ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন [২৮]। আলী ছিলেন সর্বগুণের

---

২৫ Muir: The Caliphate. London. 2nd. Edition. 1891. p. 234.

২৬ Syed Ameer Ali: op. cit., p. 49.

২৭ ক. Muir: op. cit., p. 234.
খ. S. Khuda Bakhsh: op. cit., p. 75.

২৮ Muir: op. cit., p. 235.

আকর স্বরূপ। তিনি শক্তিশালী যোদ্ধা, অকৃত্রিম বন্ধু, সহানুভূতিশীল আত্মীয় এবং বিচক্ষণ সেনাপতি। শত্রুর প্রতিও তাঁহার উদারতার অন্ত ছিল না[২৯]। কিন্তু বনী 'উমাইয়াগণ তাঁহার খিলাফতের সূচনা হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন[৩০]। সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীর মু'আবিয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং 'উসমান হত্যার প্রতিশোধ লইবেন এই মর্মে ঘোষণাবাণী প্রচার করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি আলীকে খলীফা বলিয়া স্বীকার করিলেন না[৩১]।

আলী খলীফা নির্বাচিত হইয়া সর্বপ্রথমে মুসলিম-সাম্রাজ্যের সুশাসনের দিকে মনঃসংযোগ করেন। 'উসমানের সময়ে যে-সব দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি দেশ ও জাতির সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে অপসারণের জন্য আদেশ দেন[৩২]। নূতন খলীফার দুই এক জন হিতাকাংক্ষী আত্মীয় ও বন্ধু খলীফাকে জানাইলেন যে, রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার সুশৃংখলা বিধান না করিয়া অথবা তাহার ভিত্তি সুদৃঢ় না করিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে কাজ চালাইয়া যাইতে দেওয়া হোক। বর্তমান অবস্থায় তাহাদিগকে বরখাস্ত করিলে ইসলাম-সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ আসন্ন হইবে; বিশেষতঃ সিরিয়ার গভর্ণর মুআ'বিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান। সুতরাং বরখাস্ত যদি করিতেই হয়, তবে মুআ'বিয়াকে না করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিকে করাই বাঞ্ছনীয়। আলী কোন কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সরাসরি প্রাদেশিক শাসনকর্তা-

---

২৯ Nicholson : op. cit., p. 191.

৩০ Syed Ameer Ali : op. cit., p. 49.

৩১ Nicholson ; op. cit., p. 191.

৩২ Syed Ameer Ali : op. cit., p. 49

গণকে বরখাস্তের আদেশ দিলেন[৩৩]। কিন্তু এই আদেশের ফল হইল বিপরীত। যাহারা পূর্ববর্তী খলীফার আমলে সাম্রাজ্য লুটিয়া খাইতেছিল তাহাদের অসুবিধা হইল। এই সকল ব্যক্তি আলীর আদেশের ফলে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিল এবং খলীফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। পূর্ববর্তী খলীফা 'উসমানের মনোনীত কোন কোন প্রাদেশিক গভর্ণর বিনা প্রতিবাদে তাঁহার আদেশ পালন করিলেন ; কিন্তু অন্যান্য সকলে বিদ্রোহী হইল। বিদ্রোহী ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিরিয়ার গভর্ণর আবু সুফিয়ানের পুত্র মু'আবিয়া। মু'আবিয়া ধ্বনি তুলিয়াছিলেন যে, 'উসমানের হত্যাকারী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হইবে। আলী তাহা না করায় মু'আবিয়া আলীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। সিরিয়ার ধনবল ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়া মু'আবিয়া আলীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করিলেন[৩৪]। তিনি 'উসমানের রক্ত-রঞ্জিত জামা এবং বীবী নায়িলার ছিন্ন আঙ্গুল রাজধানী দামেস্কের মসজিদের মিম্বরের সঙ্গে ঝুলাইয়া দিলেন ; এবং আলীর বিরুদ্ধে 'উসমান-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে সিরিয়াবাসীকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন[৩৫]। আসলে মু'আবিয়ার এ-কার্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল খিলাফৎ দখল।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আলীর সম্মুখে আরও বিপদ আসন্ন হইল। হযরত রসূলের (দঃ) দুই সাহাবা এবং মক্কার বিখ্যাত কুরয়শ-নেতা তাল্‌হা এবং যুবায়র খলীফার নিকট যথাক্রমে কুফা ও বস্‌রার শাসন-কর্তৃত্ব প্রার্থনা করিলেন। আলী তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন

৩৩ Muir : op. cit., p. 236.

৩৪ Syed Ameer Ali : op. cit., p. 50.

৩৫ Muir : op. cit., p. 237.

S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 79.

নাই। এ-কারণে, তাঁহারা খলীফার শত্রু হইয়া দাঁড়ান[৩৬]। এই সময়ে রসূলুল্লাহ্‌র বিধবা পত্নী বীবী 'আইশা মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি মক্কা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে 'উসমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং আলীর খলীফা-নির্বাচনের সংবাদ শুনিতে পান। 'উসমানের হত্যাকাণ্ডের সহিত আলীর যোগাযোগ আছে মনে করিয়া বীবী 'আইশা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পুনর্বার মক্কায় ফিরিয়া যান*। আলীকে পদচ্যুত করিয়া যুবায়রকে খলীফা মনোনীত করিবার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বীবী 'আইশা মক্কার জনসাধারণকে উত্তেজিত করায় সেখানে আলীর বিরুদ্ধে একটি দল সংগঠিত হইল। তাল্‌হা ও যুবায়র সংগোপনে মদীনা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কায় বীবী 'আইশার সহিত সম্মিলিত হন; এবং তাঁহারা সদলবলে বসরায় গিয়া উপস্থিত হন। বস্‌রা সমৃদ্ধিশালী দেশ। মক্কার কুরয়শগণের সহিত বসরাবাসীর সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ ছিল। বীবী 'আইশা, তাল্‌হা এবং যুবায়রের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বসরায় এক বিরাট সৈন্যদল গঠিত হইল। বসরার শাসন-কর্তা 'উসমান ইব্‌ন হানিফা সর্বসাধারণের নির্বাচিত খলীফা আলীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের এই বিদ্রোহ সমর্থন করিলেন না। ইহার ফলে, 'উসমান ইব্‌ন হানিফাকে তাঁহারা প্রথমে কারারুদ্ধ ও পরে বিতাড়িত করেন[৩৭]। বীবী 'আইশা কুফা, মদীনা এবং ইয়ামেনের

---

৩৬ Syed Ameer Ali: op. cit., p. 50.

* 'She could not endure Ali, and on hearing that homage had been paid to him, she openly declared Uthman to be a saint and called for vengeance for him upon the new Khalifa.' [Wellhausen: Arab Kingdom & its fall. C. U. 1927. pp. 52-53. (Introduction.)]

৩৭ Muir: op. cit., pp. 240-243.

জনসাধারণের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন যেন তাহারা হযরত আলীর প্রতি তাহাদের আনুগত্য ভঙ্গ করে এবং হযরত 'উসমান-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। কিন্তু কেহই সে আবেদনে কর্ণপাত করিল না[৩৮]।

অবশেষে এই সংবাদ মদীনায় খলীফা আলীর কর্ণগোচর হইল। 'উসমান-হত্যার জন্য তাঁহারা খলীফার নিকট বিচারপ্রার্থী না হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন শুনিয়া আলী বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সৈন্যদল লইয়া (হিজরী ৩৬) বস্‌রার দিকে যাত্রা করিলেন। দুই পক্ষের সৈন্যদল 'খোরায়বা' নামক স্থানে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ হয়, এরূপ ইচ্ছা আলীর আদৌ ছিল না। খিলাফতের জন্য মুসলমানের রক্তপাত হইবে চিন্তা করিয়া আলী বিদ্রোহীদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করিতে চাহিলেন। তিনি বিদ্রোহীদের বলিয়া পাঠাইলেন, 'উসমান-হত্যার বিচার হইবে না তাহা তিনি কোন দিনই বলেন নাই। তিনি নিশ্চয়ই হত্যাকারীদের দণ্ডবিধান করিবেন। খলীফার প্রতিশ্রুতিতে যুবায়র, তাল্‌হা এমন কি বীবী 'আইশা পর্যন্ত মনোভাব বদলাইলেন। 'উসমানের হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত এরূপ বহু লোক আলীর সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল। এই হত্যাকারীরা যখন দেখিল যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলীর একটা আপোষ-মীমাংসা হইলে আলী তাহাদের প্রাণবধ করিবেন, তখন তাহারা সন্ধির বিরোধিতা করিতে মনস্থ করিল। সন্ধিপত্র যথাসত্বর স্বাক্ষরিত হইবে; দুই পক্ষ নিশ্চিন্ত হইয়া আছে, এমন সময়ে আকস্মিকভাবে 'উসমানের

J. Wellhausen: op. cit., pp. 52-53. (Introduction)
S. Khuda Bakhsh: op. cit., p. 77.

৩৮ Muir: op. cit., p. 243.

হত্যাকারীদলের অন্যতম নেতা মালিক উশ্‌তুর, তাঁহার দলবল লইয়া বিদ্রোহী যুবায়রী-সৈন্যের উপর নিপতিত হইলেন। আকস্মিক আক্রমণে বিদ্রোহীদল ক্রোধান্বিত হইয়া প্রতি আক্রমণ শুরু করিল। তাহাদের মনে হইল, খলীফা আলী তাহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। তাল্‌হা এবং যুবায়রকে অস্ত্রধারণ করিতে দেখিয়া আলীও মনে মনে বুঝিলেন, বিদ্রোহীদল তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছেন। তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে তাল্‌হা ও যুবায়র নিহত হইলেন। হযরত আলী যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন[৩৯]। বিবি 'আইশা একটি উষ্ট্রের উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে ইহা 'উষ্ট্রের যুদ্ধ' বা 'জঙ্গে জমল' নামে খ্যাত। হযরত আলী, বীবী 'আইশাকে পূর্ণ মর্যাদার সহিত মদীনায় পাঠাইয়া দেন** [৪০]। এই সময় হইতেই মুসলমানে মুসলমানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূত্রপাত হইল।

॥ জঙ্গে সিফ্‌ফিন ॥

৩৬ হিজ্‌রী সনে হযরত আলী 'উস্‌মান-হত্যার সাত মাস পরে মদীনা হইতে ইরাকের কুফা নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত

৩৯ ক. Ibid : p. 247.
খ. S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 78.

** বীবী 'আইশার প্রতি খলীফা আলীর মহত্ত্বপূর্ণ ব্যবহার এবং সসম্মানে তাঁহাকে মদীনায় প্রেরণ করা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক এস, খুদা বখ্‌শ, সৈয়্যিদ আমীর আলীর সহিত একমত।

৪০ 'Ayesha was taken prisoner. She was sent back with every mark of consideration and respect to Medina.' (Syed Ameer Ali ; A Short History of the Saracens, London, 1934, p, 50,)

করেন। তাঁহার খিলাফতের প্রথম চারি মাস মদীনাতেই রাজধানী ছিল ; এবং তিনি সেখানেই রাজত্ব করেন। বাকি তিন মাস তিনি 'জমলের যুদ্ধে' ব্যস্ত ছিলেন। কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত করায় তাঁহার কিছু সুবিধা হইয়াছিল ; কারণ সেখানে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি বসবাস করিতেন। তাঁহারা বিপদে-আপদে খলীফাকে সাহায্য করিতে আগ্রহশীল ছিলেন। এতৎভিন্ন, ভবিষ্যতে খিলাফতের দাবী লইয়া তাঁহার সঙ্গে মু'আবিয়ার গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে ইহা তিনি পূর্বাহ্নেই অনুমান করিয়াছিলেন[৪১]। মু'আবিয়াও আলীর আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। তখন মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন আলীর বিশ্বস্ত সেনানায়ক কয়স্ ইব্‌ন সাদ বিন্ উবায়্‌দা। কয়সের শক্তি, সামর্থ্য এবং রণনৈপুণ্যের জন্য খলীফা আলী তাঁহাকেই মিশরে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মু'আবিয়া দেখিলেন, কয়সের ন্যায় শক্তিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি মিশরে থাকিলে তিনি বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবেন না। কাজেই, ছলে-বলে-কৌশলে কয়সের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আলীর মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন ; এবং এক্ষেত্রে মু'আবিয়া আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করিলেন। আলী কয়সকে মিশর হইতে অপসারিত করিয়া রাজধানীতে তাঁহার অন্যতম উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত করিলেন। কয়সের ন্যায় একজন বিচক্ষণ শাসক ও সেনাপতির অপসারণে মু'আবিয়ার বেশ সুবিধা হইল[৪২]। এতদ্ব্যতীত বস্‌রায় 'জমলের যুদ্ধে' তাল্‌হা ও যুবায়র নিহত হইলে মু'আবিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত লোক একমাত্র খলীফা আলী ভিন্ন আর কেহই রহিল

৪১ Muir : The Caliphate, London 1891, pp, 252-53,
৪২ Ibid : pp. 254-255,

না[৪৩]। সৌভাগ্যক্রমে, মু'আবিয়া আমরের ন্যায় একজন শক্তিশালী এবং দূরদর্শী ব্যক্তিকে উপদেষ্টা এবং সহায়ক হিসাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৪৪]। মু'আবিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আলী এবং মু'আবিয়া নিজ নিজ সৈন্যদল লইয়া ফোরাত নদীর পশ্চিম-তীরবর্তী 'সিফ্‌ফিন্' প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন এবং উভয় পক্ষই পরস্পরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। আলী মুসলমানের সহিত মুসলমানের ধ্বংসাত্মক আত্মকলহ বন্ধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইল না। বহুদিন ধরিয়া দুইপক্ষের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলিল। আলী মুসলমানের রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য মু'আবিয়াকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া জয়পরাজয় মীমাংসা করিয়া লইতে বলিলেন; কিন্তু মু'আবিয়া স্বীকৃত হইলেন না। আলীর আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন শান্তি স্থাপনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হইল। এই যুদ্ধই ইসলামের ইতিহাসে 'সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ' নামে কথিত। তিনদিন তুমুল যুদ্ধের পর মু'আবিয়ার সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবার উপক্রম হইল। মু'আবিয়া রণস্থল হইতে পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু তাঁহার কূটবুদ্ধি ও কৌশলী সেনাপতি 'আমর ইব্‌নুল্'আস্ কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফলে সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী আশু ধ্বংসের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল[৪৫]। আমরের নির্দেশ অনুসারে মু'আবিয়ার বেতনভোগী সৈন্যগণের প্রত্যেকের পতাকা ও বর্শার শীর্ষদেশে এক এক খণ্ড কুর'আন বাঁধিয়া ঊর্ধ্বে উত্তোলন পূর্বক খলীফা আলীর

---

৪৩ Ibid : p. 256.

৪৪ Ibid ; pp. 254-255.

৪৫ Syed Ameer Ali : op. cit., pp. 50-51.
S. Khuda Bakhsh : op. cit., 80-82.

নিকট বলা হইল যে, কুর'আনের দ্বারাই বিবাদের মীমাংসা হইবে। আলী শত্রুগণের ছলচাতুরী বুঝিতে পারিলেন। কুফী সৈন্যগণ বর্শার অগ্রভাগে পবিত্র কুর'আন বিলম্বিত দেখিয়া আর সম্মুখে অগ্রসর হইল না, বরং তাহারা খলীফাকে বলিল যে, যুদ্ধের আর প্রয়োজন নাই। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী মীমাংসার পক্ষপাতী; সুতরাং কুর'আনকে শালিশী মানিয়া বিবাদ মীমাংসা করা হোক। আলী কুফী সৈন্যগণকে অনেক বুঝাইলেন যে, ইহা শুধু মু'আবিয়ার ছলনা মাত্র, প্রকৃত সন্ধির প্রস্তাব নহে। সুতরাং যুদ্ধ স্থগিত করিলে খলীফার সমূহ বিপদ আসন্ন হইবে। খলীফার সৈন্যগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য জেদ ধরিল এবং চরম বিজয়লাভের পূর্ব-মুহূর্তে খলীফা আলী শান্তির প্রস্তাব শুনিতে বাধ্য হইলেন[৪৬]। আলী দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদল শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অসম্মত। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া শালিশীর ভার তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকের উপর অর্পণ করিয়া সসৈন্যে কুফাভিমুখে গমন করিলেন[৪৭]।

এইভাবে যুদ্ধ স্থগিত হওয়ায় কুফার পথে হঠাৎ আলীর সৈন্যগণের মধ্যে একটি বিরাট দল বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহারাই আলী এবং মু'আবিয়ার খিলাফতের দাবী কুর'আনের

---

৪৬ ক, Syed Ameer Ali : op. cit., p. 51.
খ, S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 82.
গ. Muir : The Caliphate, Edinburgh, New & Revised Edition. 1915, pp. 266-267.
ঘ. J. Wellhausen : op. cit., pp. 56-57 (Introduction)
ঙ. R. A. Nicholson : op. cit., pp. 192-193.

৪৭ Syed Ameer Ali : op. cit., p. 51.

শালিশী মারফত নিষ্পত্তি করিতে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল ; এখন তাহারাই এই কার্যকে অন্যায় এবং বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিয়া আলীকে চুক্তি নাকচ করিবার জন্য চাপ দিল। আলী এই বিদ্রোহীদের প্রস্তাব শুনিতে রাজী না হওয়ায় তাহারা খলীফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। 'নাহরাইন' নামক স্থানের যুদ্ধে এই বিদ্রোহীদল পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহীদল 'খারিজী' নামে অভিহিত[৪৮]।

ওদিকে শালিশীতে সিদ্ধান্ত হইল, আলী এবং মু'আবিয়ার পক্ষের একজন করিয়া প্রতিনিধি একটি নির্দিষ্ট স্থানে সম্মিলিত হইয়া বিবাদ মীমাংসা করিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, খলীফার পক্ষ হইতে বৃদ্ধ আবূ মূসা আশ'আরী এবং মু'আবিয়ার পক্ষে দূরদর্শী 'আমর ইব্‌নুল্ 'আস্ নির্বাচিত হইলেন। আবূ মূসা সরল প্রকৃতির মানুষ* ; কাজেই, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আমরের যুক্তিতর্কের নিকট তিনি নিজের মতামত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। আমর, আবূ মূসাকে বুঝাইলেন যে, ইসলাম সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলী এবং মু'আবিয়া উভয়কেই পদচ্যুত করিতে হইবে ; এবং তদনুসারে

---

৪৮ S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 86.
Syed Ameer Ali : op. cit., p. 51.
J. Wellhausen : op. cit., pp. 57-58 (Introduction)
কাযী আকরম হোসেন : ইসলামের ইতিহাস, ৯ম সংস্করণ, পৃঃ ৯৭।

* সৈয়্যিদ আমীর আলী বলেন, আবূ মূসা গোপনে হযরত আলীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। কাজেই, তিনি হযরত আলীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিলেন বলিয়া সৈয়্যিদ সাহেব মনে করেন। (A Short History of the Saracens. London 1934, p. 51) সৈয়্যিদ খুদা বখশ, আমীর আলীর উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। (S. Khuda Bakhsh : A History of the Islamic peoples. c.u. 1914.p.85)

তাঁহারা একজন নূতন খলীফা নিযুক্ত করিবেন। বৃদ্ধ এবং সরলমতি মূসা, ধূর্ত আমরের ফাঁকি ধরিতে পারিলেন না। কাজেই, তিনি সহজে তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলেন ; এবং শলা-পরামর্শ করিয়া প্রতিনিধিদ্বয় সভাস্থলে আসিলেন। সভার মিম্বরের উপরে দাঁড়াইয়া প্রথমে মূসা আশ'আরী বলিলেন যে, তিনি খলীফার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার (খলীফার) খিলাফতের দাবী রদ্ করিলেন। অতঃপর, ধূর্ত 'আমর মিম্বরের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন যে, খলীফার প্রতিনিধি আবূ মূসা, আলীকে পদচ্যুত করিয়াছেন। তৎস্থলে তিনি ('আমর) মু'আবিয়াকে নূতন খলীফা মনোনীত করিতেছেন ; কারণ মু'আবিয়া খলীফা পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত[৪৯]। আলীর লোকজন 'আমরের এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইল ; এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ দুইটি দল প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বলাবলি করিতে করিতে স্থান ত্যাগ করিল। আবূ মূসা মদীনায় ফিরিয়া গেলেন। তিনি পরবর্তীকালে 'উমাইয়াগণের নিকট হইতে উপযুক্ত পেনসন পাইতেন[৫০]।

মু'আবিয়ার সহিত আলীর বিবাদের মীমাংসা প্রবঞ্চণাপূর্ণ শালিশী দ্বারা সম্ভবপর হইল না। কিন্তু মু'আবিয়া কিছুতেই আলীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। উভয় পক্ষের নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে আলী পূর্ববৎ অশান্তির সহিত কুফায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

---

৪৯ ক Muir : op. cit., pp. 269-271.
খ S. Khuda Bakhsh: op. cit. pp. 83-86.
গ Syed Ameer Ali: op. cit., pp. 51-52.

৫০ Syed Ameer Ali: op. cit., p. 52.

এইরূপ গৃহবিবাদে মুসলিম-সাম্রাজ্য যখন ছিন্নভিন্ন হইতে-ছিল, তখন কয়েকজন ধর্মোন্মাদ খারিজী মুসলমানগণের কলহ বিবাদের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য একস্থানে সমবেত হইয়া ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে আলী, মু'আবিয়া এবং 'আমর এই তিন ব্যক্তিকে হত্যা করিতে পারিলে পৃথিবীতে ধর্ম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। কারণ তাঁহারাই যত অশান্তি, দলাদলি এবং যুদ্ধবিগ্রহের মূল কারণ[৫১]। যা হোক, খারিজী দলের তিন ব্যক্তির এক এক জন আলী, মু'আবিয়া এবং 'আমরকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত করিল। নির্দিষ্ট দিনে (শুক্রবার, জানুয়ারী, ৬৬১ খ্রীঃ) তাহারা যথাক্রমে কুফা, দামেস্ক ও ফুস্তাতের মস্‌জিদে গিয়া পূর্ব পরামর্শ অনুসারে আলী ও মু'আবিয়াকে এবং 'আমর ভ্রমে অন্য এক ব্যক্তিকে আঘাত করিল। সৌভাগ্যক্রমে, মু'আবিয়া ও 'আমর রক্ষা পাইলেন; কিন্তু আবদুর রহমান ইব্‌নে মুলযম** নামক এক

৫১ S. Khuda Bakhsh: op. cit., p. 87.

** মওলানা আজাদ আলী-হত্যার ব্যাপারে 'কাওাম' নাম্নী এক খারিজী নারীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আবদুর রহমান মক্‌কা হইতে রওয়ানা হইয়া কুফায় পৌছিল। এখানে খারিজীদের আর একটি বিরাট দল ছিল। সে তাহাদের নিকট যাতায়াত করিত। একদিন তামীমররুবার গোত্রের কতিপয় খারিজীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের মধ্যে কাওাম বিন্‌তে সাজ্‌না নাম্নী এক পরমা সুন্দরী যুবতী ছিল। আবদুর রহমান তাহার প্রেমে আসক্ত হইল। নিষ্ঠুর প্রেমিকা বলিল যে, তাহাকে পাইতে হইলে মোহরানা বাবদ চারিটি জিনিষ দিতে হইবে। প্রথমতঃ, তিন সহস্র দেরহাম; দ্বিতীয়তঃ, একটি ক্রীতদাস; তৃতীয়তঃ একটি দাসী এবং চতুর্থতঃ, হযরত আলীর জীবন। আবদুর রহমান প্রস্তুত হইল। (মওলানা আজাদ রচিত 'ইন্‌সানিয়াত মওত কে দরওয়াজা পর' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান। ঢাকা, ১৯৫৯ পৃঃ ৬৯)। Wellhausen বিখ্যাত ঐতিহাসিক তা'বারী উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মওলানা আজাদ-বর্ণিত ঘটনার সমর্থন

ধর্মোন্মাদ খারিজী কুফার মস্‌জিদে হযরত আলীর দেহ ও মাথায় সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিল[৫২]। ইসলামের ভবিষ্যৎকে আরও তমসাবৃত করিয়া হযরত আলী আঘাত প্রাপ্তির তৃতীয় দিবসে ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে (১৭ই রমজান, ৪০ হিঃ) পরলোকগমন করেন[৫৩]। আলীর উরসে এবং বীবী ফাতিমার গর্ভে ইমাম্‌ হাসান, ইমাম্‌ হুসৈন প্রভৃতি তিনপুত্র এবং চারি কন্যা ভূমিষ্ঠ হন। বহু বিবাহ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আলী, ফাতিমার জীবৎকালে দ্বিতীয় বিবাহ করেন নাই। আলীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'সাধারণ তন্ত্র' ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তৎস্থলে 'রাজতন্ত্রের' প্রতিষ্ঠা হয়[৫৪]।

৩। ইমাম হুসৈনের কুফাযাত্রা এবং কারবালার যুদ্ধ

হযরত আলীর শাহাদতের ফলে কুফায় খিলাফতের পদ শূন্য হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র ইমাম হাসান খলীফা নির্বাচিত হইলেন। কিন্তু কুফার লোকেরা যেমন হযরত আলীর সুখে-

---

পাওয়া যাইতেছে। (J. Wellhausen : Arab kingdom and its fall. c. u. 1927. pp. 103-104) অবশ্য Syed Ameer Ali, Muir এবং P. K. Hitti প্রমুখ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক পূর্বোক্ত ঘটনার কোন উল্লেখ করেন নাই।

৫২ ক. Muir : The Caliphate. London. 1891. 2nd Edition. pp. 285-289.

খ. S. Khuda Bakhsh : op. cit., pp. 87-88.

গ. মওলানা আজাদ (অনূদিত : মুহিউদ্দীন খান):পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮-৭১।

ঘ. Nicholson : op. cit., p. 193.

ঙ. J. Wellhausen : op. cit., p. 103

৫৩ কাযী আকরম হোসেন : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।

৫৪ Syed Ameer Ali : op. cit., pp. 53-54.

শান্তিতে রাজত্ব করিবার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তেমনি তাহারা ইমাম হাসানের সময়েও অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায় [১]। আলীর প্রাণবিয়োগের পর সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আবিয়া নিজেকে সমগ্র ইসলাম জগতের খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু নিরঙ্কুশ-ভাবে ক্ষমতা হস্তগত করিতে তাঁহাকে ও তাঁহার পরবর্তী বনী 'উমাইয়াগণকে ত্রিশ বৎসর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল [২]। নূতন খলীফা হাসান কুফার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিশৃংখল রাজ্যে শান্তি স্থাপনে মনোযোগ দিবার পূর্বেই চতুর মু'আবিয়া ইরাক আক্রমণ করেন। অতএব, বাধ্য হইয়া হাসান বিচক্ষণ সেনাপতি কয়স্‌কে বহু সৈন্যসহ মু'আবিয়ার গতিরোধ করিতে পাঠাইলেন ও স্বয়ং মাদাইন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইরাকী সৈন্যদলের বিশ্বাসঘাতকতায় ইমাম হাসান অত্যন্ত বিব্রত হইয়া কুফায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি কুফীগণের চরিত্রের দুর্বলতা এবং তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় অবগত হইয়া মু'আবিয়ার সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার (মু'আবিয়ার) স্বপক্ষে খিলাফতের দাবী পরিত্যাগ করিলেন [৩]। চুক্তি অনুসারে মু'আবিয়া আজীবন খলীফা থাকিবেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ইমাম হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইমাম হুসৈন মু'আবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। আরও স্থিরীকৃত হইল যে, মু'আবিয়া ইমাম হাসানকে জীবৎকাল

---

১ Ibid. p. 59.

২ S. Khuda Bakhsh: The Arab Civilization. 2nd. Edition. 1943. p. 56.

৩ ক. Muir: The Caliphate. London. 1891. pp. 280-291.
খ. Syed Ameer Ali: op. cit., p. 70.
গ. J. Wellhausen: op. cit., pp. 105-107, 111.

পর্যন্ত যথোপযুক্ত পেন্সন এবং পারস্যের একটি জেলার সমুদয় রাজস্ব প্রদান করিবেন *[৪]। খিলাফৎ ত্যাগ করিয়া হাসান সপরিবারে মদীনায় গমন করেন। মদীনাবাসী তাঁহাকে ধর্মীয়-জীবনে রসূলের প্রতিনিধি বা ইমাম হিসাবে গ্রহণ করিলেন। এইবার মু'আবিয়া যথার্থই ইসলাম-জগতের খলীফারূপে জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত হইলেন। হযরত আলী কুফায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মু'আবিয়া কুফার পরিবর্তে দামেস্কে রাজধানী স্থাপন করিলেন[৫]। মু'আবিয়া শাসক হিসাবে দুর্দান্ত আরব জাতির জন্য অনুপযুক্ত ছিলেন না; তিনি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির ও দৃঢ় চরিত্রের শাসক ছিলেন। তিনি বহির্জগতে সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া রাজকার্য দেখাশুনা করিতেন। এ-কারণে, তিনি রাজকার্যে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দান করিতে সমর্থ হন। কঠোর হস্তে রাজকার্য পরিচালনার জন্য তাঁহার রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা বিরাজ করিত[৬]। সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার অভিলাষে তিনি শত্রুপক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বিষপ্রয়োগে বা গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। হযরত আলীর বিখ্যাত সেনাপতি মালিক উশ্‌তুরকে তিনি বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেন; এবং হযরত রসূলের প্রিয়তম দৌহিত্র ইমাম হাসানকে তিনি একইভাবে পৃথিবী হইতে অপসারিত

---

* Muir বলেন, কুফার মস্‌জিদে হযরত আলীর কুৎসা রটনা করিয়া মুআ'বিয়া যে-খুৎবা পড়িতেন, সন্ধির শর্তানুসারে তিনি এখন হইতে তাহা বন্ধ করিবেন। (The Caliphate, 2nd Edition 1891, p. 291.)

৪ ক Syed Ameer Ali : op. cit., p. 71.

খ. P. K. Hitti : op. cit., p. 190.

গ. খাজা হাসান নিযামী : মুহর্রম নামা। ১৩৩৮, দিল্লী, পৃঃ ৪৯।

৫ Syed Ameer Ali : op. cit., p. 71.

৬ Ibid : pp. 71-72.

করেন ** [৭]। মু'আবিয়ার রাজ্য-শাসন নৈপুণ্যে সাম্রাজ্যের পরিধি বহু দূরবর্তী অঞ্চল অবধি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তিনি কান্দাহার, বোখারা, মাকরাণ, সিজিস্তান, জাবুলিস্তান প্রভৃতি অধিকার করিয়া সাম্রাজ্যের শক্তি ও সম্পৎ বৃদ্ধি করেন। ইউরোপ অপেক্ষা আফ্রিকায় তিনি অধিকতর সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন [৮]। মু'আবিয়া বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর খিলাফৎ লইয়া পুনরায় বিবাদ বাধিতে পারে বলিয়া তিনি অনুমান করিলেন। সুতরাং, পুত্র ইয়াযীদকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিবার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং এ-ব্যাপারে বস্‌রার শাসনকর্তা মুঘাইরার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। মুঘাইরার পরামর্শ অনুসারে মু'আবিয়া ইমাম হাসানের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ চুক্তি ভঙ্গ করিলেন এবং তৎপুত্র ইয়াযীদকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনিই এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করিবার জন্য ইরাক ও খুরাসানের শাসনকর্তা যিয়াদের * সাহায্য এবং সহানুভূতি লাভ করিলেন। ইরাকবাসীদের উৎকোচ দিয়া এবং অন্য প্রকারে বশীভূত করিয়া

** ইমাম হাসানের বিষ প্রয়োগে মৃত্যু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে।

৭ Ibid : p. 72.

৮ S. Khuda Bakhsh : op. cit., pp. 95-96.

* যিয়াদ—'The most celebrated case of adoption in Islam was that of Ziyad, 'his father's son' into the family of Abu Sufyan, father of Muawiyah the Arabian Sisyphus. The story is told in the histories. Ziyad was the son of a woman named Sumayyah who was in slavery and bare Ziyad to a Greek client of the tribe Thakif, named Ubaid. The fact was not generally known, and Ziyad's parentage was generally supposed to be uncertain, whence

স্বপক্ষে আনয়নের চেষ্টা হইল। সিরিয়ার প্রজাগণ বহুকাল যাবৎ মু'আবিয়ার শাসনাধীনে বাস করিয়াছিল। ইহাতে তাহারা তাঁহার প্রতি শুধু আনুগত্য স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহাকে সর্বতো-ভাবে সাহায্য এবং সহায়তা করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ৫১ হিজরী সালে মু'আবিয়া মক্কা এবং মদীনায় গমন করিয়া পুত্র ইয়াযীদকে খলীফা মনোনয়নের উদ্দেশ্যে সেখানকার জনসাধারণের সমর্থন লাভের প্রার্থনা জানাইলেন। এখানে তাঁহার চাতুর্য অনেকটা ফলপ্রসূ হইল এবং ইসলাম সাম্রাজ্যের জনসাধারণ তাঁহাকে সমর্থন করিল। কেবল হুসৈন ইব্‌ন আলী, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'উমর, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু বকর এবং আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়র

---

he was called his 'father's son'. When Muawiyah became a candidate for the Caliphate and required help, he endeavoured to enroll among his adherents a number of the most sagacious of the Arabs. Among these was Ziyad, whom he determined to adopt. He, therefore, obtained an affidavit from a wine-dealer of Taif named Abu Maryam Al-Saluli, to the effect that Abu Sufyan had come to his tavern and demanded a prostitude, that Sumayyah had been brought by him to Abu Sufyan, and that Sumayyah in consequence gave birth to Ziyad. The best historians disbelieve this story, which they suppose to have been a fabrication of Muawiyah got up with the intention of securing the services of Ziyad, an intention which was realised. Ziyad in consequence came to be called son of Abu Sufyan, after having been called son of Sumayyah, or 'his father's son'.

[(Umayyad and Abbasids by Jurji Zaydan. (tr. into English by Professor Margoliouth. p. 10.)]

কাহাকেও সমর্থন জানাইতে অস্বীকৃত হইলেন *[৯]। ৬০ হিজরী সালে (এপ্রিল, ৬৮০) পঁচাত্তর বৎসর বয়সে খলীফা মু'আবিয়ার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র ইয়াযীদ দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইয়াযীদ পূর্ব হইতেই গীত-বাদ্যে আসক্ত এবং আমোদ-প্রমোদ-বিলাসী ছিলেন; খলীফারূপে সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরও তাঁহার স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় নাই[১০]। মৃত্যুর পূর্বে মু'আবিয়া পুত্রকে উপদেশ দিয়া যান, খলীফা হইয়া যেন তিনি হুসৈন ইব্‌ন আলীর সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করেন। এতৎভিন্ন, তিনি আরও বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র অত্যন্ত ধূর্ত এবং কূট। সুতরাং, তাঁহার সহিত সাবধানতাপূর্ণ আচরণ করিবার জন্য মু'আবিয়া পুত্রকে নির্দেশ দেন। দূরদর্শী মু'আবিয়া বিভিন্ন প্রদেশের শাসন-সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কেও পুত্রকে উপদেশ দেন[১১]। পিতার মৃত্যুর পর ইয়াযীদ খিলাফৎ গ্রহণ করিয়া শাসনকার্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। মু'আবিয়ার জীবৎকালে মদীনার যে-কয় ব্যক্তি ইয়াযীদের বশ্যতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এইবার ইয়াযীদ তাহাদের প্রতি মনঃসংযোগ করিলেন[১২]। ইয়াযীদ মদীনার

---

* সৈয়িদ খুদা বখ্‌শ বলেন, মদীনার এই চারিজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি প্রথমে ইয়াযীদকে অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু মু'আবিয়ার ভীতি প্রদর্শনে তাঁহারা আর কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন। (S.Khuda Bakhsh : A History of the Islamic people, C. U. 1914, p. 97)

৯ Syed Ameer Ali : op. cit., p. 81.
J. Wellhausen : op. cit., pp. 144-145.
Muir : The Caliphate, London. 1891, pp. 301-303, 306.

১০ S. Khuda Bakhsh: op. cit., p. 96.

১১ Ibid : p. 97.

১২ Muir : op. cit , p. 306.

শাসনকর্তা উলিদ ইব্ন 'উত্‌বার নিকট মারওয়ানের মারফত পত্র দিলেন। পত্রে তিনি জানাইলেন ইমাম হুসৈন, ইব্ন 'উমর এবং ইব্ন যুবায়রের নিকট হইতে নূতন খলীফার নামে যেন বশ্যতা স্বীকার করান হয়। উলিদের কার্যকলাপের জন্য হুসৈন এবং যুবায়র মদীনা হইতে মক্কা গমন করেন[১৩]। কুফার লোকেরা হযরত আলীর বংশধরগণের প্রতি নাড়ীর টান বরাবরই অনুভব করিত। কিন্তু তাহাদের মানসিক অস্থিরতা এবং চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য হযরত আলীর রাজত্ব শান্তিময় হয় নাই। ইমাম হাসানের সংক্ষিপ্ত শাসনকালের মধ্যে কুফাবাসীরা খুব কম সময়ই তাঁহাকে সাহায্য ও সহায়তা দান করিয়াছিল[১৪]। তথাপি, রসূলে খুদার আহল-ই-বয়তের প্রতি কুফীগণের সম্ভ্রমবোধ বরাবরই ছিল; সমর্থকের সংখ্যাও নিহায়েৎ কম ছিল না। কাজেই, তাহারা ইমাম হুসৈনকে বহু চিঠিপত্র লিখিয়া কুফা গমনের জন্য অনুরোধ জানাইল। তাহারা বুঝাইল, হযরত আলী এবং ইমাম হাসানের পর তিনিই (ইমাম হুসৈন) প্রকৃতপক্ষে খলীফা পদের অধিকারী। সুতরাং, কুফায় গমন করিলে তাঁহাকে তাহারা বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিয়া খলীফা হিসাবে গ্রহণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। ইমাম হুসৈন প্রবঞ্চক কুফীগণের প্রতিশ্রুতিতে ভুলিলেন। তিনি মনে করিলেন, হযরত রসূলের উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার দাবী সত্যই অগ্রগণ্য; সুতরাং তিনি কুফার বিশ্বাসঘাতক শী'য়াগণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন[১৫]। তিনি তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র মুস্‌লিম ইব্ন 'আকীলকে

---

১৩ J. Wellhausen : op. cit., p. 146.

১৪ Muir : op cit., p. 306.

১৫ S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 98.
মওলানা আজাদ (অনূদিত মুহিউদ্দীন খান) : পূর্বোক্ত, পৃঃ, ৮০
P. K. Hitti : op. cit., p. 190.

তাঁহার প্রতিনিধিরূপে কুফায় প্রেরণ করেন। কুফার জনসাধারণ যথার্থই ইমাম হুসৈনকে খলীফারূপে প্রাপ্ত হইতে চাহে কিনা, তৎসম্পর্কে নিশ্চিত সংবাদ জানিবার উদ্দেশ্যেই মুস্‌লিম প্রেরিত হইলেন। মুস্‌লিম গিয়া দেখিলেন যে, কুফার জনসাধারণের মনোভাব হুসৈনের সম্পূর্ণ অনুকূলে। অতএব, মুসলিম ভ্রাতা-হুসৈনকে জানাইলেন যে, তিনি কুফায় গমন করিলে তাহারা তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করিবে। কুফার শাসনকর্তা নোমান্ ইব্‌ন বসীর পর্যন্ত এ-ব্যাপারে সমর্থন জানাইয়াছেন। নোমান্ হযরত রসূলের অন্যতম সাহাবা ছিলেন। কাজেই ইমাম হুসৈন, মুস্‌লিম ইব্‌ন 'আকীলের পত্র পাইয়া তাঁহার সংকল্পে অটল রহিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, মক্কা হইতে হুসৈনের কুফা রওয়ানা হইবার সময় কুফার রাজনৈতিক অবস্থার এবং জনসাধারণের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। কুফায় হুসৈনের সমর্থকগণের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তদ্বিষয়ে গভর্ণর নোমানের ঔদাসীন্য সম্পর্কে ইয়াযীদ যথারীতি সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নোমানকে পদচ্যুত করিয়া তৎস্থলে বস্‌রার শাসক 'উবায়দুল্লাহ্ * ইব্‌ন যিয়াদকে কুফার নূতন গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন [১৬]।

'উবায়দুল্লাহ্ কুফায় গমন করিয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইলেন; এবং তন্নতন্ন করিয়া কুফা শহর অনুসন্ধান পূর্বক 'আহ্‌ল-

---

* কুফার নবনিযুক্ত গভর্ণর কুখ্যাত 'উবায়দুল্লাহ্, যিয়াদের পুত্র। আবূ সুফিয়ান-পুত্র যিয়াদের কথা ইতঃপূর্বে পাদটীকায় (পৃঃ ১৪৩) প্রদত্ত হইয়াছে। 'উবায়দুল্লাহ্, তাঁহার পিতার ন্যায় নির্মম এবং কঠোর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। (Syed Ameer Ali : A short History of the Saracens. London, 1934. p. 85)

১৬ ক S. Khuda Bakhsh : op. cit., pp. 98-99.

খ Muir : op. cit., pp. 306-307.

ই-বয়তের’ ভক্ত হানী নামক এক ব্যক্তির গৃহ হইতে মুসলিম ইব্‌ন ‘আকীলকে বাহির করিলেন। কুফার জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া ‘উবায়দুল্লাহ্‌র প্রাসাদ ঘিরিয়া ফেলিল। চতুর ‘উবায়দুল্লাহ্‌ বুদ্ধি-বলে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করিয়া অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিতে সমর্থ হন। তাঁহার আদেশে হানী এবং মুস্‌লিমের শিরশ্ছেদন করা হইল; এবং কুফার জনসাধারণকে ছলে-বলে-কৌশলে ইয়াযীদের পক্ষে যোগদান করিতে বাধ্য করা হইল। এই জন-সাধারণ ইতঃপূর্বে মুসলিমের হস্তে হুসৈনের নামে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মনের দৃঢ়তা না থাকায় ‘উবায়দুল্লাহ্‌ সহজেই তাহাদের মত পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, নিষ্ঠুর ‘উবায়দুল্লাহ্‌র ভীতি প্রদর্শনে ভীত হইয়া কুফাবাসী সকলেই ইমাম হুসৈনের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল[১৭]। ৬০ হিজরী সালের শেষের দিকে যেদিন ইমাম হুসৈন সর্বপ্রথম মক্কা হইতে কুফাভিমুখে রওয়ানা হইলেন, সেইদিন কুফায় মুস্‌লিম নিহত হন। কুফাযাত্রার পূর্বে তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণ বিশ্বাসঘাতক কুফীগণের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির প্রতি কর্ণপাত না করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন[১৮]। কিন্তু হুসৈন সকলের অনুরোধ এবং উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় লক্ষ্যে অবিচলিত থাকেন এবং স্ত্রী পুত্রকন্যা ও পরিবারের অন্যান্য বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-পরিজনের একটি ক্ষুদ্র কাফেলা লইয়া কুফাভিমুখে রওয়ানা হন।

---

১৭ Muir : op cit. p. 37.
S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 99.
J. Wellhausen : op. cit., p. 147.

১৮ ক. মওলানা আজাদ : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০-৮২।
খ. Muir : op. cit., p. 307.

মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ অগ্রাহ্য করিয়া কয়েকদিন অবিরাম পথ চলিবার পর কুফার সীমান্তবর্তী কাদেসিয়া নামক স্থানের সন্নিকটে যখন তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, তখন কুফায় মুস্‌লিম-নিধনের সংবাদ অবগত হইলেন। তখনও তাঁহার প্রত্যাবর্তন করিবার উপায় ছিল। তাঁহার সহিত কতকগুলি নিরপরাধ শিশু এবং মহিলা, কতকগুলি বিশ্বস্ত অনুচর এবং আত্মীয়-বন্ধু ব্যতীত আর কেহ ছিল না। এই অবস্থায় সোজাসুজি প্রত্যাবর্তন করিয়া নিরীহ ব্যক্তিগণের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মুস্‌লিমের আত্মীয়-স্বজন এবং পুত্রগণ তাঁহার অভিলাষের প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, তাঁহারা মুস্‌লিম-হত্যার প্রতিশোধ না লইয়া কিছুতেই ফিরিবেন না। অগত্যা ইমাম হুসৈন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু মুস্‌লিম ইব্‌ন আকীলের মৃত্যুতে তিনি মর্মবেদনায় মুহ্যমান হইলেন[১৯]।

পথিমধ্যে কবি ফারাযদকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কবি কুফা হইতে রওয়ানা হইয়া এই পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। ইমাম হুসৈন তাঁহার নিকট কুফাবাসীর কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। কবি উত্তরে জানাইলেন, তাঁহার প্রতি কুফীগণের আন্তরিক টান আছে, কিন্তু ইয়াযীদের ভয়ে তাঁহার (হুসৈনের) বিরুদ্ধে তাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছে[২০]। মক্কা হইতে কতকগুলি বেদুঈন হুসৈনের সঙ্গী হইয়াছিল। তাহারা বিপদ আসন্ন দেখিয়া তাঁহার অনুমতিসহ

---

১৯ ক. Muir : op. cit., p. 307.
খ. R. A. Nicholson : op. cit., p. 196.
গ. মওলানা আজাদ : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩।

২০ ক. Muir : op. cit., p. 307.
খ. R. A. Nicholson : op. cit., p. 196.
গ. মওলানা আজাদ : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩।

দলত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শেষে দেখা গেল, তাঁহার দলে মাত্র ত্রিশ জন অশ্বারোহী এবং চল্লিশজন পদাতিকমাত্র রহিয়াছে**[২১]। কাফেলা কাদেসিয়া পার হইয়া সম্মুখের দিকে আরও অগ্রসর হইল। ইমাম হুসৈন নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, হোর নামক ইয়াযীদের এক সেনাপতি সহস্রাধিক সৈন্যসহ তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছেন। হোরের প্রতি 'উবায়দুল্লাহ্ ইবন্ যিয়াদ নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, ইমামের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া হোর যেন তাঁহাকে তাঁহার (ইব্ন যিয়াদ) নিকট লইয়া যান[২২]। তাঁহার আদেশানুসারে হোর, ইমাম হুসৈনকে অনুসরণ করেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যথারীতি পত্র বিনিময় হয়[২৩]। ইমাম হুসৈন কুফীগণের বিশ্বাসঘাতকতা ও মত পরিবর্তনের সংবাদে মর্মপীড়িত হইলেন। অবশেষে ক্ষুদ্র কাফেলা কুফা হইতে পঁচিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির বামপার্শ্বে ফোরাত নদীর পশ্চিমতীরবর্তী ভয়াবহ 'কারবালা' প্রান্তরে আসিয়া (হিজরী ৬১ সনের ২রা মুহর্রম) শিবির সন্নিবেশ করে। ক্রমাগত পথ চলিতে চলিতে সকলেই ঘর্মাক্তকলেবর এবং পরিশ্রান্ত। ইমাম হুসৈন মক্কা হইতে কুফাভিমুখে সদলবলে যাত্রা করিয়াছেন এই সংবাদ গুপ্তচর মারফত প্রাপ্ত হইয়া 'উবায়দুল্লাহ্ হিজায হইতে কুফা পর্যন্ত পথের কেন্দ্রস্থলগুলিতে সতর্ক প্রহরী মোতায়েন করেন[২৪]।

** যথার্থ সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

২১ Muir. op. cit., p. 307.

২২ মওলানা আজাদ: শাহাদৎ-ই-হুসৈন, লাহোর ১৯৫৭, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৭

২৩ Muir: op. cit., p. 308.

২৪ ক. Ibid. p. 308.

খ. P. K. Hitti: op. cit., p. 190.

'উবায়দুল্লাহ্, 'আমর্ ইব্‌ন সা'আদ নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষকে চার হাজার* অশ্বারোহী সৈন্যসহ ফোরাত নদীর উপকূলভাগ অবরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, ইমাম হুসৈনের শিবিরে পানি সংগ্রহের পথ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাদের কষ্ট প্রদান-পূর্বক ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হোক্। 'আমরের আদেশে ইমাম হুসৈনের শিবিরে পানি সংগ্রহের পথ অবরুদ্ধ হইল। একে মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ, তদুপরি সকলে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত এবং অবসন্ন। পানির অভাবে কচিকচি শিশু ও বালকবালিকা এবং পুর-মহিলাগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। পানি সংগ্রহের আর কোন উপায় নাই[২৫]। ইমাম হুসৈন নিরুপায় হইয়া 'আমর্ ইব্‌ন সা'আদ-এর নিকট তিনটি সম্মানজনক প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাব তিনটি[২৬] ঃ

প্রথমতঃ, ইমাম হুসৈন যে-স্থান হইতে আসিয়াছেন, সেস্থানে ফিরিয়া যাইবেন।

দ্বিতীয়তঃ, দামেস্কে খলীফা ইয়াযীদের নিকট গিয়া তাঁহার সহিত বুঝাপড়া করিবেন।

তৃতীয়ত, ঃ কোন দূরদেশে যাইতে অনুমতি দিলে তিনি খলীফার স্বপক্ষে ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য শত্রুগণের বিরুদ্ধে জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ) করিবেন।

---

* Muir এর মতানুসারে। (The Caliphate. London. 2nd Edition-1891. p. 308.

২৫ Syed Ameer Ali : op, cit., p. 85.

২৬ ক. Muir : op, cit., p. 308.

খ. Syed Ameer Ali : op. cit., p. 85.

গ. S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 99.

ঘ. মওলানা আজাদ : শাহাদতে হুসৈন, লাহোর, ১৯৫৭, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৬।

ইমাম হুসৈনের এই সম্মানজনক প্রস্তাব তিনটি আমর্ ইব্‌ন সা'আদ কুফার গভর্ণর 'উবায়দুল্লাহ্‌র নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু 'উবায়দুল্লাহ অত্যন্ত কঠোর এবং নির্মম-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়া তিনি সেনাপতি 'আমর্ ইব্‌ন সা'আদকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'হুসৈনের কোন শর্তই মানিয়া লওয়া সম্ভবপর নহে** তাঁহাকে বিনা শর্তে ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য কর, নচেৎ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন কর এবং শির কুফায় প্রেরণ কর।' ইমাম হুসৈন 'উবায়দুল্লাহ্‌র কঠোর আদেশ শ্রবণপূর্বক সিদ্ধান্ত করিলেন যে, দুষ্‌ক্রিয়াশীল ইয়াযীদের হস্তে বশ্যতা স্বীকার অপেক্ষা প্রকৃত ধর্মবীরের ন্যায় সম্মুখ যুদ্ধে জীবন বিসর্জন দেওয়া উত্তম[২৭]। 'আমর্, ইমাম হুসৈনকে পুনরায় নির্দেশ দিলেন যে, খলীফা ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহার কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই। কিন্তু হুসৈন বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, বরং সেনাপতি 'আমর্‌কে জানাইলেন যে 'উবায়দুল্লাহ্ শুধু তাঁহার বিনাশ কামনা করেন; সুতরাং তাহারা যেন শুধু তাঁহার (ইমাম হুসৈনের) জীবনের অবসান ঘটাইয়া নিরপরাধ পরিবার-পরিজন ও অনুচরদের নির্বিঘ্নে স্থান ত্যাগ করিতে অনুমতি দেয়। কিন্তু

** মওলানা আজাদ বলেন, আমরের পত্র পাইয়া 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন, এবং প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। কিন্তু শিমার বিন্ যিল জোশানের বিরোধিতায় 'উবায়দুল্লাহ্ নিজের আদেশ প্রত্যাহার করেন। (মওলানা আজাদ রচিত 'ইনসানিয়াত মওতকে দরওয়াজে পর' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ঢাকা ১৯৫৯, পৃঃ ৯৩-৯৪)

২৭ Muir : op, cit., pp. 308-309.
Syed Ameer Ali : op. cit., p. 85.
মওলানা আজাদ (অনূদিতঃ মুহিউদ্দীন খান) : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৩-৯৪।

'আমর্ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইমাম হুসৈন বিপদের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়া বন্ধুবান্ধব এবং অনুচরদিগকে সময়মত আত্মরক্ষা করিবার জন্য কারবালা পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু প্রভুভক্ত অনুচরগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে রাজি হইলেন না[২৮]।

কার্যসম্পাদনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া 'উবায়দুল্লাহ্, শিমার ইব্ন যিল জোশান নামক এক দুর্বৃত্তকে মৌখিক আদেশ দিয়া কারবালায় প্রেরণ করিলেন। আদেশে বলা হইল, ইমাম হুসৈনকে অনতিবিলম্বে জীবিত কিংবা মৃত যে-কোন অবস্থায় কুফায় প্রেরণ করিতে হইবে***। শিমারকে তিনি নির্দেশ দিলেন, যদি 'আমর্ ইব্ন সা'আদ তাঁহার আদেশানুসারে কার্য না করেন, তবে শিমার

---

২৮ Syed Ameer Ali : op. cit., p. 85.

*** মওলানা আজাদ সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্নে জারীরের মতামত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে 'উবায়দুল্লাহ্, পত্রে আমর ইব্ন সা'আদকে বিশেষভাবে শাসাইয়া দিলেন। পত্রে লেখা ছিল, আমি তোমাকে এইজন্য প্রেরণ করি নাই যে, তুমি হুসৈনকে বাঁচাইবে এবং আমার নিকট সুপারিশ পত্র প্রেরণ করিবে। আমার নির্দেশ পরিষ্কার। তিনি যদি আত্মসমর্পণ করেন, তবে নিরাপদে আমার নিকট প্রেরণ কর। আর যদি অস্বীকার করেন, তবে বিনাদ্বিধায় আক্রমণ কর, এবং রক্ত প্রবাহিত কর। দেহ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেল। কেননা, তিনি ইহারই যোগ্য। মৃত্যুর পর তাহার দেহ অশ্বের পদাঘাতে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেল ; কেননা, তিনি বিদ্রোহী, আমাদের দলত্যাগী। আমি শপথ করিয়াছি, তাঁহাকে অবশ্যই হত্যা করিব। [মওলানা আজাদ (অনূদিতঃ মুহিউদ্দীন খান): জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ, পৃঃ ৯৪]

যেন তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করে[২৯]।

হুসৈন তখনও সন্ধির আশা ত্যাগ করেন নাই, এবং এই উদ্দেশ্যে পবিত্র কুর'আন শত্রুসৈন্যগণের নিকট প্রদর্শন করিয়া (সিফফিন যুদ্ধে যেমন মু'আবিয়া করিয়াছিলেন) সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কুফীগণ সমস্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিল[৩০]। ৬১ হিজরী সালের (৬৮০ খ্রীঃ) ১০ই মুহর্রম তারিখের প্রাতঃকালে উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল *। তদনুসারে, হুসৈন নিজের পরিবারবর্গকে আল্লাহ্‌র হিফাযতে সমর্পণ করিয়া মাত্র বাহাত্তর জন** অনুচর এবং স্বজন-বন্ধুসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে আরব দেশের প্রাচীন প্রথানুসারে যুদ্ধ চলিল। হুসৈনপক্ষীয় এক এক জন বীরের সঙ্গে শত্রুপক্ষের এক এক জনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিল; এবং পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া হুসৈনের অনুচরগণ একে একে প্রাণ বিসর্জন দিলেন[ক]।

---

২৯ Muir : op. cit., p.309.

মওলানা আজাদ (অনূদিত : মুহিউদ্দীন খান) : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৪।

৩০ S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 100.

* Muir বলেন যে, ১০ই মুহর্রম তারিখের প্রাতঃকালে ইমাম হুসৈন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি তখনও সন্ধির চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই। তিনি সর্বশেষ বার বলিলেন, তাহারা যদি তাঁহাকে স্বয়ং খলীফার নিকট যাইতে দেয়, তাহা হইলে বিবাদ মিটিতে পারে। কিন্তু তাঁহার এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইল। (The Caliphate, London. 2nd Edition, 1891 p. 310)

** এই সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

ক ৭২ জন শহীদানের মধ্যে বনী হাশীম বংশীয় ছিলেন ১৭ জন। মওলানা আজাদ তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :

১। মুহম্মদ ইব্‌ন আবি সায়ীদ ইব্‌ন আকীল;

তাঁবুর মধ্যে ইমাম হুসৈনের শিশুপুত্র তাঁহার হস্তের উপর শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের তীরের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণ একে একে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার সম্মুখে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন[৩১]। পুরুষগণের মধ্যে (একমাত্র রুগ্ন জয়নুল আবেদীন ব্যতীত) একে একে প্রায় সকলেই শাহাদৎ বরণ করিলে ইমাম হুসৈন স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেহই তাঁহার নিকটবর্তী হইতে সাহস পায় নাই। মহাবীর ইমাম হুসৈন প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ক্ষুৎপিপাসা ও ক্লান্তিতে

২। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুস্‌লিম ইব্‌ন আকীল;
৩। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আকীল;
৪। আবদুর রহমান ইবন আকীল;
৫। জাফর ইব্‌ন আকীল;
৬। মহম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবন জাফর;
৭। আউন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবন জাফর;
৮। আব্বাস ইব্‌ন আলী;
৯। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলী;
১০। ‘উসমান ইব্‌ন আলী;
১১। মুহম্মদ ইব্‌ন আলী;
১২। আবু বকর ইব্‌ন আলী;
১৩। আবু বকর ইব্‌নুল হাসান;
১৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান;
১৫। কাশেম ইব্‌ন হাসান;
১৬। আলী ইব্‌ন হাসান;
১৭। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান;
(মওলানা আজাদ: শাহাদতে হুসৈন। লাহোর, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃঃ ৩৬-৩৭)

৩১ ক. Syed Ameer Ali: op. cit., p. 86.
খ. Muir: op. cit., p. 310.

কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ তীর ও অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইল। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে তিনি দুর্বলদেহে ভূমি-শয্যা গ্রহণ করেন। শত্রুগণ তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল এবং শির দেহচ্যুত করিল। অতঃপর, তাঁহার দেহ অশ্বপদতলে দলিত করিয়া তাহারা চরম নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল[৩২]। এই নৃশংসতম ঘটনাই ইসলামের ইতিহাসে 'কারবালার হত্যাকাণ্ড' নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম হুসৈনের একমাত্র জীবিত পুত্র আলী (জয়নুল আবেদীন) রোগাক্রান্ত হইয়া শিবিরের মধ্যে পড়িয়া ছিলেন। আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান হুসৈন-পরিবারভুক্ত মহিলাদের ক্রন্দন এবং বিলাপে কারবালা রণপ্রান্তর মুখর হইয়া উঠিল। অতঃপর, জয়নুল আবেদীন সহ তাঁহাদের কুফায় 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের নিকট প্রেরণ করা হইল[৩৩]। এই যুদ্ধে হুসৈন-পক্ষীয় মোট বাহাত্তর জন এবং ইয়াযীদ পক্ষীয় মোট ৮৮ জন কুফীসৈন্য নিহত হয়[৩৪]। হুসৈনের ছিন্ন-মস্তক কারবালা হইতে কুফায়, শাসনকর্তা 'উবায়দুল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি ছিন্ন-শিরের মুখমণ্ডলের উপর একখানা যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন। এই অমানুষিক দৃশ্য দর্শন করিয়া জনৈক শুভ্র-শ্মশ্রু মুসলমান বলিয়া উঠিলেন, 'আহা! আহা!! আমি এই ওষ্ঠের

---

৩২ ক. Muir: op. cit., p. 310.
খ. Syed Ameer Ali: op. cit., p. 86.

৩৩ Syed Ameer Ali: op. cit., pp. 86-87.

৩৪ মওলানা আজাদ: শাহাদতে হুসৈন, লাহোর, ৩য় সংস্করণ ১৯৫৭, পৃঃ ৪১।

উপর হযরত রসূলকে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি[৩৫]।'

অতঃপর, 'উবায়দুল্লাহ্ হযরত রসূলের বংশ বিলোপ করিবার উদ্দেশ্যে জয়নুল আবেদীনকে হত্যা করিতে আদেশ দেন। হত্যার আদেশ প্রচারিত হইলে ইমাম হুসৈনের কনিষ্ঠা ভগ্নী বীবী যয়নব, ইব্ন যিয়াদকে জানাইলেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিলে তাঁহাকেও হত্যা করিতে হইবে। তাঁহার করুণ ও স্থির দৃষ্টির সম্মুখে 'উবায়দুল্লাহ্ আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন[৩৬]। তৎপর, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ হুসৈন-পরিবারের মহিলা ও বালক-বালিকাসহ জয়নুল আবেদীনকে বন্দী করিয়া দামেস্কে খলীফা ইয়াযীদের নিকট প্রেরণ করেন। সৈন্যগণ ইমাম হুসৈন এবং অন্যান্য শহীদানের ছিন্নশির বর্শাগ্রে বিদ্ধ করিয়া দামেস্কে লইয়া চলিল[৩৭]। হুসৈন-পরিবার দামেস্কে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের মাতম এবং ক্রন্দনে রসূল-ভক্তমাত্রের অন্তর স্পর্শ করিল। পাছে কুফার জনমত বিপ্লবী আকার ধারণ করে, এই আশঙ্কায় ইয়াযীদ তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিলেন এবং অত্যন্ত যত্ন ও সমাদরের সহিত মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন। ইব্ন যিয়াদের ঘৃণিত কার্যের জন্য ইয়াযীদ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন,

---

৩৫ ক. Syed Ameer Ali : op. cit., p. 86.

খ. মওলানা আজাদ (অনূদিত : মহিউদ্দীন খান): ইনসানিয়াত মউত কে দরওয়াজে পর। ঢাকা, ১৯৫৯, পৃঃ ১১৭।
Muir : op cit., p. 311.

৩৬ ক. মওলানা আজাদ : শাহাদতে হুসৈন। লাহোর, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃঃ ৪৪।

খ. Syed Ameer Ali : op. cit., p. 87.

৩৭ ক. Syed Ameer Ali : op. cit., p. 87.

খ. মওলানা আজাদ : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬

এবং ইমাম হুসৈনের শোচনীয় মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন*[৩৮]।

৪। কারবালা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া।
(মর্সীয়া কাব্যবর্ণিত ঘটনা মুখতারের পতন পর্যন্ত।)

কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে ইসলাম জগতের সর্বত্র প্রচারিত হইল। মদীনার জনগণ হযরত রসূল এবং আহ্‌ল-ই-বয়তের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কাজেই, হুসৈন-পরিবার দামেস্ক হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে মদীনা বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। মদীনার জনসাধারণ কুফীগণের অমানুষিক কার্যে উত্তেজিত হইলেন এবং ইমাম হুসৈনের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিকার চাহিলেন। খলীফা ইয়াযীদ মদীনার উত্তেজনা শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে মদীনার শাসনকর্তা পরিবর্তন করিলেন। নূতন গভর্ণর মদীনার জনসাধারণকে বুঝাইলেন যে, খলীফার সঙ্গে তাঁহাদের আপোষ-মীমাংসা হইলে সর্বদিক রক্ষিত হইবে। তদনুযায়ী মদীনার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া দামেস্কে খলীফার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিলেন। ইয়াযীদ প্রতিনিধি-

---

* ঐতিহাসিক এস, খুদা বখ্‌শ কারবালার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ইয়াযীদকে নির্দোষ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, একটি সাধারণ হত্যাকাণ্ডকে পরবর্তীকালের লোকেরা একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া রূপ দিয়াছেন। ('The Tragedy of Karbala--Fact & Legend' by S. Khuda Bakhsh : Vide -- Statesman, dated 29th May, 1931.)

৩৮ ক. Muir ; op. cit., p. 311.
খ. Syed Ameer Ali : op. cit., p. 87.
গ, মওলানা আজাদ (অনূদিতঃ মুহিউদ্দীন খান) : পূর্বোক্ত পৃঃ ১২৩-১২৬।

দলকে মূল্যবান উপঢৌকন ও যৌতুকাদি প্রদান করিয়া খুশী করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা খুশী না হইয়া কারবালার হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত অপরাধিগণের বিচার প্রার্থনা করিলেন। খলীফা অপরাধিগণের বিচার সম্পর্কে মনোযোগ না দেওয়ায় এবং তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র এবং কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হওয়ায় প্রতিনিধিদল মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনাবাসিগণ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা নামক এক আনসারের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া ইয়াযীদের কার্যের তীব্র নিন্দাবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন এবং সকলে মিলিয়া খলীফার বশ্যতা অস্বীকার করিলেন[১]।

ইয়াযীদ দূত মারফত মদীনার বিক্ষোভের সংবাদ অবগত হইয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি মদীনাবাসীদিগকে দণ্ড প্রদানের জন্য মুসলিম ইব্ন 'উক্বা আল্মা নামক এক প্রসিদ্ধ সেনাপতির অধীনে এক বিরাট সৈন্যদল মদীনায় প্রেরণ করেন[২]। যুদ্ধের পূর্বে মদীনাবাসিগণ মদীনার 'উমাইয়া-বংশীয় ব্যক্তিদের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় স্থিরীকৃত হইল যে 'উমাইয়াগণ, সিরিয়াবাসী শত্রুদিগকে কোন গোপন সংবাদ পরিবেশন করিতে পারিবেন না। কিন্তু মুসলিম ইব্ন উক্বা সৌভাগ্যক্রমে, মারওয়ানের পুত্র চতুর আবদুল মালিকের সন্ধান পাইয়া তাহার নিকট হইতে মদীনার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অনেক তথ্য অবগত হইল[৩]। মদীনাবাসী

---

১ ক. J. Wellhausen : op. cit., pp. 152-154.
খ. Syed Ameer Ali : op. cit., p. 87.
গ. S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 102.

২ ক. Syed Ameer Ali : op. cit., pp. 87-88.
খ. J. Wellhausen : op. cit., pp. 154-155.

৩ Ibid : p. 155.

ইতঃপূর্বেই নগরের উত্তর দিকে গড়খাই খনন করিয়া নগর সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করেন। বিখ্যাত সেনাপতি ইব্‌ন হান্‌যালার অধীনে মদীনার সেনাদলকে চারিটি প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে মোতায়েন করা হইল [৪]। অবশেষে ৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে উভয় পক্ষের সৈন্যদল 'হারাহ্' নামক স্থানে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। তুমুল যুদ্ধের পর মদীনার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পরাজয় স্বীকার করে। যুদ্ধে হযরত রসূলের অনেক প্রিয় সাহাবা, আনসার ও মুহাজির সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীর হস্তে নির্যাতিত ও নিহত হইলেন। তিনদিন পর্যন্ত মদীনা শহরে যে-অকথ্য নির্যাতন ও লুটতরাজ চলিয়াছিল, ইসলামের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। প্রতিগৃহ লুণ্ঠিত হইল; হত্যা ও ধ্বংসের লীলা চলিতে লাগিল। হযরতের প্রিয় মস্‌জিদটি পর্যন্ত আস্তাবলে পরিণত হইল। তিনদিন পর্যন্ত অমানুষিক হত্যা ও অত্যাচার চলিবার পর সোনার মদীনা ধ্বংস--স্তূপে পরিণত হইলে মুসলিম ইব্‌ন উক্‌বা সিরিয়ায় সৈন্যদল সরাইয়া লইলেন। মদীনার প্রতি-পত্তিশালী মুসলমানদের অধিকাংশই যুদ্ধে নিহত হইলেন অথবা সিরিয়াসৈন্যের অত্যাচারের ভয়ে প্রাণ লইয়া দূরদেশে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন [৫]।

মদীনা নগরীকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করিয়া মুসলিম বিন্ উক্‌বা মক্কার দিকে সৈন্যবাহিনীসহ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে

---

৪. Ibid : p. 155.

৫ ক. J. Wellhausen : op. cit., pp. 156-157.

খ. Syed Ameer Ali : op. cit., p. 88.

গ. S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 102,

ঘ. Muir : The Caliphate, Edinburgh, New and Revised Edition 1915, p. 314.

মুসলিমের মৃত্যু ঘটিলে হুসৈন ইব্‌ন নমীর নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সৈন্যদল মক্কা গিয়া উপস্থিত হইল। ইতোমধ্যে মক্কায় আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়র যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া ইয়াযীদের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। খারিজীগণ মক্কাভূমির মর্যাদা এবং সম্মান রক্ষার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল। ৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখে সিরিয়ার সৈন্যদল মক্কা আক্রমণ করিলে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়র প্রাণপণে বাধা প্রদান করিলেন। যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সিরিয়া-সৈন্যদলের প্রবল আক্রমণে মক্কা নগরী যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গৃহরাজি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল এবং অগ্নিসংযোগ করিয়া কাবাঘরের কিছু অংশ ভস্মীভূত করা হইল*। দুইমাস পর্যন্ত শত্রুগণ মক্কা শহর অবরোধ করিয়া রহিল; এবং পর্বতমালা ও উচ্চভূমি হইতে নগর মধ্যে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মক্কাবাসী নরনারীর দুঃখের সীমা রহিল না। এমন সময়ে হঠাৎ খলীফা ইয়াযীদের মৃত্যু ঘটায় যুদ্ধ স্থগিত হইল। হুসৈন ইব্‌ন নমীর সিরিয়া অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল।

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়রকে হিজায, ইরাক এবং খুরাসানের খলীফা বলিয়া ঘোষণা করা হইল [৬]। ইয়াযীদ চল্লিশ বৎসর বয়সে

---

* সিরিয়াবাসীর দ্বারা কাবাঘরের অগ্নিসংযোগ হইয়াছিল কিনা তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক Wellhausen আরবীয় ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মতামত উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, সম্ভবতঃ কাবাগৃহের অগ্নিসংযোগ আবদুল্লাহ্‌ ইবন যুবায়রের স্বপক্ষীয় জনৈক ব্যক্তির অসাবধানতার ফল। (J. Wellhausen : Arab kingdom and its fall. C. U. 1927-pp. 165-166)

৬ ক J. Wellhausen : op. cit., pp. 157, 165-67.

খ Syed Ameer Ali : op. cit., p. 89.

গ Muir : op. cit., pp. 314-315.

সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিবার পর মৃত্যু বরণ করেন। তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের মধ্যে তিনটি প্রধান ঘটনা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। রাজত্বের প্রথম বৎসরে ঃ হুসৈন ইব্‌ন আলী হত্যা, দ্বিতীয় বৎসরে ঃ মদীনা নগরী আক্রমণ ও ধ্বংসসাধন ; এবং তৃতীয় বৎসরে ঃ মক্কা নগরী ও কাবাঘর আক্রমণ এবং তাহার অপূরণীয় ক্ষতি সাধন [৭]। ইয়াযীদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় মু'আবিয়া দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দুর্বল প্রকৃতির শাসক ছিলেন। কয়েকমাস রাজত্ব করিবার পর তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা খালিদ অল্প-বয়স্ক বালক ; কাজেই নেতৃস্থানীয় উমাইয়াগণ বিশৃঙ্খলপূর্ণ রাজ্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার অভিলাষে খালিদের অভিভাবকস্বরূপ খলীফা 'উসমানের মুন্সী এবং প্রাক্তনমন্ত্রী কূটনীতিবিদ্ মারওয়ানকে খলীফা মনোনীত করিলেন। আবদুল্লাহ্ যুবায়র যখন মক্কা ও মদীনার খলীফারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন কুখ্যাত 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ বস্‌রার কর্তৃত্ব লাভের জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন, এবং পলায়ন করিয়া দামেস্কে মারওয়ানের নিকট গমন করিলেন। 'উবায়দুল্লাহ্, মারওয়ানকে সমগ্র মুসলিম-সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। মারওয়ান আপন বুদ্ধিবলে ধীরে ধীরে 'উমাইয়া শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। মারওয়ান খালিদের পরিবর্তে স্বীয়পুত্র আবদুল মালিককে উত্তরাধিকার মনোনীত করায় তিনি তাঁহার নব-বিবাহিতা যুবতী পত্নীর (খালিদের জননী এবং

---

৭ ক Muir : op. cit., pp. 315-16.

খ S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 103.

ইয়াযীদের বিধবা স্ত্রী) হাতে একদিন নিহত হন [৮]। মারওয়ানের মৃত্যুর পর ৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল মালিক দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন *।

কারবালার লোমহর্ষক যুদ্ধের পর ইরাকে উমাইয়াগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। ইরাকবাসী বিশেষতঃ কুফার লোকেরাই কারবালা যুদ্ধে ইমাম হুসৈন এবং হুসৈন-পরিবারের ভাগ্য-বিপর্যয়ের মূলকারণ। কুফাবাসিগণ চিরদিনই আলীভক্ত; তাহারা সকলেই শী'য়া। সুতরাং উমাইয়াগণের ভয়ে তাহারা ইমাম হুসৈনের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া যে-মহাপাপ করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া একদল লোক অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইতেছিল। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে-সকল ব্যক্তি ইমাম হুসৈনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। বিক্ষোভ ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করে। অবশেষে ৬৫ হিজরী সালের এক রজনীতে কুফার এক বিরাট দল ইমাম হুসৈনের মাযারে গিয়া অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া অশ্রুপাত করিল এবং অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা চাহিল। সুলায়মান ইব্‌ন সুরর্‌দ নামক এক প্রবীণ সাহাবা এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দল নিজেদেরকে 'অনুতাপকারী' নামে অভিহিত করিল **। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার

---

৮ ক Syed Ameer Ali : op. cit., pp. 89-93.
খ Muir : op. cit., pp. 317-319.
গ J Wellhausen : op. cit., p. 183.

* উমাইয়া খলীফাগণের বংশ-লতিকা বর্তমান গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

** "They called themselves 'the penitents', and under their leader Sulaiman carried at first everything before

ধর্মোন্মত্ত কুফাসৈন্য ভীষণ গর্জনে দামেস্ক অভিমুখে ধাবিত হইল। ওদিকে সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী লইয়া কূটবুদ্ধি মারওয়ান কুফার ধর্মোন্মত্ত শী'য়াগণকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। যুদ্ধে সুলায়মান ও অন্যান্য সেনাপতি প্রাণ হারাইলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য কুফা প্রত্যাবর্তন করিয়া আত্মরক্ষা করিল [৯]। এইভাবে সাহাবা সুলায়-মানের পরিচালিত বাহিনীর প্রতিশোধ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

খলীফা আবদুল মালিক, পিতা মারওয়ানের ন্যায় কর্মঠ এবং কূটবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। শাসনকার্য গ্রহণ করিবামাত্র তিনি বিশৃঙ্খল রাজ্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার দিকে মনোনিবেশ করিলেন [১০]। ওদিকে মক্কা, মদীনা প্রভৃতি স্থানে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র স্বাধীন খলীফারূপে শক্তিশালী হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। আবদুল মালিক রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া রাজ্য বিস্তারের দিকে যখন মনোযোগ দিয়াছেন, তখন কুফার 'অনুতাপকারী' বিদ্রোহীদল শক্তি সঞ্চয় করে এবং আল্ মুখতার নামক এক বিপ্লবী নেতার নেতৃত্বে সমবেত হইয়া হুসৈন-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। মুখতারের পিতার নাম আবূ উবায়েদ। উবায়েদ 'সেতুর যুদ্ধে' নিহত হন। মুখতার অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন *। হযরত মুসলিম ইব্‌ন আকীল

---

them, but they were ultimately defeated by an overwhelming force sent against them by Marwan.'' (Syed Ameer Ali : A short History of the Saracens, London-1943. p. 92.)

৯ ক Muir : op. cit., pp. 321-322.
  খ Syed Ameer Ali : op. cit., p. 92.

১০ Ibid : p. 93.

* ঐতিহাসিক খুদা বখ্‌শ বলেন, '............ Mukhtar who, ambitious to a degree, like most of the leading men of the

যখন ইমাম হুসৈনের দৌত্য লইয়া কুফায় আগমন করিয়াছিলেন এবং হুসৈনের পক্ষে কুফীগণের বয়‘অত (আনুগত্য) গ্রহণ করিতে-ছিলেন, তখন এই মুখতার মুসলিমের কার্যে সহায়তা করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উমাইয়া-শাসন তাঁহার দেশের স্বার্থ-রক্ষার অনুকূল নহে। এতৎউদ্দেশ্যে, তিনি ইমাম হুসৈনের পক্ষ সমর্থন করিয়া মুসলিমের সহিত যোগদান করেন। তাঁহার কর্ম-তৎপরতার জন্য তিনি ধৃত হইয়া কুফার শাসনকর্তা ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের নিকট নীত হন এবং ইব্‌ন যিয়াদের মুষ্ঠাঘাতে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। নিরুপায় হইয়া তিনি কুফা হইতে পলাইয়া আরবে গমন পূর্বক প্রতিজ্ঞা করেন যে, ‘উবায়দুল্লাহ্‌কে হত্যা করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। সিরিয়াবাসীর মক্কা আক্রমণের সময় মুখতার, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে সাহায্য করিয়া-ছিলেন। পরে ইব্‌ন যুবায়রের অবিশ্বাসভাজন হইয়া কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইমাম হুসৈন হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে যত্নবান হন [১১]। ইতঃপূর্বে কুফার অনুতপ্ত শী‘য়াগণ সুলায়মানের অধীনে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেও মুখতারের নেতৃত্বে পুনরায় ইহাদের অভ্যুত্থান ঘটে। মুখতার অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে কুফায় শী‘য়াগণের মনে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রচার করিলেন, ইমাম হুসৈনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মুহম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়া কর্তৃক তিনি হুসৈন-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে বিখ্যাত

---

time cloaked his selfishness under the garb of piety and specious declamations.' (A History of Islamic peoples. C. U. 1934. p. 111.)

১১ Muir : op. cit., p. 321.

সেনাপতি ইবরাহীম ইব্‌ন উশ্‌তুর* এবং কুফার অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তি সমবেত হইলেন। তাঁহারা কুফা হইতে ইব্‌ন যুবায়রের নিযুক্ত গভর্ণরকে তাড়াইয়া দিয়া কুফার কর্তৃত্ব অধিকার করেন। শুধু তাহাই নহে, পারস্য এবং আরবের খানিকটা অংশও মুখতার দখল করিয়া লইলেন [১২]।

শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া মুখতার সর্বপ্রথম পুরাতন শত্রু 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। খলীফা আবদুল মালিক ইতোমধ্যে রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তিনি মুখতারের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের নেতৃত্বে সিরিয়া সৈন্যবাহিনীকে কুফাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। আল্ মুখতার ইতঃপূর্বেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনিও ইবরাহীম বিন্ আল্ উশ্‌তুরকে সৈন্যদলসহ ইব্‌ন যিয়াদের গতিরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে কুফার কিছুসংখ্যক লোক বিদ্রোহ ঘোষণার উপক্রম করে; কারণ, মুখতারের কার্যে তাহাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। এতদ্ব্যতীত, তাহাদের অনেকেই কারবালা যুদ্ধের আসামী ছিল। মুখতার বুদ্ধিবলে নিজ সৈন্যদলের বিদ্রোহ দমন করিয়া সিরিয়া সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। সেনাপতি ইবরাহীম বিন্ আল্ উশ্‌তুরের বীরত্বে মুখতার জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে ৮০০ সৈন্য নিহত হয়। এইবার মুখতার বিশ্বাসঘাতক কুফীসৈন্য এবং কারবালা যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের পাইকারীহারে হত্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তরবারী হইতে শিমার, আমর্ ইব্‌ন সা'আদ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান হত্যাকারিগণের কেহই নিস্তার পাইল না। ইমাম

---

* ইনি হযরত আলীর বিখ্যাত সেনাপতি আল্ উশতুরের পুত্র।

১২ Ibid : p. 322.

হুসৈন ও তাঁহার নিরীহ সহচরদের যেরূপ অমানুষিক নির্যাতন করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল, তদ্রূপ মুখতার কারবালার আসামীদের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিলেন**। মুখতারের আদেশে কুফায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। কারবালা রণাঙ্গণের প্রধান আসামী 'আমর্ ইব্‌ন সা'আদ ও তৎপুত্রকে হত্যা করিয়া তিনি তাহাদের মস্তকগুলি মদীনায় মুহম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন; এবং তাঁহাকে লিখিলেন, তিনি সাধ্যমত তাঁহার (মুহম্মদ হানাফিয়ার) ভ্রাতৃহন্তাগণকে কোতল করিয়াছেন। অবশিষ্ট যাহারা এখনও লুকাইয়া আছে, তিনি তাহাদের ধৃত করিয়া হত্যা করিবেন[১৩]। এইভাবে হত্যালীলা চলিতে থাকাকালে 'উমাইয়া রাজের সেনাপতি 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যিয়াদ মুসৈল অধিকার করিয়া ইরাকের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। মুখতার সংবাদ পাওয়ামাত্র অবিলম্বে ইবরাহীম বিন্‌ আল্ উশ্‌তুরের নেতৃত্বে সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। তিনি নিজেও অন্য এক পথ দিয়া সেনা-পতির সহিত সম্মিলিত হইলেন। দুই পক্ষের সেনাবাহিনী ৬৭ হিজরী সালে 'জাব' নদীর তীরে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। প্রচণ্ড যুদ্ধের

** 'Some they stoned, some they stabbed, and some they shot with arrows like as they had shot Al-Hosein. Of course, Al-Mukhtar had the four limbs cut-off, and the wretched creature so left to die; another half dead, they burned in the fire. The feeling ran so high as to over-ride the ties of nature; thus the citizen who brought in from Kerbala the head of Al-Hosein who hunted down till at last he was pointed out by the fanatic piety of his own life, and slain. (Muir : The Caliphate. London. 1891. p. 323-f.n.)

১৩ ক. Muir : op. cit., pp. 322-323.
খ. Syed Ameer Ali : op. cit., p. 93.

পর ‘উবায়দুল্লাহ্ এবং হুসৈন বিন্ নমীর নিহত হইলেন। উবায়-দুল্লাহ্র মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কুফার রাজদরবারে প্রেরিত হইল। ছয় বৎসর পূর্বে এই রাজদরবারেই ইমাম হুসৈনের খণ্ডিত শির আনীত হইয়াছিল। কারবালা প্রান্তরে হুসৈন-হত্যার সহিত জড়িত প্রধান প্রধান আসামীকে হত্যা করিয়া আল্ মুখতার প্রতিশোধ লইলেন [১৪]। ‘উমাইয়া-খলীফা আবদুল মালিকের সেনাপতি ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদকে হত্যা করায় মুখতারের খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ভাল ছিল না। তাহাছাড়া ইব্ন যুবায়র, মুখতারের ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ-কারণে, তিনি বস্‌রার শাসন-কর্তা তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুসাব ইব্ন যুবায়রকে পত্রযোগে মুখতারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নির্দেশ দিলেন। মুসাব সুশিক্ষিত সৈন্যদল ও অস্ত্রসহ কুফাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মুখতার কুফী সৈন্যদলসহ প্রবল বিক্রমে বাধাদান করিলেন; কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে, কুফী সৈন্যবাহিনী তাঁহার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে এই বিপৎ-কালে পরিত্যাগ করিল। তথাপি, তিনি মাত্র উনিশ জন বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া ৬৭ হিজরী সালে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করিলেন। মুখতারের পতনের পর মুসাব ইরাক দখল করেন এবং আবদুল্লাহ্ বিন্ যুবায়রকে ইরাকের খলীফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন [১৫]। আল্ মুখতারের মৃত্যুতে ‘কিসানিয়া ধর্ম’ তথা শীয়া ধর্মের ভিত্তিমূলে আঘাত লাগে।

যাহোক, বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে।

---

১৪ ক. Muir : op. cit., pp. 323-324.
খ. S. Khuda Bakhsh : op. cit., p. 113-115.

১৫ ক. Muir : op. cit., pp. 324-325.
খ. Syed Ameer Ali : op. cit., p. 93.

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের আলোচনা।

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের আলোচনা

প্রথম অধ্যায়

মুখবন্ধ

১। মুঘল আমলে মর্সীয়া সাহিত্যের পূর্বাভাস

মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে বিষয়-বৈচিত্র্য, বিশালতা এবং মননশীলতার পরিচয় আছে। এই যুগে বাংলার বহু মুসলমান কবি নানা বিষয়ে অর্থাৎ ইসলামী শরা-শরিয়ৎ, মুসলিম ধর্ম, মুসলিম সৃষ্টিতত্ত্ব, ইসলামী-দর্শন বা সূফীতত্ত্ব, মুসলিম প্রেমোপাখ্যান, মর্সীয়া সাহিত্য, রূপক ও ঐতিহাসিক কাব্য, পদাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ, মুঘল আমলকেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণযুগ বলিয়া চিহ্নিত করা হয়[১]। মুঘল আমলের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারার কাব্যের মধ্যে মর্সীয়া সাহিত্যের ধারা অন্যতম। বিশেষ করিয়া দৌলত উজীর বাহরাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াৎ মাহ্‌মূদ, জাফর, হামিদ প্রমুখ একাধিক প্রতিভাশালী কবি মর্সীয়া কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের লেখনী চালনায় এই সাহিত্যের যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল তদ্রূপ অন্য কখনও হয় নাই। অতএব, মর্সীয়া সাহিত্যের ধারা মুসলিম বাংলা সাহিত্যের

---

১ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: মু. বা. সা। ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ: ২৬১।

বিভিন্ন ধারার কাব্যের মধ্যে অন্যতম বলিলে ঠিক বলা হয় না। বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য এই আমলে বিষয়বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতায়, সৃষ্টি-প্রাচুর্য ও জনপ্রিয়তায় উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। সুতরাং, মুঘল আমল বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যেরও স্বর্ণযুগ।

এই আমলের কবি মুহম্মদ খান, হামিদ ও হায়াৎ মাহ্‌মূদের পূর্ণ কাব্য পাওয়া গিয়াছে। কাব্য তিনখানিতে কবিত্রয়ের বর্ণিত কাহিনী ভাব-গাম্ভীর্য, মননশীলতা, চরিত্রসৃষ্টি, ও বর্ণনা-ভঙ্গিতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের অন্য কোন আমলের কাব্যে দেখা যায় না।

মুঘল আমলের আর একটি বৈশিষ্ট্য, বহু কবি শোকমূলক ক্ষুদ্র খণ্ডকবিতা জাতীয় কাব্যও প্রচুর রচনা করিয়াছিলেন। শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌র 'জয়নাবের চৌতিশা' এবং অজ্ঞাতনামা কবিগণের রচিত 'সখিনার চৌতিশা', 'সখিনা বিলাপ', 'সখিনার বারমাস', 'জয়নব বিলাপ' প্রভৃতি খণ্ড কবিতার মাধ্যমে বিলাপ বর্ণনার যে-রীতি প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা মর্সীয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে একান্তই বিশিষ্ট।

ভারতে মুঘল আমলের গোড়াপত্তনের পূর্ব হইতেই অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের শী'য়া মুসলমানগণের রাজত্বকালে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দাকিনী ভাষায় (প্রাচীন উরদূ) মর্সীয়া সাহিত্য রচনার উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়। গোলকুণ্ডা, বীজাপুর প্রভৃতি রাজ্যের শী'য়া শাসকগণের উৎসাহে বিদেশাগত বহু শী'য়া দরবেশ ও প্রচারকের উত্তর ভারতের নানা স্থানে ধর্মপ্রচারের ফলে শী'য়া ভাবধারা ও সংস্কৃতি জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়ে উত্তর ভারত ও অন্যান্য কেন্দ্রস্থলগুলিতে মর্সীয়া সাহিত্য রচিত হইবার প্রমাণ পাওয়া না গেলেও শী'য়া দরবেশ, শাসক ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণের ঐ সকল কেন্দ্রে আগমনের ফলে মুঘল আমলের পূর্বেই

শী'য়া-প্রভাবান্বিত সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। (বর্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড, ২য় অধ্যায় পৃঃ ৬৪-১০৪ দ্রষ্টব্য) মুঘল আমলে অনুকূল আবহাওয়ার সংস্পর্শ লাভ করায় তাহাতে ফল ফলিতে শুরু করে; এবং পরবর্তী দেড়শত বৎসরের মধ্যে অসংখ্য মর্সীয়া কাব্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বাংলা দেশে রচিত হইতে থাকে। শুধু তাহাই নহে, বাংলা মর্সীয়া কাব্যের কবিগণ এই সময়ের মধ্যে (১৫৭৬-১৭৫৭) উৎকৃষ্ট রচনা-সম্ভারে এই সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করেন।

বাংলা ভাষা এই আমলে স্বাভাবিকভাবে উন্নততর ফারসী সাহিত্যের সংশ্রবে আসে। ফারসী রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহৃত হওয়ায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ফারসী-চর্চা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে, মুঘল আমলে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ফারসীর চর্চা চরমে উঠে। এতৎসত্ত্বেও দেখা গেল, ইমাম হুসৈনের আত্মদান সম্পর্কিত করুণ কাহিনী উপলক্ষে মর্সীয়া সাহিত্য রচিত হইলেও রচয়িতাগণ বেপরোয়াভাবে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের অনুসৃত মর্সীয়া কাব্যের ভাষা একান্তভাবে সাধু বাংলা। ইহাতে মনে হয়, তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে সমসাময়িককালে প্রচলিত, বাংলা কাব্য রচনার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই দেখা যায়, মুঘল আমলের মর্সীয়া সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য অন্য আমলের রচনাবৈশিষ্ট্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এতদ্ব্যতীত, এই জাতীয় সাহিত্যে নারীর রূপ-বর্ণনা বা সম্ভোগবর্ণনার প্রচলন দেখা যায়। নারীর রূপ-বর্ণনার রীতি-পদ্ধতি পরবর্তী ইংরেজ আমলের কাব্যমধ্যে লক্ষণীয় হইলেও সম্ভোগবর্ণনা নিতান্তই দুর্লভ। এই আমলের কবিগণ কতকগুলি প্রচলিত প্রবাদ ও উপদেশ বাক্যের প্রয়োগে বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মর্সীয়া কাব্য-সাহিত্যে প্রবাদ-রীতির প্রচলন মুঘল পরবর্তী কবিগণের কাব্যে বর্তমান নাই।

ফলতঃ, উপরোক্ত কারণে মুঘল আমলের মর্সীয়া সাহিত্য তৎকালে জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল এবং ইংরেজ আমলের কবিগণ পূর্বসূরীদের অনুসৃত ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন। আমরা যথাস্থানে (পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মুঘল আমলের কবিগণের কাব্যগুলি আলোচনা করিব।

২। ইংরেজ আমলের মর্সীয়া সাহিত্যের পূর্বাভাস।

ক. মর্সীয়া সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন।

চিন্তা করিলে দেখা যায়, বাংলায় ইংরেজ আমলের মর্সীয়া সাহিত্য চারিটি ধারায় প্রবাহিত। ইহাদের একটির সহিত অপরটির পার্থক্য যত বেশী, সাদৃশ্য সেই পরিমাণে নিতান্ত কম। নিম্নে ছক্ কাটিয়া এই ধারাগুলির সহিত মর্সীয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য দেখানো গেল ঃ
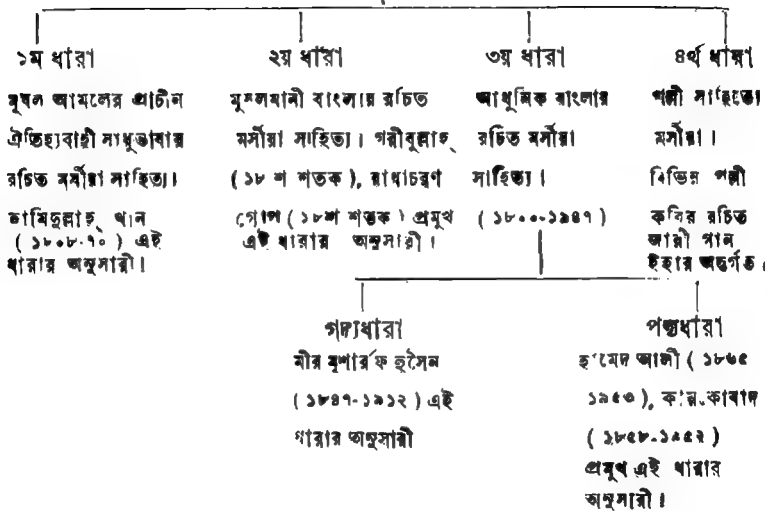
একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই আমলের প্রত্যেকটি ধারার মর্সীয়া কাব্য রচিত হইয়াছে। আমরা যথাস্থানে এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব। যে-পটভূমিকায় এই সাহিত্য রচিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মুঘল যুগে বা মুঘল পূর্বযুগে হিন্দু-মুসলমান কবিগণ সাধু বাংলা ভাষায় কাব্যাদি রচনা করিতেন। অতঃপর, বাংলা দেশে ইংরেজ শাসন চালু (১৭৫৭) হইলে বাংলা সাহিত্যের পূর্বতন ঐতিহ্য ও রীতি অনুসরণ করিয়া কিছু সংখ্যক কবির সাহিত্য সাধনা চলিতে থাকে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন সত্ত্বেও মুঘল ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য রচনার ধারা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই ধারাকেই আমি প্রথম ধারার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। পলাশীর রণপ্রান্তরে (১৭৫৭) বাংলার নবাবের ভাগ্য-বিপর্যয়ের পর বাংলার মুসলমানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি শুরু হয়। এই সময়ে দেশের দ্বৈত শাসন, মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩), আফিস আদালত হইতে ফারসী ভাষার বিলোপ সাধন (১৮৩৬) ও ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন প্রভৃতি কারণে বাঙালী মুসলমান, জীবনের বহুক্ষেত্রে সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন হন। মুসলমানেরা বিদেশী ভাষার মাধ্যমের প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া দূরে সরিয়া থাকায় তাহারা শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িল। পক্ষান্তরে, হিন্দুগণ ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা করিতে থাকায় তাহারা সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। এই সময়ে ‘ওহাবী’ ও ‘ফরায়েজী’ নামক ইসলাম-ধর্মের সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু হয়। নিম্নবঙ্গের (হাওড়া, হুগলী, কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের) সাধারণ মুসলমানেরা হিন্দুগণের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের ফলে উর্দু-হিন্দী প্রভাবিত বাংলা সাহিত্য

রচনা করিতে মনোযোগী হন[১]। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গে যে এক নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে থাকে, তাহাকে লং সাহেবের ভাষায় 'মুসলমানী বাংলা' নামে চিহ্নিত করা যায়। জনসাধারণের মধ্যে এই ধারা দীর্ঘদিন ধরিয়া বর্ধিত হইতে থাকে। ইহাই সচরাচর 'দোভাষী পুঁথি সাহিত্য' নামে পরিচিত। মুসলমানী বাংলায় রচিত এই সাহিত্য ২য় ধারার অন্তর্গত।

কলিকাতায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন স্থাপিত হইলে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে কতকগুলি বাংলা গদ্য পুস্তকপ্রণয়ন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। ইংরেজ শাসক-প্রবর্তিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রচারের মধ্য দিয়া যে-পাশ্চাত্ত্য আদর্শ-উদ্বুদ্ধ বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠে, তাহা গদ্য ও পদ্য এই দুই ধারায় আত্মপ্রকাশ করে। ইহার নামঃ সাধু বাংলা সাহিত্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ বাঙালী হিন্দু-সমাজেরই সৃষ্টি। হিন্দু সাহিত্যিকগণের অনুসরণে পরে মীর মুশার্রফ হুসৈন (১৮৪৭-১৯১২), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২) প্রমুখ বাঙালী মুসলিম কবি-সাহিত্যিক সাহিত্য রচনায় যত্নশীল হন। ইঁহাদের রচিত বাংলা সাহিত্য তৃতীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত।

ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত চতুর্থ ধারা 'পল্লীসাহিত্য'। বাংলাদেশের বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাতনামা পল্লীকবির রচিত অসংখ্য গান, গীতিকা, ছড়া, উপাখ্যান সমগ্রভাবে পল্লী-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। পল্লীর মানুষের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ এই সাহিত্যের উপজীব্য। জারীগান পল্লী সাহিত্যের একটি অংশ। (এ সম্পর্কে 'পল্লী সাহিত্যে মর্সীয়া' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

---

১ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: মু. বা. সা। ১৯৫৭ ঢাকা, পৃঃ ২৭৮-২৭৯।

অতঃপর, ইংরেজ আমলে রচিত পূর্ব-বর্ণিত মুসলমানী বাংলা (২য় ধারার অন্তর্গত) কাব্যগুলির যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার ভাষা, সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে। আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, উরদূ-হিন্দীমিশ্রিত এক প্রকার নূতন বাংলা ভাষায় এই ধারার কাব্যগুলি রচিত। এই ভাষা-বৈশিষ্ট্যের মূলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ বিদ্যমান।

খ. মুসলমানী বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশ

ইংরেজ আমলে মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া সাহিত্যের ধারা (২য় ধারা) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই কাব্যধারায় উর্দূ-হিন্দী ভাষার বেপরোয়া ব্যবহার থাকায় ইহাকে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষায় রচিত মর্সীয়া সাহিত্য হইতে পৃথক করিয়াছে। বাংলা কাব্যে আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহার নূতন নহে; সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিচয় প্রদানের খাতিরে এবং মুসলমান সমাজের আচার-ব্যবহারকে স্পষ্ট করিবার প্রয়োজনে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষপাদে, বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতকে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে বাংলা ভাষায় যে-নূতন সাহিত্য রচিত হইল, তাহা 'মুসলমানী বাংলা' নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে: মুসলিম কবিগণের রচিত বাংলা সাহিত্যে এই নূতন রীতির প্রবর্তন ও মর্সীয়া কাব্য রচয়িতা কবিগণের ধর্মীয় মনোভাবের কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা যায়, বাংলা দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ দেশের নরনারীর ব্যক্তিগত জীবনে, সাহিত্যে, শিল্পে এমন কি ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বহুদিন যাবৎ উরদূ-হিন্দী মিশ্রিত কাব্যগুলিকে 'পুঁথি সাহিত্য' নামে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই সব ভাষামিশ্রিত রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যান, পীরমাহাত্ম্যজ্ঞাপক পাঁচালী প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে লিখিত কাব্যগুলিকে ব্যাপক অর্থে 'পুঁথি সাহিত্য' নামকরণ করিয়াছেন[২]। কেহ কেহ এই শ্রেণীর কাব্যগুলিকে 'দোভাষী পুঁথি' নামে অভিহিত করিয়াছেন[৩]। কিন্তু 'দোভাষী পুঁথি' নামকরণ বোধহয় সমীচীন হইবে না, কারণ ইহা শুধু দুইটি ভাষা মিশ্রিত কাব্য নহে। কলিকাতার বটতলার ছাপাখানা হইতে এই পুঁথিগুলি মুদ্রিত হইয়া বাংলাদেশে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ায় ইহাকে 'বটতলার পুঁথি' নামেও চিহ্নিত করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। রেভারেণ্ড লং এই ভাষাকে 'মুসলমানী ভাষা' এবং ডব্লিউ হান্টার 'মুসলমানী বাংলা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন[৪]। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে ইহা 'ইসলামি বাংলা'[৫]।

আরও অনেকে বিভিন্ন নামে এই পুঁথিগুলিকে চিহ্নিত করিলেও সে সম্পর্কে তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া হিন্দী-উরদূ মিশ্রিত

---

২ 'পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তি'। মাহেনও, পৌষ, ১৩৬৩, ৮ম বর্ষ—৯ম সংখ্যা; পৃঃ ২৯।

৩ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্সান: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ঢা. বি. ১৯৫৬, পৃঃ ২১-৩২।

এবং আহ্মদ শরীফ: 'দোভাষী পুঁথির ভাষা'। দিলরুবা, ৭ম বর্ষ, আজাদী সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬২; পৃঃ ২০৯।

৪ (a) J. Long: Descriptive Catalogue of Bengali Works-Calcutta 1855.

(b) W. W. Hunter: The Indian Musalmans, Reprinted from 3rd Edition, 1945. Calcutta p. 146.

৫ ইসলামি বাংলা সাহিত্য। বর্ধমান সাহিত্য সভা কর্তৃক প্রকাশিত, বাং ১৩৫৮, পৃঃ ১৮২।

এই কাব্যগুলিকে 'মুসলমানী বাংলা পুঁথি' বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

বাংলা দেশ মুসলমানদের অধিকারে আসার পর হিন্দুকবি বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' দুই একটি আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পাঠান যুগে হিন্দু-মুসলমান কবিগণের রচিত কাব্যে কিছু আরবী, ফারসী শব্দের প্রয়োগ আছে; কিন্তু উরদূ বা হিন্দীশব্দের প্রয়োগ নাই। মুঘল অধিকারের পরে বাংলা সাহিত্যে হিন্দী ও উরদূ শব্দের আমদানী হয়। মধ্যযুগের (১৭শ শতাব্দী) কবি কৃষ্ণরামদাসের 'কালিকামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে মধ্যযুগীয় ভাষা ব্যবহৃত হইলেও কোথাও কোথাও তিনি হিন্দী-ফারসী শব্দবহুল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন[৬]। অষ্টাদশ শতকের (অন্ত্য মধ্যযুগ) কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যগুলির কোন কোন স্থলে মুসলমানী বাংলা রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। তিনি 'অন্নদা মঙ্গল'-এর শেষ অধ্যায় "মানসিংহ"-এ বলিয়াছেন:

> মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
> উচিত সে আরবী-পারসী-হিন্দুস্থানী॥
> পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
> কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
> না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
> অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

মুঘল আমলের পূর্বে আরবী-ফারসী শব্দের কিছু কিছু প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যে ছিল; কিন্তু উরদূ বা হিন্দী শব্দ মুঘল আমল হইতে চালু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাঙালী কবিগণ জাতিধর্মনির্বিশেষে যে একই বাংলা ব্যবহার করিতেন, তাহাকে 'সাধু বাংলা ভাষা' বলা চলে। কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর

---

৬ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্: পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯-৩০।

(১৪শ শঃ), যয়নুদ্দীন (১৫শঃ), সৈয়দ সুলতান (১৬শ শঃ) সৈয়দ আলাওল (১৭শ শঃ) প্রমুখ কবির কাব্যের ভাষা হইতে এ-কথা প্রমাণিত হয়[৭]।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা দেশ মুঘলদের অধীনে আসে। এই সময় হইতে হিন্দুস্তানীভাষী লোক ভারতের পশ্চিমাঞ্চল হইতে বিপুল সংখ্যায় বাংলা দেশে আসিয়া ভীড় জমায়। বাঙালীরা তাহাদের সহিত মেলামেশা করিয়া ও সুবাদারের (পরে নবাবের) দপ্তরে কাজকর্ম করিয়া জীবিকানির্বাহের জন্য ফারসী পড়িতে শুরু করে। শহরে রাজদরবারে, আদালতে যাতায়াত করিয়া মুল্লা, আলেম ও ধর্মপ্রচারকগণের প্রভাবে আসিয়া তাহারা নূতন আরবী ফারসী কথা শিখিয়া ফেলিল[৮]। অতঃপর মুর্শিদাবাদ সুবে-বাংলার রাজধানী হওয়ায় বাংলা ভাষায় উরদূর* প্রভাব বাড়িয়া গেল ; এবং উরদূ ভাষাভাষী বহু হিন্দুস্তানী ও অবাঙালী সিপাহী এবং রাজকর্মচারী চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, কলিকাতার শহরতলী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে শুরু করে। উরদূ হিন্দী বা হিন্দুস্তানী ছিল তাহাদের মাতৃভাষা। স্বদেশের সহিত

---

৭ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০-৩১।

৮ ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ 'আরবী ফারসী শব্দের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর'। (ব. সা. প. প. ১৩২৪, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২১৪)

* উরদূ : ইহা ফারসী ও হিন্দীমিশ্রিত এক প্রকার সঙ্কর ভাষা। হিন্দুস্তানী ও বহিরাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভাব আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে অক্ষমতার ফলে ফারসী ও হিন্দীমিশ্রিত এই নূতন ভাষা (উরদু) Lingua-franca হিসাবে চলিতে লাগিল ; এবং তিনচার পুরুষেই ইহা উত্তর ভারতের অভিজাত মুসলমানের ঘরোয়া ভাষায় পরিণত হইল। কিন্তু তাহাদের লেখ্য ভাষা ছিল ফারসী।

তাহাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। কাজেই, বাঙালীর সহিত ভাব আদানপ্রদানের জন্য উরদূ-হিন্দী-বাংলা মিশ্রিত এক নূতন ভাষা তাহারা Lingua-franca রূপে ব্যবহার করিতে শুরু করে। এই ভাষা বাংলাদেশের মুসলমান জনসাধারণের কথ্যভাষা ছিল না। ইহা নগরের জনসাধারণ ও মাঝিমাল্লাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল[৯]। কিন্তু একটা বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার যে, গ্রাম-বাংলায় এই মুসলমানী বাংলা ভাষা কথ্যভাষার বাহনরূপে গৃহীত না হইলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং রাজকার্যোপলক্ষে বহু আরবী-ফারসী শব্দের সহিত জনসাধারণের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। এইভাবে উরদূ (অর্থাৎ ফারসী-হিন্দী) এবং আরবী শব্দ বাংলার সর্বত্র দেশীয় ভাষার সহিত মিশিয়া গেল।

'নবাব বাংলা দেশ শাসন করিতেন। কাজেই, আদালতের কাগজপত্র বাংলা ভাষায় লিখিত হইলেও সেগুলি প্রায়ই ফারসী বা উরদূ শব্দে পূর্ণ থাকিত। কোন কোন কাগজপত্র সম্পূর্ণ উরদূতে (?) লেখা চলিত'[১০]। যাহা হউক, আরবী-ফারসী-উরদূ মিশ্রিত বাংলা ভাষা সে যুগের হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত বাঙালী অবাধে ব্যবহার করিতে থাকেন। ফলে হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা এবং কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে মুসলমানী বাংলা রীতি অবলম্বনে মর্সীয়া, মুসলিম প্রেমোপাখ্যান প্রভৃতি কাব্য প্রচুর রচিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, এই সব পুঁথির অধিকাংশই ফারসী-উরদূ গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত[১১]। শুধু ফারসী-উরদূ অবলম্বনে

---

৯ J. Long: Descriptive Catalogue of Bengali Works-Calcutta 1855.

১০ রাজেন্দ্র কুমার মজুমদার: 'ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা,' সা. প. প. ৪র্থ সংখ্যা, বাং ১৩১২, পৃঃ ১৪৫।

১১ 'It should not be supposed, however, that the Muhammedan writers have ceased to be Muhammedan

লিখিতই বা বলি কেন, অনেক পুঁথি ফারসী, উরদূ কাব্যের হুবহু অনুবাদ। অনুবাদকগণ মূল ভাষায় যেরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন, বাংলা ভাষায় তদ্রূপ ছিলেন না। কাজেই, তাঁহারা অনেক দুরূহ ও কঠিন আরবী, ফারসী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ না পাওয়ায় ঐ শব্দগুলি হুবহু বাংলা ভাষার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। যেমন দেখা যায়, মর্সীয়া সাহিত্যের অন্তর্গত কাব্যগুলি প্রায় সবই ফারসী অথবা উরদূ কাব্য হইতে তরজমা করা। যাহা হউক, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার প্রভাব ভাষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলমানী বাংলা ভাষায় মর্সীয়া সাহিত্য রচনার পশ্চাৎপটে এ-দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবও কম দায়ী নহে। সুবে-বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের নবাবগণের শাসন-শৈথিল্য, বর্গীর হাঙ্গামা এবং পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) নবাব সিরাজ-দ্দৌলার ভাগ্য-বিড়ম্বনায় সমগ্র দেশব্যাপী বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের নগর-সমাজের সকল স্তরে ধনী সামন্তগণের যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা নগ্ন-মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া সমাজের ভিত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে[১২]। এই সময়ে দেশের মুসলিম জনসাধারণ নিজেদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই আত্মনির্ভরশীল হইতে পারেন নাই। জাতীয়-জীবনের এই চরম লাঞ্ছনা ও

---

or that there is nothing Islamic in their work. On the contrary, they enlarge the content of Bengali literature with the Islamic ideas they express and the themes they introduce from Arabic and Persian sources.' (J. C. Ghose: Bengali Literature. Oxford University Press. 1948 p. 82.)

১২ ডক্টর শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য: ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, কলিকাতা ১৯৫৬, পৃঃ ১-৪।

আহমদ শরীফ: পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৪।

বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁহারা একান্তভাবে অদৃষ্টনির্ভর ও দৈববাদী হইয়া পড়েন। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া সাহিত্য পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সাধারণ বাঙালী মুসলমান তাঁহার বিড়ম্বিত-জীবন ও লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সত্যপীর, বড় খাঁ গাজী, ইস্‌মাঈল গাজী প্রভৃতি ইষ্টপীর বা শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মুসলিম কবিগণ জাতীয়-বীর-পুরুষগণকে (যেমনঃ ইমাম হুসৈন, হজরত আলী প্রভৃতি) কাব্যমধ্যে আমদানী করিয়া কাব্য রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্বেই অর্থাৎ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলিম জন-সাধারণ ধর্মবোধমূলক সাহিত্য পাঠের জন্য অতীব উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা বহুকাল যাবৎ হিন্দুকবিরচিত দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক পুরাণ-পাঁচালী পড়িয়া কাব্য-পিপাসা মিটাইয়াছেন; কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। ইহার ফলে, তাঁহারা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধমূলক কাব্যপাঠের জন্য ঝুঁকিয়া পড়েন। অতঃপর, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মুসলিম জনসাধারণ অদৃষ্টনির্ভর হইয়া পড়েন, তাহা ইতঃপূর্বেই বলিয়াছি। ইংরেজ আমলে দেশের সাধারণ মানুষের রুচি ও চাহিদা অনুসারে মুসলমান কবিগণ পাঁচালীর আঙ্গিকে মুসলমানী বাংলায় যে-মর্সীয়া কাব্যাদি প্রণয়ন করিলেন, তাহার কোন কোনটিতে পীরের মাহাত্ম্য ও শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন; এবং ধর্মীয় জীবনের সহিত যুক্ত মহাবীর ইমাম হুসৈনের কারবালা রণাঙ্গণে আত্মদান কাহিনী বর্ণনার মারফত শক্তির প্রতি তাহাদের অকুণ্ঠ নিষ্ঠা ও বিশ্বাসপ্রবণতা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুঘল ও ইংরেজ আমলে রচিত কাব্যগুলির ঐতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত কাব্যগুলি ঃ

১। মুঘল আমল ঃ (১৫৭৬-১৭৫৭)

১. শৈখ ফয়জুল্লাহ্ ঃ যয়নবের চৌতিশা
২. দৌলত উজীর বাহরম খাঁ
ঃ জঙ্গনামা (খণ্ডিত)
৩. মুহম্মদ খান ঃ মকতুল হুসৈন
৪. শেরবাজ ঃ কাশিমের লড়াই
৫. হায়াৎ মাহ্মূদ ঃ জারীজঙ্গনামা
৬. জাফর ঃ শহীদ-ই-কারবালা (খণ্ডিত)
৭. হামিদ ঃ সংগ্রাম হুসন

২। ইংরেজ আমল ঃ (১৭৫৭-১৯৪৭)

১. ফকীর গরীবুল্লাহ ও ইয়াকুব
ঃ জঙ্গনামা
২. রাধাচরণ গোপ ঃ জঙ্গনামা বা ইমামএনের কেচ্ছা
৩. মুহম্মদ হামীতুল্লাহ্ খান
ঃ গুলজার-ই-শাহাদৎ বা শাহাদৎ নামা
৪. মীর মনোহর ঃ হানিফার লড়াই
৫. ওয়াহিদ আলী ঃ বড় জঙ্গনামা
৬. জনাব আলী ঃ শহীদ-ই-কারবালা
৭. মুহম্মদ মুন্শী ঃ শহীদ-ই-কারবালা
৮. সাদ আলী ও আবদুল ওহাব
ঃ শহীদ-ই-কারবালা
৯. মুহম্মদ ইসহাক উদ্দীন
ঃ দাস্তান শহীদ-ই-কারবালা
১০. কাজী আমীনুল হক
ঃ জঙ্গে কারবালা

/

দ্বিতীয় অধ্যায়

মর্সীয়া কাব্যগুলির ঐতিহাসিক আলোচনা

১। মুঘল আমল (১৫৭৬-১৭৫৭)

এক. শৈখ ফয়জুল্লাহ্

মুঘল আমলে বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কয়েকজন কবির রচিত কয়েকখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শৈখ ফয়জুল্লাহ্, দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াৎ মাহ্‌মূদ, শেরবাজ, হামিদ ও জাফর-এর রচনা ব্যতীত অন্যান্য কয়েকজন অজ্ঞাতনামা কবির খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপির সন্ধান জানা যায়। কাজেই, আলোচ্য পরিচ্ছেদের শেষাংশে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিগুলির[১] নামোল্লেখ করা হইল।

বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের আদি কবি কে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে, এ-পর্যন্ত উপাদানাদি যাহা পাওয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে মনে হয়, শৈখ ফয়জুল্লাহ্ এ-শ্রেণীর কাব্য রচনার অগ্রদূত। কেননা তিনি 'জয়নবের চৌতিশা' রচনা করিয়াছিলেন[২]। এতদ্ব্যতীত, তিনি আরও কয়েকখানি পুঁথির প্রণেতা। তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে 'গোরক্ষবিজয়', 'গাজী

১ এই পাণ্ডুলিপিগুলি বেশ পুরাতন। কাজেই, এগুলিকে বর্তমান পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

২ বা. এ. প.। ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৭০-৭৪।

৩ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯।
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : 'গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা'। সা. প. প., ৬০ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬০ বাং, পৃঃ ১১৪-১২১।

বিজয়', ও 'সত্যপীরের' সন্ধান পাওয়া গিয়াছে[৩]। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত উপরোক্ত পুঁথির লেখকরূপে শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌র ভণিতা ব্যতীত আর এক ফয়জুল্লাহ্‌র সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি মীর ফয়জুল্লাহ্‌। মীর ফয়জুল্লাহ্‌র ভণিতা-সম্বলিত 'রাগনামা'[৪] ও 'পদাবলী'[৫] পাওয়া যাইতেছে। অতএব, স্বভাবতই প্রশ্ন দাঁড়ায়ঃ শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌ ও মীর ফয়জুল্লাহ্‌ এক ব্যক্তি কি না? এ-প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, 'গাজী বিজয়', 'গোরক্ষবিজয়', 'সত্যপীর, প্রভৃতি পুঁথিতে শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌ সত্যপীর, গাযী সাহেব এবং গোরক্ষনাথের অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন; এবং কাব্য-গুলির মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণার অভিব্যক্তি ঠিকরিয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে, মীর ফয়জুল্লাহ্‌ রচিত 'রাগনামা' একখানি গানের বই। এই পুঁথিতে সঙ্গীতের তাল-রাগ সম্বন্ধীয় আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ইহা শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌ রচিত পুঁথি-গুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহা ছাড়া, 'শৈখ' ও 'মীর' কুল-উপাধিও পৃথক। শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌ মীর ছিলেন না। সুতরাং শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌ ও মীর ফয়জুল্লাহ্‌ এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। অধ্যাপক আলী আহ্‌মদ সংগৃহীত 'গোরক্ষবিজয়' পুঁথির কয়েকখানি

---

৪ অধ্যাপক আলী আহমদঃ বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ, ১ম ভাগ। ১৩৫৪ বাং। ৬৫ নং পুঁথির ৮ পৃঃ; ৮৩ নং পুঁথির ১০ পৃঃ; ৩০৯ নং পুঁথির ৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব 'রাগনামা'কে শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌র রচনা বলিয়া মনে করেন। (মু. বা. সা.। ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৫৭, পৃঃ ৯০)।

৫ যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যঃ বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। ১৩৫৬, পৃঃ ক-২৭; এতদ্ব্যতীত, মীর ফয়জুল্লাহ্‌-রচিত পাঁচটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'-৩য় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপিতে মীর ফয়জুল্লাহ্‌র ভণিতা আছে[৬]। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত আটখানি পুঁথির[৭] সহিত আলী আহ্‌মদের সংগৃহীত পুঁথির ভণিতা ও পাঠ মিলাইয়া দেখিলে লক্ষ্য করা যায় যে, অধ্যাপক আলী আহ্‌মদের সংগৃহীত পুঁথিগুলি প্রকৃতপক্ষে শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌র রচিত। অধ্যাপক আলী আহ্‌মদের পুঁথির মীর ফয়জুল্লাহ্‌ যে 'গোরক্ষবিজয়'-এর গায়ক বা অনুলেখক তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। কেননা 'গোরক্ষবিজয়ের' অন্যান্য ভণিতার মধ্যে মাত্র তিনটি ভণিতা মীর ফয়জুল্লাহ্‌র। এই ভণিতা তিনটি গায়ক বা অনুলেখকের। পুঁথি গান করিবার সময় অথবা নকল করিবার সময় সে নিজের নাম বসাইয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এ-জাতীয় দৃষ্টান্ত সুলভ।

---

৬ এবং ৭ সাহিত্য বিশারদ ও অধ্যাপক আলী আহমদ-এর সংগৃহীত পুঁথি ছাড়াও কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও দুইখানি পুঁথি সংরক্ষিত আছে। কোন্‌ পুঁথিতে কাহার ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :

সাহিত্য বিশারদের	১ নং পুঁথিতে	ফয়জুল্লাহ্‌, কবীন্দ্র ও কবীন্দ্রদাস
”	২ ” ”	ফয়জুল্লাহ্‌ ও ভীমদাস
”	৩ ” ”	ফয়জুল্লাহ্‌ ও ভীমদাস
”	৪ ” ”	ফয়জুল্লাহ্‌ ও ভীমদাস
”	৫ ” ”	ফয়জুল্লাহ্‌ ও শ্যামদাস সেন
”	৬ ” ”	ফয়জুল্লাহ্‌
”	৭ ” ”	ফয়জুল্লাহ্‌
”	৮ ” ”	ফয়জুল্লাহ্‌
অধ্যাপক আলী আহ্‌মদের	১ নম্বর পুঁথিতে	মীর ফয়জুল্লাহ্‌
”	২ ” ”	মীর ফয়জুল্লাহ্‌
”	৩ ” ”	মীর ফয়জুল্লাহ্‌

শৈখ ফয়জুল্লাহ্-রচিত 'জয়নবের চৌতিশা' নামক ক্ষুদ্র কাব্যখানির শেষে কবির একটি মাত্র ভণিতা আছে[৮]। পাণ্ডু-লিপির প্রথম কয়েকখানি পৃষ্ঠায় লিখিত বিষয়বস্তুর সহিত কবি মুহম্মদ খানের 'মোক্তাল হোসেন' (মকতুল হুসৈন) কাব্যের অংশ বিশেষের কিছু সামঞ্জস্য থাকায় ইহাকে মুহম্মদ খানের রচনা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু ইহা যে একখানি স্বতন্ত্র ও বিশেষ আঙ্গিকে লিখিত ক্ষুদ্র কাব্য, পুঁথি দুইখানি মিলাইয়া পড়িলে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। ইহার রচয়িতা কবি শৈখ ফয়জুল্লাহ্[৯]। 'জয়নবের চৌতিশা' কারবালা-যুদ্ধ সম্পর্কিত বড় কাব্য নহে; বিরাট কারবালা কাহিনীর একটি অতি ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে বিশেষ আঙ্গিকে ঢালিয়া রচিত কাব্য। এই আঙ্গিক চৌতিশা কাব্যের আঙ্গিক। বাংলা চৌত্রিশটি বর্ণের প্রত্যেকটিকে এক বা একাধিক চরণের আন্তবর্ণরূপে ব্যবহার করিয়া যে-পদবন্ধ রচনা করা হয়, তাহাকে 'চৌতিশা' অথবা 'চৌত্রিশা' বলে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেব-দেবীর স্তবস্তুতি বা তত্ত্বকথা প্রকাশের জন্য এই 'চৌতিশা' রচিত হইত। স্তবস্তুতি বা তত্ত্বকথা প্রকাশের এই রীতি

---

৮ শেখ ফয়জুল্লা কহে জয়নব কথন।
স্বর্গে কান্দে হুর সব কান্দে সখিগণ॥

(জয়নবের চৌতিশা)।

৯ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন: 'জয়নবের চৌতিশা' কাব্যখানি 'গোরক্ষবিজয়', 'গাজী বিজয়', 'সত্যপীর' প্রণেতা ফয়জুল্লাহ্‌র কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না (মু. বা. সা.। ঢাকা ১৯৫৭, পৃঃ ২৬৫)। তাঁহার এই প্রকার সন্দেহ পোষণের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, পুঁথিখানিতে কেবল একটি ভণিতা রহিয়াছে। সুতরাং এই পুঁথির অপর কোন পাণ্ডুলিপি না পাওয়া গেলে এই একটিমাত্র পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অপরিহার্য ছিল। ইহা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে গ্রহণ করা হয়। কবি শৈখ ফয়জুল্লাহ্ এই রীতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার চৌতিশায় আঙ্গিকের কোন পরিবর্তন হইল না বটে ; কিন্তু বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল। তিনি তাঁহার কাব্যে দেব-দেবীর চিরাচরিত স্তব না লিখিয়া কারবালার করুণ ও বিষাদময় কাহিনীর সহিত সম্পর্কিত হুসৈন-পরিবারভুক্ত বীবী জয়নবের বিলাপ বর্ণনা করিলেন। এই বর্ণনায় বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ বিকশিত হইয়াছে[১০]। মধ্যযুগের প্রায় অধিকাংশ কবির পুঁথিতে বারমাসী ও চৌতিশা রহিয়াছে। কোন কোন কবির রচনায় 'বিলাপ' শীর্ষক একটি সর্গও সন্নিবেশিত হইয়াছে দেখা যায়। তাহাতে নায়ক বা নায়িকার কোন দুঃখ-বেদনার অভিব্যক্তি দেওয়া হয়। মুহম্মদ খানের 'মকতুল হুসৈন' কাব্যেও হুসৈন-পত্নী বীবী 'শাহের বানুর বিলাপ' (স্ত্রী পর্ব) নামক একটি সর্গ আছে। যাহা হউক, সাধারণ নাম 'চৌতিশা' হইলেও বর্ণসংখ্যা সব কবির রচনায় সমান নহে। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের চৌতিশায় সবগুলি বর্ণই অনুক্রম অনুসারে ব্যবহৃত হইয়াছে। ফয়জুল্লাহ্র 'জয়নবের চৌতিশা' কাব্যে 'ঝ' বর্ণের পর 'ন', 'ড' 'ঢ'-এর পর 'আ', 'আ'-বর্ণের পর 'ত' প্রভৃতি বর্ণ ব্যবহৃত হওয়ায় বর্ণমালার অনুক্রম রক্ষিত হয় নাই। শৈখ ফয়জুল্লাহ্ বাংলাধ্বনি অনুসারে বর্ণ ব্যবহার করায় 'ক্ষ'-কে 'খ' ও 'য'-কে 'জ' ধরিয়া আদ্যবর্ণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন[১১]।

---

১০ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯০, ১১৫ ;
আহমদ শরীফ : বা. এ. প.। ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৭।

১১ ক. 'খীন হৈল তনু মোর বিচ্ছেদে তোমার।
খেমাই রাখিতে চিন্তা না পারিএ আর॥'

অধ্যাপক আহ্‌মদ শরীফ কবির বর্ণব্যবহার সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌ 'বহু স্থলে শব্দের বানান বিভ্রাটে' পড়িয়াছেন এবং 'আন্তবর্ণযুক্ত শব্দের অপপ্রয়োগ' ঘটিয়াছে[১২]। প্রকৃতপক্ষে কবি কোন ভুলচুক করেন নাই।

কবির আবির্ভাবকাল সম্পর্কে এখন আর বিশেষ সংশয় নাই*। তিনি ১৫৪৫ বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সত্যপীর' রচনা করিয়াছিলেন[১৩]। সুতরাং কবির জীবৎকাল অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। কবির আবির্ভাব-কাল সম্পর্কে কেহ কেহ ভিন্নমত পোষণ করেন[১৪]।

খ. 'জৌবন সমএ নারী না থাকিলে পতি।
জীবন সাফল্য নহে সংসারে বসতি॥
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে হৃদয়ের আগুন।
জৌবন সমএ প্রভু দিলা প্রেমাগুন॥'

১২ আহমদ শরীফ: বা. এ. প.। ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৭।

* ষোড়শ শতকের কবি শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌ ও দৌলত উজীর বাহরাম খানের কারবালা-বিষয়ক কাব্যাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, ষোড়শ শতক হইতে বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য পাওয়া যাইতেছে; কারণ এই কবিদ্বয় ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। —লেখক।

১৩ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: মু. বা. সা.। ১ম প্রকাশ ১৯৫৭, ঢাকা, পৃঃ ৮৯।

১৪ ডক্টর সুকুমার সেন 'সত্যপীর' পুঁথির রচনাকাল ১৭২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে, শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক (বা. সা. ই., ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৪৮ পৃঃ ৯২৬); ডক্টর সেন তাঁহার এই মতের সমর্থনে কোন প্রমাণ দেন নাই।

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে কবিকে ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, (সাহিত্য প্রকাশিকা, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৬২ আশ্বিন, পৃঃ ১৬৪)। সম্প্রতি তিনি তাঁহার

শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌র নিবাস কোথায় ছিল, তৎসম্পর্কে সর্ববাদীসম্মত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক আবিষ্কৃত শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌র 'গোরক্ষ-বিজয়' পুঁথির যে-কয়খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটির মধ্যেই কবির পরিচয় দেওয়া নাই। কবি-রচিত একমাত্র 'গাজী-বিজয়' ব্যতীত অন্যান্য পুঁথির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে 'গোরক্ষবিজয়', 'সত্যপীর' ও 'জয়নবের চৌতিশা' কাব্যের সন্ধান জানা যায়। কবি-রচিত এই সকল পুঁথি হইতে তাঁহাকে উত্তরবঙ্গের লোক বলিয়া মনে হয়। কেননা, ইসমাঈল গাজী উত্তরবঙ্গের পীর ; পশ্চিমবঙ্গেরও বটে, এবং 'গোরক্ষবিজয়' উত্তর-বঙ্গের নাথপন্থীদের কাহিনী।

যাহা হউক, শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌ যে একজন প্রতিভাবান কবি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার কাব্যগুলির পাণ্ডু-লিপি উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বঙ্গে কবির পুস্তকগুলি সমাদৃত হইয়াছিল।

একগ্রন্থে পূর্বমত পরিবর্তন করিয়া বলেন যে, শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌ ষোড়শ শতাব্দীতে 'সত্যপীর' রচনা করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব। এই উক্তি প্রসঙ্গে কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন : গোরক্ষবিজয় পুঁথির উনিশ শতকের আগেকার পাণ্ডুলিপির দুষ্প্রাপ্যতা। তিনি মনে করেন, শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌ ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে গোরক্ষবিজয়ের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, ১ম প্রকাশ ১৯৫৮, পৃঃ ২৬২-২৬৩)। তাঁহার এই মত যে কত অসার এ-স্থলে তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সংগৃহীত কবি-রচিত 'গোরক্ষবিজয়ের' একখানি পাণ্ডুলিপির লিপিকাল '১১৮৪ সন' অর্থাৎ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ (পুঁথি নম্বর ৩১৬, ঢা. বি. লা.।

দুই: দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান

শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌র পরে বা সমসাময়িককালে দৌলত উজীর বাহরাম খান একখানি 'জঙ্গনামা' কাব্য প্রণয়ন করেন। এই জঙ্গনামা পুঁথির চারিখানি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে *। উহাদের একটিতে ভণিতায় 'বার আউলিয়া' 'চাটিগ্রাম' 'জাফরাবাদ' ও 'নৃপতি নিযাম শাহ্‌র' নামোল্লেখ আছে। দৌলত উজীর নিজেকে নিযাম শাহ্‌র সেবক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

দৌলত উজীর বাহরাম খান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ও শের শাহ্‌র ভ্রাতা নিযাম শাহ্ সুরের (১৫৪৫-৫৩) দৌলত উজীর বা অর্থসচিব ছিলেন। কবির পিতার নাম মোবারক খান। তিনিও নিযাম শাহ্‌র অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তদানীন্তন চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ শহরে ছিল কবির নিবাস [১৫]। কবি-রচিত অপর শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম 'লায়লী-মজনু'।

তিন: মুহম্মদ খান

জনপ্রিয় কাব্য 'মোক্তাল হোসেন' (মকতূল হুসৈন) প্রণেতা মুহম্মদ খানের নাম শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। তিনি

পুঁথি পরিচিতি--পৃ: ১৩১)। সুতরাং কবির পুঁথি অন্ততঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে নকল করা হইয়াছিল।

* এই চারিখানি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি বর্তমানে অধ্যাপক আলী আহমদের কাছে সংরক্ষিত আছে। খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিগুলি হইতে 'কারবালা' সম্বন্ধীয় এলোমেলো কাহিনী পাওয়া যায়। কাজেই, এগুলি বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। —লেখক।

১৫ আহমদ শরীফ সম্পাদিত: পুঁথি পরিচিতি। ঢা. বি., ১৯৫৮, পৃ: ৪৯৩-৯৪।

যথার্থই উচ্চ কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 'মকতূল হুসৈন' কাব্য এই নামীয় ফারসী কাব্যের ভাবানুবাদ; তথাপি ইহাতে কবির নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা ও কল্পনার প্রাধান্য পরিস্ফুট। কাব্যের সর্বত্র ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নাই। কাব্যখানি করুণ রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার। সরল, মধুর ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় সপ্তদশ শতাব্দীর অল্প কবিই তাঁহার সহিত দাঁড়াইতে সক্ষম [১৬]। মুহম্মদ খান চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী ছিলেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত কোন অঞ্চলে কবির বাস ছিল। ডক্টর হক অনুমান করেন যে, জোবরা গ্রাম কবি মুহম্মদ খানের জন্মস্থান [১৭]। কবি 'মকতূল হুসৈন' কাব্যে চট্টগ্রামের পীরপরম্পরার স্তুতি করিয়াছেন এবং স্বীয় বংশ ও নিজের ব্যক্তিগত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন [১৮]। এতৎভিন্ন 'কেয়ামতনামা', 'হানিফার লড়াই' কাব্যেও তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় কিছু কিছু আছে। পীরপরম্পরার স্তুতিরক্ষেত্রে কবি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে যাঁহার নাম বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি 'নবীবংশ' প্রণেতা সৈয়্যিদ সুলতান। কবি সৈয়্যিদ সুলতান, মুহম্মদ খানের কাব্য ও আধ্যাত্মিক সাধনার মুর্শিদ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সৈয়্যিদ সুলতানের সহিত মুহম্মদ খানের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর।

কবি-প্রদত্ত বর্ণনা হইতে মুসলমানগণের প্রথম চট্টল-বিজয়ের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। সেকালে

---

১৬ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ: আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য। ১ম সংস্করণ, ১৯৩৫, পৃঃ ৭৩।

১৭ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: মু. বা. সা. ঢাকা, ১৯৫৭, পৃঃ ১৮২।

১৮ মুহম্মদ খান: মকতুল হুসৈন। পুঁথির নম্বর ২২৩ (ঢা. বি. লা.) এবং 'সাহিত্য-পত্রিকা' দ্রষ্টব্য। বর্ষা ১৩৬৬; ৩য় বর্ষ: ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৯৯-১০৩।

আরববাসী অনেকে সমুদ্রপথে বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন—সিন্ধু হইতে স্থলপথে নহে। মাহীসওয়ার দরবেশ অর্থাৎ বগুড়াজেলার মহাস্থানের শাহ্ সুলতান মাহীসওয়ার সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত জনশ্রুতি আছে। এই জনশ্রুতি হইতে মনে হওয়া খুবই সঙ্গত যে, তাঁহারা সমুদ্রপথে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন[১৯]। পাঠান আমলে সৈয়্যিদ বক্তিয়ার মাহীসওয়ার নামক এক দরবেশও সুদূর বোগদাদ হইতে জলপথে চট্টগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হন। 'মাহীসওয়ার' ছিল তাঁহার কুল-উপাধি, প্রকৃত নাম সৈয়্যিদ বক্তিয়ার বোগ্দাদী[২০]। প্রকৃতপ্রস্তাবে, চট্টগ্রামে মুসলিম উপনিবেশের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। বাংলায় মুসলমান অধিকারের পূর্ব হইতেই এখানে আরবীয় বণিক ও প্রচারকগণ আসিয়া বসতি স্থাপন করে ; ফলে ষোড়শ শতাব্দীর অনেক পূর্বকাল হইতেই তাহারা বাঙালী বনিয়া যায়[২১]।

মুহম্মদ খাঁর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ 'মাহী সওয়ার'ও একজন দরবেশ ছিলেন[২২]। তিনি সুদূর আরবদেশ হইতে চট্টগ্রাম আসিয়াছিলেন। মুসলমানগণের চট্টগ্রাম বিজয়ের সহিত কবির এই আদি পিতৃপুরুষ 'মাহী সওয়ার'—এর

---

১৯ ডক্টর আহমদ হুসৈন দানী : 'বঙ্গদেশের সহিত মুসলমানদের যোগাযোগ।' মা. মো. ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, পৃঃ ১০২।

২০ হাকিম হাবিবুর রহমান : আসুদগান-ই-ঢাকা। ১ম সংস্করণ, ১৯৪৬, ঢাকা, পৃঃ ৯৭।

২১ ডক্টর সুকুমার সেন : ই. বা. সা. ! ১ম সংস্করণ, ১৩৫৮, বর্ধমান সাহিত্য সভা, পৃঃ ৪৪।

২২ অধ্যাপক আহমদ শরীফ মাহীসওয়ারকে একজন আরব-ব্যবসায়ী বলিয়া মনে করেন। (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা ১৩৬৬, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১০৫)।

জীবৎকাহিনী বিজড়িত। তিনি চট্টগ্রামের বিখ্যাত পীর বদর শাহ্ এবং প্রথম চট্টগ্রাম-বিজেতা কদল খাঁ গাজীর[২৩] সমসাময়িক।

কবি মুহম্মদ খান রচিত তিনখানি কাব্যের সন্ধান জানা যায়। যথা ঃ

১। সত্যকলি বিবাদ সংবাদ ;
২। হানিফার লড়াই ;
৩। মকতুল হুসৈন ;

এতদ্ব্যতীত 'কিয়ামতনামা',[২৪] 'দজ্জালনামা',[২৫] 'কাসিমের লড়াই'[২৬] পৃথক পুস্তকরূপে প্রচারিত। মূলতঃ এই পুঁথিগুলি মূল 'মকতুল হুসৈন'-এর বিশেষ বিশেষ অংশ বা পর্ব। 'কাসিমের লড়াই' বিরাট 'মকতুল হুসৈন' কাব্যের পঞ্চম পর্ব, 'কিয়ামতনামা' একাদশ পর্ব (অন্ত্যভাগ) এবং 'দজ্জালনামা' একাদশ পর্ব (আদিভাগ)। কবি-রচিত 'হানিফার লড়াই' পুঁথিখানিকে 'মকতুল হুসৈন' কাব্যের একটি অংশ বলিয়া ভুল করিবার সম্ভাবনা আছে। 'হানিফার

২৩ কদলখাঁ গাজী একজন ঐতিহাসিক পুরুষ। চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য তিনি সম্ভবতঃ 'গাজী' আখ্যা পাইয়াছিলেন। কবি প্রথম চট্টগ্রাম-বিজেতারূপে কদল খানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শাহাবুদ্দীন তালিশের লেখা হইতে জানা যায়, প্রথম মুসলিম চট্টগ্রাম-বিজেতা বাংলার অন্যতম সুলতান ফখ্রুদ্দীন মুবারক শাহ্ (রা. কা. ১৩৩৮-৫৬)। [J.N. Sarker, sir : Studies in Mughal India, 1919, p. 122]

২৪ ৩০৩, ৩৩৭, ৩৫১, ৫০১, ৫২৬ নম্বর পুঁথি দ্রষ্টব্য। পুঁথি পরিচিতি- ঢা. বি. বাংলা বিভাগ। ১৯৫৮, পৃঃ ৭৬-৮০।

২৫ ২১৯, ৬১০, ৩২৬, ২২২, ৬১১, ৫৭৭ নং পুঁথি দ্রষ্টব্য। পু. প.। ঢা. বি. বাংলা বিভাগ ১৯৫৮, পৃঃ ২৩০-৩৭।

২৬ ২১৭ এবং ৪৬নং পুঁথি। পুঁ. প.। ঢা. বি. বা. বি. ১৯৫৮, পৃঃ ৮৭ ও ৮৯।

লড়াই' অলিদপর্বের একটি ঘটনা বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমরা আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত (রচনাকাল ১৭২৪) একখানি 'হানিফার লড়াই' পুঁথির সহিত 'মকতুল হুসৈন' কাব্যের হানিফার যুদ্ধ-সংক্রান্ত অংশ আগাগোড়া মিলাইয়া ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু ইহাদের পাঠের মধ্যে তেমন কোন সাদৃশ্য নজরে পড়ে নাই। উভয় কাব্যের বর্ণিত কাহিনীর মধ্যেও প্রচুর গড়মিল বর্তমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'হানিফার লড়াই' পুঁথিতে দেবতা-অসুর-গন্ধর্বের মর্ত্যে আগমন এবং হানিফার বীরত্বের জন্য তাহাদের প্রশংসার বর্ণনা আছে। পক্ষান্তরে, 'মকতুল হুসৈন' কাব্যের অন্তর্গত অংশে ইহা নাই। এতদ্ব্যতীত, ত্রিপুরা জেলা হইতে সংগৃহীত 'হানিফার লড়াই' কাব্যের গোড়ার দিকের অংশে বিস্তৃত বন্দনা পাওয়া যাইতেছে। অতএব, আমাদের মত 'হানিফার লড়াই' একখানি পৃথক পুঁথি। 'মকতুল হুসৈন' কাব্যের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই[২৭]। কিন্তু কেহ কেহ ভিন্ন মত পোষণ করেন[২৮]।

---

২৭ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকও এই মতের পরিপোষক। (মু. বা. সা.। ঢাকা ১৯৫৭, পৃঃ ১৮৭-৮৮)।

২৮ অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেন: 'হানিফার লড়াই' মুহম্মদ খানের স্বতন্ত্র রচনা নহে, 'মকতুল হুসৈনে'র অংশ। কাব্যের বন্দনা অংশটি প্রক্ষিপ্ত; অতএব ইহা গায়েনের সংযোজন ছাড়া আর কিছু নয় (সা. প.; ঢা বি. বা. বি., বর্ষা ১৩৬১, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১১৬)। অধ্যাপক শরীফের এই মত যে স্বকপোলকল্পিত তাহার প্রমাণ, ত্রিপুরা জেলা হইতে সংগৃহীত "হানিফার লড়াই" কাব্যের পাঠ 'মকতুল হুসৈন'-এর পাঠ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কাব্য দুইখানি সম্পূর্ণ পৃথক না হইলে তাহাদের মধ্যে পাঠগত মিল অবশ্যই থাকিত

'মকতুল হুসৈন' মুহম্মদ খানের কবিপ্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কাব্যখানি মোট ১১টি পর্বে বিভক্ত। এই পর্বগুলি নিম্নরূপ ঃ[২৯]।

আদি পর্ব	—	নাম —	ফাতিমা পর্ব
দ্বিতীয় পর্ব	—	,,	আসহাব পর্ব
তৃতীয় পর্ব	—	,,	হাসন পর্ব
চতুর্থ পর্ব	—	,,	মুসলিম পর্ব

এবং 'ছানিফার লড়াই' পুঁথির গোড়ায় এমন দীর্ঘ বন্দনা থাকিত না। এই বন্দনা কখনও গায়েনের সংযোজন হইতে পারে না, ইহা মুহম্মদ খানের নিজস্ব রচনা।

২৯ আদি পর্বে ফাতেমার বিবাহ কহিব।
তুই ভায়ের জন্ম তবে পাছে বিরচিব॥
কহিব দ্বিতীয় পর্বে শুন দিয়া মন।
চারি আছাবের কথা শাস্ত্রের নিদান॥......
কহিব তৃতীয় পর্বে হাসানের বাণী।
জয়নবকে বিবাহ করিলা মনে গুনি॥......
চতুর্থে মুসলিম পর্ব শুন দিয়া মন।......
কহিব পঞ্চম পর্বে যুদ্ধ অবশেষে।......
ষষ্ঠমে হোসন পর্ব কহিবম পাছে।......
সপ্তমেতে স্ত্রী পর্ব কহিবম পুনি।......
অষ্টমেতে দূত পর্ব শুন দিয়া মন।......
নবমে অলিদ পর্ব শুন গুণিগণ।......
দশমে এজিদ পর্ব কহিবাম এবে।......
একাদশ পর্ব তবে পশ্চাতে কহিব।
প্রলয় হইতে যত অনর্থ ফলিব॥

পঞ্চম পর্ব	—	নাম	যুদ্ধ পর্ব
ষষ্ঠ পর্ব	—	„	হুসৈন পর্ব
সপ্তম পর্ব	—	„	স্ত্রী পর্ব
অষ্টম পর্ব	—	„	দূত পর্ব
নবম পর্ব	—	„	অলীদ পর্ব
দশম পর্ব	—	„	ইয়াযীদ পর্ব
একাদশ পর্ব	—	(পরে রচিত)	অন্ত্যপর্ব

'মকতূল হুসৈন' কাব্যের পরিকল্পনা বাংলা 'মহাভারতের' (রচনাকাল ১৬৪৫) অনুরূপ। 'মহাভারতের' পর্বগুলি যেমন আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শৈল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাস, মুষল, মহাপ্রস্থান, স্বর্গারোহণ—এই অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত, তেমনি 'মকতূল হুসৈন'-এর পর্বগুলি ফাতিমা, আসহাব, হাসন, মুসলিম প্রভৃতি একাদশ পর্বে বিভক্ত। পার্থক্যের মধ্যে লক্ষণীয় যে, 'মকতূল হুসৈন' কাব্য-কাহিনীতে আগাগোড়া ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুসৃত হইয়াছে[৩০]।

মুহম্মদ খান কাব্যগুলির মধ্যে যে-বিবরণ ও তারিখ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায় যে, 'সত্যকলিবিবাদসংবাদ' বা 'যুগসংবাদ' (প্র° ১৬৩৫) রচনার পর দ্বিতীয় কাব্য 'মকতূল হুসৈন' লিখিত হয়। কবি মকতূল হুসৈন কাব্যের রচনাকাল দিয়াছেন ঃ

মুসলমানী তারিখের দশ শত ভেল।
শতের অর্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল॥

৩০ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ঃ মু. বা. সা. ১৯৫৭, পৃঃ ১২১।

হিন্দুয়ানী তারিখের শুন কহি কত।
বাণ বাহু সম অর্ধ (?) আর বাণ শত ॥
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া দধি।
পাঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি ॥

কবি কাব্য মধ্যে মুসলমানী (হিজরী) ও হিন্দুয়ানী (শকাব্দ) উভয় তারিখ (সন) উল্লেখ করিয়াছেন। কবির বর্ণনানুযায়ী মুসলমানী তারিখ দাঁড়ায় ঃ

দশ শত	(১০ × ১০০) =	১০০০
শতের অর্ধেক	(১০০ ÷ ২) =	৫০
ঋতু	৬ =	৬

১০৫৬ হিজরী অর্থাৎ ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।

হিন্দুয়ানী (শকাব্দ) তারিখ বর্ণনার ক্ষেত্রে পাঠবিকৃতি আছে বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ লিপিকরের দোষে এইরূপ হইয়াছে। কাজেই অনুমিত শুদ্ধপাঠ 'সম অর্ধ' স্থলে 'শত অব্দ' হইলে মুসলমানী তারিখের সহিত মিলিয়া যায়। অর্থাৎ

*　　*　　*　　*　　*

বাণ বাহু শত অব্দ আর বাণ শত ॥
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া দধি।

সংখ্যাবাচক শব্দগুলি অঙ্কে প্রকাশ করিলে দাঁড়ায় ঃ বাণ = ৫, বাহু = ২, দধি = ৭। সুতরাং, হিন্দুয়ানী (শকাব্দ) তারিখ ঃ

বাণ বাহু শত	৫ × ২ × ১০০ =	১০০০
বাণ শত	৫ × ১০০ =	৫০০
বিংশ তিন পূর্ণ	২০ × ৩ =	৬০
দধি	৭ =	৭

১৫৬৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ[৩০ক]।

৩০ক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯০-৯১।

অতএব দেখা গেল, 'সত্যকলিবিবাদসংবাদ' কাব্য রচনার (১৬৩৫) মাত্র দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মকতুল হুসৈন' কাব্য রচিত হয়। এই প্রকাণ্ড কাব্য রচনার পর কবি অপর কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। বিশেষতঃ, আজ পর্যন্ত 'মকতুল হুসৈন' কাব্যের পরবর্তী কোন পুঁথি আবিষ্কৃত হয় নাই। এ-কাব্য রচনার সময় কবি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'মকতুল হুসৈন' কাব্য রচনার সময়কাল ধরিয়া নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন[৩১]।

চার। শেরবাজ

মর্সীয়া সাহিত্যে মুহম্মদ খানের পরবর্তী কবিগণের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ কবি শেরবাজ ও হায়াৎ মাহ্‌মূদ। ইঁহারা দুইজনেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ। শেরবাজের 'কাশিমের লড়াই' একখানি ক্ষুদ্র পুঁথি। ইহা মুহর্‌রম-বৃত্তান্তের অংশ মাত্র অবলম্বনে লিখিত। বর্ণনীয় বিষয় গতানুগতিক। কোন নূতনত্ব নাই। 'কাশিমের লড়াই' ব্যতীত 'ফক্করনামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল' এবং 'ফাতিমার সুরতনামা'র পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কবির বাড়ি ছিল ত্রিপুরা জেলায়। তিনি ত্রিপুরার কবি[৩২]।

---

৩১ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন যে, কবি আনুমানিক ১৫৮০ হইতে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। (মু. বা. সা., ঢাকা ১৯৫৭, পৃঃ ১৯৩)।

৩২ ডক্‌টর মুহম্মদ এনামুল হক : মু. বা. সা.। ঢাকা, ১৯৫৭, পৃঃ ২৫৮-৫৯।

পাঁচ॰ হায়াৎ মাহ্‌মূদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের অন্যতম কবি হায়াৎ মাহ্‌মূদ। ইনি মুঘল আমলের শেষ কবিও বটে। বহু দিন পর্যন্ত তাঁহার জীবনকাহিনী ও কাব্যসাধনা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কিন্তু এখন অনেক তথ্য পাওয়া যাইতেছে। 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যে কবির আত্মপরিচয় আছে। এই আত্ম-পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে কবি নিজের বাড়িঘর ও বাসস্থানের সংবাদ দিয়াছেন। এই সংবাদ হইতে জানা যায় যে, রংপুর জেলার অন্তর্গত ঘোড়াঘাট সরকারের[৩৩] সুলুঙ্গা বাগত্নয়ার পরগণায় ঝাড়-বিশিলা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল শাহ্‌ কবীর উদ্দীন অথবা কবীর উদ্দীন খান। কবির পিতামহ খেতাব উদ্‌দীন এবং পিতামহের পিতা ছিলেন দোয়াখান[৩৪]। হায়াৎ মাহ্‌মূদের পিতা কবীর উদ্দীনও কবি ছিলেন এবং তিনি ঘোড়াঘাট সরকারের অধীনে দেওয়ানের কার্য করিতেন[৩৫]। সম্ভবতঃ, কবির পূর্বপুরুষ দোয়া খান (মতান্তরে দাউদ খান) আদি নিবাস পশ্চিমা-ঞ্চলের গাযীপুর জেলা হইতে সম্রাট্ আকবরের নিম্নতম কর্মচারী হিসাবে 'বারভূঁইয়া' বিদ্রোহের সময় রংপুর আগমন করেন এবং

---

৩৩ ঘোড়াঘাট সরকার পূর্বে ছিল রংপুর জেলার অন্তর্গত। বর্তমানে ইহা দিনাজপুরের অধীন। কিন্তু ঝাড়বিশিলা গ্রাম ও বাগত্নয়ার পরগণা বর্তমানে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত। ঘোড়াঘাট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সম্রাট আক্‌বরের সময়ে এখান হইতে ৫০ গজারোহী, ৯০০ অশ্বারোহী ও ৩২৬০০ পদাতিক সৈন্য সংগৃহীত হইত (F. Gladwin's Aynee-I-Akbari. Vol II, part II, 1783; p. 466)।

৩৪ ডক্টর মুযহারুল ইসলাম: কবি হেয়াত মামুদ, রাজশাহী, ১৯৬১, পৃঃ ৭-৮

৩৫ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক: মু. বা. সা.। ঢাকা ১৯৫৭, পৃঃ ২২৯।

ঘোড়াঘাট সরকারের ঝাড়বিশিলাগ্রামে স্থায়ী বাসিন্দারূপে বাস করিতে থাকেন। তৎকালে ঘোড়াঘাট ছিল শিক্ষাদীক্ষা ও ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র। ঝাড়বিশিলাও ছিল সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল। এই ঘোড়াঘাটেই কবি শিক্ষালাভ করেন। তিনি ঘোড়াঘাট ব্যতীত অন্য কোথাও যান নাই বলিয়া শহর-বন্দরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন নাই[৩৬]। কাজেই, তাঁহার কাব্যে বৈচিত্র্যের অভাব বিশেষ-ভাবে নজরে পড়ে[৩৭]। বাগদুয়ার পরগণায় হায়াৎ মাহ্‌মূদের পূর্বপুরুষের একটি বিরাট তালুক ছিল। তাঁহাদের অবহেলায় ইহা তদানীন্তন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। পরে কবি হায়াৎ মাহমূদ বাজেয়াপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করিতে যাইয়া ব্যর্থ হন বটে; কিন্তু কার্যীপদে নিযুক্ত হন। কবি সাংসারিক চিন্তার হাত হইতে রেহাই পাইয়া কবিতা ও কাব্য রচনায় যত্নশীল হন[৩৮]।

'জারীজঙ্গনামা' কবির প্রথম রচনা[৩৯]। কাব্যখানি মূলতঃ একখানি ফারসী কাব্যের অনুসরণে রচিত। কবি কাব্যখানি রচনা

---

৩৬ মোহাম্মদ মেহ্‌রাব আলী বলেন যে, হায়াৎ মাহমূদ মাহীগঞ্জে বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তদীয় অনুজ শৈখ জামাল সহ উচ্চশিক্ষা লাভার্থে দিল্লী যান। সেখানে তিনি অল্পকালের মধ্যে আরবী, ফারসী ও উরদূ ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন (নওরোজ। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৬৩, ১৫শ বর্ষ, পৃঃ ৫১-৫২)। মেহরাব আলীর পরিবেশিত এ-তথ্যের পশ্চাতে কতখানি সত্য আছে, তদ্বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই। সুতরাং, তাঁহার মত গ্রহণযোগ্য নহে।

৩৭ ডক্টর মুযহারুল ইসলাম: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬।

৩৮ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬-১৭।

৩৯ শ্যামাপদ বাগচী ভ্রমবশতঃ 'জারীজঙ্গনামা' ও 'মুহর্রম পর্ব' নামক দুইখানি স্বতন্ত্র পুঁথির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (ব. সা. প. প.-১৩৩৭, ১-৪ সংখ্যা, পৃঃ ৩১-৩৮)। প্রকৃতপক্ষে কবি এই দুই নামে দুইখানি পৃথক পুঁথি রচনা করেন নাই।

করিয়াছেন ১১৩০ সালে (১৭২৩ খ্রীঃ)[৪০]। তিনি কাব্য-রচনার তারিখ দিয়াছেন ঃ

'শকআব্দ প্রগণাতি যাহে বিরচিনু পুঁথি
সন এগার শ ত্রিশ সাল ;
হেয়াত মামুদ বলে মোহাম্মদের পদতলে
মোকে দয়া কর সর্বকাল।'

হায়াৎ মাহমূদ 'জারীজঙ্গনামা'র সূচনায় প্রথমে আল্লাহ্, এবং পরে হযরত রসূল ও তদীয় কন্যা বীবী ফাতিমার মহিমা বন্দনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তারপরেই তিনি এ-কাব্য রচনার উপলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

পড়িনু শুনিনু ভাই আরবী ফারসী।
ইমামের কথা শুনি দুঃখ মনে বাসী ॥
যতেক শুনিনু মুঞি পুস্তক বয়াতে।
কথো আছে কথো নাহি কিতাবের মতে ॥
নাহি জানে আত্মকথা নাহি পায় তত্ত্ব।
পচাল পাড়িয়া মিথ্যা ফিরয়ে সতত ॥
তাহা শুনি মনে মোর দ্বিধা সর্বক্ষণ।
রচিনু পুস্তক তবে জানিতে কারণ ॥

বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের ধারায় মুহম্মদ খানের 'মকতূল হুসৈন' কাব্যের পরে হায়াৎ মাহমূদের 'জারীজঙ্গনামা' পূর্ণ কাব্য। এ-কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য, প্রতিপর্বের প্রারম্ভে এক একটি ধুয়ার সংযোজন[৪১]।

৪০ ডক্টর মুযহারুল ইসলাম ঃ পূর্বোক্ত পৃঃ ৭৮, ৮৫-৮৬ ও ১১০।

৪১ দুই একটি ধুয়া উদ্ধৃত করা গেল ঃ

ক. হায় হায় হায় আল্লা সুকুর হাজার।
কে কহিতে পারে আল্লা মহিমা তোমার ॥

'জারীজঙ্গনামা' ব্যতীত হায়াৎ মাহমুদ 'চিত্তউত্থান' (বাং ১১৩৯), 'হিতজ্ঞানবাণী' (বাং ১১৬০), এবং 'আম্বিয়াবাণী' (বাং ১১৬৫) প্রণয়ন করেন। 'আম্বিয়াবাণী'ই কবির সর্বশেষ কাব্য। 'হিতজ্ঞানবাণী' রচনার সময়ই কবি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরবর্তী কাব্য রচনাকালে কবি কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলেন। তিনি কাব্য সমাপ্ত না করিয়া ছেদ টানিয়াছিলেন। কিছুকাল পরেই তিনি মারা যান।

হায়াৎ মাহমুদের জীবৎকাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন সন তারিখ নিরূপিত হয় নাই। তবে তাঁহার কাব্য রচনার তারিখ দৃষ্টে মনে হয়, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে আবির্ভূত হন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত (১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক বৎসর পরে) জীবিত ছিলেন [৪২]।

খ. হায় হায় ভাই নিবেদন আমি পাই
আশীর্বাদ করহ আমার।

গ. আরে ও জয়নাল রে
বদহালে কেন কান্দ কুফার মাঝে,
হায় হায় ফকির বেশে তোমার চাচা আইয়াছে তল্লাশে
রাত পোহালে ফজর হৈলে লয়া যাবে দেশে
জয়নাল রে।

৪২ ডক্টর মুযহারুল ইসলাম কবির 'জারীজঙ্গনামা' রচনার সময় ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, এই সময় কবির বয়স ২৮ হইতে ৩৮ বৎসর ধরিলে তিনি ১৬৫৮ হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (কবি হেয়াত মামুদ। রাজশাহী, ১৯৬১, পৃঃ ১)

ছয়. জাফর।

হায়াৎ মাহমূদের পর জাফর নামক এক অজ্ঞাতনামা কবি-রচিত 'শহীদ-ই-কারবালা' ও 'সখিনা বিলাপ' নামক দুইখানি খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে[৪৩]। পুঁথি দুইখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু পুস্তকাকারে একসঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ। ইহাতে বৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্ট। কাব্য দুইখানি পড়িলে মনে হয়, কবি জাফর স্বাভাবিক কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। পাণ্ডুলিপি দুইখানির আখ্যায়িকা পাঠে জানা যায় যে, 'শহীদ-ই-কারবালা' পুঁথির আকার আরও বড় ছিল।

কারবালা যুদ্ধে ইমাম হুসৈনের শাহাদৎ ও তদীয় জননী বীবী ফাতিমার বিলাপ-কাহিনী খণ্ডিত প্রথম পুঁথিতে এবং কাসেম-সখিনার বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদজনিত করুণ-কাহিনী দ্বিতীয় ক্ষুদ্র পুঁথিতে বর্ণিত হইয়াছে। পুঁথির মধ্যে কবি-পরিচিতি অথবা কাব্যের রচনাকাল পাওয়া যায় নাই। কাব্যের আদ্যাংশে কবি-পরিচিতি ছিল কিনা পত্রগুলি হারাইয়া যাওয়ায় তাহা জানিবার উপায় নাই। সুতরাং, কাব্যখানির রচনা-কাল সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে লিপির প্রাচীনত্ব এবং ভাষা ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে[৪৪]।

---

৪৩ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সংগৃহীত এই পুঁথিখানি (নং ৬১৫) বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর পুঁথিশালায় সংরক্ষিত আছে।

৪৪ লিপির প্রাচীনত্ব : লিপিকরের হস্তাক্ষর সুন্দর ; কাজেই অক্ষরগুলির বৈশিষ্ট্য সুন্দররূপে ধরা পড়িয়াছে। যেমন : 'উ'-কার (ু) য-ফলার মত; 'ল' ও 'ন' একই আকৃতির। 'র'-এর নিচে বিন্দু (.) নাই; শুধু 'ব'-এর মাঝখানে একটি টান দিয়া 'র' অক্ষর চিহ্নিত। 'খ'

বাংলা ভাষা ও লিপির এই বৈশিষ্ট্য প্রায় দেড়শত পৌনে দুইশত বৎসর পূর্বের। ইহাতে অনুমান করি, পুঁথিখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং তৎপরে লিপিকর কর্তৃক অনুলিখিত হয়। এই হিসাবে কবি জাফর অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন[৪৫]।

সাত. হামিদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের ধারায় আর একজন নূতন কবির সন্ধান মিলিতেছে। এই কবির নাম হামিদ। মধ্যযুগের বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যে মুহম্মদ খান, হায়াৎ মাহমূদ প্রমুখ কবির ন্যায় কবি হামিদের রচনাও যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তৎরচিত 'সংগ্রাম হুসন'[৪৬] কাব্যখানি পাঠের পর এ-সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না।

স্থানে 'জ'-এর এবং 'য়া' স্থলে 'আ'-এর ব্যবহার। 'ড়' স্থানে 'র'-এর এবং 'চ'-এর নিচে 'Λ' চিহ্ন দিয়া 'ছ' অক্ষর লিখিত। 'তু' স্থলে 'ত্ত', 'মু' স্থলে 'ক্ষ' আছে। যুক্তাক্ষরের উপরে রেফের ন্যায় (⁄) টান দেওয়া। 'ভু' অক্ষর পুরানো লিপিতে লিখিত। দীর্ঘ ঈ-কার (ী)-এর ব্যবহার কম দেখা যায়। 'কু', 'ঙ্গ' ও 'দ্ধ' দেখিতে অনেকটা একপ্রকার।

৪৫ অধ্যাপক আহমদ শরীফ এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। (পুঁথি-পরিচিতি : ঢা-বি-বা-বি কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৫৮, পৃঃ ৫১৫)

৪৬ বাংলা একাডেমীর (ঢাকা) পুঁথিশালায় পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত আছে। একাডেমীর সৌজন্যে আমি এই মূল্যবান পুঁথিখানি পড়িবার সুযোগ লাভ করি। পুঁথিখানি পুরাতন তুলোট কাগজে লেখা। হস্তাক্ষর সুন্দর। সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ হইতে সংগৃহীত। পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ১০২ ; প্রতি দুই পৃষ্ঠায় এক পৃষ্ঠা ধরা হইয়াছে। পুঁথির সাইজ ৯½″ × ৩½″ ; লিপিকর শ্রী আছে খাঁ। রচনাকাল সন ১১৪৭ সাল (পুঁথির পৃষ্ঠা ১০২)। পুঁথিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর লিপি-বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

'সংগ্রাম-হুসন' কাব্যের ৩৪ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

আপাততঃ কবি হামিদের এই একখানি কাব্যই পাওয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে তাঁহার অন্য কাব্য-রচনার প্রমাণ হয়ত পাওয়া যাইবে। 'সংগ্রাম হুসন' কাব্যখানি প্রায় সোয়া দুই শত বছরের পুরাতন। বাংলা ১১৪৭ সালে (১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ) কাব্যখানির অনুলিপি হইয়াছিল। পুঁথিখানির প্রথম চারিখানি পৃষ্ঠা অপাঠ্য। কাব্যখানিতে কবি নিজের ভণিতা, পুঁথির নাম এবং যাঁহার আদেশে বা নির্দেশে ইহা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহার নাম একাধিক বার একাধিকস্থলে উল্লেখ করিয়াছিলেন। কবি বলিয়াছেন ঃ

১. সাহা তামাছের চরণ প্রসাদে।
তাহান আজ্ঞায় তবে কহএ হামিদে॥
মুক্তাল হুসন এক কিতাব আছিল।
বাঙ্গালা করিতে তবে তান আজ্ঞা দিল॥
প্রচার করিলু মুই রচিয়া পয়ার।
সংগ্রাম হুসন নাম রাখিলু ইহার॥

(পাণ্ডুলিপির পৃঃ ৩৪).

২. সাহা তামাছের পায়ের রেণু মাথে লৈআ।
সংগ্রাম হুসন কৈলু তান আজ্ঞা পাইয়া॥
তাহান আদেশে কৈলু পাঁচালী পয়ার।
সেবকের শক্তি কিবা আজ্ঞা লঙ্ঘিবার॥
গুণিগণে ক্ষমিবাএ দোস থাকে যথা।
মুই এর অঙ্গকথা কহিলু সর্বথা॥ (ঐ পৃঃ ২২)

৩. নারীগণে মহাতম কৈলা অতিশএ।
কি কহিমু যতেক কান্দিলা সে সমএ॥
সাহা তামাছের চরণ বন্দি অতিশএ।
বিনয় করিয়া হেন হামিদে কহএ॥

তান আজ্ঞা পাইয়া তান চরণ প্রসাদে।
সংগ্রাম হুসন নাম মধুর শবদে॥ (পৃঃ ৭২)

৪. হামিদ জানহ নাম শান্তিত তাহান॥
সেই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
ফারসী ভাঙ্গিয়া মুর্খে সুখে বুঝিবার॥
সাহা তামাছ মহাশএ চরণের ধূলি।
তাহ্ণ কারণ হেতু শিরে লয় তুলি॥ (পৃঃ ৯)

৫. সাহা তামাছের চরণ মাথে লৈয়া।
সংগ্রাম হুসন কৈলু তান আজ্ঞা পাইআ॥
বাঁচাইতে শ্রদ্ধা মোর না ছিলু বিশেষ।
বিস্তর করিলু মুই সাহার আদেশ॥ (পৃঃ ১৫)

উপরে উৎকলিত উদ্ধৃতিগুলির রেখাঙ্কিত শব্দগুলি দ্বারা কবি ও কাব্য সম্পর্কে মোটামুটি পরিচয় জানা যাইতেছে। কবির ব্যক্তিগত পরিচয় এবং বাসস্থানের সংবাদ এই পাণ্ডুলিপি মারফত কিছু পাওয়া যায় না। তবে, হামিদ এ-কথা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, তিনি ফারসী 'মুক্তাল হুসন' (মকতুল হুসৈন) কাব্যের অনুসরণে এই বাংলা কাব্যখানি রচনা করেন এবং কাব্যের নামকরণ করেন 'সংগ্রাম হুসন'। কবি একাধিক বার 'সাহা তামাছ'-এর নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। কবির বর্ণনানুসারে দেখা যায়, তিনি ছিলেন সাহা তামাছের স্নেহের পাত্র। কবি-বর্ণিত এই সাহা তামাছের আদেশেই তিনি এ-কাব্য প্রণয়ন করেন। এখন প্রশ্ন হইল এই যে, কবির উল্লিখিত 'সাহা তামাছ' কে? তিনি কি তৎকালীন সিলেট অঞ্চলের [সে সময়ে সিলেট আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল] কোন পীর-দরবেশ? মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এ-দৃষ্টান্ত সুলভ যে, বহু কবি তদীয় পীর-মুর্শিদের আদেশে বা

'সংগ্রাম-হুসন' কাব্যের ৩৫ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

নির্দেশে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই হিসাবে কবি হামিদ তদীয় পীর-মুর্শিদের আদেশে কাব্য রচনা করিলেও করিতে পারেন। তিনি কাব্য-মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় কোথাও এমন কিছু ইঙ্গিত করেন নাই, যাহার সাহায্যে 'সাহা তামাছ' সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কবি তাঁহার কাব্যের কোন কোন স্থলে এমন সব ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা হইতে ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 'সাহা তামাছ' কবি হামিদের মুর্শিদ বা পীর। নিম্নলিখিত পংক্তি সমূহের রেখাঙ্কিত অংশগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ক. সাহা তামাছ মহাশএ চরণের ধূলি।
তারণ কারণ হেতু শিরে লম তুলি॥ (পৃঃ ৯)

খ. সাহা তামাছের চরণ মাথে লৈয়া।
সংগ্রাম হুসন কৈলু তান আজ্ঞা পাইয়া॥ (পৃঃ ৩)

গ. সাহা তামাছের পায়ের রেণু মাথে লৈয়া
সংগ্রাম হুসন কৈলু তান আজ্ঞা পাইয়া॥ (পৃঃ ৩৪)
....
সেবকের শক্তি কিবা আজ্ঞা লঙ্ঘিবার॥

ঘ. সাহা তামাছ মএশএ হামিদ সেবক হএ
করুণাএ কহে সেই কথা। (৫১)

ঙ. সাহা তামাছের চরণ বন্দি অতিশয়।
বিনয় করিয়া হেন হামিদে কহএ॥ (৭২)

চ. শিরে বন্দি সাহা তামাছের চরণ। (৮৩)

ছ. সাহা তামাছের চরণ প্রসাদে। (৩৪)

উপরোদ্ধৃত 'চরণের ধূলি', 'তারণ কারণ হেতু', 'চরণ মাথে লৈয়া,' 'পায়ের রেণু মাথে লৈয়া,' 'সেবকের শক্তি কিবা আজ্ঞা

লজ্ঘিবার,' 'হামিদ সেবক হএ,' 'চরণ বন্দি অতিশয়,' 'শিরে বন্দি সাহা তামাছের চরণ,' এবং 'তামাছের চরণ প্রসাদে' উক্তিগুলি কবির ভক্তিভাজন পীর-মুর্শিদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। মুর্শিদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবশতই কবি এই সব বিনয়সূচক উক্তি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

আসাম ও বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মুঘল আমলে 'শাহ্ তামাছ' নামক কোন শাসক বা সুবাদার এই দুই প্রদেশে রাজত্ব করেন নাই। তবে, মুঘল আমলে ভারতের বাহিরে সুদূর পারস্যে সাফাবী বংশীয় ২য় শাসকের নাম ছিল শাহ্ তাহ্মাস্প (রা° কা° ১৫২৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি ছিলেন গোঁড়া শী'য়া। তিনি ইমাম হুসৈনের শাহাদৎ এবং কারবালা যুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়াদি লইয়া কাব্য রচনা করিবার জন্য তাঁহার সভাকবিদের সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। তাছাড়া, তিনি ভারতের দাক্ষিণাত্যের বীজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজন্যবর্গকেও শী'য়া মত প্রচার ও শী'য়া আদর্শ-বিস্তার মানসে নানা উপঢৌকনাদি পাঠাইতেন[৪৭]। বাদশাহ্ তাহ্মাস্প-এর বিদ্যোৎসাহে কারবালা বিষয়ে কবিতা লেখা হইত এবং সে কবিতা মুহর্রম অনুষ্ঠানে পাঠ করা হইত। তবে ঈরাণের বাদশাহ্ বাংলা দেশের (তদানীন্তন আসাম) কবি হামিদকে ফারসী 'মুক্তাল হুসন' ('মকতুল হুসৈন') অবলম্বনে বাংলা 'সংগ্রাম হুসন' রচনা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন কি না চিন্তার বিষয়। এতৎভিন্ন, তদানীন্তন আসামের সিলেট অঞ্চলের এক বাঙালী কবির সঙ্গে ঈরাণের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বাদশাহ্, শাহ তাহ্মাস্পের দেখা-সাক্ষাৎ কি ভাবেইবা সম্ভবপর হইতে পারে? যাহা হউক, সাহা তামাছের

---

৪৭ M. T. Titus: R. Q. I, Oxford Uuiversity press, 1930. p. 86.

'সংগ্রাম-হুসন' কাব্যের শেষ পৃষ্ঠার (১০২) প্রতিলিপি।

কথা কবি হামিদ এতবার এত বেশী করিয়া বলিয়াছেন যে, তৎসম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিতরূপে বলা চলে না। ভবিষ্যতে তাঁহার অপর কোন কাব্য আবিষ্কৃত হইলে তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব[৪৮]।

বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচিত কবিগণের রচিত মর্সীয়া কাব্যগুলি ছাড়াও আরও কতকগুলি কাব্যের ছিন্নাংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে[৪৯]। এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত পত্রগুলি যে কতকগুলি মূল পুঁথির অংশ ছিল পত্রগুলি পাঠে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই পুঁথিগুলি কখন ও কাহাদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল জানিবার উপায় নাই। তবে, এগুলির অধিকাংশই বেশ পুরাতন। মর্সীয়া সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এই বিচ্ছিন্ন পত্রগুলি নিম্নলিখিত নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি-ভবনে তালিকাভুক্ত আছে।

ক।	সখিনার চৌতিশা	৬ খানি পত্র,	লেখক-অজ্ঞাত,	পুঁথির নং	২১৮
খ।	সখিনা বিলাপ	১০ ,,	,,	,,	৩
গ।	সখিনার বারমাস	১ ,,	,,	,,	৫১৫
ঘ।	মর্সীয়া	৩২ ,, এলোমেলো এবং অসংলগ্ন	,,	,,	৫৩৭
ঙ।	সখিনা বিলাপ	২ ,,	,,	,,	১৬৪
চ।	সখিনার চৌতিশা	৪ ,,	,,	,,	৪১৪
ছ।	জয়নব বিলাপ	২ ,,	,,	,,	৫১৬

পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইংরেজ আমলে রচিত কাব্যগুলির ঐতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে।

---

৪৮ 'কবি হামিদ' সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য মৎ কর্তৃক লিখিত 'বাংলা একাডেমী পত্রিকায়' (ষষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৯, পৃঃ ১১২-১২৪) দ্রষ্টব্য।

৪৯ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সংগৃহীত এই পুঁথিগুলি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি ভবনে সংরক্ষিত আছে।

২। ইংরেজ আমল
(১৭৫৭-১৯৪৭)

এক. ফকীর গরীবুল্লাহ্

ফকীর গরীবুল্লাহ্ মুসলমানী বাংলায় প্রথম 'জঙ্গনামা' কাব্য রচনা করেন। তাঁহার পূর্বে এই নূতন ধারায় আর কোন কবি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা' (মুহম্মদ ইয়াকুবের নামে বাজারে বহুল প্রচলিত) অত্যন্ত জনপ্রিয় কাব্য। ইংরেজ আমলে রচিত মর্সীয়া কাব্যগুলির মধ্যে তৎরচিত 'জঙ্গনামা' প্রথম কাব্য। এ যুগের মর্সীয়া কাব্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

ফকীর গরীবুল্লাহ্ স্বীয় কাব্যগুলির মধ্যে নিজের পরিচয় এবং বাড়িঘরের যে-খবর দিয়াছেন তাহা পর্যাপ্ত নহে। অধিকাংশ কাব্যের মধ্যে তিনি কাব্য রচনার সময়কাল দেন নাই; ফলে তাঁহার ব্যক্তিগত খবরাখবর সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। তাঁহার শিষ্য ও উত্তর সাধক সৈয়্যিদ হামযার বর্ণিত অংশ হইতেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। গরীবুল্লাহ্ ও সৈয়্যিদ হামযার বিভিন্ন কাব্যে বর্ণিত কতকগুলি বিক্ষিপ্ত অংশ[১] হইতে জানা যায় যে, ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র পিতার নাম শাহ্ দুন্দি। শাহ্ দুন্দি ছিলেন 'আল্লাহ্‌র ফকির' অর্থাৎ

---

১ ক. আল্লার মকবুল শাহা গরীবুল্লা নাম।
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম॥
আছিল রওশন দেল শায়েরি জবান।
যাহাকে মদদ গাজী শাহা বড় খান॥
(আমীর হামযা : সৈয়্যিদ হামযা)

আল্লাহ্‌র পথে সমর্পিতপ্রাণ দরবেশ। কবি, শাহ্ দুন্দির জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। পিতার দেখাদেখি পুত্রও আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন; ফলে তিনি নিজকে 'ফকির' আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। তাঁহার শিষ্যের (সৈয়্যিদ হামযার) উক্তি 'রওশন দেল' অর্থে বুঝা যায়, গরীবুল্লাহ্ তাসাউফের পথে জ্ঞানালোকমণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার পিতার নামের পূর্বে ব্যবহৃত 'শাহ্' উক্তি হইতেও একথা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। যতদূর মনে হয়, কবির বংশ পীর-ফকীরের বংশ। সম্ভবতঃ এই জন্যই সৈয়্যিদ হামযা তদীয় মুর্শিদের পরিচয় জ্ঞাপনার্থে গভীর অর্থোদ্যোতক 'আল্লার মকবুল' উক্তি উচ্চারণ করিয়াছেন।

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ হুগলী জেলার (তদানীন্তন কালের বর্ধমান জেলা) বালিয়া পরগণার অন্তর্গত হাফিযপুর গ্রামে (বর্তমানে ডাকঘর পাতিহালের অন্তর্গত) জন্মগ্রহণ করেন; এবং সেখানেই তিনি বসবাস করেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, তাঁহার

খ. অধীন ফকির কহে আল্লা ধেয়াইয়া ॥
বাপ নাম শাহা দুন্দি আল্লার ফকির।
ভাটির সুলতান গাজী বড় খান পীর ॥

(জঙ্গনামা : গরীবুল্লাহ্)

গ. বড় খান হুকুম দিলে অধীন ফকির বলে
কেতাবের বয়ান সবায় ॥

ঘ. আমীর আরবে চলে গরীব ফকির বলে
শাহা দুন্দির পহেলা ফরজন্দ ॥

(আমীর হামযা-১ম বালাম : গরীবুল্লাহ)

কবর হাফিযপুরের নিকটবর্তী হাটনৈকুলি গ্রামে বিদ্যমান আছে[২]। কবির লেখাপড়া এবং সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে তিনি যে স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং ফারসী-উরদূ-হিন্দী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কাব্যের ভাষাদৃষ্টে এ-কথা বলিবার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। সৈয়্যিদ হামযার লিখিত 'শায়েরী জবান' উক্তি হইতেও গরীবুল্লাহ্‌র কবিত্বশক্তি সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কবি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে পীর বড় খাঁ গাজী ও জাফর খাঁ গাজীর নাম 'জঙ্গনামা'-য় উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি পীর বড় খাঁ গাজীর হুকুমে (স্বপ্নে?) কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। বড় খাঁ গাজী ছিলেন তাঁহার উৎসাহদাতা। গাজীর এই মহৎ প্রেরণাই তাঁহার কাব্য সাধনার মূল উৎস।

অদ্যাবধি ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র রচিত পাঁচ খানি পুঁথির সন্ধান জানা গিয়াছে। যথা:

ক। সোনাভান খ। আমীর হামযা (১ম বালাম)
গ। ইউসুফ জোলেখা ঘ। জঙ্গনামা ঙ। সত্যপীর।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ উপরোক্ত পাঁচখানি কাব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন[৩]। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কবির তিনখানি কাব্যের কথা বলিয়াছেন, এবং 'সোনাভান' কাব্যখানি সৈয়্যিদ হামযার রচনা বলিয়া তিনি মনে করেন (মু. বা. সা., ১ম সংস্করণ ১৯৫৭, ঢাকা, পৃঃ ২৯৪)। কিন্তু হামযা নিজে তাঁহার সর্বশেষ কাব্য 'হাতেম

২ 'পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি গরীবুল্লাহ্‌': মোহাম্মদী ১৩৬১ কার্তিক, ২৬শ বর্ষ, পৃঃ ২৬।

৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭-২৯,

তাই'-এর উপসংহারে নিজের রচনাগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

আছিনু বসন্তপুরে মঙ্গনদ্দি মোল্লার ডেরে
সেইখানে করিনু যতন ॥
কেচ্ছা মধু মালতীর জঙ্গনামা আমীরের
জৈগুন পুঁথি লিখেছিনু আগে।
আল্লাতালা ভাল করে যাহার খাহেস পরে
হাতেম লিখিনু শেষভাগে ॥

। হাতেম তাই ।

ইহাতে প্রমাণিত হয়, 'সোনাভান' সৈয়িদ হামযার রচিত নহে। ইহা ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র ঃ কারণ কাব্যমধ্যে 'গরীব রচিল পুঁথি ফাতেমার পায়' বা 'অধীন ফকীর বলে রছুলের পদতলে' ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। আরও স্পষ্ট উক্তি আছে। 'সোনাভান' পুঁথির সর্বশেষে গরীবুল্লাহ্‌ লিখিয়াছেন ঃ

১১২৭ সালে বাংলা মাঘ মাসে।
সোমবারের বাদ আছর ফকিরেতে ভাষে ॥*

। সোনাভান ।

'সোনাভান' রচনার তারিখ বাংলা ১১২৭ সাল অর্থাৎ ১৭২০ খ্রীঃ। কিন্তু সৈয়্যিদ হামযার জন্ম হয় বাং ১১৪০ সালে (১৭৩৩ খ্রীঃ)। সৈয়্যিদ হামযা 'হাতেমতাই' লিখিয়া শেষ করেন ঃ

একশত একুশ লিখে তার পিঠে শূন্য রাখে
সনের ঠিকানা পাবে তায়।

---

* শাহ্‌ গরীবুল্লাহ্‌ ঃ ছহি বড় সোনাভান। বটতলার ছাপানো এই পুঁথিখানি পুরাতন। ইহার টাইটেল পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় জানা যায় না যে, ইহা কোন্‌ প্রেস হইতে ছাপা হইয়াছিল। প্রকাশিত বাং ১৩৩০ (?)।

এবং মুন্‌শী ফকীর মুহম্মদ ঃ ছহি বড় সোনাভান। হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, প্রকাশিত ১/৫/৫৪ ইং।

অর্থাৎ বাং ১২১০ (১৮০৩ খ্রীঃ)। এই সময় হামযার বয়স ছিল ৭০ বৎসর ; (একস্থানে হামযা লিখিয়াছেন ঃ

নহে ত এমন কালে, কে কোথা কবিতা বলে
সত্তর সন বয়স যাহার।)

সুতরাং, হামযার জন্ম হয় (১২১০-৭০) = ১১৪০ সালে। 'সোনা-ভান' পুঁথি বাং ১১২৭ সালে রচিত হইলে ইহা হামযার রচনা হইতে পারে না।

ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র সর্ববাদীসম্মত জীবৎকাল নির্ণীত হয় নাই। কবি নিজে স্পষ্ট করিয়া এ সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ মনে করেন, কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন[৪]। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতানুসারে, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন[৫]। ডক্টর সুকুমার সেন কবির কোন সময়কাল নিরূপণ করেন নাই[৬]। ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র জীবৎকাল নিরূপণ করিতে হইলে কাব্যোল্লিখিত কয়েকটি বৃত্তান্ত এবং তারিখের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। কবি-রচিত কাব্যগুলি লইয়া আরও একটা সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। তিনি মোট কয়খানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা লইয়াও পণ্ডিত মহলে মতভেদ বর্তমান। কারণ, গরীবুল্লাহ্‌ রচিত অধিকাংশ পুঁথিই প্রকাশকগণের কারসাজীর ফলে বাজারে অপরের নামে প্রচলিত।

---

৪ 'পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি গরীবুল্লাহ্‌'। মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৬১, ২৬শ বর্ষ, পৃঃ ২৬।

৫ মু. বা. সা.। ঢাকা, ১৯৫৭, পৃঃ ২২৪।

৬ তিনি বলেন ঃ এঁর জীবৎকাল জানা নেই। (ই. বা. সা., বর্ধমান সাহিত্যসভা, প্রকাশিত বাং ১৩৫৮, পৃঃ ১০৭) তবে তিনি কবির

বল আমি বিয়া করি কারে * মল্লিকা ডাকিয়া কহে সমর্ত্তভানেরে ॥ যার তরে এত দুঃখ খুন কৈলে তারে * স্বামী যে আশক হয়ে লড়ে বারে বার ॥ মাশুকে মারিলে তার হবে গোণাগার * মল্লিকার কথা শুনে হুসিয়ার হইল ॥ সোনাভানের তরে তবে কহিতে লাগিল * কি হইবে সোনাভান কহ গো আমারে ॥ স্বামী যে আশক আছে তোমার উপরে খুসী হালে হও যদি স্বামীর পিয়ারী ॥ তবেত তোমার তরে নাহি আমি মারি * সোনাভান বলে বিবী কহি যে তোমায় ॥ ইছলামী কালেমা এবে পড়াও আমায় * কালেমা পড়িয়া আমি দাসী হয়ে রব ॥ তোমাদের সাথে আমি মদীনাতে যাব * একথা শুনিয়া সবে খোসাল হইল ॥ হানিফার কাছে সবে যাইয়া কহিল * শুন ২ পাহালওয়ান মোবারক বাদি ॥ সোনাভান রাজি আছে দিব তোমায় সাদী * হানিফা কহেন শুন সমর্ত্তভান বিবী ॥ সোনাভানের পাশে বস দেখা যাক খুবি * বাঘের মতন চোখ আড়ে ২ চায় ॥ সোনাভানে দেখে মোর প্রাণ উড়ে যায় * একথা শুনিয়া তারা উঠিল হাসিয়া ॥ সোনাভানের চারিদিকে বসিল ঘিরিয়া তিন বিবী আরজ করে হাত উঠাইয়া ॥ হুজুরের কাজি আল্লা দেহ পাঠাইয়া * কবুল হইল দোওয়া আল্লার দরগায় ॥ হানিফার সাদী দিতে ফেরেস্তা পাঠায় * আশা হাতে খেলকা গায় আইল এক জন ॥ হানিফার কাছে এসে দিল দরশন * ফকির ভাবিয়া হানিফা ছালাম জানায় ॥ দোওয়া করে জিব্রাইল হাত দিয়া গায় * ফকিরের আগে মর্দ্দ কহে তাকাইয়া ॥ আপনি আমার সাদী দেন পড়াইয়া * একথা শুনিয়া পীর কালেমা পড়ায় ॥ বুড়িকে ডাকিয়া মর্দ্দ এইবাত কয় * বাদশাই করহ বুড়ি তক্ত পরে বসে ॥ আমরা চলিয়া যাই আপনার দেশে * সোনাভানে নিয়া সবে করিল গমন ॥ মদীনা সহরে গিয়া দিল দরশন * আল্লা ২ বল ভাই যত মোমিন-গণ । তামাম হইল পুথি শুন সর্ব্বজন * ১১২৭ সালে বাংলা মাঘ মাসে ॥ সোমবারের বাদ আছর ফকিরেতে ভাষে খতম হইল পুথি আর কিছু নাই ॥ আকবত খায়ের করে দোওয়া কর ভাই আল্লা২ বল ভাই সব মোমিনগণ ॥ মোহাম্মদ হানিফার জঙ্গ হইল খতম *

[সমাপ্ত]

প্রিন্টার—এম, আজিজুর রহমান চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।
হামিদিয়া প্রেস, ৫০ হরনাথ ঘোষ রোড ঢাকা।

ছাপানো 'ছহি বড় সোনাভান' পুঁথির শেষ-পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

কবির জীবৎকাল সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে আমাদিগকে পূর্ববর্ণিত 'সোনাভান' কাব্যোদ্ধৃত '১১২৭ সালে বাংলা মাঘ মাসে' তারিখটির উপর নির্ভর করিতে হয়। বাংলা ১১২৭ সাল অর্থাৎ ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ যখন 'সোনাভান' পুঁথির রচনাকাল, তখন কবি নিশ্চয়ই অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ হইবেন।

তাহাছাড়া, 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের উপসংহারে প্রদত্ত কয়েকটি পংক্তি[৭] বিশ্লেষণ করিয়া ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এ-কাব্যের রচনাকাল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে হওয়া সম্ভব[৮]। ডক্টর সাহেবের মতে বাঙ্গালাদেশ তখনও দিল্লীর বাদশাহ্র অধীনে ছিল এবং কাব্যাংশে মুর্শিদাবাদের নওয়াব নাযিম (বাদশাহ্র উযির) এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (রাজার দেওয়ান) সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে[৯]। ১৭৬০-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীর কাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব ইংরেজ বণিকগণকে

'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের উপসংহারে লিখিত কয়েকটি অংশ বিচার করিয়া মনে করেন যে, সম্ভবতঃ কাব্য-সমাপ্তির কালে বাংলা দেশে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। (ই. বা. সা., বাং ১৩৫৮, পৃঃ ১০৭)।

৭ পংক্তিগুলি নিম্নরূপ ঃ

আল্লাতালা ছালামতে রাখিবে বাদশারে।
ছহি ছালামতে রাখ বাদশার উজিরে॥
বজায় ছালামত রাখ রাজার দেওয়ানে।
সিকদার চোপদার ইজারদার জনে॥
গরীব ফকির কহে কেতাবের বাত।
লায়েকের তরে আল্লা বাড়াও হায়াত॥

৮ 'পুঁথি সাহিত্যের আদিকবি গরীবুল্লাহ্': মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৬১, পৃঃ ২৭।

৯ পূর্বোক্ত।

লিখিয়া দিয়া মীর জাফরের স্থলে নবাব হন এবং নবাবী-শাসন পুনরুদ্ধার করিয়া স্বহস্তে লইবার চেষ্টা করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। অতঃপর, পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে (১২ই আগষ্ট) ইংরেজ কোম্পানী (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট হইতে দেওয়ানী লাভ করিলেন[১০]। সুতরাং, গরীবুল্লাহ্‌র 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য যে ১৭৬৫ অথবা তাহার কিছুকাল পরে সমাপ্ত হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্ত একেবারে অমূলক নহে। এতৎভিন্ন, 'আমীর হামযা' (১ম বালাম) পুঁথির উপসংহারে যে-ভণিতা পাওয়া যায় ('গরীব কহেন শাহা নেজামের পায়') তাহা ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র সময়কাল নির্ণয়ে সাহায্য করে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অল্প কিছুকাল মীর জাফর-পুত্র শাহ্ নিযামউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের নবাব হইয়াছিলেন[১১]। সম্ভবতঃ গরীবুল্লাহ্ এই নিযামউদ্দৌলা সম্পর্কেই ইঙ্গিত প্রদান করিয়া থাকিবেন। কবি-বর্ণিত নিযাম-উদ্দৌলা যদি নবাব মীর জাফরের পুত্র হন, তাহা হইলে

---

১০ John Clark Marsman : History of India. Part I, 4th Edition, Serampore. Published at Serampore Press-1868, p. 310.

১১ ক. '........... No time was, therefore, to be last in the appointment of another Nabab. The Covenants were thrown aside and Nizum-ood-dowla, the son of Meer Jaffar, was raised to the throne.' (J. C. Marsman : History of India. Part I, 4th Edition. Serampore Press. 1868. p. 307.)

খ. 'He (Meer Jafar) died in January 1765 and was succeeded as titular ruler by a son named Najmu-d-doula. (V. A. Smith : The Oxford History of India. 2nd Edition, 1923. p. 500.)

সিদ্ধান্ত করা যায় 'আমীর হামযা' ১ম বালাম-এর রচনা কার্য ১৭৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল[১২]।

কবির 'সোনাভান' কাব্যের উল্লেখ অনুসারে জানা যায় যে, তিনি উহা বাংলা ১১২৭ অর্থাৎ ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন[১৩]। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, সে সময়ে কবির বয়স ছিল ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে, তবে তিনি ১৬৯০ হইতে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

'ইউসুফ জোলেখা' পুঁথি-সমাপ্তির সময়কাল যদি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বা তৎপরবর্তী কোন সময় ধরা হয় এবং 'আমীর হামযা' (১ম বালাম) কাব্য-বর্ণিত 'শাহা নেজাম' যদি নবাব নিযামউদ্দৌলা (১৭৬৫-৬৬) হন, তবে 'সোনাভান' কাব্য-সমাপ্তির সময়কাল (১৭২০) হইতে ইহা ৪৫ বা ততোধিক বৎসরের ব্যবধান সূচিত করে। তাহা হইলে 'ইউসুফ জোলেখা' বা 'আমীর হামযা'

---

১২ ডক্টর আনিসুজ্জামানঃ 'সায়ের ফকির গরীবুল্লাহ্'। সা. প. বর্ষা সংখ্যা, বাং ১৩৬৫, পৃঃ ৫৫।

১৩ অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেনঃ গরীবুল্লাহ্ ১৭৬০-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার কাব্যগুলি রচনা করেন। (পুঁথি পরিচিতি—ঢা. বি. বা. বি., ১৩৫৮, পৃঃ ৬ ও ১৭১)। অধ্যাপক শরীফের এ-মন্তব্য কতখানি সত্য তৎসম্পর্কে সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে; কারণ কবি স্বয়ং 'সোনাভান' কাব্য-সমাপ্তির সময় নির্দেশ করিয়াছেন বাংলা ১১২৭ (১৭২০ খ্রীঃ)। সুতরাং কবি ৭০।৭৫ বৎসরের জীবৎকালে মাত্র ২০ বৎসর সাহিত্যসাধনা করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত মনে হয় না। কবির কাব্য-সাধনার কাল আরও বেশী বলিয়া মনে হয়। তবে, তিনি বোধহয় একটানাভাবে কাব্য-চর্চা করেন নাই। সম্ভবতঃ তাসাউফের জ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন থাকার দরুণ কাব্যসাধনা কবির জীবনের একমাত্র কাম্য হয় নাই।

(১ম বালাম) রচনার সময় কবির বয়স ছিল অনুমান (১৭৬৫-১৬৯৫) ৭০ কিংবা তাহার কিছু উর্ধ্বে। এ-কাব্যগুলি রচনার পরও কবি হয়ত কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিবেন। অতএব, ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছান যায় যে, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'জঙ্গনামা' পুঁথির একখানি বাজার সংস্করণ দেখিয়া মনে করেন যে, ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র এই অসমাপ্ত পুঁথি মুহম্মদ ইয়াকুব সমাপ্ত করেন বাং ১১০১ সালে (১৬৯৪ খ্রীঃ)[১৪]। কিন্তু গরীবুল্লাহ্‌ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কবি হইতে পারেন না। আর যদি না হন, তবে তাঁহার অসমাপ্ত পুঁথি ইয়াকুব কি করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাপ্ত করিবেন ? সুতরাং ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। অতএব আমাদের ধারণা, সম্ভবতঃ বাং ১১০১ সালের পরিবর্তে বাং ১২০১ সাল অর্থাৎ ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'জঙ্গনামা' সমাপ্ত হইলেও হইতে পারে। কারণ, এ-কাব্যে কবি-প্রতিভার পরিণতির ছাপ বিদ্যমান। ইয়াকুব নামক কোন কবি 'জঙ্গনামা'-র রচনাকার্য সমাপ্ত করেন নাই, সম্ভবতঃ ফকীর গরীবুল্লাহ্‌ নিজেই কাব্যখানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ইয়াকুব লিপিকর হইতে পারেন, অথবা প্রকাশকের কারসাজীর ফলে ইয়াকুবের ভণিতা আসিয়া থাকিবে। এ-বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করিতেছি। যাহা হউক, ফকীর গরীবুল্লাহ্‌ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিতে এ-কথার সমর্থন মিলিতেছে[১৫]।

মুহম্মদ ইয়াকুবের নামে প্রচলিত বাজার সংস্করণ 'জঙ্গনামা' প্রকাশকদের কল্যাণে সর্বজনবিদিত। 'জঙ্গনামা'র প্রকৃত লেখক কে,

---

১৪ মু. বা. সা., পা. পা., ঢাকা, ১৯৫৭, পৃঃ ২২৪।

১৫ O. D. B. L.-Part I., C. U. Press--1926, p. 212.

এ প্রশ্ন লইয়া সমালোচক এবং পণ্ডিতমহলে বিস্তর মতভেদ বর্তমান। সমগ্র কাব্যখানি ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র রচিত কিনা এবং না হইলে ইয়াকুবের যে-ভণিতা পাওয়া যায় তাহা কবি ইয়াকুবের,—না, লিপিকর ইয়াকুবের অথবা প্রকাশকের কারসাজী, সে সম্পর্কে সর্বজন-গ্রাহ্য কোন মত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 'জঙ্গনামা' কাব্যের তিন চতুর্থাংশেই ইয়াকুবের ভণিতা সংযুক্ত। আমি তিন তিনখানি 'জঙ্গনামা' পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। বাজার সংস্করণ 'জঙ্গনামা'র প্রথম দিকে গরীবুল্লাহ্‌র পিতার নাম 'শাহ তুন্দি' ও ইষ্টপীর 'বড় খাঁ গাজী'-র প্রসঙ্গ আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত আরবী হরফে অনুলিখিত একখানি 'জঙ্গনামা' (কলমী পুঁথি, পুঁথির নং ৬৫৩) এবং ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের সংগৃহীত আরবী হরফে লিখিত অপর একখানি কলমী পুঁথি পড়িয়া দেখিয়াছি। পুঁথি দুইখানি যথাক্রমে আনুমানিক এক শত এবং ৭০।৮০ বৎসরের পুরাতন। হস্তলিখিত এই পুঁথি দুইখানির সহিত ইয়াকুবের নামে প্রচলিত ছাপানো পুঁথির পাঠ ও ভণিতা মিলাইয়া দেখিয়াছি। কিন্তু কোন পাঠভেদ বা ভণিতার পরিবর্তন নজরে পড়ে নাই। তিনখানি পুঁথির আদ্যাংশে ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র ভণিতা, তাঁহার পিতার নাম ও পীরপরম্পরার প্রসঙ্গ এবং উত্তরাংশে ইয়াকুবের ভণিতা আছে। আরও একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়িল। তিনখানা কাব্যের সূচনা-অংশে (হাম্‌দ, নাত বর্ণনায়) ইয়াকুবের ভণিতা থাকিলেও পাঠের মধ্যে ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র পীরপরম্পরার নাম আছে।

গরীবুল্লাহ্‌র ভণিতাযুক্ত কাব্যাংশ যে ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র রচিত সে সম্পর্কে সকলেই এক মত; কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে কাব্যের অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ লইয়া। এই তিন চতুর্থাংশের সর্বত্র ইয়াকুবের ভণিতা। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এবং ডক্টর সুকুমার

সেনের সিদ্ধান্ত, সমগ্র 'জঙ্গনামা' কাব্যের লেখক ফকীর গরীবুল্লাহ্। শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলেন, ইয়াকুবের ভণিতা সংযোজনের পশ্চাতে আছে প্রকাশকগণের কারসাজী[১৬]। ডক্টর সুকুমার সেন ইয়াকুবকে গরীবুল্লাহ্র পুঁথির লিপিকর মাত্র মনে করেন[১৭]। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন যে, 'জঙ্গনামা'র প্রথমাংশ ফকীর গরীবুল্লাহ্র এবং শেষাংশ মুহম্মদ ইয়াকুবের রচনা[১৮]।

আমি পূর্ব-বর্ণিত দুইখানি আরবী কলমী পুঁথি এবং বাজার সংস্করণ 'জঙ্গনামা' পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, 'জঙ্গনামা'র প্রকৃত রচয়িতা ফকীর গরীবুল্লাহ্ই। মুহম্মদ ইয়াকুবের ভণিতা সংযোজন প্রকাশকের কারসাজী বা লিপিকরের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্যের ফল বলিয়াই মনে করি। সম্ভবতঃ এ-কাব্য রচনার ব্যাপারে গরীবুল্লাহ্র সহিত ইয়াকুবের কোন সম্পর্ক ছিল না। ইয়াকুব যে 'জঙ্গনামা' কাব্যের পরবর্তী অংশ রচনা করেন নাই, তদ্বিষয়ে আমার যুক্তি ঃ

ক। এক কবির অসমাপ্ত পুঁথি পুনরায় লিখিবার সময় দ্বিতীয় কবি যে-স্পষ্ট ভাষণ করিয়া থাকেন, এ-স্থলে তাহা নাই। (যেমন দৌলত কাজীর 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' সম্পূর্ণ করিতে গিয়া কবি আলাওল এবং ফকীর গরীবুল্লাহ্র অসমাপ্ত 'আমীর হামযা' পুনরায় লিখিবার সময় সৈয়্যিদ হামযা স্পষ্ট করিয়া পূর্ব-সূরীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।)

---

১৬ 'পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি গরীবুল্লাহ্'। মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৬১, পৃঃ ২৮।

১৭ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৪৮, পৃঃ ৯১৬।

১৮ মু. বা. সা., পা-পা, ঢাকা। ১ম সংস্করণ ১৯৫৭, পৃঃ ২২৪।

খ। ইয়াকুবের একক ভণিতা সম্বলিত কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

গ। গরীবুল্লাহ্‌র প্রায় সব পুঁথিই অপরের নামে প্রচলিত, স্বনামে চলে না। 'সোনাভান', 'সত্যপীর', 'ইউসুফ জোলেখা', 'জঙ্গনামা', পুঁথির মূল রচয়িতা ফকীর গরীবুল্লাহ্‌ হইলেও পরবর্তীকালে প্রকাশকগণের গাফলতী অথবা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্যের ফলে পুঁথিগুলি অপর ব্যক্তিগণের নামে বাজারে প্রচলিত হইয়াছে। যেমন—'সোনাভান' পুঁথির রচয়িতারূপে সৈয়্যিদ হামযা (সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬) এবং অন্যস্থলে মুনশী ফকীর মোহাম্মদ-এর নাম (হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪১) ছাপানো আছে, তেমনি 'সত্যপীর' পুঁথিও ওয়াজেদ আলীর (সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬) নামে বাজারে প্রচলিত। এই হিসাবেই গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা' ইয়াকুবের নামে প্রচলিত।

ঘ। ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র ভণিতা-সম্বলিত কাব্যাংশের সহিত ইয়াকুবের ভণিতা-সম্বলিত কাব্যাংশের ভাষাগত, বাক্য গঠনগত (Syntax), ভাবগত, অলঙ্কারগত এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগত কোন পরিবর্তন নজরে পড়ে না। [গরীবুল্লাহ্‌র 'ইউসুফ জোলেখা' পুঁথিতে জোলেখার রূপবর্ণনার ভাষা এবং 'জঙ্গনামা' কাব্যে ইয়াকুবের ভণিতা-সম্বলিতঅংশে হুসৈনের পাঁচ বৎসর বয়স্কা কন্যার রূপ-বর্ণনার ভাষা অবিকল এক।]

ঙ। 'ইউসুফ জোলেখা,' 'সোনাভান' 'আমীর হামযা' প্রভৃতি পুঁথির মধ্যে 'গরীব' বা 'ফকীর' ভণিতাসম্বলিত পংক্তিতে অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দের সাধারণ নিয়মের (৮ + ৬ = ১৪) ব্যতিক্রম চোখে পড়ে না। কিন্তু 'জঙ্গনামা' পুঁথিতে যেখানে ভণিতায় 'ইয়াকুব' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেখানে পয়ারে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

নিম্নে উভয়ের কয়েকটি ভণিতা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

গরীবুল্লাহ্‌র ভণিতা :

১। অধম ফকির কহে এমামের পায়।
আল্লার মক্কর যাহা কে বুঝিবে তায়॥ (জঙ্গনামা)

২। অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত।
বড় খান গাজী দিল যারে মোলাকাত॥ (ঐ)

৩। শুনিয়া ফাতেমা বিবি ছাড়িল কান্দনা।
অধীন ফকির কহে গাজীর ভাবনা॥ (ঐ)

৪। ফকির গরীব কহে কেতাবের বাত।
যেবা ইহা পড়ে তার বাড়ুক হায়াত॥ (ইউসুফ জোলেখা)

৫। অধীন ফকির কহে কেতাব কালাম।
এই সব মিথ্যা নহে এলাহীর নাম॥ (ঐ)

গরীবুল্লাহ্‌র রচিত উপরোক্ত পংক্তিগুলিতে অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পয়ারের মাত্রা সংখ্যা (৮+৬) ১৪ ; গরীবুল্লাহ্‌র পয়ার ব্যবহারে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। পক্ষান্তরে

ইয়াকুবের ভণিতা :

১। জঙ্গনামার কথা ভাই সহদ সাগর।
অধম ইয়াকুব রচে পিও সাধুবর॥ (জঙ্গনামা)

২। উতারিল গিয়া সবে আপন মোকাম।
রচিনু ইয়াকুব কথা হোসেনের নাম॥ (ঐ)

৩। সাবাস সাবাস করে যত পালোয়ান।
রচিনু ইয়াকুব কবি অমৃত সমান॥ (ঐ)

৪। রসুলের পদযুগ ভরসা করিয়া।
অধম ইয়াকুব কহে পাঁচালী রচিয়া॥ (ঐ)

৫। হানিফা খোসাল বড় বাহুড়িয়া চলে।
ইয়াকুব কহেন ভাবি আল্লা ও রসুলে॥ (ঐ)

উপরোক্ত পংক্তিগুলিতে 'ইয়াকুব' শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় পয়ারে ১৪ মাত্রার সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে। কিন্তু 'ইয়াকুব' স্থলে 'গরীব' বা 'ফকীর' শব্দ যুক্ত হইলে পয়ারের সাধারণ নিয়ম বজায় থাকে। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত, গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা' কাব্যে ইয়াকুবের ভণিতা সংযোজনের পশ্চাতে পরবর্তী-কালের লিপিকর ইয়াকুবের স্বেচ্ছাকৃত কর্মতৎপরতা বা কারসাজী প্রকারান্তরে দায়ী *।

দুই· রাধা চরণ গোপ

বাংলা মর্সীয়া কাব্য রচনার ক্ষেত্রে রাধাচরণ গোপ বা রাধপ-গোপ নামক এক হিন্দু কবির সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি 'ইমাম-এনের কেচ্ছা' ও 'আফৎনামা' (হুসৈনের মৃত্যু-কাহিনী) নামক দুইখানি খণ্ডিত কাব্যের প্রণেতা[১৯]। ডক্টর সুকুমার সেন প্রথম পুঁথির লিপি-বৈশিষ্ট্য এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্য দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়[২০]। 'আফৎনামা' 'ইমামএনের কেচ্ছা' হইতে স্বতন্ত্র পুঁথি বলিয়া মনে হয় না, সম্ভবতঃ ইহা 'ইমামএনের কেচ্ছা'র একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর রাঢ়ের (বীরভূম অঞ্চলের) লোহাগুড়ি গ্রাম হইতে উহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ রাধা গোপ নিজেও উত্তর রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। পুঁথি দুইখানির লিপিকাল বাং ১২৩৪ সাল (১৮২৭)। ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল 'পুঁথি-পরিচয়' গ্রন্থে কাব্য দুইখানির ভণিতাগুলি প্রদর্শন করিয়া কাব্য সম্পর্কেও

* বর্তমান কবি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য মৎপ্রণীত 'ফকীর গরীবুল্লাহ্‌' গ্রন্থ (প্রকাশিত : বাংলা একাডেমী, চৈত্র ১৩৬৮) দ্রষ্টব্য।

১৯ বিশ্বভারতীর পুঁথি-সংরক্ষণ বিভাগের ৬৮১-৬৮৩ নং পুঁথি দ্রষ্টব্য।

২০ ডক্টর সুকুমার সেন : ই. বা. সা., বাংলা ১৩৫৮, পৃঃ ৪৯।

কিছু পরিচয় দিয়াছেন[২১]। ডক্টর সুকুমার সেনও রাধা গোপ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া তৎপ্রতি দেশের পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন[২২]। অষ্টাদশ শতাব্দীর হুগলী-মান্দারণ ও ভূরশুট অঞ্চলে পীর-ফকীরের মাহাত্ম্য প্রভাবে মুসলিম কবিগণ যে-পুঁথি সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, হিন্দু-সমাজও তাহার প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। রাধা গোপের কাব্য দুইখানি এই প্রভাবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই হিসাবে পুঁথি দুইখানির স্বতন্ত্র মূল্য আছে। দুইখানি কাব্যই মুসলিম কবিগণের ন্যায় ফারসী কায়দায় রচিত[২৩]। ইহার একাধিক স্থলে পীরের প্রসঙ্গ আছে। যথা ঃ

ক। রাধপ গোপে বলে পীরের মুখের বাণী।
শুনিতে ইমাম কেচ্ছা অপরূপ কাহিনী॥

খ। কহিল রাধপ গোপ সত্যপীরের পায়।
আল্লা আল্লা বল ভাই তহকিক খোদায়॥

গ। বন্দিখানায় যত ছিল হইল খালাস।
সত্যপীরের পায় ভনে রাধাচরণ দাস॥

কবি ধর্মে ছিলেন হিন্দু ; কিন্তু ফারসী-উরদূ-হিন্দীমিশ্রিত বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার শব্দনির্বাচন দৃষ্টে মনে হয় যে, তিনি বেশ শিক্ষিত ছিলেন। এস্থলে একটি নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

এজিদ বলে মেরআ উজির বান্দহ কোমর
ছাড়াইব ইমামহনে মদীনা সহর।

---

২১ পুঁথি পরিচয়, ২য় খণ্ড। বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৩৬৪, পৃঃ ১৬, ১৮, ১৯, ২১ এবং ১১, ১২, ২২, ১৭ ইত্যাদি।

২২ ডক্টর সুকুমার সেন ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯-৫১।

২৩ ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল ঃ পূর্বোক্ত (ভূমিকা, পৃঃ ৬)।

আবুল আহাম্মদ হাতিঞাড়ে জিব কিতাবত
কোমর বেন্ধে চল ভাই শুন হকিকত।
এত শুনে ফজলিয়া চলিল পুনর্বার
সঙ্গে করে নিল ফৌজ বায়ান্ন হাজার।
মুদাইন ঘেরে গিয়া যত পাহালওয়ানে
ইমামএনের কেচ্ছা ছি রাধপ গোপে ভুনে।

....

মন মজে থাকো আমার পীরের চরণে ॥
কিতাবত এজিদ লিখেছে সেই ঠাঁই
আগে করিতে তুমি ইমামের দোহাই।
পাএ বেড়ি হাত কড়ি উঠাইঞা নায়
জলদি করে মোর সঙ্গে মিলিবারে আয়।
যদি মোর সঙ্গে না মিলিবে তুমি
চার মুড়িতে মুদাইন উড়াইয়া দিব আমি[২৪]।

তিন. মুহম্মদ হামীদুল্লাহ্ খান

ফকীর গরীবুল্লাহ্ এবং রাধাচরণ গোপ ভিন্ন অষ্টাদশ শতাব্দীর মর্সীয়া কাব্য সাহিত্যের ধারায় অন্য কোন কবির সন্ধান জানা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর কবিগণের মধ্যে প্রথমেই নামোল্লেখ করিতে হয় মুহম্মদ হামীদুল্লাহ্ খান এবং মুন্‌শী জনাব আলীর। হামীদুল্লাহ্ খান চট্টগ্রামের স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অপরিসীম। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে 'খান বাহাদুর' খেতাব পান। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। বাংলা ভাষাতেও যে তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্বাক্ষর 'গুলজার-ই-

২৪ ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল : পুঁথি পরিচয়, ২য় খণ্ড। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৩৬৪ সাল, পুঁথির নং ৬৮১, পৃঃ ১৭।

শাহাদৎ বা 'শাহাদতুত্থান' কাব্যে বর্তমান[২৫]। ইংরেজ আমলে রচিত বাংলা মর্সীয়া কাব্যগুলির মধ্যে এই কাব্যখানির ভাষা ফারসী-উরদূ-হিন্দী শব্দের মিশ্রণ হইতে মুক্ত। ইহা আগাগোড়া সাধু ভাষায় লিখিত। কাব্যের মূলে আছে একখানি আরবী-গ্রন্থ। বস্তুতঃপক্ষে, 'শাহাদতুত্থান' কাব্য মুঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী। কবি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া পশ্চিমবঙ্গীয় কবিদের মুসলমানী বাংলা ভাষা-রীতিদ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আরবী-ফারসী শব্দ কবি ব্যবহার করেন নাই। ঐতিহাসিক হিসাবেও তিনি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ছিলেন[২৬]।

কবির স্বহস্তলিখিত 'গুলজার-ই-শাহাদৎ' কাব্যখানি মোট ২৮৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ[২৭]। কবি এ-কাব্যের নামকরণ করিয়াছেন 'গুলজার-ই-শাহাদৎ'; কিন্তু ইহার দুই তৃতীয়াংশে কারবালা যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয়ের অবতারণা করেন নাই। 'ইমাম হোসেনের শাহাদতের কথা' শীর্ষক পরিচ্ছেদ (১৮৬ পৃষ্ঠা) হইতে মূল কাহিনী

---

২৫ 'গুলজার-ই-শাহাদৎ' ব্যতীত 'ত্রাণপথ' নামক অপর একখানি পুঁথি তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন 'ভেলুয়া সুন্দরীর কাব্য' নামক একখানি পুঁথির রচয়িতা বলিয়া চট্টগ্রামের এক কবি হামীদুদ্দিনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সংস্করণ, কলিকাতা, পৃঃ ৩১৯) কিন্তু এই হামীদুদ্দিন, খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ্ খান কিনা বলিতে পারি না। —লেখক।

২৬ তাঁহার ফারসী ভাষায় রচিত বিখ্যাত তওয়ারিখ-ই-হামীদিয়া গ্রন্থখানিতে চট্টগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

২৭ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কর্তৃক সংগৃহীত এই পুঁথিখানি আমি অধ্যাপক আহমদ শরীফের সৌজন্যে পড়িবার সুযোগ লাভ করি। — লেখক।

বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্য-রচনার সময় কবির বয়স ছিল ৫৫ বৎসর। কাব্যের সূচনায় কবির বর্ণনা ঃ

বয়স পঞ্চান্ন অব্দ তাতে আর শোগী।
দুঃখ ক্লেশে হইয়াছি বলহীন রোগী॥
দেখিলাম আছে বহু বাঙ্গালা ভাষাতে।
পদবন্ধ পুস্তকাদি নানা লোকে হাতে॥

*   *   *   *

নাম এ পুস্তকের গোলজার শাহাদত।
বঙ্গভাষে শাহাদতুন্থান সেইমত॥

পুঁথির উপসংহারে পুঁথি-সমাপ্তির তারিখ আছে ঃ

সমাপ্ত হইল শাহাদৎনামা জান।
জুমাবার আছিলেক সতর রমজান॥
হিজরীর সন হৈল বার শত আশি।
বার শত সত্তর ফাল্গুনার্ধ প্রকাশি॥
কহিলাম এ পুস্তক আরবী থাকিয়া।
রওয়ায়েত মতে বঙ্গ ভাষাতে আনিয়া॥

কবির ভণিতা ঃ

মোহাম্মদ হামীদুল্লাহ্ খান বাহাদুর।
শাহাদৎনামা যবে কহিল প্রচুর॥

বাংলা ১২৭০ সালের ১৫ই ফাল্গুন (ফাল্গুনার্ধ), হিজরী ১২৮০ সালের ১৭ই রমজান শুক্রবার অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পুঁথির রচনাকার্য সমাপ্ত হয়। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইলে তিনি (১৮৬৩-৫৫) ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

চার. মীর মনোহর

উনবিংশ শতাব্দীর অপর একজন নূতন কবির সন্ধান মিলিতেছে। কবির নাম মীর মনোহর। তৎরচিত 'হানিফার লড়াই' কাব্যখানি বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের ধারায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য*। সম্ভবতঃ কবি উত্তরবঙ্গের (বগুড়া জেলার) অধিবাসী ছিলেন। কাব্যখানি বাং ১২৯৪ সালে (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) অনুলিখিত হয়। ইহা হইতে মনে হয় যে, মীর মনোহর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে (অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে?) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাব্যমধ্যে কবি তাঁহার জন্মস্থান ও বংশ-পরিচয় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিয়াছিলেন কি না, পুঁথির সূচনা-অংশের ১৭ খানি পাতা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় তাহা জানিবার উপায় নাই। কবি কাব্য-মধ্যে ভণিতা দিয়াছেন:

ক. রচে মীর মনোহর কেতাব দেখিয়া।

খ. রচে মীর মনোহর কেতাব দেখিয়া।
মহাম্মদ হানিফার কথা শুন মন দিয়া॥

গ. রচে মীর মনোহর কেতাবের বচন।
শহর তোরবাজের কথা শুন দিয়া মন॥

---

* পুঁথিখানি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত। ইহা একখানি খণ্ডিত পুঁথি; পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮-১৮৮। পুঁথির লিপিকর: শ্রীজান মোহাম্মদ ফকীর; ষ্টেশন: সেবগ্ঞ (বগুড়া)। লিপিকাল বাং ১২৯৪ সাল।

ঘ. দিবস বহিয়া গেল লেখা শেষ হইল।
রচে মীর মনোহর আল্লা আল্লা বোল ।।

কবির বর্ণনা-দৃষ্টে বুঝা যায়, তিনি ফার্সী বা উর্দূ কোন কাব্যের অনুসরণে 'হানিফার লড়াই' প্রণয়ন করেন।

পাঁচ. ওয়াহিদ আলী

ইনি সুনামগঞ্জের (সিলেট) লক্ষণশ্রী পরগণার ষোলঘর মৌজার অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ ওয়াহিদ আলী উনিশ শতকের মানুষ। তৎরচিত 'বড় জঙ্গনামা' একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য। এ-কাব্যের ভাষা দোভাষী বাংলা, কিন্তু লিপি সিলেটী নাগরী*। এ-কাব্যের বহু অংশের সঙ্গে ইংরেজ আমলের মর্সীয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা' কাব্যের অনেক অংশের হুবহু মিল লক্ষ্যযোগ্য। এ-কারণে সন্দেহ হয় যে, ওয়াহিদ আলী ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা' কাব্যের অনেকাংশ বেমালুম নকল করিয়া এবং তৎসঙ্গে কিছু কিছু নুতন অংশ সংযোজন করিয়া এই 'বড় জঙ্গনামা' রচনা করিয়াছেন। কাব্যখানি বৈশিষ্ট্য-হীন নয়। ইমাম হুসৈনের যুদ্ধসজ্জার বর্ণনাটি উপভোগ্য। যথা ঃ

এত বলি শাহাজাদা দু'রেকাত নমাজ
পড়িয়া করিল আপে মহিমের সাজ।
জেরাবখত লিয়ে পিন্দে আলি মর্তুজার
রছুলের দেওয়া পাগ ছিরের দস্তার।
মবারক জুলুফ যুই পড়িয়াছে কান্ধে
কোমর বান্ধিলা যে দাউদের কোমরবন্ধে।

* আরও বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের ৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ছালে পয়গম্বরের মোজা পরিলেন পায়
হজ মক্কার কোবা জোড়া তুলি দিলা গায়।
পৃষ্ঠেতে বান্ধিলা ঢাল আমীর হামযার
হস্তে তুলি লইলা তেগ আলী মর্তুজার।
তীর তরকশ ছুলফা খন্‌জর কামান
নেজা গুর্জ ছংগ পাশী আরবি নিশান।
সাজান করিলা ঘোড়া দুলদুল সংকার
অতিশয় উচা ঘোড়া পর্বত আকার।

ছয়. জনাব আলী

জনাব আলী, ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র অনুসৃত মুসলমানী বাংলা ভাষা অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। তিনি কাব্যমধ্যে তাঁহার নিবাস ও পিতা-পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন:

এবে শুন দিনদার আমার ঠিকানা।
হাওড়া জেলার বিচে বালিয়া পরগণা॥
তার বিচে ধসাগ্রামে আমার মোকাম॥
আমির মরহুম মেরা বাবাজির নাম॥
দাদাজি মরহুম নাম গোলাম রসুল।
নেক পাক ছিল তিনি খোদার মকবুল॥
মা বাপ ওস্তাদ পীর ভাই বেরাদর।
এলাহী রহম কর সবার উপর॥
কহেন জোনাব আলী এলাহী ভাবিয়া।
আনাছেরে শাহাদাতেন কেতাব দেখিয়া॥

কবি আরও জানান যে, ফারসী 'মকতুল হুসৈনের' বঙ্গানুবাদ 'জঙ্গনামা' পড়িয়া দেশের লোকে অলীক ও মিথ্যা কাহিনীকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। এই সময়ে কবির সহিত ঢাকা জেলায়

গড়পাড়া নিবাসী মুন্‌শী তাজউদ্‌দীনের সাক্ষাৎ ঘটে। মুন্‌শী সাহেব কবিকে 'আনাসারে সাহাদাতায়েন' উরদূ কেতাব অনুসরণে বাংলা পুঁথি রচনা করিবার জন্য অনুরোধ জানান। ফলে, কবি 'শহীদ-ই-কারবালা' কাব্যের রচনাকার্য শুরু করেন। কারবালার অরুন্তুদ কাহিনী কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিবার সময় কবি-হৃদয় বেদনা-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। জনাব আলীর 'শহীদ-ই-কারবালা' একখানি প্রকাণ্ড কাব্য[২৮]। কাব্যের উপসংহারে কবি কাব্য-সমাপ্তির সময়কাল নির্দেশ করেন ১২৮৯ সালের ১৪ই কার্তিক (১৮৮২ খৃষ্টাব্দ)।

> বার শত উননব্বই সাল বাঙ্গালার।
> চৌদ্দই কার্তিক মাহা রোজ জুম্মাবার॥
> কহেন জনাব আলী লিয়া আল্লা নাম।
> ধসাগ্রামের বিচে যাহার মোকাম॥

'শহীদ-ই-কারবালা'য় মোট ৬৬টি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত; পুঁথি-সমাপ্তির পর 'দরুদ শরীফ' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র অংশ সংযোজিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী মর্সীয়া কাব্যগুলি অপেক্ষা আলোচ্য পুঁথিখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পূর্ববর্তী কাব্যসমূহে এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী আছে; সবগুলির সমন্বয়ে একটি পূর্ণ কাহিনীর অবতারণা। পক্ষান্তরে, এ-কাব্যের কাহিনী ও ঘটনাগুলিতে একাধিক 'রওয়া-য়েতের' বর্ণনা থাকায় কাব্যের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে; অথচ কাহিনী দানা বাঁধিতে পারে নাই। রওয়ায়েত বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বত্র এক রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। যথা: 'আর এক রওয়ায়েত

---

২৮ কলিকাতা বটতলা হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। ৩৩৭/২ নং অপার চিৎপুরস্থিত সিদ্দিকীয়া লাইব্রেরী হইতে ইহার কয়েকটি সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। ইদানিং বটতলার এই ছাপান পুঁথি পাওয়া যায় না।

শুন দিনদার', 'রওয়ায়েতে রাবি লোক করেছে বয়ান', 'রওয়ায়েতে রাবি লোক এয়ছাই লিখিল', 'তারপরে রওয়ায়েত শুন দিনদার,' রওয়ায়েতে আসিয়াছে এয়ছাই কালাম', 'রাবি লোক রওয়ায়েতে করেছে জেকের' ইত্যাদি। ইহা উরদু কাব্য 'আনাসারে সাহাদাতায়েন' কাব্যের অনুসরণ। 'শহীদ-ই-কারবালা' ব্যতিরেকে জনাব আলী আরও কয়েকখানি গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন বলিয়া জানা যায়[২৯]।

সাত. মুহম্মদ মুন্‌শী

জনাব আলীর পর সায়ের মুহম্মদ মুন্‌শী অপর একখানি 'শহীদ-ই-কারবালা' পুঁথির রচয়িতা। এ-কাব্যের রচনাকার্য বাংলা ১৩০৭ সালে (১৯০০) সমাপ্ত হয়।

> বাঙ্গালা তের শ সাত সালে হল সায়।
> দোয়া সব কর মোরে আর বাপ মায়॥

মুহম্মদ মুন্‌শীর হস্তলিখিত পুঁথির একখানি পাণ্ডুলিপি[৩০] এবং

২৯ 'নামাজ মাহাত্ম্য', 'ফজিলতে দরুদ', 'জিয়ারতে কবর', 'জঙ্গে খয়বর', 'জেহাদে ইসলামিয়া' অর্থাৎ খালেদ ও 'উমরের আমলের যুদ্ধ-কাহিনী, প্রভৃতি পুঁথি জনাব আলীর রচনা। (পুঁথি পরিচিতি, ঢা. বি. বা. বি. ১৯৫৮, পৃঃ ৬৭২) ডক্টর সুকুমার সেনের মতে 'হকিকাতচ্ছালাত', 'ফজিলতে দরুদ', ও 'জিয়ারতে কবর' প্রভৃতি পুঁথি তিনি রচনা করিয়াছিলেন। 'জিয়ারতে কবর' কাব্যেও জনাব আলীর জীবনবৃত্তান্ত আছে। (ই. বা. সা., ১৩৫৮, পৃঃ ১৬৭)।

৩০ আবদুল গফুর সিদ্দিকী : 'হযরত এমাম হোসেনের জঙ্গে ছহী শহীদে কারবালা'। মা. মো., আশ্বিন, ১৩৫২, পৃঃ ৬১২।

একখানি মুদ্রিত পুঁথির[৩১] উপসংহারে প্রদত্ত 'কেতাব খাতেমা ও শায়েরের বিবরণ' শীর্ষক অংশে কবি পরিচিতি আছে।

শেখ দারাছতুল্লা হয় নাম বাবাজীর।
খেলাত পেলাত তিনি বড় বেনজীর ॥
শেখ মতিউল্লাহ মোর দাদাজীর নাম।
আল্লার কাজেতে তিনি ছিল ছোভে শাম্ ॥
আমার কপাল গুণে দুনিয়া ছাড়িয়া।
বাবাজান চলি গেল এতিম করিয়া ॥
আমা হৈতে বাপের খেদমত না হইল।
হামেশা ছফরে মোর জিন্দেগী কাটিল।

* * * *

হুগলী জেলার বিচে আমতার থানা।
খুদরা গ্রামখানি বড়ই রঙ্গিনা ॥
ভূরশুট কানপুরে আমার মোকাম।
কদিমী বসতি সেথা হামেশা গোজরান ॥

মুহম্মদ মুনশীর এই পুঁথির রচনাকার্যের সময়কাল (১৯০০) ও রচনা-বৈশিষ্ট্য দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কবি ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর মানুষ। তাঁহার এই কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ১৩১৯ সালে এই পুঁথির দশম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। কাব্যান্তর্গত পরিচ্ছেদ-গুলি [সংখ্যা মোট ৭২] সায়ের জনাব আলীর কাব্যের ন্যায় দীর্ঘ। কাব্যের বৈশিষ্ট্যও তদনুরূপ। মুহম্মদ মুনশীর কাব্যের বিষয়বস্তুকে

৩১ শহীদে কারবালা। প্রকাশক: মোবারক আলী খোন্দকার, কলিকাতা। ২৭/১২ নং গোপী কৃষ্ণ পাল লেন, সত্যনারায়ণ প্রেস, দশম সংস্করণ, সন ১৩১৯।

তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ ইতিহাস, ইতিহাসের ছায়া এবং কল্পনা। যতদূর সম্ভব, কবি আরও কয়েকখানি পুঁথির গ্রন্থকার ছিলেন[৩২]।

আট. সাদ আলী ও আবদুল ওহাব

এই দুই কবি এজমালীতে তৃতীয় 'শহীদ-ই-কারবালা' কাব্য রচনা করেন। পুঁথিখানি চারি দপ্তরে ৫৩৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। কাব্যের ভাষা দেখিয়া নির্ভুলরূপে বলা যায়, ইহা বিশ শতকের প্রথমার্ধের লেখা। আশ্চর্যের বিষয়, কবিদ্বয় কোথাও নিজেদের পরিচয় বা কাব্য রচনার সময়কাল দেন নাই। ফলে, আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে, সম্ভবতঃ কবিদ্বয় সায়ের মুহম্মদ মুনশীর বহুল-প্রচলিত 'শহীদ-ই-কারবালা'র কাহিনী, এমনকি ভাষা পর্যন্ত হুবহু নকল করিয়া এই 'শহীদ-ই-কারবালা' প্রণয়ন করেন। কাব্য দুইখানি আমি তুলনামূলকভাবে আগাগোড়া পড়িয়া দেখিয়াছি। দুইখানি কাব্যের মধ্যে কাহিনী, ঘটনা, ভাষা এবং ভাবের মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। কাহিনীর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা বিচিত্র নহে, কারণ ইহাদের মূলে আছে একই উরদূ কাব্য। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে হুবহু মিল থাকায় এবং পুঁথির মধ্যে রচয়িতাদ্বয়ের পরিচয় এবং পুঁথি রচনার সন তারিখ না থাকায় আমার সন্দেহ দৃঢ় হইয়াছে। কাজেই, এ-কথা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, কবিদ্বয় তাঁহাদের পূর্বসূরী শেখ মুহম্মদ

---

৩২ অধ্যাপক আহমদ শরীফ 'পুঁথি-পরিচিতি' গ্রন্থে মুহম্মদ মুনশীর রচিত 'রূপচাঁদ সওদাগর ও কাঞ্চন মালা' 'সামঙ্গুরীমানের জঙ্গ', 'উম্মর উম্মিয়ার নকল', 'দেলবাহার ও আলী' এই চারিখানি পুঁথির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (পুঁথিপরিচিতি, ১ম সংস্করণ ১৯৫৮, ঢা. বি. বা. বি., পৃঃ ৬৭৪)।

মুনশীর কাব্যের ভাষা ও ঘটনার একটু আধটু রদ্ বদল করিয়া, কোথাও বা হুবহু অনুসরণ বা নকল করিয়া কাব্যকে নূতন আকারে চালাই করিয়াছেন। জনাব আলীর কাব্যের ভাষাও কবিদ্বয় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, তবে মুহম্মদ মুনশীর কাব্যের ভাষার সহিত সর্বত্র অভিন্নতা ও মিল থাকায় আমি নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে, সাদ আলী ও আবদুল ওহাবের রচিত 'শহীদে কারবালা' কাব্যখানি মুহম্মদ মুনশীর ঐ নামীয় কাব্যের হুবহু নকল। প্রকাশকগণের কারসাজীর ফলে এক কবির রচিত পুঁথি হুবহু নকল করিয়া বা কোথাও একটু আধটু রদ্‌বদল করিয়া বাজারে অপরের নামে চালু করা যায়, সাদ আলী ও আবদুল ওহাবের 'শহীদ-ই-কারবালা' পুঁথিখানি ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। দুই একটি নমুনা আমি আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে পেশ করিলাম ঃ

মুহম্মদ মুন্‌শীর শহীদের কারবালা	সাদ আলী ও আঃ ওহাবের শহীদে কারবালা
এক	এক
মগিরা সোবার বেটা মদিনা বিচেতে।	মগিরা সোবার বেটা মদিনা বিচেতে।
আছিল গোলাম তার ফিরোজ নামেতে॥	গোলাম আছিল তার ফিরোজ নামেতে।
বলিল আসিয়া সেই ওম্মরের কাছে।	আসিয়া বলিল হজরত ওমরের কাছে।
আপনা হুজুরে মেরা আরজ এ আছে॥	শুনহ সাহেব মেরা এ নালিশ আছে॥
মগিরা মনিব মেরা করে বরাজুরী।	মগিরা গোলাম আমি কহি যে তোমায়।
হররোজ দু দেরেম লয় সে মজুরী॥	হররোজ দু দেরেম মজুরী সে লয়॥
ফিরোজ কারণে বলে হজরত ওমর।	ফিরোজের তরে বলে হজরত ওমর।
কোন্ কাম কর তুমি কহনা খবর॥	কোন্ পেশা কর তুমি কহ না খবর॥
ফিরোজ কহেন করি নকাশির কাম।	ফিরোজ কহেন নাক্যাশির কাম করি।
লোহার গড়ন আমি গড়ি যে মোদাম॥	লোহার গড়ন আমি মোদাম যে গড়ি॥

দুই	দুই
শোন হোর নাহি যাও কাছে এমামের।	শুন হোর নাহি যাও কাছে এমামের।
এন্তেজার আছে তো া হুর বেহেস্তের॥	এন্তেজার আছে তেরা হুর বেহেস্তের॥
শহীদ হইবে তুমি কারবালা মাঝার।	শহীদ হইবে তুমি কারবালা মাঝার।
পানি লিয়া হুরগণ আছেন তৈয়ার॥	পানি লিয়ে হুরগণ আছেন তৈয়ার॥
হোর মর্দ এ আওয়াজ শুনিয়া যে কানে।	গায়েবী আওয়াজ শুনে হোর পাহালওানে।
হাঁকিয়া কহিল চেয়ে হোছেনের পানে॥	হাঁকিয়া বলেন চেয়ে এমামের পানে॥
শুন এবনে রসুলুল্লা আরজ হুজুরে।	শুনহ হোছেন শাহা আমার বচন।
শহীদ হইয়া আমি যাব এইবারে॥	শাহাদতের ওক্ত মেরা পৌছিল এখন॥
আখেরি ছালাম নিয়া দেহ না বিদায়।	ছালাম আমার দেহ বিদায় আমাকে॥
কহ কি কহিব গিয়া তোমার নানায়॥	বল কি বলিবে কব তোমার নানাকে॥

আর বেশী নমুনা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। সাদ আলী ও আবদুল ওহাব রচিত পুঁথির ভাষা মুহম্মদ মুনশীর পুঁথির ভাষা অপেক্ষা আধুনিকতর। কবিদ্বয়ের এই কাব্য কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয় বলিয়া জানা যায়[৩৩]। কবিদ্বয়ের পরিচয় এবং ঠিকানা না থাকায় তাঁহাদের জীবনকথা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ মুনশী আবদুল ওহাব কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন। তিনি বহু পুঁথির রচয়িতা[৩৪]। সাদ আলী সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায় না।

---

৩৩ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্: 'শহীদে কারবালা'। বাংলা পুঁথি সাহিত্য, পা. পা. ১৯৫৫, প: ১৩।

৩৪ এ. কিউ. এম. আদম উদ্দীনের মতে আবদুল ওহাব 'লায়লী মজনুন', 'আসরারুল সালাত', 'ওজুদনামা', 'নাজাতুর আরওয়াহ' এবং কবি

একেবারে হাল আমলে রচিত দুইখানি মর্সীয়া কাব্যের সন্ধান পাইয়াছি। ইহার একখানি মুহম্মদ ইসহাক উদ্‌দীনের 'দাস্তান শহীদ-ই-কারবালা' এবং অপরখানি কাজী আমীনুল হক রচিত 'জঙ্গে কারবালা'। 'দাস্তান শহীদ-ই-কারবালা' একখানি দাস্তানই (বিরাট কাহিনী) বটে। কারণ, মোট ৭টি বালামে (খণ্ড) ৬৮৭ পৃষ্ঠায় কাব্যখানি সমাপ্ত। মধ্যযুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মর্সীয়া সাহিত্যের অন্তর্গত যতগুলি কাব্যের আমি সন্ধান পাইয়াছি, তন্মধ্যে আলোচ্য কাব্যখানির কলেবর যেমন বিরাট, কাব্যান্তর্গত কাহিনীও তেমনি সুদীর্ঘ।

নয়. মুহম্মদ ইসহাক উদ্‌দীন ঃ

কবি কাব্যমধ্যে আত্মপরিচয় ও নিজের বাসস্থান-প্রসঙ্গ উল্লেখ করায় কবি ও কাব্য সম্পর্কে সবকিছু জানা যাইতেছে।

একেত গরীব তাহে নানান জঞ্জাল।
লিখিনু দাস্তান তবু রাহে জুল জালাল॥
ওমর বহুত মেরা চসমা চোখেতে।
পঞ্চান্ন বছর বয়স এই দুনিয়াতে॥
তের শত চৌত্রিশ সাল দশই চৈত্রতে।
কল্য যে ঈদের দিন রমজান বাদেতে॥

সাদ আলীর সহযোগে 'শহীদ-ই-কারবালা' প্রণয়ন করেন। (মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন, ১৩৫২ সাল, পৃঃ ৫৮২) কিন্তু অধ্যাপক আহমদ শরীফ 'শহীদ-ই-কারবালা', 'রাগনামা শতমনা', 'আছবারছালাত', এবং 'ফয়ছলে আহকাম' পুঁথির নামোল্লেখ করেন। (পুঁথি পরিচিতি, ঢা. বি. বা. বি., ১৩৫৮, পৃঃ ৬৭০)।

রোজ হইল শুক্রবার জানিবে মোমিন।
কেতাব করিনু শুরু এছহাক উদ্‌দীন ॥
গোনার কামেতে গেল জেন্দেগী আমার।
না করিনু কোন নেকি দুনিয়া মাঝার ॥

*　　*　　*

জেলা মোর রংপুর কাজীরহাট পরগণা।
মহকুমা নিলফামারি জলঢাকা থানা ॥
খালিসা খুটামারা বলি গেরামের নাম।
সেখানে দুনিয়ার বাসা জানো খাস আম ॥
টেঙ্গনমারীর হাট আছে মসহুর।
তাহার উত্তরে বাড়ি এক মাইল দূর ॥
বরামদী নন্দন কহে মমিনের পায়।
এই তক চৌথা বালাম হৈল সায় ॥

কবির অনেক বয়স হওয়ায় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে; তথাপি তিনি অসীম ধৈর্যে চোখে চশমা অাঁটিয়া কারবালা কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থের রচনাকার্য শুরু করেন। তিনি তাঁহার পাঁচ পাঁচটি পুত্র হারাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে এফাজল হুসৈন ছিল সৌন্দর্য এবং নানাগুণের অধিকারী। মাত্র ৭ বৎসর বয়স্ক বালক পুত্রের মৃত্যুতে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক কবি শোকাভিভূত হন। এই সময়ে কবির দৃষ্টিশক্তি আরও ক্ষীণ হয়। তিনি বেশ কয়েকখানি উরদূ কেতাব অনুসরণে এই বিরাট দাস্তান লিখেন:

বহুত কেতাব উরদু লিনু মাঙ্গাইয়া।
তাহার তরজমা দিনু দস্তানে লিখিয়া ॥[৩৫]

---

৩৫ কবির উল্লিখিত উরদূ কেতাবগুলির নাম: ১। লতায়েফে আশরফি; ২। আনসারে শাহাদাতায়েন; ৩। নবুওতন শোহাদা; ৪। তফসির আশশাফ; ৫। সাবাছানা হুলিয়া; ৬। আওন রেওয়াজ; ৭। মোসাহাল কুলুব; ৮। রাহাতুল কুলুব ইত্যাদি।

ইসহাক উদ্‌দীন কাব্যের ষষ্ঠ বালাম পর্যন্ত লেখা সমাপ্ত করিয়া নদীয়া জেলার ভাদালিয়া থানার অন্তর্গত দহকুলা গ্রামের 'মান্যমান' 'আল্লার রফিক' মৌলবী আজহার আলীকে এই দাস্তান পড়িতে দেন। তিনি ইহা আগাগোড়া পড়িয়া মন্তব্য করেন যে, ইহাতে মোহাম্মদ হানিফার যুদ্ধ-কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। হানিফার যুদ্ধ-কাহিনী সংযোজিত হইলে ইহা সহজেই পাঠক-সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে। কাজেই, ইসহাক উদ্‌দীন বিখ্যাত বাংলা গদ্যলেখক মীর মুশার্রফ হুসৈনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ 'বিষাদ-সিন্ধু'তে বর্ণিত হানিফার জঙ্গকাহিনী অনুকরণ করিয়া এই দাস্তানের সপ্তম বালাম রচনা করেন।

বিষাদ-সিন্ধুর আমি পিছেতে হাটিয়া।
দাস্তানে হানিফার জঙ্গ লিখি বিবরিয়া।।

সুতরাং, এ-কাব্যের সপ্তম বালামে নতুনত্ব কিছু নাই। কবি ১৩৩৪ সালের চৈত্রমাসে এই কাব্য রচনা শুরু করিয়া ১৩৩৬ সালের ১২ই ভাদ্র তারিখে (১৯২৯) সমাপ্ত করেন।

তের শ ছত্রিশ সাল বারই ভাদর।
দুই প্রহর আগে ইতি রোজ বুধবার॥

এই দাস্তানের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। মর্সীয়া সাহিত্যের অন্তর্গত পূর্ববর্ণিত কাব্যগুলির সূচনায় 'হাম্‌দ' ও 'নাত' সংযুক্ত করিয়া যে-প্রকারে কাব্য আরম্ভ করা হইয়াছে, বর্তমান দাস্তানে তাহা অনুসৃত হয় নাই। 'খোদাতালার দরগাহে মোনাজাত' শীর্ষক অংশের বর্ণনা দিয়া এ-কাব্যের সূচনা হইয়াছে। 'হাম্‌দ' ও 'নাত' অবশ্য দেওয়া হইয়াছে, তবে দ্বিতীয় বালামের সূচনায়। ইহা প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

দশ. কাজী আমীনুল হক

কবি আমীনুল হক 'জঙ্গে কারবালা' কাব্যে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং বাসস্থানের খবর দিয়াছেন। কবি বলেন ঃ

অধীন আমীনল হক নাম যে আমার।
কাজীর চাকুরী করে এ দীন খাকসার॥
প্রসিদ্ধ আলেম ছিল বাবাজান আমার।
এল্‌ম শরিয়ত আর মারেফত মাঝার॥
মৌলানা এমামুদ্দীন ছিলেন নামেতে।
হেদায়েত করেন লোক এল্‌ম ও বায়েতে॥
বহুত আলেম হয় সাগরেদ তাঁহার।
মুরিদান আছেন তাঁর হাজার হাজার॥
ফুরফুরার মৌলানা আবু বকর নামেতে।
বাবাজী খলিফা তাঁর এল্‌ম মারফতে॥

* * *

চট্টগ্রাম জেলার বিচে মির্জাপুর গ্রাম।
অধীন হীনের হয় কদিমী মোকাম॥
ইসলামাবাদ নাম চাটি গাঁ জেলার।
আলেম দরবেশ যথা হাজার হাজার॥

কবি যখন 'জঙ্গে কারবালা' কাব্যের অর্ধেক লিখিয়াছেন, তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) ডামাডোল বাজিয়া উঠিয়াছে। কবি বলেন ঃ

লিখিলাম অর্ধেক এই কেতাব যখনে।
দুনিয়া টলমল হৈল যুদ্ধের আগুনে॥
তেরশ শত পঞ্চাশ সনে বাঙ্গালা মাঝারে।
দুর্ভিক্ষ হইল ইহা বর্ণনার বাহিরে॥

কাজেই

অধীনের কেতাব লেখা এ সব খাতের।
হইয়া আছিল বন্ধ কয়েক বৎসর ॥
আবার লিখিলাম কিন্তু আরম্ভ করিয়া।
হাসরে আমার পাপ মুক্তির লাগিয়া ॥

কিন্তু কোন্ সময়ে 'জঙ্গে কারবালার' রচনাকার্য সমাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া কবি কিছু বলেন নাই। শুধু লিখিয়াছেন ঃ

তামাম কেতাব এই দিলাম লিখিয়া ॥
রমজান মাসের শবে কদর নিশিতে।
হইল কেতাব লেখা সম্পূর্ণ তাহাতে ॥

ইহাতে নির্দিষ্ট কোন তারিখ পাওয়া যায় না ; তবে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে যে কবি অসমাপ্ত পুঁথি সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কাব্যের পৃষ্ঠা মোট ২৬০ ; কাহিনী বর্ণনার বেলায় কাজী সাহেব পূর্বসূরীদের কাহিনীর রোমন্থন করেন নাই। কাব্যখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমতঃ, ইহা অনেকটা ইতিহাসনির্ভর ; ফলে পাঠকপাঠিকা একাধারে ইতিহাস পাঠের জ্ঞান ও অন্যধারে কাব্য-পাঠের রস আস্বাদন করিবার সুযোগ পান। দ্বিতীয়তঃ, কবি তাঁহার পূর্বসূরী পুঁথিকারগণের রচিত 'জঙ্গনামা', 'মকতুল হুসেন', 'শহীদ-ই-কারবালা' প্রভৃতি পুঁথি দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবান্বিত হন নাই। এবং তৃতীয়তঃ, কাব্যখানিতে কবির পাণ্ডিত্যের যথারীতি পরিচয় বিদ্যমান। কবিগণের স্বকপোলকল্পিত কাহিনীর জঞ্জাল হইতে ইতিহাস-নির্ভর ঘটনা বাছাই করিতে হইলে যে-বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োজন কাজী সাহেবের তাহা ছিল। এ-দিক দিয়া 'জঙ্গে কারবালা' কবির পাণ্ডিত্যের নিদর্শনও বটে।

পরবর্তী অধ্যায়ে মুঘল এবং ইংরেজ আমলে রচিত সমধারার বাংলা মর্সীয়া কাব্যগুলির কাহিনী বিবৃত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

মুঘল এবং ইংরেজ আমলে রচিত সমধারার বাংলা মর্সীয়া কাব্য-কাহিনী।

আলোচ্য অধ্যায়ে নিম্নলিখিত পুঁথিগুলির কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে ঃ

শেখ ফয়জুল্লাহ্	ঃ	জয়নবের চৌতিশা
মুহম্মদ খান	ঃ	মকতুল হুসৈন
হায়াৎ মাহ্মূদ	ঃ	জারীজঙ্গনামা
জাফর	ঃ	শহীদ-ই-কারবালা ও সখিনা বিলাপ
হামীদ	ঃ	সংগ্রাম হুসন
ফকীর গরীবুল্লাহ্ ও ইয়াকুব	ঃ	জঙ্গনামা
রাধাচরণ গোপ	ঃ	জঙ্গনামা বা ইমামএনের কেচ্ছা
মুহম্মদ হামীতুল্লাহ্ খান	ঃ	গুলজার-ই-শাহাদৎ বা শাহাদৎনামা
জনাব আলী	ঃ	শহীদ-ই-কারবালা
মুহম্মদ মুনশী	ঃ	শহীদ-ই-কারবালা
সাদ আলী ও আবদুল ওহাব	ঃ	শহীদ-ই-কারবালা
মুহম্মদ ইসহাক উদ্দীন	ঃ	দাস্তান শহীদ-ই-কারবালা
কাজী আমীমুল হক	ঃ	জঙ্গে কারবালা

—

তৃতীয় অধ্যায়

মুঘল এবং ইংরেজ আমলে রচিত সমধারার বাংলা মর্সীয়া কাব্য-কাহিনী।

মুঘল এবং ইংরেজ আমলে রচিত সমধারার বাংলা মর্সীয়া কাব্যগুলির কাহিনীঅংশ মূলতঃ এক। তবে, কাব্যগুলির কাহিনী-অংশে যে-সব ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান, পাদটীকায় সেগুলি উল্লিখিত হইয়াছে।

বহুদিন আগের কথা। আরব দেশের অন্তর্গত মক্কা নগরে আবদুল মুন্নাফ নামক কুরেশ (কুরয়শ) বংশীয় এক অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। নিজের ক্ষমতায় তিনি আরবের বাদশাহ হন। তাঁহার ছিল দুই যমজ পুত্র: হাশিম ও উম্মিয়া। যমজপুত্র-দ্বয়ের জন্মের সময়ে উভয়ের পৃষ্ঠদেশ এক সঙ্গে যুক্ত ছিল[১]। আবদুল মুন্নাফ খোদার হুকুমে তলোয়ারের আঘাতে তাহাদিগকে পৃথক করেন। কালক্রমে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে হাশিম আরবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক ছিলেন। কনিষ্ঠ উম্মিয়া (উমাইয়া) জ্যেষ্ঠ হাশিমের

---

১ কাজী আমীনুল হক 'জঙ্গে কারবালা' কাব্যে বলিয়াছেন যে, হাশিম ও উম্মিয়া, আবদুল মুনাফের যমজ পুত্র ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, মুনাফের দুই পুত্র: হাশিম ও আবদুস্ সমস্। আবদুস্ সমসের পুত্র উম্মিয়া সুতরাং,

'আবদুস সমছের বেটা উম্মিয়া হইল।
হাশেম উম্মিয়া চাচা ভাতিজা আছিল॥'

মানমর্যাদাবৃদ্ধি ও রাজ্যপ্রাপ্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া আরবের একস্থানে পনর হাজার সৈন্য মোতায়েন করেন এবং পৈত্রিক রাজ্যের অর্ধেক তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া দাবী জানান। হাশিম আপোষে বিবাদ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিলে উম্মিয়া জানাইলেন যে, রাজ্যের অর্ধাংশ না পাইলে তিনি যুদ্ধ করিবেন। অগত্যা হাশিমও যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। তুমুল যুদ্ধের পর উম্মিয়া তায়েফ নামক এক শহরে পলায়ন করিলেন। সিংহাসন উপলক্ষ করিয়া হাশিম ও উম্মিয়ার মধ্যে আরও বহুবার যুদ্ধ বাধে এবং রক্তের গঙ্গা বহিয়া যায়। কালক্রমে হাশিম ও উম্মিয়ার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদি বংশপরম্পরায় এই বিবাদ সংক্রামিত হয়। হাশিমের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মোতালেব এবং উম্মিয়ার পর তৎপুত্র হরব দ্বন্দ্ব ও কলহ বিবাদে রত হয়। মোতালেব এবং হরবের মৃত্যুর পরেও বিবাদ থামে নাই। মোতালেবপুত্র আবূ তালিব এবং হরব-পুত্র আবূ সুফিয়ানের মধ্যে বিবাদ পূর্বের মতই চলিতে থাকে[২]।

আবূ তালিবের এক সহোদর ভ্রাতা ছিলেন—আবদুল্লাহ্। আবদুল্লাহ্‌র পুত্রই বিশ্ববরেণ্য হযরত মুহম্মদ (দঃ)। আবূ তালিব এবং আবূ সুফিয়ানের মৃত্যুর পর তালিব-পুত্র আলী এবং সুফিয়ান-পুত্র মাবিয়ার (মু'আবিয়ার) মধ্যে রেষারেষি ও দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। হযরত মুহম্মদ জ্ঞান, বুদ্ধি ও ধর্মবলে বলীয়ান হইয়া আরব-বাসীকে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেন। তাঁহার কন্যা ছিলেন বীবী ফাতিমা। হযরত, আবূ তালিব-পুত্র আলীর সঙ্গে

---

২ হায়াৎ মাহমূদ 'জারী জঙ্গনামা' কাব্যে বলিয়াছেন, মোতালিবপুত্র আবদুল্লার সহিত হরব-পুত্র ছুফিয়ার (সুফিয়ানের) বিবাদ ছিল।

এই কন্যার বিবাহ দেন। কালক্রমে আলীর ঔরসে এবং বীবী ফাতিমার গর্ভে হাসান-হোসেন (হুসৈন) নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। বালক দুইটি হযরতের নিকট প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন।

একবার কোতরেস্[৩] নামক এক ফেরেস্তা নাফরমানি করার অপরাধে খোদা-প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করে। ফলে, তাহার পাখা জ্বলিয়া যায়[৪]। তখন 'কোতরেস্' জিবরাইলের সহিত হযরতের নিকট আসিয়া জানাইল যে, শিশু হোসেনের পদধূলি পাইলে আল্লাহ্ তাহার গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। তখন সে পুনরায় পাখা ফিরাইয়া পাইবে। হযরতের হুকুম লইয়া কোতরেস্ তাহাই করিল। হোসেনের বরকতে তাহার গুনাহ্ মাফ হইল।

আর একদিন এক আরববাসী বণিক হরিণের এক শাবক আনিয়া হযরতকে উপহার দিলে হাসান উহা লইয়া সানন্দে খেলা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে, হোসেন আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া হরিণ-শাবকের জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া আল্লাহ্ তায়ালা মৃগকে আদেশ দিলে মৃগ অপর শাবকটি লইয়া নবী-সমীপে হাযির হইল। হযরত মৃগকে দোয়া করিলেন। হোসেন মৃগবাচ্চা পাইয়া সানন্দে খেলিতে লাগিলেন। হযরত রসূলের এক ইহুদী বন্ধু[৫] ছিলেন। ইহুদী যখনই হযরতের নিকট

---

৩ মুহম্মদ খানের 'মকতুল হুসৈন' কাব্যে ইদ্রিস।

৪ ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা' কাব্যে ফেরেস্তার দাড়ি জ্বলিয়া যাওয়ার কথা আছে। হোসেনের হাত ফেরেস্তার মুখের উপর দিয়া ফিরাইয়া দিলে সে দাড়ি ফিরাইয়া পাইবে।

৫ হায়াৎ মাহমুদ, মুহম্মদ মুনশী ও হামিদের কাব্যত্রয়ে এই বন্ধুর নাম দাহিয়া কলবি।

আসিতেন, তখনই তিনি বালক হাসান-হোসেনের জন্য কিছু ফলমূল বা সন্দেশ সঙ্গে করিয়া আনিতেন। একদিন জিবরাইল ঐ ইহুদীর রূপ ধারণ করিয়া হযরতের নিকট আসিয়া হাযির হন। কিন্তু তিনি কোন ফল সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। হাসান-হোসেন জিবরাইলকে ইহুদী মনে করিয়া তাঁহার সন্নিকটবর্তী হইয়া নানা আব্‌দার শুরু করিলেন; এবং জিবরাইলের বস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও যখন ফলের সন্ধান পাইলেন না, তখন নবীজী জিবরাইলকে ইহুদীর কথা বিবৃত করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি (জিবরাইল) মুহূর্তমধ্যে বেহেস্ত হইতে সুগন্ধযুক্ত ও সুমিষ্ট আঙ্গুর* ফল আনিয়া তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় আঙ্গুর খাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। এমন সময়ে হঠাৎ এক ভিক্ষুক আসিয়া হাসান-হোসেনের নিকট ফল চাহিলে হযরত ভিক্ষুককে যেইমাত্র ফল দিতে যাইবেন অমনি জিবরাইল তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, এই ভিক্ষুক মানুষ নহে—সে ভিক্ষুকবেশী শয়তান।

একবার ঈদের দিনে বীবী ফাতিমা পুত্রদ্বয়কে ভাল পোশাক দিতে না পারিয়া ক্ষুন্ন মনে নবীজীর নিকট আরয জানাইয়া বলিলেন, হাসান-হোসেনকে পরাইবার মত কোন বস্ত্র তাঁহার ঘরে নাই। খোদার হুকুমে জিবরাইল দুই ভাইয়ের জন্য শুভ্র বস্ত্র আনিয়া দিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয় রঙীন বস্ত্রের জন্য বায়না ধরিলেন। হাসান সবুজ বস্ত্র এবং হোসেন লাল বস্ত্র চাহিলেন। এই রং দুইটি তাঁহাদের শাহাদৎকালের দৈহিকবর্ণের প্রতীক।

---

* হামিদের 'সংগ্রাম হুসন' কাব্যে 'আনার' ফল। কারণ কবি বলেন:
'ইহা শুনি জিবরিল গেলা বেহেস্তে।
আনার লইয়া গেলা নবীর পাশেতে॥' (পৃঃ ৬)

হযরত একদিন হাসান-হোসেনকে লইয়া খেলাধূলা করিতেছিলেন। এমন সময়ে দৈবাৎ জিবরাইল আসিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ঃ

'জিবরাইল বলেন, মাবিয়ার বেটা এক হবে,
তাহার হাতে এই দুই ইমাম মারা যাবে[৬]।'

জিবরাইল আরও বলিলেন যে, মাবিয়ার (মু'আবিয়ার) পুত্র এজিদ (ইয়াযীদ) জ্যেষ্ঠ হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবে এবং কনিষ্ঠ হোসেন তাহার হস্তে কারবালা প্রান্তরে ক্ষুৎপিপাসায় ওষ্ঠাগত হইয়া অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হইবেন। জিবরাইল কারবালার এক টুক্রা শোণিতবর্ণ মৃত্তিকা আনিয়া হযরতকে প্রদান করিলে তিনি তাহা বীবী উম্মে সাল্‌মার নিকট রাখিতে দিলেন। কিন্তু প্রিয় দৌহিত্র হাসান-হোসেনের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া 'দিলগির হইয়া গেলেন দীন পেগাম্বর'। আলী ও ফাতিমা রসূলের পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাবিয়া (মু'আবিয়া) ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া বলিলেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ; কারণ তিনি জীবনে বিবাহ করিবেন না। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। একদিন মাবিয়া প্রস্রাব করিতে বসিয়াছেন,

'সেইক্ষণে বিচ্ছু আসি লিঙ্গেতে দংশিল।
আগুনি সমান বিষ জ্বলিয়া উঠিল[৭]॥'

তিনি যন্ত্রণায় কাতর হইলেন। রসূল কহিলেন, একমাত্র নারী

---

৬ রাধাচরণ গোপ ঃ ইমামএনের কেচ্ছা।
৭ হায়াৎ মাহ্‌মূদ ঃ জারী জঙ্গনামা।

সহবাসে তাহার যন্ত্রণার উপশম হইতে পারে। অগত্যা মাবিয়া এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন।

'বাদশা বলেন পণ্ডিত নাহি যাবে ছাড়ি ;
তবে আও করি যদি মেলে এক বুড়ি।
এক শ নই বছরের যদি বুড়ি কোথায় থাকে,
এমন বুড়িকে ভাই এনে দাও মুকে[৮]।'

অবশেষে, এক বৃদ্ধাকে পাওয়া গেলে তাহার সহিত মাবিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। মাবিয়া বৃদ্ধার সহিত সহবাস করিলেন, তাঁহার যন্ত্রণার উপশম হইল এবং বৃদ্ধার গর্ভ সম্ভাবনা দেখা দিল। যথা সময়ে বৃদ্ধার যে-পুত্রের জন্ম হয় সেই পুত্রই এজিদ (ইয়াযীদ)।

কালক্রমে হযরত রসূল এবং বীবী ফাতিমা পরলোক গমন করেন। হযরতের পর আবূ বকর, 'উমর, 'উসমান যথাক্রমে খলীফা মনোনীত হন এবং রাজত্ব করেন। 'উসমানের মৃত্যুর পর আলী খলীফা হন। আলীর খিলাফৎ কালে মাবিয়া সিরিয়ায় রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ইহার পর মাবিয়ার সহিত আলীর যুদ্ধ বাধে। তাঁহারা উভয়ে যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন, তখন আলীর স্বপক্ষীয় একদল সৈনিক তাঁহার বিরোধিতা করিতে থাকে। ফলে, আলী বাধ্য হইয়া ষড়যন্ত্র-কারিগণকে নাহেরান-যুদ্ধে পরাজিত করেন। নাহেরানের যুদ্ধের পর আলী কুফার গভর্ণর বশির হাকিমের নিকট মলযম-পুত্র আবদুর রহমানের মারফত একটি চিঠি প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান চিঠি সহ কুফার বাজারের ভিতর দিয়া চলিবার সময় একটি গলির মধ্যে এক বাড়িতে নৃত্যগীতের শব্দ শুনিতে পায়, এবং বাড়ির ভিতরে

---

৮ রাধাচরণ গোপ : ইমামএনের কেচ্ছা।

প্রবেশ করে। সে দেখিতে পাইল, যাহারা নৃত্য-গীত করিতেছে, তাহারা সকলেই 'আওরত'। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না ; কারণ ঃ

'তার মধ্যে এক নারী রূপে গুণে বিদ্যাধরী
কর্তামা তাহার বলি নাম ॥
চাচর চিকুর বেণী সহজে চামর জিনি
পৃষ্ঠভাগে দোলে অনুপাম[৯]।'

আবদুর রহমান এই পরমা সুন্দরী নারীর প্রেমে পতিত হইয়া তাহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হইল। তখন তাহার 'প্রেমের লালসা হয় দারুণ ভীষণ'। রহমান এই নারীকে বিবাহ করিতে চাহিলে সে (কর্তামা) উত্তর দিল যে 'হযরত আলীর শির আনহ কাটিয়া'। আবদুর রহমান অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আলী-হত্যায় রাজী হয়। অবশেষে, এক প্রাতঃকালে আবদুর রহমান কুফার মস্‌জিদে গিয়া হাজির হয় এবং নামায পড়িবার সময় আলীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারীর আঘাতে তাঁহাকে সাংঘাতিক ভাবে জখম করে। কয়েকদিন পরে আলী মৃত্যু বরণ করেন[১০]। আলীর অছিয়ত

---

৯ মুহম্মদ খান ঃ মকতুল হুসৈন। তুলনীয় ঃ

'আওরত নাজনি এক ছিলেন তাহায়।
সে রূপ দেখিলে মণি স্থির নাহি হয় ॥
সেই আওরতের নাম কোতাম বলিয়া।
এয়ছা মিঠা কথা তার শিরিকে চাহিয়া।'

(মুহম্মদ মুন্‌শী)

১০ ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা' কাব্যে আবদুর রহমানের পরিবর্তে আবদুল্লা দিনারের নাম আছে।

অনুসারে তাঁহার লাশ একটি উষ্ট্রপৃষ্ঠে তুলিয়া দেওয়া হইল। উষ্ট্র নজফের বনে 'সফেদ পাথর' বিশিষ্ট এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে পূর্ব হইতেই একটি কবর খনন করা ছিল। আলীর মৃতদেহ উহার মধ্যে কবরস্থ করা হয়[১১]।

আলী যখন মক্কা, মদীনা ও কুফার শাসনকর্তারূপে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন মাবিয়া দামেস্কে রাজধানী স্থাপন করিয়া এবং সিরিয়ার একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। আলীর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র হাসান কুফার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাবিয়া হাসানের খেলাফত প্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া তন্মুহূর্তে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রাজ্যের শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় করিবার পূর্বেই তাঁহাকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারিলে দামেস্ক, মেসের, রুম, বোগদাদ, ইরাক, আরব, ঈরাণ প্রভৃতি দেশ নিজের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া যাইবে। কাজেই, মাবিয়া ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিলেন। হাসান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মাবিয়ার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন বটে;

---

১১ হায়াৎ মাহ্‌মূদের 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যে এই কাহিনী একটু পরিবর্তিত আকারে দেওয়া আছে। তিনি বলেন, উষ্ট্র নজফের বনে প্রবেশ করিলে আলীর মৃতদেহ হঠাৎ স্বর্গের উদ্দেশ্যে উড়িল। ইহাতে বসুমতী নিজেকে অপমানিতা মনে করিলেন। তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট নালিশ জানাইয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে অবহেলা করার দরুণ তিনি অপমানিতা হইয়াছেন। অতএব এখন হইতে তিনি অপর কাহাকেও মাটিতে স্থান দিবেন না। আল্লাহ্‌ বিপদে পড়িলেন। কিন্তু তিনি হুকুম দিলে ফেরেস্তাগণ একটি আসন আনিয়া আলীর মৃতদেহ সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করিলেন। অতঃপর, দুই দুইটি পর্বত মাটির দুই পার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া আলীকে গ্রহণ করিল। আলীর মৃতদেহ এইভাবে স্থান লাভ করিল।

কিন্তু, নিজের সৈন্যগণের বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হইয়া মাবিয়ার সহিত সন্ধি করিলেন। মাবিয়া সমগ্র আরবের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন। এই সময়ে মাবিয়াপুত্র এজিদ (ইয়াযীদ) তরুণ যুবক। মাবিয়া দেখিলেন, পুত্রকে এখন বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজন। তিনি একদিন তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক কি না। এজিদ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, বিবাহ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, কারণ ঃ

'তোমার নগরে আছে আবদুল্লা জবির।
তাহার বণিতা[১২] দেখি প্রাণ নহে স্থির ॥
রূপে গুণে হুর পরী কি দিব উপমা।
এহি রাজ্যে নারী নাহি রূপে তার সমা[১৩] ॥

বাদশাহ্ মাবিয়া পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে আবদুল জব্বারকে দামেস্কের রাজদরবারে উপস্থিত হইবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন[১৪]। জব্বার যথাসময়ে দামেস্ক রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে জানান হইল যে, বাদশাহ্ তদীয় কন্যার সহিত আবদুল জব্বারের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ; কিন্তু রাজকন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন ;

---

১২ এই বণিতা শাহাবানু। কিন্তু মুহম্মদ খান, শেখ ফয়জুল্লাহ প্রমুখ কবির কাব্যবর্ণিত—জয়নব। মুহম্মদ খানের কাব্যে আছে যে, জয়নব অনূঢ়া। তাহার পিতার নাম জাফর।

১৩ হায়াৎ মাহ্মূদ ঃ জারীজঙ্গনামা।

১৪ মুহম্মদ মুনশী, জনাব আলী প্রমুখ কবি 'শহীদে কারবালা' কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এজিদ স্বয়ং কৌশলে আবদুল জব্বারের সহিত তাহার স্ত্রী জয়নবের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য জব্বারের নিকট দূত পাঠান, মাবিয়ার সহিত এই ষড়যন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই।

কারণ, জব্বারের ঘরে এক পত্নী বর্তমান। জব্বার বরাবরই অর্থলোভী ছিল। কাজেই, সে মাবিয়ার ষড়যন্ত্রের কথা বুঝিতে পারে নাই। সে সহজেই মাবিয়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া নিরপরাধ পত্নী জয়নবকে (যয়নব) তালাক দিল। পরক্ষণেই মাবিয়া তাহাকে জানাইলেন যে, জব্বারকে বিবাহ করিতে তাঁহার কন্যা রাজী হইতেছে না। কেননা, যে-ব্যক্তি অর্থলোভে এক নিরপরাধ পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না, সে সুযোগ পাইলে রাজকন্যাকেও ত্যাগ করিবে। এইবার আবদুল জব্বার নিজের বোকামীর জন্য অনুতপ্ত হইল, এবং রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিল।

মাবিয়া জয়নবের সহিত এজিদের বিবাহের অভিলাষে জয়নবের নিকট মুসা আনসারী[১৫] নামক এক ঘটক প্রেরণ করেন। মুসা আনসারী এজিদের বিবাহ-প্রস্তাব লইয়া জয়নবের নিকট যাত্রা করিলে পথিমধ্যে আলী-তনয় হাসান এবং আবদুল্লাহ্ বিন্ 'উমরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হাসান ও আবদুল্লাহ্ বলিলেন, জয়নব যদি এজিদকে স্বামিত্বে বরণ না করে, তবে তাঁহাদের প্রস্তাবও যেন একে একে উপস্থিত করা হয়।

মুসা আনসারী যথাসময়ে জয়নবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমে এজিদ, তৎপর হাসান এবং শেষে আবদুল্লাহ্ বিন 'উমরের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। রূপবতী ও গুণবতী জয়নব পার্থিব ঐশ্বর্য ও সুখশান্তি এবং দৈহিক সৌন্দর্যের মোহ পরিত্যাগ করিয়া

---

১৫. হায়াৎ মাহ্মূদের 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যের মুসাসারি ও হামিদের কাব্যের মুছা আছআরি; মুহম্মদ খানের কাব্যে আবু হোরেরা এবং মুহম্মদ মুনশী, জনাব আলী, সাদ আলী ও আবদুল ওহাবের শহীদে কারবালা 'কাব্যত্রয়ে'—আবু মুছা।

পারত্রিক শান্তি লাভার্থে হাসানকে স্বামিরূপে বরণ করিতে স্বীকৃত হইল[১৬]। অতঃপর, হাসানের সহিত তাহার বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

কালক্রমে মাবিয়ার মৃত্যু ঘটিলে এজিদ খলীফা হন এবং হাসান-হোসেনের বধ-সাধনে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে তাঁহার প্রিয়মন্ত্রী মেরুয়ার (মারওয়ানের) সহায়তায় মায়মুনা[১৭] নাম্নী এক বৃদ্ধা কুট্নীকে হাসান-পত্নী জায়েদার নিকট জহর প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেন। জায়েদাকে রাজরাণী করা হইবে ও প্রচুর ধনসম্পত্তি উপঢৌকন দেওয়া হইবে বলিয়া প্রলোভন দেখাইলে জায়েদা নিজের স্বামী হাসানকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হন[১৮]। জায়েদা হাসানের প্রতি সন্তুষ্ট-চিত্ত

১৬ এই বিবাহ-কাহিনী বিভিন্ন কবির কাব্যে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মুহম্মদ খানের কাব্যে শুধু এজিদ ও হাসানের অর্থাৎ দুই জনের বিবাহ প্রস্তাবের কথা আছে। ফকীর গরীবুল্লাহ্ 'জঙ্গনামায়' চারিজনের প্রস্তাবের কথা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ ঘটক মুছা নিজের প্রস্তাব দেন; তৎপর এজিদ, আব্বাস এবং শেষে হাসানের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কবি হায়াৎ মাহ্মূদের কাব্যে তিন জনের প্রস্তাবের কথা আছে। প্রথমে এজিদের প্রস্তাব, অতঃপর কাসেম নামক এক সুপুরুষ ও রূপবান যুবকের এবং শেষে হাসানের। এতদ্ভিন্ন, হায়াতের কাব্যে এই কাহিনীর আরও যে-বৈশিষ্ট্য আছে তাহা এই: 'মুসাসারি এজিদ, কাসেম ও হাসানের প্রস্তাব কন্যার নিকট লইয়া উপস্থিত করিলে কন্যা ঘটকের নিকটই পরামর্শ চাহিল যে, এখন স্বামী হিসাবে তাহার কাহাকে গ্রহণ করা উচিত?' অন্যান্য কবিগণের কাব্যে পরামর্শ চাহিবার প্রসঙ্গ নাই।

১৭ হায়াৎ মাহমূদের কাব্যবর্ণিত 'জালি বুড়ি'।

১৮ মুহম্মদ খানের 'মকতূল হুসৈন' কাব্যে আছে: হাসানের বিশ্বস্ত অনুচর ছিফুয়া সালেহার হস্তে হাসান নিহত হন। হায়াৎ মাহমূদের কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর হস্তে হাসানের মৃত্যু ঘটিয়াছে; তবে কবি এই পত্নীর নামোল্লেখ করেন নাই। ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা' কাব্যে জায়েদার স্থলে কদবানুর নাম আছে।

ছিলেন না। কারণ, হাসান জয়নবকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। হাসানের মৃত্যু ঘটিলে সপত্নী জয়নবের জ্বালা-যন্ত্রণা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অন্তর জুড়াইবেন, এই ছিল তাঁহার অভিলাষ। এই উদ্দেশ্যে জায়েদা হাসানকে চার চার বার বিষ প্রদান করেন; কিন্তু প্রতি বারেই হাসান রসূলের দোওয়ায় বিষক্রিয়া হইতে নিষ্কৃতি পান। অবশেষে জায়েদা হীরকচূর্ণ (তীব্র হলাহল) সোরাহীর পানিতে মিশাইয়া দিলেন[১৯]। হাসান স্বপ্ন দেখিয়া জাগিলে, তাঁহার পিপাসাবোধ হইল। পিপাসার নিবৃত্তি সাধনার্থে তিনি সোরাহী হইতে পানি ঢালিয়া পান করিলেন। অমনি বিষের ক্রিয়া শুরু হইল। মৃত্যুর পূর্বে হাসান কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনকে বলিলেন, 'তোমার সকিনা সুতা কাসেমকে দিবা'। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার হত্যাকারীর সন্ধান পাইলেও হোসেন যেন প্রতিহিংসাপরায়ণ না হন এবং তাহাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর,

---

১৯ হায়াৎ মাহমুদের 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে, জালি বুড়ি হাসানের প্রথমা পত্নীর নিকট গিয়া কহিল যে, হাসান পুনরায় বিবাহ করিতে যাইতেছেন। এক স্ত্রী বর্তমানে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিলে সংসারে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং হাসানের হৃদয় জয়ের জন্য জালি বুড়ি প্রথমা স্ত্রীকে ঔষধ দিল; এবং তাহা পানিতে মিশাইয়া হাসানকে পান করিতে নির্দেশ দিয়া দুষ্টা স্ত্রীলোক বিদায় গ্রহণ করিল। সূর্যাস্তের সময় রোজাদার হাসান এফ্‌তারের জন্য পানি চাহিলেন। তখন সরলবিশ্বাসীপত্নী ঔষধ মিশ্রিত পানি দিলেন। সেই পানি পান করিবামাত্র হাসান যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন এবং মৃত্যু বরণ করিলেন। মর্সীয়া সাহিত্যের অন্যান্য কাব্যে স্বামিহন্তাকারী হাসানপত্নীকে সরলবিশ্বাসীরূপে চিত্রিত করা হয় নাই।

বিষের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া হাসান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সতী সাধ্বী জয়নব স্বামিশোকে পাগলিনী।

'খীন (ক্ষীণ) হৈল তনু মোর বিচ্ছেদে তোমার।
খেমাই (ক্ষেমাই) রাখিতে চিন্তা না পারিএ আর ॥
খোদাএ করিল মোর এথ বিড়ম্বন[২০]।'

অতঃপর, এজিদ মদীনার গভর্ণর উলিদকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, সে যেন হোসেন প্রভৃতিকে তাঁহার নামে বয়অ'ত করে। তদনুসারে, হোসেন উলিদের নিকট হইতে আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়া ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈন্যসহ মদীনায় উলিদের রাজদরবারে উপস্থিত হইবার জন্য গমন করিলেন। তিনি অশ্বারোহিগণকে দরজার নিকট মোতায়েন করিয়া নিজে উলিদের দরবারে উপস্থিত হইলেন। উলিদ বিনয়সূচক কণ্ঠে তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন; কিন্তু কূটবুদ্ধি মেরুয়া হোসেনকে হত্যা করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিলে হোসেন ক্রুদ্ধ হইলেন। ত্রিশজন সওয়ার ছুটিয়া আসিয়া হোসেনের পার্শ্বে দাঁড়াইল। হোসেন তাহাদিগকে কলহ করিতে নিষেধ করিলেন। পরক্ষণেই অশ্বারোহী অনুচর-বৃন্দসহ তিনি দরবারকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এজিদ তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য অহর্নিশ চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া তিনি মদীনা হইতে মক্কা গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হোসেন এজিদকে খলীফা বলিয়া স্বীকার করেন নাই; কুফাবাসিগণ ইহা জানিতে পারিয়া দেড়শত পত্র লিখিয়া তাঁহাকে কুফা গমনের জন্য বারংবার আমন্ত্রণ জানাইল[২১]। হোসেন কুফা গমনের জন্য

---

২০ শৈখ ফয়জুল্লাহ্ : জয়নবের চৌতিশা।

২১ কুফাবাসী কর্তৃক হোসেনকে আমন্ত্রণের বৃত্তান্ত হায়াৎ মাহমূদের কাব্যে নাই। হায়াতের কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে, হোসেন এজিদের বশ্যতা

প্রস্তুত হইলেন। কুফীগণ পূর্বে হযরত আলী ও ইমাম হাসানের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে হোসেনের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়গণ ইহা তাঁহাকে জানাইলেন; কিন্তু হোসেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তখন সকলে মিলিয়া হোসেনকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যখন নিতান্তই কুফাগমনে দৃঢ়সংকল্প তখন কুফাবাসীর যথার্থ মনোভাব পূর্বাহ্ণে জানিয়া লওয়ার জন্য একজন প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেওয়া উত্তম। হোসেন এ-কথা সঙ্গত মনে করিয়া তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা মুসলিম বিন্ আকীলকে প্রতিনিধিরূপে কুফা প্রেরণ করিলেন। মুসলিম মারফত কুফার অধিবাসিগণের বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাইলে তিনি সদলবলে কুফা গমন করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। মুসলিম দুই বালকপুত্র ইবরাহিম ও মোহাম্মদ (মুহম্মদ) সহ রওয়ানা হন[২২]। পথিমধ্যে দুঃখকষ্ট ভোগের পর মুসলিম পুত্রদ্বয়সহ কুফা গিয়া উপস্থিত হন। মুসলিমকে হোসেনের প্রতিনিধিরূপে প্রাপ্ত হইয়া কুফাবাসী জনসাধারণ সন্তোষ প্রকাশ করিল এবং মুসলিমের হাতে হোসেনের নামে আঠার হাজার কুফী 'বয়'অত' (বশ্যতা স্বীকার) হইলে মুসলিম,

---

স্বীকার না করিলে এজিদ কুফীয়ার (কুফা) শাসনকর্তা (গভর্ণর) কুফিয়াকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যেন সে (কুফিয়া) হোসেনকে কুফীয়া গমন করিবার জন্য পত্র লিখিয়া প্রলুব্ধ করে। গভর্ণর কুফিয়া তাহাই করিল। হোসেন বাবী সালমার নিকট হইতে জানিয়া লইলেন যে, তাঁহার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী। শুনিয়া হোসেন কাঁদিলেন। অতঃপর রসূলের মাযারে গমন করিয়া সেখানে ঘুমাইয়া পড়িয়া স্বপ্ন দেখিলেন যে, রসূল তাঁহাকে কুফীয়ায় গমন করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিতেছেন। তখন তিনি অনুচরসহ কুফীয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

২২ ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুসলিম এক হাজার সৈন্য সঙ্গে করিয়া কুফা গমন করেন। ইহাতে মুসলিমের দুই বালক পুত্রের কথার উল্লেখ নাই।

ভ্রাতা হোসেনকে এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, কুফাগমনের পক্ষে কোন বিঘ্ন নাই। কুফাবাসীরা অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত। হোসেন মুসলিমের পত্রপাঠ মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া কুফা রওয়ানা হইলেন। এদিকে কুফার কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তি গোপনে দামেস্কের খলীফা এজিদের নিকট গুপ্তচর পাঠাইয়া জানাইয়া দিল যে, হোসেনের খুল্লতাত ভ্রাতা মুসলিম কুফায় আসিয়া কুফাবাসীকে হোসেনের নামে বয়'অত করিতেছেন। এজিদ এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অনতিবিলম্বে বসরা শহরের হাকিম (গভর্ণর) আবদুল্লাহ্ যেয়াদকে নিয়োগপত্র সহ কুফার শাসনভার গ্রহণ করিতে এবং তথায় হোসেনের প্রাধান্য নষ্ট করিতে নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ্ যেয়াদ ইতঃপূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, মক্কা হইতে হোসেন কুফায় আসিবেন। কাজেই, তিনি চতুরতাপূর্বক আরবীয় হাজীর বেশ ধারণ করিয়া কুফায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুফীগণ আবদুল্লাহ্ যেয়াদকে হোসেন বলিয়া ভুল করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল এবং তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এই সময়ে হঠাৎ মুসলিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে কহিলেন যে, এ-ব্যক্তি হোসেন নহেন—আবদুল্লাহ্ যেয়াদ। আবদুল্লাহ্ ধরা পড়িবামাত্র নিজের ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিলেন। ইহাতে সকলে আশ্চর্যান্বিত এবং লজ্জিত হইয়া নিজ নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

আবদুল্লাহ্ যেয়াদ কুফাবাসীকে নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করিলে তাহারা হোসেনের বয়অ'ত পরিত্যাগ করিয়া এজিদের বয়অ'ত স্বীকার করিল। মুসলিম নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হইলেন। আবদুল্লাহ্ যেয়াদের কুফার কর্তৃত্ব লাভের পূর্বে যে-কুফীগণ সর্বপ্রকারে হোসেনের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা একে একে মুসলিমের বিপক্ষে দাঁড়াইল। নিরুপায় মুসলিম শেষে

রসূল-ভক্ত কছিরের বাড়িতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আবদুল্লাহ্‌র কর্ণে এই সংবাদ গিয়া পৌঁছিলে সে 'কছিরের ছের কাটি করে দুইখান'। শুধু তাহাই নহে, 'কছিরের জরু বেটার কাটিল গর্দান'। অতঃপর মুসলিম, হানির ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ্‌ ক্রোধান্বিত হইয়া হানিকে কারারুদ্ধ করে এবং তাহার প্রতি অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। কাজী সরিহ্‌ নামক এক রসূলভক্তের বাড়িতে মুসলিমের দুই বালকপুত্র অবস্থান করিতেছিল। তথা হইতে মুসলিম, পুত্রদ্বয়কে এক পুণ্যাত্মা মহিলা তুয়া বীবীর ঘরে লইয়া গেলেন। বীবী রসূল বংশকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কাজেই, তুয়া বীবী মুসলিমের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে পরম সমাদর করেন। তুয়া বীবীর এক পুত্র ছিল। তাঁহার এই পুত্রের দ্বারা নিযুক্ত এক গোলামের কারসাজীতে মুসলিমের সংবাদ আবদুল্লাহ্‌ যেয়াদের গোচরীভূত হইল। মুসলিম কুফীগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মদান করিলেন। তারপর, আবদুল্লাহ্‌ যেয়াদ মুসলিমের পুত্রদ্বয়ের সন্ধান করিয়া তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারাগারের দারোগা মসকূর দয়ার্দ্র-চিত্ত ছিলেন। তিনি দয়াপরবশ হইয়া বালকদ্বয়কে দুইটি অঙ্গুরী প্রদান করিয়া কাদসিয়ার পথের উদ্দেশ্যে গমনের জন্য যথারীতি নির্দেশ দিলেন। মস্‌কূর বালকদ্বয়কে ছাড়িয়া দিয়াছে এ-সংবাদ আবদুল্লাহ্‌ জানিতে পারিয়া তাহাকে কঠোর শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। শাস্তির ফলে মস্‌কূরের মৃত্যু ঘটে। বালকদ্বয়কে ছাড়িয়া দিলে তাহারা কাদসিয়ার পথ ধরিয়া অনেক হাঁটিল; অবশেষে ক্লান্ত হইয়া দূরে এক খোরমার বাগিচা দেখিয়া তাহারা উহার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং একটি গাছের কুঠ্‌রীর মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। সেই বাগিচার এক তালাবে পানি লইতে আসিয়া এক বাঁদী সুদর্শন বালকদ্বয়কে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া

বিস্মিত হইল। বাঁদী তাহাদিগকে পুণ্যাত্মা গৃহকর্ত্রীর নিকট লইয়া গেল। নবীভক্ত বীবী ভ্রাতৃদ্বয়কে রসূল-বংশধর জানিতে পারিয়া তাহাদের খুব আদরযত্ন করিল এবং তাহাদিগকে ঘরের অন্য একটি কামরায় নিরাপদে থাকিবার ব্যবস্থা করিল। বীবীর স্বামী হারেস ছিল মহাপাপী। সে এই বালকদ্বয়কে খুঁজিয়া খুঁজিয়াই সারাদিন কাটাইয়া দিয়াছে; কারণ তাহাদিগকে ধরাইয়া দিতে পারিলে আবদুল্লাহ্‌র ঘোষিত হাজার টাকার পুরস্কার সে লাভ করিবে। সারাদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে ব্যর্থমনোরথ হয়; অবশেষে ক্লান্ত দেহে রাত্রিতে বাড়ি ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। গভীর রাত্রিতে বালকদ্বয় পার্শ্ববর্তী কক্ষে স্বপ্ন দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলে হারেস প্রথমে ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারে নাই। তারপর যখন বুঝিতে পারিল, তখন সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। পিতৃহীন বালক দুইটিকে নিষ্ঠুর স্বামীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অভিলাষে বীবী অনেক অনুনয় বিনয় করিল। কিন্তু নিষ্ঠুর হারেস স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করিল না। সে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া শির আবদুল্লাহ্ যেয়াদকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যে প্রাতঃকালে ফোরাত নদীর দিকে যাত্রা করিল। বালকদ্বয়কে রক্ষা করিতে গিয়া হারেসের পত্নী, পুত্র এবং গোলাম মৃত্যু বরণ করে; তবু হারেস পৈশাচিক কার্য হইতে বিরত হয় নাই। হারেস খড়্গাঘাতে বালকদ্বয়ের মাথা কাটিয়া কুফায় আবদুল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত করে। আবদুল্লাহ্ যেয়াদ নিজেও অতিশয় কঠোর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তথাপি, তিনি বালকদ্বয়ের এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত না হইয়া পারিলেন না। তিনি তাহাকে (হারেস) তাহার জঘন্য কার্যের পুরস্কার ত দিলেনই না; অধিকন্তু তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য আদেশ দিলেন। মকতূল নামক এক ব্যক্তি হারেসকে কঠোরভাবে শাস্তি দিয়া হত্যা করিল। হারেসের মৃতদেহ

নদী বা মাটি কেহই গ্রহণ করিল না ; অগত্যা অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হইল। মকতুল মুসলিম-পুত্রদ্বয়ের খণ্ডিত শির আনিয়া ফোরাত নদীর পানিতে ফেলিলে তাহা ধড়ের সঙ্গে জোড়া লাগে। অতঃপর তাহা জমিতে দাফন করা হয়।

হোসেন, মুসলিমের পত্র পাইয়া পরিবার-পরিজন এবং অনুচর সমভিব্যাহারে কুফা রওয়ানা হইয়াছেন। কিন্তু :

'হোসাইন যে দিন যায় ছাড়িয়া মক্কায়।
মোসলেম সেদিন হয় শহীদ কুফায়'[২৩] ॥

কুফার পথে হোসেনের সহিত কয়েক ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটে[২৪]। তাহারা তাঁহাকে কুফাবাসীর হস্তে মুসলিম ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। হোসেন শুনিয়া মর্মপীড়ায় পীড়িত হইলেন। হোসেনের কাফেলা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্ষুদ্র দলটি কুফার সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এমন সময়ে আবদুল্লাহ্ যেয়াদের সেনাপতি[২৫] হোরের

২৩ কাজী আমিনুল হক : জঙ্গে কারবালা।

২৪ মুহম্মদ হামীদুল্লাহ্ খান 'গুলজার-ই-শাহাদৎ' কাব্যে বলেন, হোসেনের কুফা গমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 'উমর পুত্র আবদুল্লাহ্ মদীনা হইতে হোসেনের উদ্দেশ্যে গমন করেন। পথে তাহাদের দুই জনের সাক্ষাৎকার হইলে আবদুল্লাহ্, হোসেনকে নানাভাবে কুফা গমনে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হোসেন অস্বীকৃত হইলেন এবং প্রবোধ বাক্যে আবদুল্লাহ্কে ফিরাইয়া দিলেন।

২৫ হায়াৎ মাহ্মুদের 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যে কাহিনীটি অন্য প্রকারে বিবৃত হইয়াছে। তাহার কাব্যে হুর (হোর ?) আবদুল্লাহ্ যেয়াদের সেনাপতি হইলেও সে এজিদের পুত্র। এজিদ স্বীয় পুত্র হুরকে বহু সৈন্য-সামন্ত সহ কারবালায় প্রেরণ করেন। হুর কারবালায় আসিয়া

সহিত হোসেনের সাক্ষাৎ হইল। হোসেনকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করিবার জন্য এজিদ-সেনাপতি হোর বহু সৈন্যসামন্তসহ প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু সে 'অন্তরে রাখিত ভুক্তি রাসূল আল্লার'। হোর হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে রাত্রির গভীর অন্ধকারে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিল। হোসেন আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করিয়া অন্যদিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। কারণ 'খোদার কুদরতে সবে দিশা হারাইল'। তাঁহারা ফোরাত নদীর কূলে কারবালার বিস্তীর্ণ ময়দানে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং সেখানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। হোসেন, তাঁহার অনুচরবৃন্দ, মহিলা ও বালক-বালিকাগণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। পানির অভাবে শিবিরে হাহাকার পড়িয়া গেল। এক বিন্দু পানি সংগ্রহের কোন উপায় নাই। কারণ আবদুল্লাহ্ যেয়াদের নির্দেশক্রমে সেনাপতি উম্মর ছায়াদের সৈন্যবাহিনী ফোরাত নদীর কূল তিনদিক হইতে অবরোধ করিয়াছে। বালুকাময় সুবিস্তীর্ণ মরুভূমির কোথাও বৃক্ষাদির চিহ্নমাত্র নাই। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে দুধের বাচ্চারা মৃতপ্রায়; শিবিরের মধ্যে

হোসেনের শোচনীয় অবস্থা দেখিলেন। এতৎভিন্ন, পরকাল চিন্তা করিয়া হুর এজিদের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক হোসেনের পক্ষে যোগদান করিলেন। হুরের অন্যান্য সেনাপতিও যুদ্ধ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এজিদ এ-কথা জানিতে পারিয়া সীমারকে পাঠাইলেন। সীমার আসিয়া সৈন্যগণকে পুনরায় এজিদের পক্ষে ফিরাইয়া আনিল। আবার সকলে কোমর বাঁধিয়া হোসেন-হত্যায় মনোনিবেশ করিল। কিন্তু হুর হোসেনের পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি যুদ্ধ করিয়া এজিদের সৈন্য হস্তে প্রাণ বিসর্জন করেন।

মুহম্মদ হামীদুল্লাহ্‌র 'গোলজার-ই-শাহাদৎ' কাব্যে বর্ণিত হোরও (হুর নহে) এজিদের পুত্র।

'পানি বিনে আর কিছু মুখে নাহি বোল'। কুফার খারিজীগণ পানি বন্ধ করিলে 'মউত বিনেতে আর না আছে আসান'। হোসেন শত্রুগণকে তিনটি শর্ত প্রদান করা সত্ত্বেও শত্রুগণ তাঁহাকে অনুচর-গণ সহ হত্যার জন্য প্রস্তুত হইল এবং দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

হোসেন তদীয় অনুচরগণকে এই আশু বিপদ হইতে আত্মরক্ষার্থে তথা হইতে নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহারা এই মহাবিপদে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। এদিকে শত্রুসৈন্যদল তাঁহাদের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন নিরুপায় হইয়া হোসেনের অনুচর এবং আত্মীয়স্বজন শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মপ্রাণ বলী দিতে লাগিলেন। দশই মুহর্রম সকাল বেলা হোসেন গায়েবী আওয়াজ শুনিলেন। তিনি তখন নামাযের মোশাহেদায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, অনেকগুলি কুকুর আক্রমনোদ্যত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইতেছে। কুকুরগুলির মধ্যে একটি কুকুরের 'সফেদ' দাগ ছিল। ইহা হোসেনের হত্যাকারীর সাদা দাগের সঙ্কেত। ওদিকে এজিদ সেনাপতি হোরও স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিল এবং হোসেনের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য অনুতপ্ত হইল। অতঃপর, হোর হোসেনের নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পানি আনিবার জন্য অনুমতি চাহিল। হোসেন অনুমতি দিলেন। হোর বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষতদেহে হোসেনের নিকট আসিয়া তাঁহার দোয়া চাহিল। হোসেন জানাইলেন যে, তিনি তাহার দোষ ইতঃপূর্বেই ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি তাহাকে আরো জানাইলেন যে, তাহাকে (হোর) সঙ্গে না লইয়া তিনি বেহেস্তে গমন করিবেন না। শুনিয়া

হোর আনন্দিত-চিত্তে পুনরায় যুদ্ধ করিতে গমন করিয়া শাহাদৎ বরণ করিল। হোরের সঙ্গে তদীয় ভ্রাতা মুসাব, দুই পুত্র এবং এক গোলাম, হোসেনের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। তাহারাও এজিদ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুবরণ করে।

আবদুল ওহাব নামক কল্‌বী-বংশীয় এক ব্যক্তি তদীয় মাতা রাফিয়া ও পত্নীসহ হোসেনের সঙ্গী হইয়াছিলেন। নবী-পরিবারের মহাবিপদে ওহাবের বৃদ্ধা মাতা পুত্রকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলে সে সদ্য পরিণীতা যুবতী বধূর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক মাতৃ-আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া হোসেনের নিকট গমন করিলেন। ওহাব-পত্নী দুইটি শর্তে তাঁহার স্বামীকে শাহাদৎ বরণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ওহাব বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। হাসানপুত্র বীরবর কাসেম পিতৃপ্রদত্ত কবজ বাজুবন্দ হইতে খুলিয়া যুদ্ধে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হোসেন তৎক্ষণাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রকে কহিলেন যে, তাঁহাকে হাসান মৃত্যুর পূর্বে একটি ওয়াদায় (প্রতিজ্ঞা) আবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং, ওয়াদা অনুসারে সখিনাকে বিবাহ করিয়া তৎপর কাসেমের যুদ্ধে গমন করা উচিত। খুল্লতাতের সিদ্ধান্ত শুনিয়া কাসেম বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কারবালার রণ-প্রান্তর ক্ষণকালের জন্য বিবাহোৎসবে মুখর হইল। সখিনার সহিত বিবাহ সুসম্পন্ন হইবার অব্যবহিতকাল পরেই বীরবর—

'কাসেম রণেতে গেল ছকিনা বিষাদভেল
যেন দুঃখে বহু বিলাপিলা।
আহা প্রভু নিরঞ্জন হেন কৈলা কি কারণ
বিবার দিনে পতি হরি নিলা[২৬]॥'

---

২৬ জাফর : কারবালা।

কাসেম বীরবিক্রমে এজিদের অসংখ্য সৈন্য বধ করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে শাহাদৎ বরণ করিলেন। কাসেমের পর হযরত আলীর পুত্রগণ—আবূ বকর, জাফর, 'উসমান, আবদুল্লাহ্, 'উমর যুদ্ধ করিতে যান এবং তাঁহারা একে একে মৃত্যুবরণ করেন। হোসেনের ভ্রাতা আব্বাস মসক লইয়া পানি আনিবার জন্য গমন করিলেন। তিনি শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন। অতঃপর, মসক পানিতে পূর্ণ করিয়া চলিয়া আসিবার কালে বাজু ও মাথা কাটাইয়া শহীদ হন। এই সময়ে হোসেন-শিবিরে বীবী শাহেরবানুর শিশু পুত্র আলী আসগর পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ ও মুমূর্ষু। শিশু-পুত্রের জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই দেখিয়া বীবী শাহেরবানু স্বামীর নিকট করজোড়ে অনুনয় করিয়া বলিলেন, হয়ত এই নিষ্পাপ শিশুর মৃতপ্রায় অবস্থার কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলে কুফীগণ এক কাতরা পানি দিলেও দিতে পারে। পত্নীর কথা শুনিয়া হোসেন শিশুপুত্র আলী আসগরকে ক্রোড়ে উঠাইয়া অশ্বারোহণ পূর্বক শত্রুসৈন্যের সম্মুখে গিয়া পানি চাহিলেন। কিন্তু হায়! কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অধিকন্তু তাহারা তাঁহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অবশেষে একটি বিষাক্ত তীর আসিয়া আলী আসগরের কোমল বক্ষদেশ বিদ্ধ করিল। শিশুর রক্তে হোসেনের দেহ এবং পোষাক প্লাবিত হইল। ঐ অবস্থায় হোসেন শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। মৃতপুত্র দেখিয়া বীবী শাহেরবানু শোকে দুঃখে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে হোসেন তাঁহাকে এবং অন্যান্য মহিলাদের নানা উপদেশ ও প্রবোধ দিলেন এবং সকলকে বিপদে ধৈর্য ধারণ করিতে বলিলেন। তখন শিবিরে পুরুষ যোদ্ধাগণের মধ্যে রুগ্ন জয়নাল আবেদীন এবং স্বয়ং হোসেন ভিন্ন আর কেহই জীবিত ছিলেন না। জয়নাল রুগ্ন দেহেই যুদ্ধে গমন করিতে চাহিলেন। কিন্তু হোসেন তাঁহাকে

নিষেধ করিয়া অনেক উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান করিলেন। এইবার হোসেন নিজে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতোমধ্যে বীবী শাহেরবানু স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার শাশুড়ি বীবী ফাতিমা কারবালার ময়দান ঝাড়ু দিতেছেন। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বীবী ফাতিমা জবাব দিলেন ঃ

'সংগ্রামে পড়িবে কালি হোসেন এখানে।
এথা ঝাটি ছড়া আমি দেই তেকারণে॥
কঙ্কর না লাগে যেন পুত্রের বদনে[২৭]।

হোসেন স্ত্রীর নিকট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া একটু বিচলিত হইলেন। অবশেষে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এমন সময় হঠাৎ দশদিক ধূলার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া 'মেঘ হইতে নামিল এক আজব জোয়ান'। সে নামিয়াই হোসেনকে সালাম করিল। এই আজব জোয়ান পরীর সর্দার জাফর জাহেদী*। জাফর, হোসেনকে জানাইল যে, এক সময়ে হযরত আলী দেওগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করেন এবং রাজ্যটি তিনি জাফরের পিতাকে অর্পণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর জাফর জাহেদী তক্তে আরোহণ করিয়াছেন। তাই, আজ তিনি আলীর পুত্র হোসেনের এই মহাবিপদে দলবল লইয়া সাহায্য করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু হোসেন জাফরের সাহায্য গ্রহণ করিলেন না ; কারণ ঃ

'এছা জঙ্গ জায়েজ নহে শরিয়ত মতে।
সে কারণে তোমায় নাহি পারি আজ্ঞা দিতে[২৮]'।

এই বলিয়া তিনি জাফর জাহেদীকে বিদায় দিলেন। অতঃপর,

---

২৭ হায়াৎ মাহমূদ ঃ জারীজঙ্গনামা।

* কোন কোন কবির বর্ণিত জাফর সাদেক।

২৮ কাজী আমীনুল হক ঃ জঙ্গে কারবালা।

হোসেন একাকী এজিদের অসংখ্য সৈন্যবাহিনীর সহিত বীরবিক্রমে সংগ্রাম করিয়া শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত করিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর তিনি শত্রুসেনা নির্মূল করিয়া ফোরাত নদীতে অবতরণ করিলেন এবং অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া পানি উঠাইলেন। তিনি পানি পান করিতে যাইবেন এমন সময়ে শহীদগণের কথা তাঁহার স্মৃতি-পটে জাগ্রত হইল। তন্মুহূর্তে তিনি পানি ফেলিয়া দিলেন এবং নদী হইতে তীরে উঠিয়া আসিলেন। শত্রুসৈন্যগণ চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তিনি ক্ষতবিক্ষত দেহেও যুদ্ধ করিলেন। এমন সময়ে ঃ

....

এক তীর গর্দানেতে লাগে অবশেসে ॥
জেরাবক্ত পোস গায় কিছু না আছিল।
জহর আলুদ তীর গর্দানে লাগিল ॥
মোবারক গর্দানে যদি লাগিলেক তীর।
জ্বলিয়া উঠিল শাহা হইল অস্থির[২৯]।

অতিরিক্ত রক্তপাতে হোসেন দুর্বল হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। কুফী সৈন্যগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল ; কিন্তু 'ছের লিতে কাছে কেহ না যায় ডরিয়া'। অবশেষে সীমার লাইন* নামক এক দুর্বৃত্ত কোমর হইতে খঞ্জর খুলিয়া হোসেনের মস্তক কাটিবার জন্য তাঁহার বুকের উপর গিয়া বসিল। হোসেন বলিলেন, 'একবার খোল যদি ছাতি আপনার' তাহা হইলে 'বেহেস্তে লইব তুঝে সঙ্গেতে আমার'। সীমার কাপড় খুলিয়া বক্ষস্থল দেখাইল। হোসেন

---

২৯ ফকীর গরীবুল্লাহ্ : জঙ্গনামা।

* মুহম্মদ মুনশীর কাব্যের 'সোমরা'। এবং মুহম্মদ হামীদুল্লাহ্ খানের কাব্যে আছে 'সেম্রে'।

তাহার বক্ষস্থলে 'কাতেলের আলামত' (হত্যাকারীর সঙ্কেত) সাদাদাগ দেখিতে পাইলেন। এতৎভিন্ন, তাহার 'ছাতিতে পশম নাই কাফেরী দেমাগ'। সীমার তীক্ষ্ণধার খঞ্জর হোসেনের হলকুমের উপর সজোরে চালনা করিলে হোসেন যন্ত্রনায় কাতর হইলেন। কিন্তু তাঁহার গ্রীবাদেশ একচুল পরিমাণও কাটিল না। হোসেন বলিলেন, মাতামহ রসূলুল্লাহ তাঁহার গ্রীবাদেশে বারংবার চুম্বন করিতেন। কাজেই, সেখানে অস্ত্র বসিতেছে না। সীমার বারংবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলে হোসেনের পরামর্শক্রমে তীরবিদ্ধ স্থানে খঞ্জর চালাইয়া শির ও ধড় দ্বিখণ্ডিত করিল[ক]। স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ, পাতাল, গ্রহ, তারা হোসেনের শোকে বিলাপ করিতে লাগিল। হোসেনের মস্তকহীন দেহ আবদুল্লাহ্ যেয়াদের আদেশে অশ্বক্ষুরে দলিত ও মথিত করা হইল।

হোসেনের এক রেকাব-বর্দার প্রভুর শিরশূন্য ধড়ের নিকট অগ্রসর হইয়া মূল্যবান ইজারবন্দ ও অঙ্গুরী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। অমনি হোসেনের দুই হস্ত তাহাকে ধৃত করিলে দুর্বৃত্ত অস্ত্রের দ্বারা হস্তদ্বয় ছিন্ন করিল। এই সময়ে দৈববাণী হইল যে, তাহাকে এই দুষ্কার্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অতঃপর, সে দেখিতে পাইল, নবী এবং নবীপত্নীগণ মেঘারোহী হইয়া একে একে হোসেনের মৃতদেহের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বীবী ফাতিমা প্রিয় পুত্রের মস্তক ও হস্তদ্বয় ছিন্ন দেখিয়া শোকাকুল হইলে রেকাব-বর্দার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইল। বীবী তাহাকে ক্ষমা করিলেন বটে; কিন্তু ইবরাহীম নবীর চপেটাঘাতে তাহার মুখমণ্ডল কদাকার হইয়া

ক. মুহম্মদ হামীদুল্লাহ্ খানের 'গুলজার-ই-শাহাদৎ' কাব্যে আছে যে সেম্রে, খোলি এবং ছানান একসঙ্গে হোসেনকে হত্যা করে।

গেল। হোসেনের শাহাদতের পর তাহার শিবির লুণ্ঠিত হইল এবং একমাত্র রসুল-পত্নী বীবী উম্মে সালমা ভিন্ন অন্যান্য মহিলাগণের বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি ছিনাইয়া লওয়া হইল। এজিদের সৈন্য বাহিনী হোসেন-শির নেজায় গাঁথিয়া তৎসঙ্গে তাঁহার পরিবারবর্গকে কুফাভিমুখে লইয়া গেল।

পথ চলিতে চলিতে রাত্রি আসন্ন হইলে নরাধম খোলি, ওহাব নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় লইয়া রাত্রি কাটাইল। তিনদিন পরে তাহারা কুফার সীমান্তে গিয়া পৌঁছিলে খোলি নিজের বাড়িতে গমন করে। সে তাহার ধর্মাত্মা পত্নীর নিকট হইতে হোসেন-শির রক্ষার নিমিত্ত তন্দুরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে। বীবী মধ্য রাত্রিতে তাহাজ্জদ নামাজ পড়িতে উঠিয়া তন্দুরের মধ্য হইতে এক অপূর্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল।

সে আরও দেখিল যে, শিরের নিকট চারিজন মহিলা আসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। অল্পক্ষণ পরে তাঁহারা অদৃশ্য হইয়া গেলে বীবী হাতেফ মারফত জানিতে পারিলেন যে, এই শির ইমাম হোসেনের এবং বীবী চতুষ্টয়ঃ বীবী ফাতিমা, বীবী খাদিজা, বীবী আমিনা এবং রসুলুল্লাহ্‌র পিতামহী। অতঃপর, খোলির বীবী দুষ্ক্রিয়াশীল স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

শির কুফায় আবদুল্লাহ্‌ যেয়াদের নিকট আনয়ন করা হইলে তিনি শিরের উপর বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ইউসুফ ও জায়েদ নামক দুই সাহাবা প্রতিবাদ জানায়। অতঃপর, আবদুল্লাহ্‌ ছিন্ন শির লইয়া লোফালুফি খেলিতে থাকেন। হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তিনি হোসেন-শির নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। এ চেহারা কেমন?

কি কব সুরত পাক নূরের গঠন।
দপ্‌ দপ্‌ জ্বলে রূপ চাঁদের মতন॥

নূরের গঠন তাঁর চেহারাতে ছিল।
চাঁদ পূর্ণিমার যেন উদয় হইল॥[৩০]

এমন সময়ে হঠাৎ একবিন্দু রক্ত কাটা শির হইতে আবদুল্লাহ্ যেয়াদের কাপড় ও জানুতে লাগিলে জানু তন্মুহূর্তে জখম হইল। তাঁহাকে আজীবন এই জখমের কষ্ট ভোগ করিতে হয়। অতঃপর, সীমার পনর হাজার সৈন্যসহ হোসেন-শির কুফা হইতে দামেস্কে লইয়া চলিল। পথে পড়িল হেরাণ শহর। হেরাণের ইহুদী বাদশাহ্ এহিয়া হোসেনভক্ত ছিলেন। খোলি ও সীমার হোসেন-শির দামেস্কে এজিদের নিকট ভেট দিতে লইয়া যাইতেছে শুনিয়া তিনি ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করেন এবং শির ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করেন। সীমারের সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধে এহিয়া পরাজিত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন[৩১]। সীমার শিরসহ পুনরায় দামেস্কের দিকে রওয়ানা হয়। সীমারের

---

৩০ সাদ আলী ও আবদুল ওহাব: শহীদে কারবালা।

৩১ হেরাণের ইহুদী-বাদশাহ্ এহিয়ার আত্মদান-কাহিনীর সহিত গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যবর্ণিত ব্রাহ্মণ চন্দ্রভানের সপরিবারে আত্মত্যাগ সম্পর্কিত কাহিনীর আংশিক মিল আছে। গরীবুল্লাহ্ লিখিয়াছেন, যেয়াদ (অন্য কাব্যে সীমার) হোসেন-শির চন্দ্রভানের নিকট রক্ষা করিলে সে শির লইয়া অন্দরে রাখিয়া দিল। চন্দ্রভান রাত্রি কালে:

'দেখিল উজালা ঘর মানিক প্রকাশে।
পূর্ণিমার চান্দ যেন উদয় আকাশে॥
বাহমন দেখিল যদি রূপ অনুপাম।
মনেতে জানিল মোর সিদ্ধ হৈল কাম॥
বড় সাধ ছিল যে তোমার কাছে গিয়া।
ইমান আনিব আমি কলেমা পড়িয়া॥'

অতঃপর, সপরিবারে কালেমা পড়িয়া চন্দ্রভান ইসলাম গ্রহণ করে। প্রাতঃকালে যেয়াদ চন্দ্রভানের নিকট শির চাহিল; কিন্তু চন্দ্রভান

কাফেলায় হোসেনের পরিবারবর্গও ছিলেন। কিন্তু মহিলা ও বালক-বালিকাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। তাঁহারা ছিন্ন বসনে কোন প্রকারে আব্রু রক্ষা করিয়াছিলেন। এক সময়ে কাফেলা কোন পাহাড়ের নিম্নে বস্তিমধ্যে আসিয়া পৌঁছে। বস্তিতে কয়েকজন ইহুদী বাস করিত। তাহারা কাপড় বুনিত। শিরীন নাম্নী হোসেনের এক পুণ্যবতী ক্রীতদাসী বীবী শাহেরবানুর সঙ্গে ছিল। হোসেনের সঙ্গে শাহেরবানুর বিবাহের সময় শিরীনকে 'আজাদ' করিয়া দেওয়া হয়। শিরীন, বীবীর নিকট নিবেদন করিল যে, বস্তিতে গিয়া সে ইহুদীগণের নিকট হইতে কিছু বস্ত্র খরিদ করিয়া আনিতে চায়। বীবী অনুমতি দিলে শিরীন একপ্রহর রাত্রিতে পাহাড়ে গিয়া পৌঁছিল। কিন্তু সে 'কেল্লার ফটক বন্ধ দেখিল তখন'। সেই মুহূর্তে শহর-কোতোয়াল আজীজ সেই বস্তির মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়া কেল্লার ফটকের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। কোতোয়াল ফটক খুলিলে 'কেল্লার ভিতরে শিরীন পৌঁছিল যাইয়া'। তাহাকে আজীজ খাতির করিল। সে স্বপ্নে নবী মোস্তফার প্রিয়তম দৌহিত্রের হত্যাবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিল। সে তাহা বর্ণনা করিবার সময় ক্রন্দন করিল। সে আরও জানাইল যে, হযরত নবী স্বপ্নে তাহাকে জানাইয়াছেন 'শিরীনের সাথে নেকা হইবে তোমার'।

প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, 'না দিব এমামের শির বদ্‌জাত কাফেরে'। সে সাতপুত্রকে এমাম-শিরের মর্যাদা রক্ষা করিতে বলিলে একে একে পুত্রগণ আত্মদান করিয়া নিজেদের মস্তক দিল। রক্তরঞ্জিত এক একটি শির দেখিয়া য়েয়াদ়:

কহিল যে এই ছের নহে এমামের।
এমামের মুখে আছে চটক্ চাঁদের ॥

শেষে চন্দ্রভান এবং তাহার স্ত্রী য়েয়াদের সৈন্যের সহিত লড়িয়া মৃত্যুবরণ

অতঃপর, আজীজ শিরীনের সহিত গমন করিয়া এজিদের সৈন্যকে এক হাজার দেরেম এবং জয়নুল আবেদীনের নিকট আসিয়া কাপড়চোপড় এবং হাজার 'আশরফি' অর্পণ করিল। জয়নুলের কাছে আজীজ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর, আজীজ হোসেন-শির লক্ষ্য করিয়া সালাম করিলে তৎক্ষণাৎ শির হইতে উত্তর আসিল। বীবী শাহেরবানু আজীজের সহিত শিরীনের বিবাহ দিলেন। পরদিন কাফেলা বস্তি ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইল।

পথিমধ্যে মসিব খাজাই নামক জনৈক সরদার হোসেন-শির ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে রাত্রি আসন্ন হইলে খারিজীগণ এক বোতখানায় গমন করিল এবং দলপতি সীমার বোতখানার বৃদ্ধ পীরের নিকট সব কথা খুলিয়া বলিলে পীর তাহাদের নিরাপদে থাকিতে আশ্রয় দিল। পীর শির লইয়া এক সিন্দুকের মধ্যে রাখিবার ব্যবস্থা করিল। গভীর রাত্রিতে তামাম লোক ঘুমাইয়া পড়িলে বৃদ্ধ পীর 'ইমাম শির' চুম্বন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে; অকস্মাৎ—

'ঘরের ভিতরে বড় রৌশন দেখিল।
যেয়ছাই হাজার বাতি কেহ জ্বালাইল॥
পীর মর্দ ঘাবড়াইয়া কহিল এয়ছাই।
ইয়া এলাহি এ কেয়ছা রৌশনি দেখা পাই'[৩২]॥

বৃদ্ধ পীর বেহুঁশ হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া সে ঐ ছিন্ন শিরে সযত্নে সুগন্ধি দ্রব্য মাখাইল এবং তাহা দুই জানুর

করিলে যেয়াদ শির লইয়া দামেস্কের পথ ধরিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যের যেয়াদ-কাহিনীই পরবর্তীকালে 'বিবাদসিন্ধু' -প্রণেতা মীর মুশার্‌রফ হোসেনকে আজরকাহিনী রচনায় প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

৩২ জনাব আলী: শহীদে কারবালা।

উপর রাখিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এমন সময় 'শির মোবারক হইতে নেকালে আওাজ' যে 'রসূলের কলেজার টুকরা হই আমি'। বৃদ্ধ পীর কাটা শিরের পরিচয় পাইয়া 'জারে জার কান্দে'। সে তৎক্ষণাৎ তাহার বাহাত্তর জন সঙ্গীসহ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইল। কিন্তু কুফীগণ পীরের নিকট হইতে শির ছিনাইয়া লইয়া দামেস্কের পথ ধরিল। পথিমধ্যে একস্থানে যখন তাহারা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া মদ্যপান করিতেছিল, তখন একটা গায়েবী লোহার কলমের আবির্ভাব হয়। কলম রক্ত দিয়া মাটিতে লিখিয়া চলিল। রাহিব নামক এক ব্যক্তি খারিজী সৈন্য-গণের নিকট হইতে এক রাত্রির জন্য শির নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে দশ হাজার টাকা দিল এবং নিজে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিল। সৈন্যগণ সেই টাকা বন্টন করিবার কালে হঠাৎ দেখিতে পাইল যে, টাকা ভস্মে পরিণত হইয়াছে। অতঃপর রাহিবকে হত্যা করিয়া খারিজী কুফীগণ স্থান ত্যাগ করে। তাহারা হোসেন পরিবার-পরিজনসহ দামেস্কের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিলে সালেহ্ মুহম্মদ নামক এক ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্থ হোসেন পরিবার-পরিজনদের পানি পানের ব্যবস্থা করে এবং সে তাহার পাগড়ি ছিঁড়িয়া মহিলাদের মস্তকাবরণ তৈয়ার করিয়া দেয়। অবশেষে, হোসেন-শির ও মহিলাগণকে লইয়া এজিদের নিকট উপস্থিত করা হয়। তখন ঃ

> 'বসিয়াছে এজিদা তক্তে দিঞা বার ;
> খানুকা ছিরের উপর মারিল থর্কড় ।
> এজিদ বলে বাপ মুখে পাইল যমের ঘর ;
> খানুকা থার্কড় মেলেক ছিরের উপর[৩৩]।

---

৩৩ রাধাচরণ গোপ ঃ ইমামএনের কেচ্ছা।

এতদ্দর্শনে সমরাই সাহাবা মর্মবেদনায় ব্যথিত হইয়া এজিদের কার্যের প্রতিবাদ জানায় ও তাহাকে অভিসম্পাৎ করে। ইহাতে ক্রোধান্বিত এজিদ তাহাকে হত্যা করে।

দামেস্কে এজিদ-দরবারে হোসেন-শিরের সহিত হোসেনের একমাত্র জীবিত পুত্র জয়নুল আবেদীনকেও* উপস্থিত করা হয়। এজিদ তাহাকেও হত্যা করিতে আদেশ দিলে পর্দার ভিতর হইতে বীবী উম্মে কুলসুম হাঁকিয়া উঠিয়া প্রতিবাদ জানান। এজিদ নিরস্ত হন এবং হত্যার আদেশ প্রত্যাহার করেন। অতঃপর তিনি নিজের বালক-পুত্রের সহিত বালক জয়নুলকে কুস্তি লড়িতে আদেশ দেন। জয়নুল আবেদীনের নির্ভীকতা এবং সাহস দর্শনে তিনি সে আদেশ প্রত্যাহার করেন। এজিদ জয়নুলকে খুশী করিবার নিমিত্ত বলিলেন, তাঁহার কোন প্রার্থনা আছে কি না? তদুত্তরে জয়নুল জানাইলেন যে, তাঁহার কয়েকটি প্রার্থনা আছে। তদনুসারে বন্দিনীগণ মুক্তি পাইলেন, এবং শহীদের শিরসহ সকলে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি লাভ করিলেন। এইসঙ্গে জয়নুল আবেদীন দামেস্কের মস্‌জিদে খোৎবা পড়িবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। জুম্মার খোৎবায় তিনি হোসেন-হত্যার কাহিনী করুণ ভাষায় বর্ণনা করিলেন। বাদশাহ এজিদ দামেস্কের মুসলমানগণের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া নোমান নামক এক পুণ্যাত্মা সাহাবার তত্ত্বাবধানে জয়নুল আবেদীন ও হোসেম-পরিবারসহ শহীদের শির মদীনায় প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। নোমান অত্যন্ত সম্মানের সহিত নবীজীর পরিবার-পরিজনকে মদীনায় পৌঁছাইয়া দিলেন। বীবী জয়নব ও বীবী কুলসুম তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলে নবী-ভক্ত নোমান তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, তিনি ইসলামের একজন দীন

---

* কবি হামিদের 'সংগ্রাম হুসন' কাব্যের আলীআসগর।

খাদেম। রসূলের শাফায়ত ভিন্ন তিনি অন্য কোন পুরস্কার চাহেন না। তখন বীবীদ্বয় তাঁহার জন্য দোওয়া করিলেন। সকলে মদীনায় পৌঁছিলে সেখানে শোকের মাতম পড়িয়া গেল।

অতঃপর, এজিদের সৈন্য-সামন্ত মক্কা-মদীনার বিদ্রোহী জনসাধারণকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করে এবং লুটতরাজ করিয়া মক্কা-মদীনা নগরী ধ্বংস করে। মক্কার কাবাঘর পর্যন্ত তাহাদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অতঃপর, জয়নুল আবেদীন দূত মারফত আম্বাজ[৩৪] শহরে পিতৃব্য মুহম্মদ হানিফার কাছে পত্র পাঠাইলেন। জয়নুল আবেদীন তখনও শোকে মুহ্যমান। তখন বীবী উম্মে সাল্‌মা তাঁহাকে মুহম্মদ হানিফার জীবনের বাল্যকাহিনী বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আম্বাজ শহরের রাণী বীরাঙ্গনা হনুফা বীবীর গর্ভে এবং আলীর ঔরসে মহাবীর হানিফার জন্ম হয়। বীবী ফাতিমার ভয়ে হযরত আলী এক বছরের শিশুকে আনিয়া মদীনায় হযরত রসূলের কাছে গমন করিলেন। রসূল নিজের নামের সহিত মিলাইয়া শিশুর নাম 'মুহম্মদ হানিফা' রাখিলেন এবং তাঁহাকে আদর ও চুম্বন করিলেন। বীবী ফাতিমা ইহা দেখিয়া দুঃখিত হন। তখন নবীজী প্রিয় কন্যাকে বলিলেন, একদিন যখন শত্রুগণ বিষপ্রয়োগে হাসানকে শহীদ করিবে এবং কারবালায় হোসেনের শিরশ্ছেদন করিবে, তখন এই হানিফা বীরবিক্রমে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের হত্যার প্রতিশোধ লইবে। বীবী ফাতিমা রসূলের কথা শ্রবণ করিয়া শোকাকুল হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ শিশুকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'মহা বলবন্ত হও শত্রু সংহারিতে'। অতঃপর, হানিফার মাত্র বার বৎসর বয়সের সময় আলী একবার

---

৩৪ হায়াৎ মাহমুদের বর্ণিত 'বন্যাজ' শহর।

খোয়াজী শহরে যুদ্ধে যান। মাতৃমুখে সংবাদ শুনিয়া বালক হানিফা পিতৃসাহায্যে যুদ্ধে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

... ...

বাপের সাহায্য যুদ্ধে করিব গমন॥
বিচিত্র কবজ পরি দিব্য শিরস্ত্রান।
উচ্চৈশ্রবা রথে চড়ি হাতে ধনুর্বাণ॥
দ্বাদশ বৎসরের বালা নূতন যৌবন।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ রূপেতে মদন॥
সাজিল আলীর পুত্র শিরে শিরস্ত্রান[৩৫]।

তিনি যেইমাত্র একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় গিয়া হাযির হইয়াছেন, অমনি হযরত আলী আসিয়া সেখানে পৌঁছিলেন। পিতাপুত্রের কোন পরিচয় ছিল না। বালক হানিফা তাঁহাকে অন্য কোন যোদ্ধা ভাবিয়া সম্মান দেখান নাই। তখন আলী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'অশ্বপরে আরোহিলে করিতে সংগ্রাম'। অতঃপর, উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইল। আলী বালকের রণকৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। আলী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে—

'শিশুবরে কহিলেক মধুর ভারতী।
আলীর নন্দন আমি রসূলের নাতি॥
নাম মোর মোহাম্মদ হানিফা সুজন।
কি করিবা কর এবে শক্তি অনুমান[৩৬]।

আলীর মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, এই বীর বালক তাঁহারই পুত্র। তখন তিনি 'ললাটে চুম্বন দিল অধর নয়নে'।

---

৩৫ মুহম্মদ খান : মকতুল হুসৈন।
৩৬ ঐ

পিতাপুত্রের মিলন হইল। তারপর আলী মদীনায় চলিয়া যান এবং মুহম্মদ হানিফা হনুফা শহরের বাদশাহ্ হন।

হানিফা দূত মারফত ভ্রাতৃহত্যার সংবাদ পাইয়া শোকে দুঃখে অভিভূত হইলেন। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। হানিফার আদেশে 'রতনকাঞ্চনধন' এবং 'লক্ষ লক্ষ মণিমুক্তা' সংগৃহীত হইল। তিনি বিভিন্ন দেশের বাদশাহ্ ও শাসকগণের নিকট পত্র লিখিলেন ও আলীর অপর দুই পুত্র সমরখন্দ ও বাগদাদের অধিপতি উম্মর ও আব্বাসকে সসৈন্যে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর, তিনি ইরাকের বাদ্শাহ্ মুসলিম কাক্কা, তুরুকের রাজা ওফিয়ান, ওক্কাস* শহরের অধিপতি ইবরাহিম ওস্তুর প্রভৃতিকে রণসাজে সজ্জিত হইয়া মদীনাভিমুখে রওয়ানা হইবার জন্য পত্র দিলেন। এতৎভিন্ন একস্তা শহর, তোগান প্রভৃতি স্থান হইতেও মদীনার উপকণ্ঠে সৈন্য আসিতে লাগিল। আম্বাজ হইতে হানিফা তাঁহার পাত্রমিত্র, উযিরনাযির, সতেলা ভ্রাতা বাহারাম, তালেব, মোসেব, আক্কাস, চাপলুস, আকবর, আবদুর রহমান, গাজী রহমান প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া বিদ্যুৎগতিতে মদীনার দিকে ছুটিলেন; এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মদীনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অলিদ্, হানীফার সসৈন্যে মদীনা পৌঁছিবার সংবাদ দামেস্কে এজিদের নিকট পাঠাইলেন। ইতোমধ্যে, হানির[৩৭] ভ্রাতা আবিদের

---

* হায়াৎ মাহমুদের 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যে 'নকসব' শহর।

৩৭ হানি রসুলের একজন সাহাবা ছিলেন। এই কাহিনীর প্রথম দিকে উক্ত হইয়াছে যে, হোসেনের খুল্লতাত ভ্রাতা মুসলিমকে কুফায় স্বগৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া আবদুল্লাহ যেয়াদের আদেশে হানির মৃত্যু ঘটে।

পুত্র মুখ্‌তার, হোসেনের হন্তাকারী মহাদুর্জন আবদুল্লাহ্‌ যেয়াদ ও উমর সাদকে হত্যা করিবার জন্য কুফায় কয়েক হাজার সেনা সংগ্রহ করেন এবং যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরাভূত ও শিরশ্ছেদন করেন। অতঃপর, তাহাদের শির মদীনায় হানিফার নিকট প্রেরিত হয়। ইহার কিছুকাল পরেই মুখতার হোসেন-ঘাতক সীমারকে বাঁধিয়া মদীনায় লইয়া যান এবং সেখানে হানিফা এবং জয়নুল আবেদীনের নিকট উপস্থিত করেন। সীমারকে ভয়ানক শাস্তি দেওয়ায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অলিদের নিকট সংবাদ পাইবামাত্র এজিদ আবদুল্লাহ্‌, উমর, আবু হোরেরা, মেরূয়া প্রভৃতিকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও কয়েক সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ অলিদের সাহায্যার্থে মদীনায় প্রেরণ করেন। দুইপক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল। প্রথমে আম্বাজী সৈন্যের সঙ্গে এজিদ সেনার হাতাহাতি ও খণ্ডযুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সময় দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ হানিফার ভ্রাতা উমর ও আব্বাস আসিয়া মিলিত হইলে 'তিন ভাই পরস্পর কান্দিল বিস্তর'। পরদিন প্রাতঃকালে দুই পক্ষের সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়। হানীফা ভীম-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। একবার তিনি সুযোগ পাইয়া অলিদকে ধৃত করিলেন। ইতোমধ্যে, মুসলিম কাক্কা আসিয়া সসৈন্যে হানিফার সহিত সম্মিলিত হইলে হানিফা যেইমাত্র কাকার দিকে মনঃসংযোগ করিয়াছেন, অমনি সুযোগ পাইয়া দুর্মতি অলিদ 'লম্ফ দিয়া হস্ত হৈতে ধায় শীঘ্রগতি'। তুরুকের রাজা ওফিয়ান ও ওক্কাসদেশের রাজা ইবরাহীম ওস্তুর পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ আসিয়া হানিফার সৈন্যদলে মিলিত হইলে এজিদ-সেনাপতি অলিদ দামেস্কে এজিদের নিকট দূত প্রেরণ করে। এজিদ মেরূয়ার সহিত ত্রিশ হাজার সৈন্য পাঠাইলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে

এজিদ-পক্ষীয় জঙ্গি 'সত্তর গজ দীর্ঘ কলেবর' বাহারাম এবং আবু-হোরেরা হানিফার আম্বাজী সেনাদলকে ভীমবেগে আক্রমণ করিল। কিন্তু আম্বাজী সেনার সহিত তাহারা পারিয়া উঠিল না : ইহা দেখিয়া মেরুয়া গর্জন করিতে করিতে সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। তখন ঃ

দুই সৈন্যে বাজিল তুমুল মহারণ।
সৈন্য পদধূলি উড়ি ঢাকিল গগন॥
গজে গজে অশ্বে অশ্বে পদাতি পদাতি।
মল্লে মল্লে করে যুদ্ধ গর্জ্জি তর্জ্জি অতি॥
দুদিকের অস্ত্র জালে ভরিল গগন।
মন্দ অসি হই স্থর্য তাপিত তপন॥[৩৮]

হানিফার বীরত্বে এজিদসৈন্যদল টিকিতে পারিল না। মেরুয়া পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচায়। হানিফা, এজিদের সহিত লড়িবার জন্য দামেস্কের দিকে রওয়ানা হইবার উদ্যোগ করিলেন। আবদুর রহমান, বাহারাম, তালেব, মোসেব, আক্কাস, চাপলুস, আকবর প্রভৃতি রথিবৃন্দ প্রস্তুত হইলেন। গুপ্তচর মারফত সংবাদ পাইয়া এজিদ চিন্তিত হইলেন ; কিন্তু মেরুয়া বলিল যে, তাঁহার চিন্তিত হইবার কোনই হেতু নাই। কারণ, 'দশ লাখ আছে তেরা জঙ্গি জাঁহাবাজ'। এজিদ নব্বই হাজার লস্কর হানিফার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। দুই পক্ষ প্রবল বেগে পরস্পরকে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ করিল। এজিদ বাহিনী পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল। ওত্বা নামক এক সেনাপতি হানিফার হস্তে পরাজিত হইয়া হানিফার বশ্যতা স্বীকার করে। পরে তথা হইতে পলাইয়া দামেস্কে আসিয়া এজিদের নিকট হানিফার বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের

---

৩৮ মুহম্মদ খান ঃ মকতুল হুসৈন।

পরিচয় দেয়। শুনিয়া মেরূয়া তাহাকে ধিক্কার দিল। ওতবা প্রত্যুত্তরে জানাইল যে, মেরূয়া নিজেও রণস্থল হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে বাহাদুরী দেখাইতেছে। এই সময় আলপিন শহর হইতে আবদুল্লাহ্ উমর এবং হলবেবর বাদশাহ্ আসিয়া এজিদের দলে যোগদান করিলেন। তাঁহারা সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া হানিফার সহিত সন্ধি করিবার জন্য এজিদকে পরামর্শ দিলেন। এজিদ হানিফাকে পত্র লিখিলেন। তিনি পত্রে জানাইয়া দিলেন যে, আরবের বাদশাহী লইয়া হানিফার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আরবের বাদশাহীর প্রতি তাঁহার (এজিদের) মোটেই লোভ নাই। পত্র পড়িয়া হানিফা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া এজিদ ফয়লকুচ বাদশাহ্র শরণাপন্ন হন। ফয়লকুচ বাদশাহ লক্ষ লক্ষ তীরন্দাজ ও পদাতিক সৈন্যসহ আসিয়া হানিফার মস্তক দেহচ্যুত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু হানিফার বীরত্বে তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এজিদ সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় সেরেস্তান, তবরিজ, জঙ্গবার, রুম, ইস্তাম্বুল প্রভৃতি স্থানের শাসক ও বাদশাহ্গণের নিকট পত্র লিখিলে তাঁহারা অগণিত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এইবার মেরূয়া যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন; কিন্তু এ-যুদ্ধেও হানিফা বিজয়ী হন। এই যুদ্ধে হানিফার ভ্রাতা ওস্তর আলী এজিদ সৈন্যের হস্তে ধৃত হন। মেরূয়া প্রচার করিল যে 'হানিফা ধরা পড়িয়াছেন'। মেরূয়া পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে 'লোহার পিঞ্জরা মধ্যে রাখে তালা দিয়া'। এ-সংবাদে হানিফার সৈন্য ও সহচরবৃন্দ হায় হায় করিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে, হানিফা ধৃত হন নাই। তিনি এজিদের তবরেজী সৈন্যের সহিত যুঝিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ মেরূয়াকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাহাকে সংগ্রামে আহ্বান জানাইলে মেরূয়া আশ্চর্যান্বিত হয় এবং বুঝিতে পারে যে, হানিফা মনে করিয়া সে

যাহাকে বন্দী করিয়া এজিদের নিকট প্রেরণ করিয়াছে সে-ব্যক্তি হানিফা নহে—অপর কেহ। মেরূয়া অনতিবিলম্বে দামেস্কে গিয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করিল তবে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, ধৃতব্যক্তিকেই (ওস্তর আলী) শূলে চড়াইয়া হত্যা করা হউক[৩৯]। হানিফা ভ্রাতার শোকে 'পেরেশান' হইলেন, এবং 'কান্দিতে লাগিল শাহা বেকারার মন'। মন্ত্রীপ্রবর আবছুর রহমানের মন্ত্রণায় বাহারাম* নামক এক দুঃসাহসী আম্বাজী জঙ্গি সুকৌশলে ওস্তর আলীকে শত্রুকবল হইতে মুক্ত করিয়া আনিলেন। অতঃপর, এজিদের আমন্ত্রণক্রমে খাকান বাদশাহ, হাব্‌শী বাদশাহ, ফিরিঙ্গি বাদশাহ, আলমাস ডিউ প্রভৃতি সসৈন্যে দামেস্কে আগমন করিলেন এবং যুদ্ধে একে একে হানিফার হস্তে পরাভূত হইয়া পলায়িত হইলেন। এজিদের সব সৈন্য নিঃশেষ হইয়া আসিল। অবশেষে হানিফা দলবল লইয়া এজিদের রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিলেন। এই সময়ে এজিদ মহলের ভিতরে ছিলেন। হানিফা তন্ন তন্ন করিয়া রাজপ্রাসাদের মহল খুঁজিলেন; তাঁহাকে সেখানে পাওয়া গেল না[৪০]। তখন এজিদ কোঠার উপরে ছিলেন। কোঠায়

---

৩৯ ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা' কাব্যে এইস্থলে হানিফার বাজু শহীদ ও তাঁহার ধৃত হওয়ার কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বন্দী হানিফাকে অগ্নিকুণ্ডে জ্বালাইয়া হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রের বৃত্তান্তও কবি সংযোজন করিয়াছেন। মুহম্মদ খান 'মকতুল হুসৈন' কাব্যে হানিফার বাজু শহীদের কথা বলেন নাই; তবে, হানিফার বন্দী হওয়া এবং কয়েদ হইতে মুক্তি লাভের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

* ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যে 'আলকাছ'।

৪০ হায়াৎ মাহমূদ 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যে এজিদ-সংক্রান্ত কাহিনী এই স্থলে স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হানিফা দূর হইতে এজিদকে দেখিতে পাইয়া অনুসরণ করিলেন। হানিফার

ছিল একটি কূয়া। এজিদ হানিফাকে দর্শনমাত্র কূয়ার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন। হানিফা কূয়ার ভিতর হইতে ধূম্র নির্গত হইতে দেখিলেন। তিনি সবিস্ময়ে আরও লক্ষ্য করিলেন যে, তথা হইতে এক নূরের রওশনি বাহির হইতেছে। হানিফা রওশনি নূরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে নূর উত্তর দিল ঃ

আপনি খোদায়তালা কহিল আমারে।
জালাইতে কমজাত এজিদ কাফেরে ॥
হোসেনের রুহ্ আমি সত্য জান মনে।
শহিদ হইয়াছিনু কারবালা জমিনে ॥
এই দেখ বদজাত এজিদ হারামখোর।
জলিয়া কূয়ায় মরে হইয়া ছারখার[৪১] ॥

অতঃপর 'রুহ্' মোবারক 'রওশনি নূর' অন্তর্হিত হইল। হানিফা তথা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং শাহাজাদা জয়নুল আবেদীনকে বাদশাহ্ রূপে অভিষিক্ত করিলেন। হানিফার আদেশে তাঁহার ভ্রাতা ও অনুচরগণ স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিল।

অভিলাষ ছিল এজিদকে জীবন্ত অবস্থায় ধৃত করা। কাজেই, তিনি তাহার নিকটবর্তী হইলেন ; কিন্তু বিস্ময় বিস্ফারিতনয়নে দেখিতে পাইলেন যে, এজিদ হঠাৎ একটি কৃষ্ণবর্ণ কুকুরে রূপান্তরিত হইয়াছে। তন্মুহূর্তে দুইজন ফেরেস্তা আসিয়া এজিদকে লগুড়াঘাত করিতে থাকে। হোসেনকে কারবালায় অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এজিদের এই শাস্তি। হানিফা ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তরবারী খুলিলেন এবং শত্রুগণকে একধার হইতে কাটিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ দৈববাণী শুনিয়া তিনি শান্ত হইলেন। অতঃপর, আত্মীয় স্বজনকে উদ্ধার করিয়া জয়নুলকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন, তৎপর তিনি দেশে যান।

৪১ ফকীর গরীবুল্লাহ্ ঃ জঙ্গনামা।

এজিদের মৃত্যুর পর তদীয় পলায়িত সৈন্যদল হানিফাকে একাকী দেখিয়া আক্রমণ করিতে আসে। গুপ্তচর মারফত খবর পাইয়া হানিফা, ভ্রাতা আলী আকবর সহ ময়দানের দিকে যাত্রা করেন। এই সময় এজিদ-সৈন্যগণ দূর হইতে তাঁহাদের উভয়ের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে থাকে। হানিফা ক্রুদ্ধমনে 'কাটিয়া চলিল মর্দ কুফর সয়ার'। ইহা দেখিয়া 'বেজার হৈল বড় আপে করতারে'। রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য দৈববাণী হইল। খোদার সৃষ্টিকে এমনভাবে হত্যা করা অন্যায়। বিশেষতঃ, ইতঃপূর্বেই তিনি হোসেন-হত্যার প্রতিশোধ লইয়াছেন। দৈববাণী শুনিয়া হানিফা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরগাহে 'মোনাজাত করে বড় কান্দিয়া কান্দিয়া'। হঠাৎ ঐস্থানে একটি পাহাড়ের সৃষ্টি হইল এবং খোদাতালা 'হানিফারে সেথা যাইতে হুকুম করিল'। হানিফা পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। বেহেস্তের হুরপরী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল। আলী আকবর, হানিফাকে অনেক ডাকিলেন। হানিফা পাহাড়ের ভিতর হইতে জবাব দিলেন যে, তিনি রোজ কেয়ামতে পুনরায় দর্শন দিবেন। তখন আলী আকবর দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। জয়নুল আবেদীন মক্কা, মদীনা ও কুফার বাদশাহ হইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা আলোচিত হইবে।

—

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা।

কারবালা রণপ্রান্তরে ইমাম হোসেনের (হুসৈনের) শাহাদৎ বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া ফারসী ও উরদূ ভাষায় অনেক কাব্য রচিত হইয়াছে। এই সকল ভাষায় রচিত কাব্যগুলির অনুসরণে মুঘল ও ইংরেজ আমলের কবিগণ বাংলা মর্সীয়া কাব্য প্রণয়নে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহারা মূলতঃ কারবালার ইতিহাসভিত্তিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া কাব্যাদি রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইমাম হোসেন (হুসৈন) ও তদীয় সহচরগণের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতি হৃদয়ের অকুণ্ঠ দরদ, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ঢালিয়া দিয়াছেন, পক্ষান্তরে তাঁহাদের শত্রুগণের প্রতি ঘৃণার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। কবিগণের এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে কাব্যের ঐতিহাসিক সত্য ক্ষুন্ন হইয়াছে; কিন্তু আপন সৃষ্টি মহিমায় তাঁহারা এই কাব্যগুলিকে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছেন। 'একথা শুধু বাংলা 'জঙ্গনামা' সম্বন্ধেই যে প্রযোজ্য তাহা নহে, ফারসী 'মকতুল হোসেন' সম্পর্কেও বলা চলে। বরং আরবী, ফারসী কাব্যগুলিতেই এই অনৈতিহাসিকতার সূত্রপাত প্রথম লক্ষ্য করা যায়। বাংলা কাব্যে শুধু সেই রীতি অনুসরণ করিয়া বাঙালী কবিগণ এতদ্দেশীয় ভাব-কল্পনা কাব্যের অভ্যন্তরে স্থান দিয়াছেন। ফলে বাংলাদেশে এ-কাব্য আরও অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে'[১]।

---

১ ডক্টর মুযহারুল ইসলাম: কবি হেয়াত মামুদ। রাজশাহী, ১ম প্রকাশ, ১৯৬১, পৃঃ ২০৮।

কবি ঐতিহাসিক কাহিনী-নির্ভর কাব্য রচনা করিতে পারেন ; কিন্তু ইতিহাস বিকৃত করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। ঐতিহাসিক কাহিনীর বিকৃতি ঘটিলে সত্যের অপলাপ হয় এবং কাব্যের ক্ষেত্রে তাহা দোষাবহ হইয়া দাঁড়ায়[২]। বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কবিগণ ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাণকথা (myth) অবলম্বন করিয়া কাব্যে অভিনব রূপ দান করিয়াছেন।

মুঘল ও ইংরেজ আমলের বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের রচয়িতা শৈখ ফয়জুল্লাহ্, দৌলত উজীর বাহ্রাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াৎ মাহ্মূদ, হামিদ, জাফর, ফকীর গরীবুল্লাহ্, জনাব আলী, মুহম্মদ মুন্শী, সাদআলী-আবদুল ওহাব, রাধাচরণ গোপ প্রমুখ কবি নিজ নিজ কাব্য মধ্যে যে কবি-কল্পনা অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি ঘটিয়াছে। নিম্নে এ-বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে পক্ষান্তরে, কাব্যে ঐতিহাসিক সত্য রক্ষার ব্যাপারে কবিগণ অনেকক্ষেত্রে যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহাও এই সঙ্গে দেখাইবার প্রয়াস পাইব।

হায়াৎ মাহমূদ, জনাব আলী, মুহম্মদ মুন্শী, ইসহাক উদ্দীন প্রমুখ কবির কাব্যে কাহিনীর পূর্বাভাসে কারবালার যুদ্ধ এবং হোসেনের হত্যাকাণ্ডের পূর্ব-ইতিহাস-স্বরূপ কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল মন্নাফ আরবের গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্রের নাম হাশিম ও উমিয়া। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাহাদের যমজ ভ্রাতার পৃষ্ঠদেশ একসঙ্গে যুক্ত ছিল ; খড়্গের আঘাতে তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিছিন্ন করা হয় ইত্যাদি। এ-ঘটনার সবটাই ঐতিহাসিক নহে ; কারণ হাশিম উমিয়ার ('উমাইয়ার)

---

২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৮ ;

ভ্রাতা নহেন, পিতৃব্য। উমিয়া পিতৃব্যের উন্নতি বৃদ্ধিতে ঈর্ষা-পরায়ণ হইয়াছিলেন। আবহুল মন্নাফের তুই পুত্র ঃ আব্‌দে শাম্‌স এবং হাশিম। উমিয়া (‘উমাইয়া) আব্‌দে শামসের পুত্র। সুতরাং সম্পর্কে উমিয়া, হাশিমের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। উমিয়া আজীবন পিতৃব্যের প্রতি যে-ঈর্ষাপোষণ করিতেন, তাহাই উত্তরাধিকারসূত্রে সংক্রামিত হইয়া উত্তরকালে কারবালা যুদ্ধের সূত্রপাত করে[৩]। অতএব কবিগণের কাব্য-বর্ণিত বংশপরিচয়ে ইতিহাসের বিকৃতি রহিয়াছে। হায়াৎ মাহমূদ, ফকীর গরীবুল্লাহ্‌, জনাব আলী, মুহম্মদ মুনশী, সাদ আলী ও আবহুল ওহাবের কাব্যে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করায় এক ফেরেস্তার পাখা বা দাড়ি জ্বলিয়া যাওয়া এবং হোসেনের (হুসৈনের) অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে পাখা ও দাড়ি ফিরাইয়া পাওয়ার বর্ণনা আছে। সম্ভবতঃ কবিদের বর্ণিত এই কাহিনী পুরাণকথার (myth) প্রভাবের ফল।

কবি মুহম্মদ খান, জনাব আলী, মুহম্মদ মুন্‌শী, সাদ আলী, আবহুল ওহাব, ইসহাক উদ্‌দীন তাঁহাদের নিজ নিজ কাব্যে হযরত আলীর মৃত্যুকাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে কুফার এক খারিজী আবহুর রহমান ইব্‌ন মুলযম ও কর্তামা নাম্নী এক সুন্দরী দুষ্টা যুবতীর প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গটি ঐতিহাসিক। ‘কর্তামা’ বা ‘কতামা’ যে-তিনটি শর্তে আবহুর রহমানকে বিবাহ করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, কবি-বর্ণিত

---

৩ কুরয়শ বংশের বংশ-লতিকা এই গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
অথবা Vide :
P. K. Hitti : History of the Arabs, London 1951, p. 190.
E. G. Browne : A Literary History of Persia. Vol I. Reprinted 1929., Cambridge University Press. p. 214.

এই শর্তগুলিও ঐতিহাসিক[৪]। আলীর মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ কবরস্থ করা হইল না; ইহাতে বসুমতী অপমানিতা হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট নালিশ করিল। এ-ব্যাপারটি বাংলাদেশের হিন্দু আদর্শের প্রভাবজাত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ, বিষয়টি অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিয়া পাঠক-পাঠিকার নিকট পরিবেশনের অভিলাষে হায়াৎ মাহ্‌মূদ এই প্রকার অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হায়াৎ মাহ্‌মূদ এবং মুহম্মদ খানের কাব্যে বর্ণিত আছে, আলীর মৃত্যুর পর মৃতদেহকে কাফন পরাইয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে তুলিয়া দেওয়া হইল। উষ্ট্র নজফের বনমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। এ-ঘটনার ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করা কঠিন। কবি মুহম্মদ মুন্‌শী, জনাব আলী, ইসহাক উদ্‌দীন ও সাদ আলী-আবদুল ওহাবের কাব্যে হযরত আলীকে নজফের বনের মধ্যে কবরস্থ করা হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা আছে। প্রকৃতপক্ষে, আলীর দাফনকার্য কোথায় সম্পন্ন হইয়াছিল তৎসম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ এক মত নহেন। প্রচলিত মতানুসারে জানা যায় যে, কুফার সন্নিকটবর্তী একটি বাঁধের পার্শ্বে তাঁহাকে কবরস্থ করা হয়[৫]। পরবর্তীকালে এই স্থানটি 'আল্ নজফ্' নামক শহরে পরিণত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, মদীনায় বীবী ফাতিমার মাযারের পার্শ্বেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়[৬]। 'খুলাফা-ই-রাশেদীন' গ্রন্থের লেখক বিখ্যাত গবেষক

---

৪ ক. Gibb & Kramers : op. cit., p. 31.

খ. Muir : The Caliphate, Edinburgh, 1915, p. 284.

গ. Wellhausen : op. cit., pp. 103-104.

ঘ. P. K. Hitti : op. cit., p. 182. এবং বর্তমান পুস্তকের ১৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫ Gibb & Kramers : op. cit., p. 31.

৬ Ibid : p. 430.

মঈনুদ্দিন নদভী বলেন যে, ২০শে রমজান শুক্রবার রাত্রিকালে হযরত আলী ইন্তিকাল করিলে ইমাম হাসান পিতার সৎকারের ব্যবস্থা করেন, স্বয়ং জানাজার নামাজ পড়ান এবং কুফার 'ওজ্‌জা' নামক কবরস্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়*[৭]। সুতরাং কবিগণের কাব্য-বর্ণিত সমাধিস্থলকে (নজফ্‌) অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা চলে না। হযরত আলীর মৃত্যুর পূর্বে মুহম্মদ খান কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ষিপ্ত জনতা কর্তৃক খলীফা 'উসমান-নিধন[৮]', আলীর সহিত মাবিয়ার (মু'আবিয়ার) যুদ্ধ, আপোষে যুদ্ধ-স্থগিত এবং আলীর পক্ষে মুসা আন্‌সারীর ও মাবিয়ার পক্ষে উম্মরের ('আমর্‌ বিন সাদ) মধ্যস্থতা করা[৯] ঐতিহাসিক ঘটনা। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নাই।

---

* মওলানা উবায়দুল্লাহ্‌ অমৃতসরী 'সওয়ানে উমরী হযরত আলী' গ্রন্থে (২য় সংস্করণ, ১৩১৭ হিঃ, পৃষ্ঠা ১১৪) লিখিয়াছেন: আল্লামা ইব্‌ন আবদুল বার বলেন, হযরত আলীর সমাধি-স্থল সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, কুফার 'কাসরুল ইমারত' নামক স্থানে আলীকে কবরস্থ করা হয়। আবার কেহ মনে করেন, কুফার ময়দানে তাঁহার দাফনকার্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল। অন্যান্যরা বলেন, তাঁহার সমাধি নজফ্‌ নামক স্থানে বিদ্যমান।

৭ মঈনউদ্‌দীন নদ্‌ভী: খুলাফায়ে রাশেদীন। আজমগড়, ১৯৪৮, পৃঃ ৩২৪।

৮ ক. মওলানা আজাদ: পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩-৬৫।
  খ. J. Wellhausen: op. cit., pp. 48-50.
  গ. Syed Ameer Ali: A short History of the Saracens. London. 1934. p. 48.

৯ ক. Syed Ameer Ali: op. cit., pp. 50-52.
  খ. S. Khuda Bakhsh: A History of the Islamic peoples. C. U. 1914, pp. 80-86.

মুহম্মদ খানের কাব্যে আলীর মৃত্যুর পর হাসানের খলীফা নির্বাচন, মাবিয়ার সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং মাবিয়ার স্বপক্ষে হাসানের খিলাফৎবর্জন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনাগুলির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই[১০]। হায়াৎ মাহ্‌মূদ এবং মুহম্মদ খান নিজ নিজ কাব্যে ইমাম হাসানের বিবাহ-বৃত্তান্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার আশ্রয় বেশী গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিবাহ সম্পর্কে ইতিহাসে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, হাসান অনেকগুলি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন[১১]। অতঃপর, উভয় কবিই তাঁহার জনৈকা পত্নী কর্তৃক তাঁহাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যার কথা কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। কবি ইসহাক উদ্‌দীন, মুহম্মদ খান প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন, জনৈকা কুটনীর দ্বারা প্ররোচিত হইয়া হাসান-পত্নী জায়েদা স্বামীকে পানির সহিত হীরকচূর্ণ খাওয়াইয়া হত্যা করিয়াছেন। কাব্যগুলির মধ্যে এই কুটনীর নামোল্লেখ নাই। এই ঘটনার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক বিষ-প্রয়োগ সম্পর্কে একমত। সুতরাং হাসানকে বিষ-প্রয়োগেই হত্যা করা হইয়াছিল, একথা স্বীকার করিয়া লইলেও তাহা কাহার প্ররোচনায় এবং কাহার দ্বারা সাধিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়েও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ বর্তমান[১২]। হাসান

---

১০ ক. Syed Ameer Ali : op. cit., pp. 59-70.

খ. J. Wellhausen : op. cit., pp. 105-107, 111.

গ. Muir : The Caliphate, London 1891. pp. 290-291.

১১ P. K. Hitti : op. cit., p. 190.

১২ খাজা হাসান নিযামী (মুহর্রমনামা. ১৩৩৮ হি°, পৃঃ ৫০), আবদুল হালিম (তারিখে ইসলাম, ২য়খণ্ড, প্র°—উ. বি. বি., হায়দরাবাদ, ১৯২৫, পৃঃ ৯৩৭), ইব্‌ন আছীর (তারিখে ইব্‌ন আছীর, ৩য়

বিষ পানে নিহত হন নাই বলিয়াও কেহ কেহ মত পোষণ করেন[১৩]। অতএব কবিগণের কাব্যবর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র 'জয়নবের চৌতিশা' কাব্যে কবি, ইমাম হাসানের মৃত্যুর পর তদীয়

খণ্ড, প্র°—মাত্‌বাতুল আজ্‌হারিয়া প্রেস, মিশর, ১৩০১ হি°-পৃঃ ২৩২) এবং আহ্‌মদ ইবন উস্‌মান আল্ জাহাবী (তারিখুল ইস্‌লাম, ২য় খণ্ড প্র°—মক্তাবাতুল কুদ্‌সী, হি° ১৩৬৭, পৃঃ ২১৮) প্রমুখ ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত যে, ইমাম হাসানকে যথার্থই বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছিল। খাজা হাসান নিযামীর মতে, হাসান-পত্নী যায়েদা বা আস্‌মা মাবিয়ার (মু'আবিয়ার) প্ররোচনায় স্বামিহত্যা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ইবন আছীর এবং 'উসমান আল জাহাবীর মতে বিষ-প্রয়োগেই হাসানকে হত্যা করা হয়। ইবন আছীর হাসানের মৃত্যুর জন্য তদীয় পত্নী জায়েদাকে দায়ী করিয়াছেন, পক্ষান্তরে জাহাবী কোন হত্যাকারীর নামোল্লেখ করেন নাই। আবদুল হালিম বলেন, এজিদের (ইয়াযীদের) প্ররোচনায় হাসানকে বিষ পান করান হয়, মাবিয়ার (মু'আবিয়ার) চক্রান্তে নহে; তবে যেহেতু হাসান মৃত্যুর পূর্বে হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করেন নাই, সেইহেতু তাহার নাম জানা যায় না। তবে, সে হত্যাকারী যায়েদা বা অপর কেহ হইতে পারেন; কিন্তু হাসান যে বিষ পানেই নিহত হন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। ঐতিহাসিক P. K. Hitti হাসানের বিষ-প্রয়োগে মৃত্যু সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত নহেন। কাজেই, তিনি মনে করেন সম্ভবতঃ হারেমবাসী কোন মহিলার ষড়যন্ত্রের ফলে বিষপ্রয়োগে হাসানের মৃত্যু ঘটিয়া থাকিবে। (History of the Arabs: 5th Edition, 1951, p. 190.)

১৩ 'Hasan died at Madina of consumption.' (Gibb & Kramers: Shorter Encyclopaedia of Islam. p. 135.)

পত্নী জয়নবের বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। কবি মুহম্মদ মুনশী, জনাব আলী, সাদ আলী ও আবদুল ওহাবও স্ব স্ব কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এজিদের চক্রান্তে জয়নব (যয়নব) নাম্নী এক সুন্দরী নারীর সহিত তাহার স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু পরে জয়নব এজিদকে স্বামিত্বে বরণ না করিয়া হাসানকে বিবাহ করেন, এবং এই বিবাহের জন্যই এজিদের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, বীবী জয়নব (যয়নব) হাসানের পত্নী ছিলেন কিনা, ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। হায়াৎ মাহমূদ ও মুহম্মদ খানের কাব্যে হাসানের মৃত্যুর পর ইমাম হোসেনের (হুসৈনের) সহিত এজিদের (ইয়াযীদের) যে বিবাদ-বিসম্বাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। মুহম্মদ খান ও আমীনুল হকের কাব্যে হোসেনের নিকট কুফাবাসীর পত্র প্রদান, বারংবার তাহাদের অনুরোধ-উপরোধ, কুফার অবস্থা পরীক্ষার জন্য হোসেন কর্তৃক তদীয় খুল্লতাত ভ্রাতা মুস্‌লিম বিন্ আকীলকে কুফায় প্রেরণ, মুস্‌লিমের হস্তে হোসেনের নামে কুফাগণের বশ্যতা স্বীকার, কুফায় শত্রুগণের সহিত মুস্‌লিমের যুদ্ধ এবং আত্মদান, এজিদ কর্তৃক আবদুল্লাহ্‌কে ('উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ) শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া কুফায় প্রেরণ, ইমাম হোসেনের কুফাযাত্রা, পথিমধ্যে মুসলিম-হত্যার সংবাদ শ্রবণ, হোসেন কর্তৃক সহচরদের মুক্তিদান, পথে এজিদের সেনাপতি হোরের সহিত সাক্ষাৎকার, হোরের মত পরিবর্তন এবং হোসেনের দলভুক্তি, পথ ভুলিয়া কারবালার বিস্তীর্ণ রণপ্রান্তরে সহচর ও আত্মীয়-পরিজনসহ হোসেনের উপস্থিতি, তৎকর্তৃক তিন শর্ত প্রদান, যুদ্ধযাত্রার পূর্বে হোসেনের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও বক্তৃতা, আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতা প্রভৃতির যুদ্ধযাত্রা ও মৃত্যু, সর্বশেষে স্বয়ং হোসেনের যুদ্ধযাত্রা এবং আত্মবলিদান করার বহু বিচিত্রময় ঘটনার বর্ণনা আছে। কবিদ্বয়ের বর্ণিত এই

ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক[১৪]। হায়াৎ মাহ্‌মূদের 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যে ইতিহাসের অনুসরণ অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে, তাঁহার কাব্যে এজিদ-পক্ষীয় সৈন্যদলের ফোরাতনদীর কূল অবরোধ, হোসেনের আত্মীয় ও বন্ধুগণের যুদ্ধে আত্মদান, হোসেনের যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি ঘটনার যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা অনৈতিহাসিক নহে। মুহম্মদ খানের কাব্যে হারেস নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক মুসলিমের দুই পুত্রহত্যার যে-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। মুসলিম ইব্‌ন আকীল, হোসেনের প্রতিনিধিরূপে কুফায় গমন করিবার সময় বিদেশে অতদূরে দুইটি নাবালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন কিনা, তৎসম্পর্কে ইতিহাসে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ, বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কবিগণ পাঠকদের নিকট মুসলিম-কাহিনীকে করুণ-রসের আকর করিয়া পরিবেশনের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনার কঙ্কালের সহিত কল্পনার রক্ত-মাংস সংযোজন করিয়াছিলেন।

---

১৪ ক. Muir : The Caliphate. Second Edition 1891, pp. 306-310.

খ. Syed Ameer Ali : op. cit., pp. 84-85.

গ. S. Khuda Bukhsh : op. cit., pp. 98-100.

ঘ. মওলানা আজাদ : শাহাদৎ-ই-হুসৈন, লাহোর, ১৯৫৭, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৮-৩৯।

ঙ. Nicholson : op. cit., pp. 196-197.

চ. রামপ্রাণ গুপ্ত : মহরম। প্রবাসী, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩১২, পৃঃ ৬৬৩-৬৬৪।

ছ. E. G. Browne : Literary History of Persia. Vol. 1. Cambridge University Press. Reprinted 1929. pp. 226-228.

মুসলিমের কুফাযাত্রা এবং তথায় তাঁহার ভূমিকা-গ্রহণের কথা ঐতিহাসিক সত্য[১৫]। কিন্তু তাঁহার দুই বালক পুত্রের কথা কবিগণ যে-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ নাই*[১৬]। 'শহীদ-ই-কারবালা' শীর্ষক তিনখানি কাব্যে এবং কাজী আমিনুল হকের 'জঙ্গে কারবালা' কাব্যে কবিগণ কয়েকটি ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা এই যে, হানি নামক রসূলের এক সাহাবা কুফায় মুসলিম ইব্‌ন আকীলের দুরবস্থা দর্শনে তাঁহাকে তাঁহার গৃহে স্থান দেন এবং পরিণামে হানিকে কারাগারে গমন ও মৃত্যুবরণ করিতে হয়। এই ঘটনার সম্পূর্ণটাই ঐতিহাসিক কিনা বলা শক্ত, তবে ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, সাহাবা হানি মুসলিম ইব্‌ন আকীলকে নিজের গৃহে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন[১৬ক]।

কবি মুহম্মদ খান, হায়াৎ মাহমুদ, জাফর, ফকীর গরীবুল্লাহ্, মুহম্মদ মুন্‌শী প্রমুখ কবি সখিনার বিবাহকাহিনী অতিশয়

---

১৫ ক. S. Khuda Bakhsh : op. cit., pp. 98-99.
খ. J. Wellhausen : op. cit., pp. 146-147.

* খাজা হাসান নিযামী বলেন : 'রওজাতুস্ সোহদা' গ্রন্থের লেখক মোল্লা হাসান ওয়ায়েজ আল্ কাশেফী তাঁহার এই গ্রন্থ মধ্যে হযরত মুসলিমের দুই পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এতৎভিন্ন, আর কোথাও এ-সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। (খাজা হাসান নিযামী : মুহর্‌রমনামা, ১৩৩৮ হিঃ, পৃঃ ১০৭)—কিন্তু মোল্লা কাশেফীর উক্তি সত্ত্বেও খাজা হাসান নিযামী মুসলিমের দুই পুত্রের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন॥

১৬ খাজা হাসান নিযামী : মুহর্‌রমনামা, ১৩৩৮ হিং, পৃঃ ১০৭।

১৬ক. Muir : The Caliphate. 2nd Edition, 1891. London, p. 307,

শোকাবহরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহা একটি বেদনাময় রোমান্টিক প্রেমকাহিনী। কবিগণের বর্ণিত এই বিষাদ-করুণ কাহিনীর পশ্চাতে যে, কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে তাহার প্রমাণ নাই। বরং বীবী সখিনা অর্থাৎ সুকায়না যে অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ মিলিতেছে: সুকায়নার তিন তিনটি বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ আছে। প্রথম বিবাহ মক্কামদীনার খলীফা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুসাব ইব্‌ন যুবায়রের সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছিল; মুসাবের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ্‌ হিজামীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ, এবং হিজামীর মৃত্যুর পর খলীফা উ'সমানের জনৈক দৌহিত্রের সঙ্গে সুকায়না তৃতীয় বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ আছে[১৭]।

---

১৭ 'Her real name is said to have been Omaima. Sukaina being a Surname given to her by her mother. Sukaina died at Medina in Rabi I. 117 A. H. (April 735), in the reign of Hisham. Left a widow when quite young by the death of her first husband, Musab bin Zubair, on the field of battle, she married one Abdullah Hizami, by whom she had a son named Kurain. Abdullah Hizami died shortly after. On his death a brother of Omar II proposed to her but was prohibited from marrying by Walid I. She then married a grandson of the Caliph Osman, who however, was compelled to separate from her under the orders of the Ummayade Sulaiman.' (Syed Ameer Ali : A short History of the saracens. Reprinted, 1934, pp. 201-202 f. n.)
Also 'She had her own peculiar way of dressing. This coiffure a'la Sukaynah became popular among men and

হায়াৎ মাহ্‌মূদ, মুহম্মদ খান, গরীবুল্লাহ প্রমুখ কবি বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম হোসেন, পরিবার পরিজন এবং কতকগুলি বিশ্বস্ত সহচর সমভিব্যহারে কুফাযাত্রা করিয়াছিলেন। এ ঘটনা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত[১৮]। কবিদ্বয় অন্যান্যক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কারবালার যুদ্ধ বর্ণনায় তাঁহারা ইতিহাসকে অনেক বেশী অনুসরণ করিয়াছেন। মর্সীয়া সাহিত্যের কোন কোন কবি আলী আসগর নামক ইমাম হোসেনের এক শিশু পুত্রের করুণ মৃত্যু-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিহাসে সদ্যোজাত একটি শিশুর তীর নিক্ষেপে মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ আছে। মওলানা আবুল কালাম আজাদ বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ইব্‌ন জারীর ও ইয়াকুবীর মত উদ্ধৃত করিয়া এই শিশুর মৃত্যুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার নাম আলী আসগর কিনা, বলা হয় নাই[১৯]। হোসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার এক রেকাববর্দার কর্তৃক হোসেনের

---

was at a later date strictly prohibited by the puritan Caliph Umar II, one of whose brothers had married Sukaynah without consumating the union. As for the successive husbands whom the charms of this lady captivated for a longer or shorter period, they could hardly be counted on the fingers of two hands. In more than one instance she made complete freedom of action a condition precedent to marriage.' (P. K. Hitti : History of the Arabs. London 1921, 5th Edition. p. 237)

১৮ ক. Muir : op, cit, p, 307.

খ. Syed Ameer Ali : op. cit., p. 84.

গ. খাজা হাসান নিযামী : মুহর্‌রমনামা, ১৩৩৮ হিঃ, পৃঃ ১১৮।

১৯ মওলানা আজাদ : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

ইজারবন্দ ও অঙ্গুরী হস্তগত করা সম্পর্কে যে-বর্ণনা কবি হামিদ ও হায়াৎ মাহমূদের কাব্যে আছে, তাহা কবিকল্পনাপ্রসূত। সম্ভবতঃ কবিগণ হোসেনহত্যাকাহিনী করুণ-রসের আমেজে সিক্ত করিয়া চিত্রিত করিবার জন্য এইরূপ ভাবকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে বলা যায়, হায়াতের কাব্য-বর্ণিত হোসেনের খণ্ডিত শিরের কলেমাপাঠ, শিরের নিকট রহবাও ব্রাহ্মণের ইসলামধর্ম গ্রহণ এবং মুহম্মদ খান ও ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র কাব্য-বর্ণিত হোসেনের ছিন্ন মস্তকের জন্য চন্দ্রভান পরিবারের আত্মবলিদান কাহিনীর মূলে কবির কল্পনাপ্রবণতাই প্রধানতঃ দায়ী। খুব সম্ভব, এই কল্পনার মূলে আছে শী'য়া কবি-সাহিত্যিকদের রচিত কাব্যাদির প্রভাব। এগুলির কোন ঐতিহাসিক সত্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাংলা গদ্য সাহিত্যের (মর্সীয়া সাহিত্যেরও বটে) বিখ্যাত মুসলিম লেখক মীর মুশার্‌রফ হুসৈন তাঁহার সর্বজনবিদিত 'বিষাদসিন্ধু'তে আজর-পরিবারের যে-আত্মত্যাগ কাহিনী সুনিপুণভাবে পরিবেশন করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহার মূল উৎস এই 'জঙ্গনামা' কাব্যের চন্দ্রভান কাহিনী। কেবল পার্থক্যের মধ্যে এইটুকু লক্ষ্য করা যায় যে, মীর সাহেবের সুনিপুণ হস্তে আত্মত্যাগ কাহিনী অধিকতর উজ্জ্বল ও জীবন্ত। মুহম্মদ খানের কাব্যে সারাবানুর (শাহেরবানুর) করুণ বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বীবী শাহেরবানু ইমাম হোসেনের (হুসৈনের) প্রিয়তমা পত্নী এবং পারস্যের বাদশাহ্ নওশেঁরোয়ার দৌহিত্রী ও ইয়াজগোর্দের কন্যা ছিলেন। সুতরাং, শাহেরবানু ঐতিহাসিক চরিত্র[২০]। এড্‌ওয়ার্ড জি. ব্রাউন বিখ্যাত

২০ ক. আল্লামা শিবলী নোমানী : মোয়াজেনা-ই-আনীস ওয়া দবীর, ১৯২১, লক্ষ্ণৌ পৃঃ ৫।
খ. Syed Ameer Ali : op. cit., pp. 86-87.

আরব-ঐতিহাসিক আল্ ইয়াকুবীর মত উদ্ধৃত করিয়া শাহেরবানুর ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিয়াছেন[২১]। ঐতিহাসিক উইলিয়ম মুয়ারও শাহেরবানুকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়া উল্লেখ করেন[২২]।

মুহম্মদ খান ও হায়াৎ মাহ্‌মুদ, হোসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারস্থ বালক-বালিকা, মহিলা ও জয়নুল আবেদীনকে এবং হোসেনের ছিন্ন শির কারবালা হইতে কুফা এবং কুফা হইতে দামেস্কে প্রেরণের কথা নিজ নিজ কাব্যমধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। এ ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য[২৩]। মুহম্মদ খান, জনাব আলী, মুহম্মদ মুনশী, সাদ আলী, আবদুল ওহাব এবং ইসহাক উদ্‌দীনের কাব্যে বর্ণিত আছে যে, দামেস্কে এজিদের (ইয়াযীদের) নিকট হোসেনের ছিন্ন শির লইয়া উপস্থিত করা হইলে তিনি একখানি বেত্রদণ্ড দ্বারা তাহার উপর আঘাত করেন। প্রকৃতপক্ষে, এই ঘটনার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কুফার শাসনকর্তা 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ একখণ্ড বেত্রদণ্ড দ্বারা হোসেনের ছিন্ন মস্তকের অবমাননা করেন। ইহা দেখিয়া হযরত রসূলের জনৈক সাহাবা (যয়েদ ইব্‌ন আকরাম) দুঃখ ও

গ. Gibb & Kramers: op. cit., p. 590.

ঘ. খাজা হাসান নিযামী: পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭।

২১ E. G Browne: A Literary History of Persia-Vol. IV. Cambridge University Press. 1930, pp. 17-18 and Vol. I. Cambridge University Press. Re-printed 1929, p. 130.

২২ Muir: The Caliphate, 2nd Edition, 1891, p. 312.

২৩ ক. Syed Ameer Ali: A short History of the Saracens, London, 1934, p. 87.

খ. মওলানা আযাদ: পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬।

বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন[২৪]। কবি মুহম্মদ খান কাব্যে ইব্‌ন যিয়াদের এই নৃশংসকার্যের বর্ণনাও প্রদান করিয়াছেন। জনাব আলী, মুহম্মদ মুনশী প্রমুখ কবি এই ঘটনার সঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এই: দামেস্কে জয়নুল আবেদীন এবং আহল-ই-বয়তকে লইয়া উপস্থিত করা হইলে এজিদ জয়নুলকে হত্যার আদেশ দেন, ইহাতে পর্দার ভিতর হইতে উম্মে কুলসুম হাঁকিয়া উঠিলে এজিদ উক্ত কার্য হইতে বিরত হন। ইতিহাসে এ ঘটনার উল্লেখ নাই। ইতিহাসে পাওয়া যায়, জয়নুল আবেদীনকে হত্যা করিবার জন্য কুফার গভর্ণর উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ আদেশ দিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া হোসেনভগ্নী বীবী জয়নব, ইব্‌ন যিয়াদকে জানান যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিলে তাঁহাকেও হত্যা করিতে হইবে। ইহাতে উবায়দুল্লাহ্ পূর্বাদেশ প্রত্যাহার করেন। মওলানা আজাদ, আরব ঐতিহাসিক তাবারী ও কামেলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এ-ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন[ক]। ইতিহাসে ইব্‌ন যিয়াদকে যেরূপ নিষ্ঠুর ও কঠোরপ্রকৃতির গভর্ণর রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, খলীফা এজিদ (ইয়াযীদ) তদ্রূপ ছিলেন না। মওলানা আজাদ বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ইবন জারীর, কামেল, তারীখে কবীর প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া বলেন যে, এজিদ (ইয়াযীদ) নরপিশাচ ছিলেন না। তিনি হোসেনের হত্যাকাণ্ডের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং ইব্‌ন সুমাইয়ার পৌত্র উবায়দুল্লাহর প্রতি অভি-সম্পাৎ করেন। অধিকন্তু, এজিদ (ইয়াযীদ) আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন যাহাতে তিনি (আল্লাহ্) হোসেনকে শান্তির ক্রোড়ে

---

২৪ ক. মওলানা আজাদ: পূর্বোক্ত, পৃ: ৪২।
খ. Syed Ameer Ali: op. cit., p. 86.

(ক) মওলানা আজাদ: শাহাদতে হুসৈন, ১৯৫৭, ৩য় সংস্করণ, লাহোর, পৃ: ৪৪ এবং এজাজুর রহমান: জয়নব, ১৯৫৮, ১ম সংস্করণ পৃ: ৪৭।

আশ্রয় দেন [২৫]। অতঃপর, খলীফা (ইয়াযীদ) হোসেন-পরিবারের মহিলা ও বালক-বালিকাগণকে পূর্ণ মর্যাদার সহিত রাজপ্রাসাদে আশ্রয় দান করেন ; এবং কয়েক দিন পরে তাঁহাদিগকে অতি সমাদরে মদীনায় প্রেরণ করেন*। কবিগণ কাব্য মধ্যে এজিদকে যেরূপ নিষ্ঠুর ও অমানুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, ইতিহাসে তদ্রূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি মনুষ্যত্বের অধিকারী ছিলেন।

---

২৫ ক. মওলানা আজাদ : পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৫।

খ. Muir : The Caliphate. 2nd. Edition. 1891, p. 311.

* মওলানা আজাদ বলেন : ইয়াযীদ আহলে-ই-বয়তকে মেহ্মানের যত্নে কিছুদিন রাখিলেন। তিনি সর্বদা দরবারে তাঁহাদের আলোচনা করিতেন এবং বলিতেন, কি ক্ষতি ছিল, যদি আমি সামান্য কষ্ট স্বীকার করিয়া হুসৈনকে আমার ঘরে ডাকিয়া আনিতাম, তাঁহার দাবী দাওয়া সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিতাম, ইহাতে আমার শক্তি যদি কিছুটা খাটোও হইয়া যাইত, তথাপি অন্ততঃ রসূলুল্লাহ্‌র সম্পর্কের মর্যাদা তো রক্ষা হইত। ইবন যিয়াদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ, কারণ হুসৈনকে সে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছে। হুসৈন তো আমার সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে সম্মত হইয়াছিলেন অথবা মুসলমানদের সীমান্ত পার হইয়া যেহাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইব্‌ন যিয়াদ তাঁহার কোন কথাই মানিল না। তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাঁহাকে হত্যা করিয়া সে আমাকে সমস্ত মুসলিম জাতির সম্মুখে অভিশপ্ত করিয়া দিল। খোদার অভিশাপ ইব্‌ন যিয়াদের উপর। খোদার অভিশাপ ইব্‌ন যিয়াদের উপর। (মওলানা আজাদ : শাহাদতে হুসৈন। লাহোর, ১৯৫৭, ৩য় সংস্করণ, পৃ: ৫০-৫১) এস, খুদা বক্স বলেন : 'Yazid treated the family of Husain with consideration.' (A History of the Islamic peoples. C. U. 1914. p. 100.)

হায়াৎ মাহ্‌মূদের 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যে এজিদের জীবনের শেষ পরিণামের যে-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অস্বাভাবিক। সম্ভবতঃ, ইহা পৌরাণিক কাহিনী (myth) অনুসরণের ফল। মুহম্মদ হানিফা তাঁহাকে জীবন্ত বন্দী করিবার জন্য ছুটিয়া গেলে এজিদ হঠাৎ কুকুরে রূপান্তরিত হইলেন। হোসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মুহম্মদ হানিফা (প্রকৃত নাম ঃ মুহম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়া) ঐতিহাসিক পুরুষ। তিনি কোন দিন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ নাই। সুতরাং এজিদের (ইয়াযীদের) পশ্চাতে তাঁহার ছুটিয়া যাইবার কাহিনী যেমন অবাস্তব, তেমনি এজিদের কুকুরে রূপান্তর প্রাপ্তির বর্ণনাও কবির স্বকপোলকল্পিত। প্রকৃত প্রস্তাবে, স্বাভাবিকভাবে এজিদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁহার সেনাপতি হুসৈন ইব্‌ন নমীর যখন মক্কা নগরী আক্রমণ করিয়া উহা ধ্বংস করিয়া ফেলিতে উদ্যত, সেই সময় অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এজিদ (৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর) এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন**। ইহাই ইতিহাসের কথা। কুকুরে রূপান্তর প্রাপ্তির বর্ণনা নিতান্ত কাল্পনিক এবং হাস্যকর। এজিদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ২য় মু'আবিয়া খলীফা হন। তাঁহার মাত্র ছয় মাস (কাহারও মতে তিন মাস) রাজত্বের পর মারওয়ান সিংহাসনে আরোহণ করেন।

** 'According to Abu Mashar, Waqidi and Elias Nisibenus, Yazid died at Huwarin (near Damuscus) on Tuesday, the 14th Rabi 1, 64, i.e., Tuesday, 11th Nov. 683.' (J. Wellhausen-tr. Margaret Graham Weir : Arab kingdom & its fall. C. U. 1927. p. 167.)

মুহম্মদ খানের 'মকতুল হুসৈন' এবং হায়াৎ মাহ্মূদের 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যে এজিদবধ পর্ব এবং হানিফার যুদ্ধকাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মুহম্মদ খানের কাব্যে এজিদের যুদ্ধ, হানিফাকে বন্দী করিয়া অগ্নিতে দাহ করিবার প্রস্তুতি, এজিদ ঘরণী দেলারাম ও অন্যান্য রমণীগণের দামেস্ক ছাড়িয়া অন্যত্র গমন প্রভৃতি বর্ণনায় যেমন ঐতিহাসিক সত্য নাই, তেমনি হায়াৎ মাহ্মূদের কাব্যে জয়নাল আবেদীনের দূতের পত্র লইয়া বন্যাজ সহরে হানিফার নিকট গমন, হানিফার সদলবলে আগমন এবং এজিদের সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বর্ণনা অনৈতিহাসিক এবং কবিকল্পনাপ্রসূত। কবিদ্বয় দেশের মুসলিম জনসাধারণের প্রচলিত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া হানিফার যুদ্ধ-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা কাব্যের বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া প্রদত্ত হইয়াছে। নানা কারণে মুহম্মদ হানিফার নাম শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলিম নরনারীর নিকট সুপরিচিত। তাঁহার বীরত্বের কাহিনী প্রাচীন ও নবীন কবিগণের বদৌলতে সর্বজনবিদিত; কিন্তু মুহম্মদ হানিফা সত্যই একজন ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা, এ-সম্পর্কে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনেও সন্দেহ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, মুহম্মদ হানিফা (প্রকৃত নাম: মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়া) একজন ঐতিহাসিক পুরুষ, তাহা আধুনিক গবেষণার সাহায্যে স্পষ্টতই প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর সন তারিখ ৮১ হিজরী (৭০০ খ্রীঃ) বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন[+]।

\+ Gibb & Kramers: Shorter Encyclopaedia of Islam, 1953, p. 208.

D. L. O'Leary: Arabic Thought and its Place in History. Revised Edition. 1939, p. 95.

M. J. De Goeji ed.: AT Tabari, II, Series II, Published in 1883-85, p. 694.

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক 'উবায়দুল্লাহ বিস্‌মিল অমৃতসরী বলেন, মুহম্মদ হানিফা সাধারণতঃ 'ইবন্নুল হানাফিয়া' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম: মুহম্মদ আকবর; ডাকনাম আবুল কাসিম এবং ইব্‌নুল হানাফিয়া। তাঁহার পিতা আলী ইব্‌ন আবূ তালিব এবং মাতা খুলা (খাওলা) বিন্তে জাফর[২৬]। 'উবায়দুল্লাহ্‌ অমৃতসরী, আরব-গ্রন্থকার আল্লামা বাদখ্‌শীর 'নজমূল আব্‌রার' গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, হযরত আলীর মোট সাতজন পত্নী ছিলেন; এতদ্ব্যতীত, আরও দুই পত্নী সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এই শেষোক্ত দুই স্ত্রীর অন্যতম ছিলেন খাওলা বিন্তে জাফর বিন্‌ কয়স আল্‌ হানাফিয়া*। বীবী খাওলার পিতা জাফর, মুহম্মদ হানাফিয়ার মাতামহ; তাঁহার মাতামহের পিতার নাম কয়স আল্‌ হানাফিয়া। সুতরাং

---

২৬ মূল আরবী:

محمد اكبر المكنى بابى القاسم المشهور بابن الحنفية

امه خولة بنت جعفر.

[উবায়দুল্লাহ্‌ বিসমিল অমৃতসরী: সওয়ানে উম্‌রী হযরত আলী, (৪র্থ বার) ২য় সংস্করণ, প্র° ছি° ১৩১৭, পৃঃ ৩১৭।]

* হযরত আলীর ৭জন বীবীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১। হযরত বীবী ফাতিমা জোহরা,
২। উম্মুল বনিন বিন্তে হারাম বিন্‌ খালিদ,
৩। আস্‌মা বিন্তে আমিস,
৪। বীবী এমামা বিন্তে আবুল আস্‌ বিন্‌ রাবি,
৫। মুখবাত বিন্তে আমরুল কয়স,
৬। উম্মে সাঈদ বিন্তে আরুয়া বিন্‌ মাসুদাস সাক্‌ফিয়া,
৭। লায়লা বিন্তে মাসুদ,

'হানাফিয়া' উপাধি এখান হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়[২৭]।

ঐতিহাসিক সৈয়্যিদ আমীর আলী এবং ই. জি. ব্রাউন মুহম্মদ হানিফার ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন নাই। হিজরীর ৭১ সালে আরাফাতের ময়দানে পবিত্র হজ্ উপলক্ষে মুসলমানগণ চারিটি প্রধান দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন। এই চারি দলের অন্যতম দল ছিল মুহম্মদ আল্ হানাফিয়ার। ব্রাউন এবং সৈয়্যিদ আমীর আলী আরও বলেন, বীবী ফাতিমার মৃত্যুর পর হযরত আলী হানাফিয়া গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এক মহিলাকে বিবাহ করেন। এই মহিলা হানাফিয়া গোত্রভুক্ত ছিলেন বলিয়া তদীয় পুত্র এই উপাধি ধারণ করেন[২৮]। আল্ মুখতার নামক যে-ব্যক্তি কুফায় হোসেনহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি এই মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার প্রতিনিধিরূপে নিজকে ঘোষণা করিয়াছিলেন[২৯]।

এতদ্ব্যতীত, আরও দুইজন বীবীর সম্পর্কে মতভেদ বর্তমান। এই দুইজন :

১। খুলা (খাওলা) বিন্তে জাফর বিন কয়স আল্ হানাফিয়া,

২। উম্মে হাবীবোছাহাবা বিন্তে রাবিয়া।

(উবায়দুল্লাহ্ অমৃতসরী : সওয়ানে উমরী হযরত আলী। ২য় সংস্করণ ১৩১৭ হিঃ, পৃঃ ৩২১।)

২৭ উবায়দুল্লাহ্ অমৃতসরী : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২১।

২৮ ক. Syed Ameer Ali : op. cit., p. 94.

খ. E. G. Browne : A Literary History of Persia. Vol. 1. Cambridge University Press. Re-printed 1929. p. 228.

২৯ 'Al-Mukhtar began propaganda of his own, saying, he was the emissary of Muhammad, son of Ali, called ibn-al-Hanafiya from the name of his mother's tribe.' (Houtsma, Wensinck etc. ed : Encyclopaedia of Islam. Vol. III. 1936. pp. 716-717.)

এতদ্ভিন্ন ইব্‌ন খলদুন[৩০], খাজা হাসান নিযামী[৩১], নিকলসন[৩২], ওলিয়ারী[৩৩], এবং গিব্‌ ও ক্রামারস্[৩৪] মুহম্মদ ইবনুল্ হানাফিয়ার (সংক্ষেপে মুহম্মদ হানাফিয়া বা হানিফা) ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদও ইব্‌নুল হানাফিয়ার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হযরত আলী মৃত্যুর পূর্বে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের সঙ্গে মুহম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়াকেও উপদেশ প্রদান করেন[৩৫]। হায়াৎ মাহমুদের কাব্যে বর্ণিত আছে, কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মুহম্মদ হানিফা বন্যাজ শহর হইতে লোক লস্করসহ আগমন পূর্বক এজিদপক্ষীয় সৈন্যের সহিত লড়াই করিয়া শত্রুদলকে পরাভূত করেন। এ-ঘটনার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। মুহম্মদ হানিফা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, ইতিহাসে এরূপ নজির কোথাও পাওয়া যায় না। তবে কুফার আল্ মুখতার নামক এক ক্ষমতাবান পুরুষ কারবালা যুদ্ধক্ষেত্রে ইমাম হোসেনের হত্যাকারিগণকে নিহত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

ইমাম হোসেন কারবালার যুদ্ধে শাহাদৎ বরণ করার পর কুফায় কিশান নামক এক ব্যক্তি (সে মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার

---

৩০ আহমদ হুসৈন অনূদিত : ইব্‌নে খলদুন, ৫ম খণ্ড, ১৯০২ এলাহাবাদ, পৃঃ ১৫৮ ও ১৮০।

৩১ খাজা হাসান নিযামী : ইয়াযীদনামা, দিল্লী ১৯২২, পৃঃ ৪৭-৪৮।

৩২ A Literary History of the Arabs : pp, 218-220.

৩৩ Arabic thought and its place in History. Revised Edition 1939, p. 93.

৩৪ S. E. I., 1953, pp. 208-209.

৩৫ মওলানা আজাদ (অনূদিত : মুহি উদ্দীন খান) : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৪-৭৫।

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল) প্রচার করিল যে, হযরত আলীর পরে মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়াই প্রকৃত ইমাম। কিশানের প্রচেষ্টায় একদল লোক মুহম্মদ হানাফিয়ার পক্ষে বয়'অত গ্রহণ করে। আল্ মুখতার এই 'কিশানী' দলভুক্ত হন। অতঃপর, মুখতার কুফা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহের মালীক হইয়া কিশানী ধর্মমত প্রচার করিতে থাকেন। কুফার শীয়াগণের সন্তুষ্টি বিধানার্থে তিনি প্রচার করিলেন যে, ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসেনের পর মুহম্মদ হানাফিয়া তৃতীয় ইমাম। ফলে, কুফার সব লোক তাঁহার দলভুক্ত হয়, তখন তিনি তাহাদের বলিলেন যে, হোসেন-ভ্রাতা মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়া কারবালা যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তাঁহাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ, মুখতার একটি সিল্‌মোহরযুক্ত চিঠি কুফার সর্বসাধারণের নিকট অর্পণ করেন। চিঠিতে লিখিত ছিল যে, মুখতার ইব্‌ন আবূ ওবায়দা সাকৃফী মুহম্মদ হানাফিয়ার প্রতিনিধি। সুতরাং, সকলে হোসেন-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যেন তাঁহার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়[৩৬]। মুখতারের অধীনে একটি বিরাট দল শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং তিনি অনুসন্ধান করিয়া হত্যাকারীদের নির্মূল করিলেন[৩৭]। ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। অতএব, কবিগণের

---

৩৬ মুখতারের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য কুফার একদল লোক মদীনায় গিয়া মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে। তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর কৌশলপূর্ণ ভাষায় প্রদান করেন। মুখতারকে তিনি তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিনা তৎসম্পর্কে তিনি কিছুই বলিলেন না, কেবল এই বলিলেন যে, ইমাম হোসেনের হত্যার প্রতিশোধ লওয়া প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ওয়াজিব। এ-কথা শুনিয়া লোকগুলি মুখতারকে সত্যবাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। (খাজা হাসান নিযামী: ইয়াযীদনামা। দিল্লী, ১৯২২, পৃ: ৪৭-৪৮।)

৩৭ **Muir: The Caliphate. London 1891. pp. 221-223.**

বর্ণিত মুহম্মদ হানাফিয়ার স্বয়ং এজিদের (ইয়াযীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা এবং তৎকর্তৃক হোসেনহত্যার প্রতিশোধ-গ্রহণ-কাহিনী আগাগোড়া কবিকল্পনার সৃষ্টি। তিনি নিজে কখনও এজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই।

হায়াৎ মাহমুদ, গরীবুল্লাহ্ ও ইসহাক উদ্দীন প্রমুখের কাব্য-বর্ণিত বন্যাজ শহর, একাস্তা শহর, আম্বাজ শহর, তোগান-তুরুক শহরের কোন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ, এই শহরগুলিও কবির কল্পনাপ্রসূত। তাছাড়া হায়াৎ মাহ্মূদ, মুহম্মদ খান, জাফর, গরীবুল্লাহ্, জনাব আলী প্রমুখের কাব্যে আরও এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা আছে যাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। খুবসম্ভব, এই বিষয়গুলির অধিকাংশ জনশ্রুতি-নির্ভর এবং বাকীগুলি পুরাণকথা। বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কাহিনীকে পাঠক-সাধারণের কাছে রসালো এবং আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার প্রয়োজনে এ-গুলির সৃষ্টি।

—

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা মর্সীয়া কাব্যগুলির সাহিত্যিক আলোচনা

১। মুঘল আমলের কাব্যগুলির সাহিত্যিক আলোচনা

ক. চরিত্র-চিত্রণ

খ. বর্ণনা-কৌশল ও ভাষার গুণাগুণ

গ. সমাজ-চিত্র

ঘ. অলঙ্কার-ব্যবহার ও তাহার আলোচনা

চরিত্র-চিত্রণ

মুঘল আমলের কবি মুহম্মদ খানের 'মোক্তাল হোসেন' (মকতূল হুসৈন) কাব্যে অসংখ্য নরনারীর সাক্ষাৎ মিলে তাঁহার এই কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত ; অপ্রধান চরিত্রের অধিকাংশই ইতিহাস-বহির্ভূত ও কাল্পনিক। তিনি কাব্যে এমন এক শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের নিষ্ঠুরতা, কপটতা, ক্রুরতা কাব্যকাহিনীর গতি-প্রবাহকে অব্যাহত রাখিয়াছে। ইহারই পার্শ্বে আর এক শ্রেণীর নর-নারীর চরিত্র সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহাদের স্নেহমমতার কল্যাণ রশ্মিপাতে কাব্যখানি উজ্জ্বল। এ-কাব্যে ইমাম হোসেন (হুসৈন) কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে চিত্রিত। কবির কল্পনা-সমৃদ্ধি, গঠন-কৌশল এবং রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় এই চরিত্রের মধ্যে যেরূপ পাওয়া যায়, অন্যান্য চরিত্রের বেলায় তদ্রূপ পাওয়া যায় না। হোসেন চরিত্রে পরিণতির ছাপ বিদ্যমান থাকিলেও অসঙ্গতির নিদর্শন কিছু আছে। এই মূল চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া আরও কয়েকটি প্রধান ও অনেকগুলি অপ্রধান

চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কবির চিত্রিত হোসেন মহাবীর। স্নেহে, প্রেমে, দয়াদাক্ষিণ্যে, ত্যাগে এবং বীরত্বে তিনি মহিমময়। পরম শত্রুর প্রতিও তিনি ক্ষমাশীল। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দণ্ডায়মান হইয়াও তিনি শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি কুফার জনসাধারণের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী। যে-কুফাবাসী ইতঃপূর্বে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, তাহাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা জানা সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে অবিশ্বাস করেন নাই। তিনি সরল, তাই কুফীগণের সরল-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। হোসেন কুফার পথে রওয়ানা হওয়া সত্ত্বেও শুধু বিধির নির্বন্ধে কারবালার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি সবান্ধব ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত; এই অবস্থায় চরম বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেন নাই। ফোরাত নদীর পানি সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্যদ্বারা অবরুদ্ধ; যে-কোন মুহূর্তে সবান্ধব প্রাণ যাইতে পারে। মরণ নিশ্চিত জানিয়াও যে-পুরুষ আদর্শ ও সত্যনিষ্ঠার জন্য অবিচলিত রহিলেন, সেই বলিষ্ঠ চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া মুহম্মদ খানের দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। হোসেনের চক্ষুর সম্মুখে পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র, সহচর ও বন্ধু-বান্ধব হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তিনি স্বচক্ষে সব দেখিতেছেন। তাঁহার অন্তরে বিষাদ ও শোকের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে; তথাপি তিনি অসত্যের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। দুই দিনের অনিত্য সংসারে মিথ্যার নিকট আত্মসমর্পণ অপেক্ষা ধর্ম ও সত্যের জন্য আত্মদান শ্লাঘাজনক। এইজন্য হোসেন বলেন ঃ

> প্রাণের কাতর নহে আলীর নন্দন।
> মৃত্যুকে না ভাবি ভয় মৃত্যু বন্ধুজন ॥

সত্য ও স্বাধীনতা, ন্যায় ও মনুষ্যত্বরক্ষার জন্য এমন দৃঢ়বলসম্পন্ন

বলিয়াই হোসেন 'মোক্তাল হোসেন' কাব্যের প্রধান চরিত্ররূপে চিত্রিত হইতে পারিয়াছে। হোসেন-চরিত্রের গৌরব এখানেই সমাপ্ত হয় নাই। যিনি সত্যসন্ধ, সত্যরক্ষার্থে যিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর, তিনি পত্নীর নিকট আদর্শ-স্বামী, পুত্র-কন্যার নিকট আদর্শ-পিতা এবং সহচরগণের নিকট আদর্শ-বন্ধু। স্নেহ, মমতা ও করুণায় তিনি পুষ্পের ন্যায় কোমল।

হোসেন অগ্নি-পরীক্ষায় যে কিভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার বলিষ্ঠ চিত্র মুহম্মদ খানের কাব্যে বর্তমান। শোকার্ত হোসেন স্বীয় পুত্র আলী আকবরকে স্বহস্তে যুদ্ধ-সজ্জা পরাইয়া দিতেছেন, তাঁহার হস্ত কম্পিত হইয়াছে, তবু কর্তব্য বিস্মৃত হন নাই। যুদ্ধের শেষ অবস্থায় হোসেন-পক্ষীয় যোদ্ধাগণ অনন্ত নিদ্রায় শায়িত; সর্বশেষে, রোগাক্রান্ত পুত্র জয়নুল আবেদীন যুদ্ধে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পুত্রস্নেহাতুর পিতা হোসেন জয়নুলকে স্নেহভরে কাছে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন এবং পুত্রকে নানা উপদেশ দিয়া স্বয়ং যুদ্ধে চলিলেন। প্রিয়তমা-পত্নী বীবী শাহের-বানু রোরুদ্যমানা; পত্নীর মর্মভেদী ক্রন্দনে হোসেন বিচলিত হইলেও তাঁহার বীর-হৃদয় কোন বাধাই মানিল না। হোসেন পরিবার-পরিজনের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া নিজেও অশ্রুপাত করিলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় তিনি অটল। সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে হোসেন-চরিত্রের বলিষ্ঠ রূপ ও মানবীয়বোধ চিত্রিত। এই চরিত্র অঙ্কনে কবি সব সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন বলিয়া অন্যান্য চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে তিনি শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তথাপি, কতকগুলি ক্ষুদ্র চরিত্র মন্দ ফুটে নাই। এই চরিত্র-চিত্রণে কবি-প্রতিভার ছাপ পড়িয়াছে। অবশ্য একমাত্র হোসেন ব্যতীত অন্য কোন নর-নারীর চরিত্রে নাটকোচিত পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় নাই।

হযরত আলীর যুদ্ধ-বিজয় সংবাদ লইয়া আবদুর রহমান কুফা গমন করিলে সে সেইস্থানে কর্তামা (ঐতিহাসিক কাতামা) নাম্নী এক সুন্দরী যুবতীর রূপ যৌবনে প্রলুব্ধ হইয়া তাহার দেহ-ভোগের জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু কর্তামা যখন রহমানকে জানাইল যে, তাহার পিতৃ-ভ্রাতৃহন্তা আলীকে হত্যা করিতে না পারিলে তাহাকে (কর্তামাকে) লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন আবদুর রহমান উভয়সঙ্কটে পতিত হয়। কর্তামা সুন্দরী যুবতী নারী, কিন্তু প্রতিহিংসায় সে কঠোর। ইহা যেন 'সুন্দর কুসুমে কীট বাস'। হিংসাপরায়ণ সুন্দরী নারীর প্ররোচনায় আবদুর রহমান, আলীকে হত্যা করিতে স্বীকৃত হইল। নারীর দেহভোগের লালসার নিকট সে ধর্ম ও মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিল। লালসার নিকট ধর্মবুদ্ধির পরা-জয়ের চিত্র কবি সুন্দর আঁকিয়াছেন। পক্ষান্তরে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য নিজের নারীত্ব, সতীত্ব এবং মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেওয়ার চিত্র কর্তামা চরিত্র মারফত কবি অঙ্কন করিয়াছেন। মুহম্মদ খানের কাব্যে নারী চরিত্রগুলি পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা উজ্জ্বলতর এবং বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। জাফর-কন্যা জয়নবের ধর্মজ্ঞান অতি প্রবল। তিনি এজিদের (ইয়াযীদের) ধনদৌলতের আশা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মবলে বলীয়ান ইমাম হাসানকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছেন। হাসানকে স্বীকার করার পশ্চাতে তাঁহার পরকালের জন্য মুক্তি-কামনা প্রবল। তাঁহার নারী-প্রকৃতি স্নিগ্ধ ও কোমল। তিনি হাসানের বিষপানে মৃত্যুর জন্য যেরূপ হাহাকার করিয়াছেন, তেমনি কারবালা রণ-প্রান্তরে প্রিয়তম-পুত্র কাসেমের (কাসিমের) অকাল মৃত্যুর জন্য বুকে করাঘাত করেন; তিনি পুত্রশোকে পাগলিনী। জয়নব (যয়নব) যেমন কাসেমের স্নেহময়ী জননী, তেমনি হাসানের পতি-গতপ্রাণা পত্নী। পুত্রবধূ সখিনার সদ্যবৈধব্যে তিনি গভীর শোকে শোকাকুলা। সখিনাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা তিনি খুঁজিয়া পান

নাই। জয়নব-চরিত্রের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য ইমাম হোসেনের পত্নী বীবী শাহেরবানুর চরিত্রেও অঙ্কিত। শাহেরবানুও সতী-সাধ্বী, প্রেমময়ী ও স্বামিসোহাগিনী। যে-স্বামী হোসেনের জীবিতাবস্থায় তিনি নিজকে সৌভাগ্যশালিনী ও স্বামিগর্বে গরবিনী মনে করিতেন, সেই হোসেনের হত্যাকাণ্ডের পর শাহেরবানু গভীর শোকে মুহ্যমান। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। নারীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ যে স্বামী, তাহার মৃত্যুতে তিনি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার দেহে স্নেহ-প্রেম-প্রীতির ফল্গুধারা সতত প্রবহমান। 'মোক্তাল হোসেন' কাব্যে মুহম্মদ খান নানা বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে জয়নব ও শাহেরবানুর চরিত্র দুইটি নারী-হৃদয়ের বিভিন্ন গুণের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তথাপি, শাহেরবানু এ-কাব্যের নায়িকা-চরিত্র নহেন।

এজিদ এ-কাব্যের একটি প্রধান চরিত্র। তাঁহাকে কাব্যের প্রতিনায়করূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু, এজিদ কাব্যের সর্বত্র পুরাভাগে অবস্থান করেন নাই। তিনি অন্তরালবর্তী হইয়াও কারবালা যুদ্ধের সূচনা করিয়া নবী-বংশ ধ্বংস করিয়াছেন। তিনি ইমাম হাসান-হোসেনের পরম শত্রু। শত্রুকে ছলে-বলে-কৌশলে হত্যা করিয়া সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তিনি যে-ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কুটিল ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ বাদশাহ-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এজিদ অতিশয় স্বার্থপর ও নীচ; তিনি স্বার্থসিদ্ধির আকাংক্ষায় হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবার জন্য দুষ্ট মেরুয়াকে (মারওয়ানকে) নিযুক্ত করিয়াছেন। মেরুয়ার সহায়তায় তিনি হাসানের পত্নী আস্‌মাকে প্রলুব্ধ করিয়া স্বামি-হত্যা করিতে প্ররোচিত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন। হোসেনের ছিন্ন শির দামেস্কের রাজদরবারে নীত হইলে তিনি একখণ্ড বেত্রদণ্ড দ্বারা

শিরের মুখমণ্ডলে অমানুষিক হিংস্রতার সহিত বারংবার আঘাত করিতে থাকেন। মুহম্মদ খানের এজিদ-চরিত্রে নানা দোষ আরোপিত। তাঁহার আদেশে হোসেন-পরিবার প্রায় নির্মূল হইয়াছে, নবী-বংশ ধ্বংসপ্রায়; তথাপি, তাঁহার মনে করুণার উদ্রেক হয় নাই। অথচ ইমাম হোসেন সম্পর্কে তাঁহার নিকট-আত্মীয়। মেরুয়া তাঁহার মন্ত্রী ও দক্ষিণহস্ত। সে উপযুক্ত বাদশাহ্‌র উপযুক্ত উজীর; কারণ এজিদের সমস্ত দুষ্কার্য এই মেরুয়ার সাহায্যেই সম্পন্ন হইত।

আকিল-পুত্র মোসলেম (মুসলিম) হোসেনের খুল্লতাত ভ্রাতা। ভ্রাতার দৌত্য লইয়া তিনি কুফা যাত্রা করিয়াছিলেন। হোসেনের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া বিদেশ-গমনে ভ্রাতার প্রতি তাঁহার অন্তরের গভীর ভক্তিশ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। কুফা যাত্রার পর মুহূর্তে, অমঙ্গলের আশু সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়াও তিনি ভ্রাতার আদেশ অমান্য করেন নাই। মোসলেম সম্পর্কে হোসেনের খুল্লতাত ভ্রাতা; কিন্তু তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত দূত এবং অনুচরও বটে। কুফার জনসাধারণ যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধে মাতিয়াছে, তখন মোসলেম প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিয়াছেন; চরম বিপদেও হোসেনের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা টলে নাই। ইহা তাঁহার দৃঢ় মনোবলের পরিচায়ক।

কুফায় মোসলেমের আত্মদানের পূর্বে হানি এবং মাস্তুরা নামক দুইটি পুরুষ ও একটি নারী চরিত্রের (এই বৃদ্ধা নারীর নাম নাই) সাক্ষাৎ মিলে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া মোসলেম এক বৃদ্ধার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলে বৃদ্ধা তাঁহাকে নবী-বংশধর জানিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করে; কিন্তু তাহার পুত্রের বিশ্বাস-ঘাতকতায় মোসলেম ধৃত হন। কবি অল্প কথায় যেমন বৃদ্ধার স্নেহ-মমতা ও পরার্থপরতার চিত্র আঁকিয়াছেন, তেমনি তাহার (বৃদ্ধার)

পুত্রের স্বার্থপরতা ও নীচতার আলেখ্যও কাব্যে অঙ্কনের প্রয়াস পাইয়াছেন। কবির তুলিকায় হানি ও মাস্তরার চরিত্র কাব্য-বর্ণিত বিভিন্ন নরনারীর চরিত্রের মধ্যে বেশ উজ্জ্বল। মোসলেমের প্রাণ-রক্ষার জন্য হানি তাঁহাকে স্বগৃহে আশ্রয় দেন। তিনি আবদুল্লাহ্ যিয়াদের ভয়ে ভীত হন নাই; অথচ এই নির্ভীকতার জন্যই তাঁহাকে জীবনাহুতি দিতে হইল। তিনি জানিতেন যে, মোসলেম তাঁহার আশ্রিত, তদুপরি নবীবংশধর। কাজেই, আবদুল্লাহ্‌র আদেশ পাইয়াও তিনি আশ্রিতকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করেন নাই।

'হানি এ বলিল আমি শত হেন জন।
মোসলেমের জন্য মৈলে সাফল্য জীবন॥

সত্যই, উপচিকীর্ষু হানি স্বয়ং প্রাণ দিলেন; আশ্রিতের বিপদ নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইলেন এবং চরম অবিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতকতার কারাপ্রাচীরের মধ্যে হানি মনুষ্যত্ব মহিমার জ্বলন্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। কারাগাররক্ষক মস্তর আত্মোৎসর্গ করিয়া ঘোর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছে। মোসলেমের বালক পুত্রদ্বয় কারাগারে ধৃত হইলে দয়ার্দ্রহৃদয় মস্তর তাহাদের মুক্ত করিয়া দেয়। মস্তর জানিত যে, সে নিজেও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে; কিন্তু মন স্থির করিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। সে বুঝিয়াছিল, বালক দুইটি নিরপরাধ এবং নিষ্কলঙ্ক। তাহাদের মুক্ত করিয়া দিবার ফলে যদি তাহাকে আত্মদানও করিতে হয়, তবু শ্রেয়ঃ। মস্তর সত্যই আত্মত্যাগ করিল। আবদুল্লাহ্‌র আদেশে তাহার কঠোর শাস্তি হইল। তাহার চরিত্রের প্রধান গুণ: প্রশান্ত সহন-শীলতা ও ক্ষমাশীলতা। বিপদ-আপদেও তিনি শান্ত ও সংযত। হানির সম্পর্কেও এ-কথা খাটে। তবে, হানির ধর্মনিষ্ঠা যে-মৃত্যুকে

আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রেরণা দিয়াছে, মস্তরের মনুষ্যত্ব ও নির্ভীকতা সেই মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইবার শক্তি জোগাইয়াছে।

ইহাদের বিপরীত প্রকৃতির মানুষরূপে হারেস, ছদ্মবেশী মহুকীল, খুলি প্রভৃতিকে মুহম্মদ খান অঙ্কন করিয়াছেন। হারেসের নিষ্ঠুরতা ও ক্রুরতার মূলে রহিয়াছে অর্থলিপ্সা। মোসলেমের বালক পুত্রদ্বয়ের মস্তক কাটিয়া আবদুল্লাহ্‌কে ভেট দিতে পারিলে সে বহু টাকা পুরস্কার পাইবে, এই আশার বশবর্তী হইয়া বালকদ্বয়কে হত্যা করিবার জন্য নদীতীরে লইয়া গিয়াছে। বালকদ্বয়কে তাহার হস্ত হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিলে নর-পিশাচ হারেস নিজের স্ত্রী, পুত্র এবং গোলামকে খুন করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। হারেসের প্রকৃতি যেমন নীচ, তেমনি বিভৎস। অর্থের জন্য সে যে নিজের সর্বনাশ সাধন করিতেছে সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যে-অর্থের জন্য সে নিজের সাধারণ মনুষ্যত্ব পর্যন্ত বিকাইয়া দিল, তাহা সে পায় নাই! বরং দুইটি নিরীহ বালককে হত্যার অপরাধে নিষ্ঠুরভাবে তাহার প্রাণদণ্ড হইল। এ-স্থলে হারেস চরিত্রের সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও ভীষণতা সত্ত্বেও তাহার প্রতি পাঠকের মন করুণায় ভরিয়া উঠে। মুহম্মদ খান হারেস চরিত্র অঙ্কনে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। ঘৃণিত পাষণ্ডের প্রতিও যে পাঠকের মনে করুণার উদ্রেক হইতে পারে, মুহম্মদ খানের কাব্য পড়িয়া তাহা জানা যায়।

মোসলেমের হস্তে বয়‘অত গ্রহণের জন্য মহুকীল ছদ্মবেশে যেভাবে তাঁহার নিকট টাকা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং পরে মোসলেমের বাসস্থানের সংবাদ আবদুল্লাহ্‌ যিয়াদের কর্ণগোচর করিয়া মোসলেমের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে তাহা মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক। হোর এজিদের বেতনভোগী সেনাপতি। হোসেনের গতিবিধি অনুসরণ করিবার জন্য তাহার প্রতি আদেশ ছিল। হোর

প্রথম প্রথম হোসেনকে অনুসরণ করিয়াছে। হোসেন কারবালার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলে ইমাম হোসেনকে সে ভিন্ন পথ ধরিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিল। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। হোসেনের কাফেলা রাত্রির ঘনান্ধকারে পথ ভুলিয়া বারংবার একই স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া উপস্থিত হইল। অবশেষে বাধ্য হইয়া শিবির সন্নিবেশ করা হইলে হোসেনের পরিবার-পরিজন ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইলেন। এদিকে এজিদ-সেনাপতি হোর রসূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকায় তাহার মনে যুগপৎ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। একদিকেঃ এজিদের অর্থ ও চাকুরী, অপরদিকেঃ হযরত রসূলের প্রতি শ্রদ্ধা ও পরকালের চিন্তা। তাহার মনে সত্যমিথ্যার দ্বন্দ্বে সত্যের জয় হইল।

হোর বলে রসুল হৈতে পরকালে উদ্ধার।
করিবারে চাহি তাকে স্ববংশে সংহার॥
আপনে আপনা চাহি নরকে দহিতে।
সেইহেতু কম্পে মন সে সব চিন্তিতে॥

হোর এজিদপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া হোসেনের কাফেলায় যোগদান করিল এবং এজিদ-সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মবিসর্জন দিল। রসূলের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও পরকালের চিন্তা তাহার অন্তরে প্রবল ছিল বলিয়া সে আত্মদানের প্রেরণা পাইয়াছিল। তাই, হোরের আত্মত্যাগের চিত্র কবির তুলিকায় ভাল ফুটিয়াছে।

ইহুদীদেশের রাজপুত্র সদ্য-বিবাহিত হিলাল, যুবতী স্ত্রীর প্রতি সকল আকর্ষণ ও কর্তব্য বিসর্জন দিয়া যুদ্ধ করিতে যায় এবং শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দান করিয়া মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর মধ্য দিয়া কবি তাহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। হিলালেরই সগোত্র মহাবীর কাসেম ও ওহাব। হিলালের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের

সঙ্গে তাহাদের উভয়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য আছে। কবি একই দৃষ্টিকোণ হইতে এই তিনটি পুরুষকে দেখিয়াছেন এবং তদনুযায়ী তাহাদের চিত্রিত করিয়াছেন। ওহাব ও কাসেম সদ্যবিবাহিত। ওহাব মাতৃভক্ত পুত্র; হোসেনের মহাবিপদে সে মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া রণক্ষেত্রে চলিয়াছে। ওহাবের তরুণ-যৌবন। তাহার সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়িয়া আছে। সে জীবন উপভোগ করিতে পারে নাই। এমন সময়ে আত্মদানের আহ্বান আসিলে সুন্দরী স্ত্রীকে চিরদিনের মত ফেলিয়া যাইতে তাহার মন প্রথমে অকুণ্ঠভাবে সাড়া দেয় নাই। যুদ্ধে গমনের পূর্বে তাহার মনে যুগপৎ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আলোড়ন জাগিয়াছে। তথাপি, তাহাকে যুদ্ধে গমন করিয়া আত্মদান করিতে হইয়াছে। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মহাবীর কাসেমের মনেও দুর্বলতার ছায়াপাত হইয়াছিল। সাহিত্যে-কাব্যে চিত্রিত নর-নারী যে সব সময় বলিষ্ঠ চরিত্র-সম্পন্ন হইবে, এমন কথা বলা ঠিক হইবে না; দুর্বল-স্বভাব মানুষের চরিত্রও সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার দুর্বলতাকে দেদীপ্যমান করিয়া তুলিতে হইবে। বলা বাহুল্য, মুহম্মদ খানের 'মোক্তাল হোসেন' কাব্যের অনেকগুলি পুরুষই দুর্বল স্বভাবের। তাঁহার রচনায় তাহারা দীপ্যমান হইয়াছে।

কাসেম-সখিনার ঘটনা কারবালা ট্র্যাজেডির অন্যতম। হিলাল ও ওহাব অপেক্ষাও কাসেমের চরিত্রের দুর্বলতা সুস্পষ্ট। চরম বিপদের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও কাসেমকে প্রেমাবেগে অধীর হইতে দেখা যায়—'দেখিয়া কুমারী মুখ, কুমারের মনে সুখ, কামবাণে আকুল হইল'। একদিকে কাম-বাসনা, অন্যদিকে ধর্মভয়। ইহাতে কাসেমের মনেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। কাসেম-চরিত্রে মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি আছে; কিন্তু তিনি জীবন-মৃত্যুর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়ের দুর্বার

প্রেমাকাংক্ষাকে দমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাসেমের চরিত্রে মানব-ধর্মের স্বাভাবিক রূপ চিত্রিত হইয়াছে। সখিনা নারী ; স্বামীর ক্ষণিক সান্নিধ্য তাঁহার নারী-জীবনে মাধুর্যের সন্ধান দিয়াছে। অথচ, সেই স্বামীকে হারাইয়া তিনি হাহাকার করিয়াছেন। যে-রণক্ষেত্রে তাঁহাদের ক্ষণিক মিলন ঘটিয়াছে, সেই রণক্ষেত্রে তাঁহাদের চির বিরহের যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে। ইহা করুণ ও মর্মস্পর্শী। মুহম্মদ খাঁর রচনা-কৌশলে কাসেম-সখিনা চরিত্রে বাংলাদেশের নর-নারীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়িয়াছে।

মুহম্মদ খানের এই কাব্যের কোন কোন চরিত্রে অসাধারণত্বের ছায়াপাত হইয়াছে। ইহার ফলে এই চরিত্রগুলি অস্বাভাবিক বর্ণে রঞ্জিত। কবি কাব্যমধ্যে অসংখ্য নর-নারীর চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। বহু চরিত্রে মহৎ গুণের ছাপ আছে, তবু তাহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা স্পষ্ট হইয়াছে। কবি কাব্যমধ্যে কখনও কখনও এমন কতকগুলি চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, যাহারা সাধারণ মানুষের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অতিমানবের পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ —মুহম্মদ হানিফার কথা উল্লেখ করা যায়। মুহম্মদ হানিফা, মহাবীর হযরত আলীর পুত্র। তাঁহার দৈহিকশক্তি অসাধারণ ; শৌর্যবীর্যেও তিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ। এদিক হইতে মহাভারত-বর্ণিত ভীমসেনের সহিত তাঁহার চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে। আম্বাজ শহর হইতে দামেস্ক আসিয়া তিনি যেভাবে এজিদের লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিমেষমধ্যে দলিত মথিত করিয়াছেন, তাহা অসাধারণত্বের লক্ষণাক্রান্ত। এতৎসত্ত্বেও, তাঁহার চরিত্রে ক্ষমাশীলতা ও ঔদার্যের পরিচয় বর্তমান। এজিদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হানিফা শত্রুতা ভুলিয়াছেন। এইজন্য তিনি এজিদের পত্নী দেলারাম ও অপরাপর পুরমহিলাদের প্রতি ক্ষমা ও ঔদার্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এজিদ তাঁহার শত্রু ; কিন্তু দেলারাম নারী ও দামেস্কের রাণী।

দেলারামের প্রতি তাঁহার কোন বৈরিভাব নাই ; কাজেই, দেলারামকে তিনি স্থানান্তরে যাইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মোহাম্মদ হানিফা কহে এই কোন্ নারী।
কাহার ঘরণী হয় এমন সুন্দরী॥
সর্বলোকে বলে এই এজিদ বণিতা।
দেলারাম পাটেশ্বরী পাত্রের দুহিতা॥
শুনিয়া সদয় হৈল আলীর নন্দন।
আজ্ঞা দিল ছাড়ি দিতে যত নারীগণ॥

ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদের কারারুদ্ধ করিতে পারিতেন বা শাস্তি দিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা করেন নাই। তাঁহার চরিত্রে ভ্রাতৃপ্রেমেরও পরিচয় আছে। ভ্রাতা হোসেনের শোকে তিনি দরবিগলিত ধারায় ক্রন্দন করিয়াছেন এবং প্রতিশোধের জন্য এজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন।

মুহম্মদ খানের কাব্যে ঐতিহাসিক চরিত্র ব্যতীত ইতিহাস-বহির্ভূত এমন অনেক চরিত্রের সমাবেশ আছে যাহাতে কবির কল্পনা-প্রবণতার স্বাভাবিক স্ফূর্তি হইয়াছে। অনৈতিহাসিক চরিত্রগুলির মধ্যে জাফর জাহেদী অন্যতম। সে পরি-সর্দার। হযরত আলী একবার দেওগণকে পরাভূত করিয়া সেই রাজ্য জাফরের পিতাকে অর্পণ করেন। পিতার মৃত্যুতে জাফর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছে। কাজেই, হোসেনের বিপদে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সে তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছে। কিন্তু, হোসেন মানুষের সহিত যুদ্ধে পরি-সর্দারের সাহায্য গ্রহণ না করায় সে চলিয়া গেল। জাফরের চরিত্র কাল্পনিক ; কাব্যের কেন্দ্রীয়-চরিত্র হোসেনকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজনে ইহার আমদানী। উপ-কারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের মধ্যে জাফর-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু, হোসেন চরিত্রের যে-বৈশিষ্ট্য সম্পাদনের

জন্য কবি পরিসর্দারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মুহম্মদ খানের কাব্যে মৌলিক দুর্বলতার পরিচায়ক। ইহা হোসেন চরিত্রের সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতা নষ্ট করিয়াছে। কবি বুঝিতে পারেন নাই যে, স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে অস্বাভাবিক, অলৌকিক বিষয়ের আমদানী করিলে কাব্যের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়; যে-ধর্ম ও সত্যের জন্য হোসেন আত্মদান করিলেন, সে ধর্ম ও সত্যের মহিমা চাপা পড়িয়া যায়।

পূর্ব-বর্ণিত নর-নারী ব্যতীত অন্যান্য কতকগুলি নর-নারীর চরিত্রে বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের পরিচয় বর্তমান। হযরত আলীর পুত্র আবু বকর, হযরত আব্বাস, উসমান, হোসেন-পুত্র আলী আকবর ও জাফর, মালীক-পুত্র ইবরাহিম, ইবরাহিম-পুত্র হারেস ওস্তর, হানিফার ভ্রাতা আকবর, মুসলিম কাক্কা, বাহারাম প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মুহম্মদ খানের কাব্যে বহু নর-নারীর 'টাইপ' (দোষ বা গুণের প্রতিনিধি) চরিত্রের সমাবেশ আছে। কবি-চিত্রিত এই চরিত্রগুলি প্রাণহীন এবং বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

'মোক্তাল হোসেন' কাব্য পাঠের সময় পাঠকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, কারবালা-কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে নবী-বংশধর ইমাম হোসেনের গৌরব-বর্ণনাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রেরণায় কবি ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক অসংখ্য নর-নারীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। মুহম্মদ খান শিল্পী ছিলেন। কাজেই, তিনি কল্পনা ও অনুভূতির সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। কল্পনা ও অনুভূতির দ্বারা চিত্র অঙ্কন করিলে জীবন-রহস্যের সঙ্কেত পাওয়া যায়। কাব্যে চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সঙ্কেতের প্রয়োজন অপরিহার্য। মুহম্মদ খানের কাব্যে চরিত্র-চিত্রণের বেলায় জীবন-রহস্যের সঙ্কেত আছে; কিন্তু কোথায়ও কোথায়ও তিনি রং খুব বেশী ফলাইয়াছেন; সে সব ক্ষেত্রে ঐ নর-নারীকে রক্ত-মাংসের মানুষ বলিয়া চেনা যায় না। কবির চিত্রিত

টাইপ (দোষ বা গুণের প্রতিনিধি) চরিত্রের মধ্যে হযরত আলী, উম্মে সালেমা, ইমাম হাসান, দেলারাম, মাবিয়া (মু'আবিয়া), আবু হোরেরা, উম্মর সাদ, আব্বাস, জয়নুল আবেদীন প্রভৃতি অন্যতম।)

মুহম্মদ খানের 'মোক্তাল হোসেন' কাব্যে চিত্রিত চরিত্রগুলি সম্পর্কে আমি আলোচনা করিয়াছি। এইবার অন্যান্য কবির রচিত কাব্যে অঙ্কিত চরিত্রগুলির সহিত তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতেছে। কবিগণের কাব্যগুলিতে অঙ্কিত চরিত্রগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের অধিকাংশ কোন একটি বিশেষ গুণ বা দোষের প্রতীক; ইহাই তাহাদিগকে সজীব ও প্রাণবন্ত করিয়াছে। তাহাছাড়া, রক্ত-মাংসের মানুষের চিত্র মাত্র অল্প কয়েকটি চরিত্রে অঙ্কিত।

মুহম্মদ খানের কাব্যে জয়নব, জাফরের কুমারী-কন্যা। সে রাজকুমার এজিদকে স্বামিত্বে বরণ না করিয়া ইমাম হাসানকে বরণ করিয়াছে। জয়নবের চোখে এজিদ দুশ্চরিত্র ও কামুক। এজিদ দোর্দণ্ডপ্রতাপ খলীফা মাবিয়ার পুত্র; সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী। এতৎসত্ত্বেও, এজিদ কুমারী জয়নবের অন্তর জয় করিতে পারে নাই; বরং—

... ...

'ভর্ং'সিতে লাগিল কন্যা গুণি অপমান ॥
কেমন মনুষ্য হয় এজিদ দুর্মতি।
আমাকে এমন কহে কেমন শকতি' ॥

এ-হেন এজিদের বিবাহ প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হওয়ার জন্য কুমারী জয়নব, ঘটক আবু হোরেরাকেও তিরস্কার করিয়াছে। মুহম্মদ খানের চিত্রিত জয়নব, এজিদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং বিরূপ।

সে স্পষ্টবাদিনী, কিন্তু দুর্মুখ নহে। পক্ষান্তরে, হায়াৎ মাহ্‌মূদের কাব্য-বর্ণিত সুন্দরী যুবতী শাহাবানু জবিবরের স্ত্রী। রাজকুমার এজিদ পরস্ত্রী শাহাবানুর রূপমুগ্ধ। শাহাবানুকে অঙ্কশায়ী করিবার অদম্য কামনা এজিদের মনে জাগ্রত হওয়ায় তাঁহার পিতা আমীর মাবিয়া হীনষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। মাবিয়া অতি নীচ। পুত্রের একটা খেয়াল পূর্ণ করিবার অভিলাষে তিনি নিজের মনুষ্যত্ব বিকাইয়া দিয়াছেন। 'মন্ত্রণা করিয়া আমি ছাড়াইব নারী, তবে যে তোমার কার্য সাধিবারে পারি'। তাঁহারই কূট-চক্রান্তে শাহাবানুর স্বামী জবিবরের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে। শাহাবানু পুণ্যবতী মহিলা। তিনি দ্বিতীয়বার পতি-নির্বাচনের ব্যাপারে ঘটক মুসা-সারির পরামর্শ চাহিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বস্তুতঃপক্ষে, হায়াতের চিত্রিত শাহাবানু পরম শত্রুর প্রতিও উদার ও সহৃদয়। স্বামী তাঁহার নিকট পরম সম্পদ্। কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র চিত্রিত জয়নব স্বামীর (হাসানের) মৃত্যুতে শোকবিহ্বলা। এই কবির বর্ণনায় জয়নবের বেদনা-করুণ মূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। বিরহিণীর বিলাপে এই নারী-চরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক উদ্‌ঘাটিত। মুহম্মদ খানের জয়নবও স্বামি-শোকে পাগলিনী। এ-ক্ষেত্রে শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র জয়নবের সহিত মুহম্মদ খানের চিত্রিত জয়নবের সাধর্ম্য পরিলক্ষিত হয়। হায়াতের সখিনা, মুহম্মদ খানের অঙ্কিত সখিনার ন্যায় সতী-সাধ্বী ও বিরহ-বিধুরা; কিন্তু তাঁহার কাসেম বীরত্বের প্রতি-মূর্তি; যুবতী পত্নীর প্রতি তাঁহার মনের দুর্বলতার কোন পরিচয় নাই।

মুহম্মদ খানের কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে, হাসানের মৃত্যুর ব্যাপারে তাঁহার অপর পত্নী আস্‌মা জড়িত। এজিদ এবং মন্ত্রী মারওয়ানের কূট ষড়যন্ত্রে আস্‌মা স্বামিহত্যায় অগ্রণী হন। আস্‌মা বুঝিয়াছিলেন যে জয়নব সুখী, তিনি অসুখী; কারণ, হাসান জয়নবকে

প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন, তাঁহাকে ভালবাসেন না। সুতরাং যে-জয়নব তাঁহার সুখের পথের কাঁটা, তাহার দুঃখ-বিপর্যয় স্বচক্ষে দেখিবার আশায় স্বামি-হত্যা করিয়াছেন। হাসানকে বিষ প্রদানের সময় তাঁহার হস্ত কম্পিত হয় নাই; কারণ প্রতিহিংসার বশবর্তী হওয়ায় তাঁহার বিবেকবুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। এজিদের প্ররোচনায় তিনি স্বামিঘাতিনী হন; কিন্তু ভাবিয়া দেখেন নাই যে, ইহা দ্বারা তিনি নিজেরও সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছেন। মুহম্মদ খানের আস্মা বিশ্বাসঘাতিনী ও অসূয়াপরায়ণ। অপরপক্ষে, হায়াৎ মাহ্‌মূদের কাব্যে হাসানের সরল বিশ্বাসী স্ত্রী (কাব্যে এই স্ত্রীর নামোল্লেখ নাই) জালি নামক এক বৃদ্ধা কুটনীর প্ররোচনায় স্বামীর মন পাওয়ার অভিলাষে স্বামীকে ঔষধ ভ্রমে বিষ পান করাইয়াছেন। এই স্ত্রীর হস্তেই হাসানের মৃত্যু ঘটে; তথাপি হায়াতের অঙ্কিত এই স্ত্রী সরল-বিশ্বাসী এবং স্বামীর মঙ্গলাকাংক্ষিণীরূপে চিত্রিত। জালি বুড়ি প্রবঞ্চক এবং শঠ্; সে ছলনাময়ীও বটে। শিশুর মত সরলা একটি স্ত্রী এক বৃদ্ধা কুট্‌নীর প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হইয়া কিভাবে নিজের স্বামিহত্যা করিতে পারেন, হায়াতের রচনায় তাহার পরিচয় বর্তমান। মুহম্মদ খান এবং হায়াৎ মাহ্‌মূদের কাব্য-বর্ণিত স্ত্রীর হস্তেই হাসান মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু দুই কাব্য চিত্রিত হাসান-পত্নীর চরিত্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

মুহম্মদ খানের অঙ্কিত হোসেন-চরিত্রে পরিণতির স্বাক্ষর বিদ্যমান। হোসেন চরম বিপদের সম্মুখীন হইয়াও যেরূপ অবিচলিত ছিলেন, হায়াৎ মাহ্‌মূদের হোসেন-চরিত্রে তদ্রূপ অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় নাই। কবি হায়াতের অঙ্কিত হোসেন অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির। কুফীয়ার (কুফা) শাসনকর্তা কুফিয়া, হোসেনকে আশ্রয় দিবার প্রলোভন দেখাইয়া পত্র লিখিলে তিনি নবী-পত্নী বীবী উম্মে সালেমার (সাল্‌মার) পরামর্শ চাহিলেন। বীবী নবী-প্রদত্ত

মৃত্তিকা রক্তবর্ণ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি হোসেনও—

'কান্দিতে লাগিল অতি উচ্চতর রাও।
নৈরাশ বচন শুনি বুকে মারে ঘাও'॥

এই হোসেন মুহম্মদ খানের চিত্রিত হোসেনের ন্যায় বলিষ্ঠ পুরুষ নহেন; তথাপি হায়াতের কাব্যে এই চরিত্রেই নায়ক চরিত্রের উপাদান আছে। হোসেন-চরিত্রে দুর্বলতা থাকিলেও কবি তাঁহাকে দেদীপ্যমান করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

হায়াৎ মাহ্‌মূদের কাব্যের হুর, বাদশাহ্‌ এজিদের পুত্র; পক্ষান্তরে, মুহম্মদ খানের হোর (হুর নহে) এজিদের পুত্র নহেন—সেনাপতি। হায়াৎ মাহ্‌মূদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুর যুদ্ধের জন্য পিতা কর্তৃক হোসেনের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি হোসেনের অবস্থা দেখিয়া এবং পরকাল চিন্তা করিয়া পিতার পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক হোসেনের পক্ষে যোগ দেন এবং যুদ্ধ করিয়া শহীদ হন। মুহম্মদ খান-বর্ণিত সেনাপতি হোরের সহিত হায়াৎ মাহ্‌মূদ-বর্ণিত হুরের সাধর্ম্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় কবির অঙ্কিত এই দুই চরিত্রে ত্যাগ, মনুষ্যত্ব ও ধর্মাধর্মবোধ প্রস্ফুটিত।

মুহম্মদ খানের চিত্রিত ওহাব যেমন পরার্থপরতার জন্য আত্ম-প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, হায়াতের অঙ্কিত ওহাবও (এবং তাহার মাতা) হোসেনের জন্য জীবন বলি দিয়াছেন। হায়াতের কাব্যে দেখা যায়, পুত্রের মৃত্যুতে পাগলিনী হইয়া বীরবর ওহাবের বৃদ্ধা-জননী স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছেন। এই চরিত্র-গুলি ক্ষুদ্র বটে; তবে এইগুলিতে মনুষ্যত্ববোধের ছাপ স্পষ্ট।

হায়াৎ মাহ্‌মূদের কাব্যে হোসেনের রেকাব-বর্দারের লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা ও নীচতা, এবং সালে মুহম্মদ কর্তৃক নিজের মাথার

পাগড়ি ছিঁড়িয়া হোসেন-পরিবারবর্গের মস্তকাবরণ তৈরী করিয়া দিবার মধ্যে উদারতা ও মনুষ্যত্বের পরিচয় নিহিত আছে। মুহম্মদ খানের কাব্যে উপরোক্ত চরিত্র দুইটি অঙ্কিত হয় নাই।

মুহম্মদ খানের কাব্যে ইমাম হোসেনকে কুফার শাসনকর্তার আশ্রয় দিবার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কোন বর্ণনা নাই। বিশ্বাসঘাতক কুফাবাসী শতাধিক পত্রে হোসেনের নিকট শপথ গ্রহণের আবেদন জানাইলে হোসেন বিচলিত হইয়া কুফা গমনে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিপদগ্রস্ত হন। কিন্তু হায়াতের কাব্যে কুফিয়া হোসেনকে বন্ধুরূপে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত ভাণ করেন। হায়াতের কুফিয়া বিশ্বাসঘাতক এবং প্রবঞ্চকরূপে চিত্রিত। মুহম্মদ খানের ন্যায় হায়াৎ মাহ্‌মূদও কাব্যে হানিফাকে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহাবীররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। মুহ্‌ম্মদ খানের হানিফা আলীর পুত্র ; কিন্তু হায়াতের হানিফা আলীর পালিত-পুত্র। উভয় কবি হানিফাকে শক্তি ও ক্ষমতার বিরাট মূর্তি-রূপে অঙ্কন করিতে গিয়া অস্বাভাবিক ঘটনা ও পরিবেশ আমদানী করিয়াছেন। তবে মুহম্মদ খানের হানিফা-চরিত্রে ক্ষমা ও ঔদার্যের যে-পরিচয় আছে, হায়াতের হানিফায় তাহা অনুপস্থিত। হায়াতের হানিফা আগাগোড়া অতিমানবের লক্ষণাক্রান্ত। হায়াতের এই অতিমানবীয় চরিত্র-কল্পনার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে একমাত্র ফার্‌সী সাহিত্যের epic প্রণেতা ('শাহ্‌নামা') মহাকবি ফরদৌসী তুসীর চিত্রিত মহাবীর রুস্তমের চরিত্র-সৃষ্টির। 'শাহ্‌নামা' কাব্যে কবি যেমন রুস্তমের শক্তি, পরাক্রম ও কীর্তিগাথার বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, রুস্তম অমানুষিক শক্তি ও পরাক্রম বলে মায়া-রাক্ষসী ও সফেদ দৈত্যকে হত্যা করিয়া ঈরাণপতি কায়কাউসকে উদ্ধার পূর্বক তাঁহাকে রাজসিংহাসনে পুনরাভিষিক্ত করেন, তেমনি হানিফাও তাঁহার অমিত বল ও শক্তি প্রভাবে শত্রুপক্ষকে পরাজিত ও নির্মূল করিয়া আত্মীয়-পরিজনদের উদ্ধার করেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র

জয়নাল আবেদীনকে রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। হায়াতের হানিফা কবি ফরদৌসীর অঙ্কিত রুস্তমের সমগোত্রীয়। এতদ্ব্যতীত, উভয় কবিই বৈচিত্র্য আনয়নের প্রয়োজনে নিজ নিজ কাব্যে কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই চরিত্রগুলি অধিকাংশ স্থলে অস্বাভাবিক। অলৌকিক কাহিনীর সমাবেশ এই অস্বাভাবিকতার মূল কারণ। অনেক স্থলে এই অলৌকিকতা আতিশয্যে পরিণত হইয়াছে।

কবি জাফরের ক্ষুদ্র 'কারবালা' কাব্যে দুইটি নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ মিলে। বীবী ফাতেম ও সখিনা। সদ্য বিবাহিতা সখিনাকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে গমনের পূর্বে কাসেমের প্রতি সখিনার যে-মনোবেদনার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে এই চরিত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ফাতেমা চরিত্রে চিরন্তন জননীর ছাপ প্রতিফলিত। সখিনাকে কবি সতী-সাধ্বী ও পতিপ্রেমে পাগলিনী রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। সখিনার পার্শ্বে কাসেম নিষ্প্রভ।

কবি হামিদ 'সংগ্রাম হুসন' কাব্যে যে-কয়েকটি চরিত্র নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এজিদ ও 'মুমিনপতি' হুসন অন্যতম। এজিদের ক্রূর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ চরিত্র অঙ্কিত করিয়া কবি হামিদ তাঁহাকে টাইপ রূপেই গড়িয়াছেন। পক্ষান্তরে, হুসন-চরিত্র-অঙ্কণে তাঁহার কৃতিত্ব লক্ষ্যযোগ্য। হুসন প্রেম-দয়া-মায়ার প্রতিমূর্তি ; কিন্তু কবির তুলিকায় এ-হেন হুসনের অন্য রূপও চিত্রিত। এজিদের পত্র পাইবামাত্র হুসন একজন সাধারণ মানুষের ন্যায়ই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 'লেখা পড়ি বাড়িলেক কোপ অতিশয়' তখন 'হুসন মুমিনপতি কোপ করি মনে' নিজের সৈন্য-সামন্ত ডাকিলেন। যুদ্ধ করিতে তিনি তৈরি হইলেন। যুদ্ধ শুরু হইলে আত্মীয়-স্বজন একে একে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে

হুসনের শক্তি খর্ব হইয়া আসিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ হাসন-পুত্র কাছেম (কাসিম) নিহত হইলে ঃ

> কান্দিয়া আকুল তবে আলির নন্দন।
> ভূমিতে লুটায় তনু ফাড়িয়া বসন॥

হুসনের শোকসন্তপ্ত মূর্তিই যে শুধু এখানে চিত্রিত হইয়াছে তাহা নহে, তিনি সংসারের অপর দশজন মানুষের ন্যায় দুর্বল। কবি হামিদের তুলিকায় হুসন-চরিত্র যেভাবে নির্মিত হইয়াছে, তাহাতে হুসনের সঙ্গে মহাভারত-বর্ণিত* যুধিষ্ঠির-চরিত্রের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই ধর্মের জন্য, মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের কারণে যুদ্ধে অবতীর্ণ ; কিন্তু আত্মীয়-বিয়োগে উভয়েই ব্যথিত। যেমন হাসন-পুত্র কাছেমের মৃত্যুতে 'মুমিনপতি' হুসন বিলাপে কাতর, তদ্রূপ অর্জুন-পুত্র বীর অভিমন্যুর সপ্তরথি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া মৃত্যুবরণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির গভীর শোকে শোকাকুল। 'সংগ্রাম-হুসন' কাব্যের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে জয়নব, মাহাবিয়া, সওদাগর ওস্কার, মোহাম্মদ হানিফা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

মুহম্মদ খান এবং হায়াৎ মাহ্‌মূদের সাহিত্য-সৃষ্টি এবং জীবনবোধ এক নহে—ভিন্ন প্রকৃতির। উভয় কবির আবির্ভাব-কালের মধ্যে প্রায় এক শত বৎসরের ব্যবধান ঃ তাহাছাড়া, উভয়েই দুই পৃথক সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সমাজ-প্রকৃতির আদর্শ এবং প্রভাব যে তাঁহাদের স্বতন্ত্র ছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের উভয়ের স্বভাব ও প্রকৃতিও এক ছিল না। কিন্তু উভয় কবির আদর্শ ছিল ফারসী 'মকতূল

---

* কালী প্রসন্ন সিংহ : মহাভারত, প্রকাশিত ১৭৮৮ শক (কলিকাতা) পৃঃ ৯৩৭

হুসৈন'। শুধু তাহাই নহে, কবি হামিদও ফারসী 'মকতূল হুসৈন'কেই অনুসরণ করিয়াছেন। হায়াৎ মাহ্‌মূদ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি; অথচ তাঁহর কাব্যে চরিত্র-চিত্রণ উৎকর্ষলাভ করে নাই। তাঁহার সমসাময়িককালের মঙ্গলকাব্যের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিয়া অম্লান খ্যাতির অধিকারী হইয়াছিলেন। হায়াৎ মাহ্‌মূদের 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যের অধিকাংশ চরিত্র ফুটিয়া উঠে নাই। তিনি কথা বলেন বেশী; কিন্তু তাহা প্রাণহীন ও নীরস। ভাষা, বর্ণনা-কৌশল, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতির উৎকর্ষের জন্য মুহম্মদ খান কাব্যরচনায় সার্থকতা লাভ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে কবিত্বশক্তির দীনতা, চরিত্র-সৃষ্টির ব্যর্থতা প্রভৃতির জন্য হায়াৎ মাহ্‌মূদ সার্থক কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই। হায়াতের অঙ্কিত হাসান, আবদুল জবিবর, মুসাসারি, উলিদ, আব্বাস, মুসিব খাকান প্রভৃতি চরিত্র বৈশিষ্ট্য-বর্জিত।

বর্ণনা-কৌশল ও ভাষার গুণাগুণ

মর্সীয়া সাহিত্যের অন্তর্গত কাব্যগুলির মধ্যে শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌র ক্ষুদ্র কাব্য 'জয়নবের চৌতিশা'-য় ব্যবহৃত ভাষা প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করে। যেহেতু কবি ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার কাব্যে ব্যাকরণ ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কবি কাব্যমধ্যে 'সমএ', 'খোদাএ', 'এথ', 'জলেত', আহ্মার', 'তোহ্মার', 'তুহ্মি', 'আহ্মি', 'মুঞি', খাইলুঁ', 'লইলুঁ,' 'ডুবিলুঁ', 'হরিলেক', 'খাইলেক' প্রভৃতি শব্দ প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। এই জাতীয় শব্দ মধ্যযুগীয় (ষোড়শ শতাব্দীর) বাংলা ভাষার লক্ষণাক্রান্ত।

হাসানের মৃত্যুর পর বীবী জয়নবের হৃদয়ে যে-শোক শেলসম বিদ্ধ হয়, বিলাপের আঙ্গিকে তাহাকে কাব্যরূপ দিতে গিয়াই

'জয়নবের চৌতিশা' লিখিত হয়। বিলাপ-বর্ণনায় শৈখ ফয়জুল্লাহ্ যথোপযুক্ত শব্দ ও ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার বর্ণনা সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বের কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার ভাষা ও শব্দচয়নের নিপুণতা পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না।

'জয়নবের চৌতিশা' কাব্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, কবি আরবী-ফারসী শব্দভারে ক্ষুদ্র কাব্যখানি ভারাক্রান্ত করেন নাই। তিনি সর্বত্র প্রচলিত ভাষা ও শব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার নিপুণতার ছাপ স্পষ্ট। মুঘল-যুগে মুসলমান কবিগণ হিন্দু কবিদের ন্যায় কাব্যে যে-সংস্কৃতমূলক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, ফয়জুল্লাহ্‌র রচনা তাহারও একটা প্রমাণ। তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যে একজন শক্তিশালী কবি, এ-কাব্য পড়িবার পর তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কবির প্রত্যেকটি বর্ণনা যেন এক একটি দৃশ্যের চিত্র। স্বামীর মৃত্যুতে যুবতী নারীর হৃদয়ে যে গভীর বিরহ বেদনা ছায়াপাত করে, নিম্নোদ্ধৃত চারিটি পংক্তিতে কবি তাহা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

> 'জোবন সমএ নারী না থাকিলে পতি।
> জীবন সাফল্য নহে সংসারে বসতি॥
> জলিয়া জলিয়া উঠে হৃদয়ের আগুন।
> জোবন সমএ প্রভু দিয়া প্রেমাগুন'॥

নারীর যৌবন-জ্বালার এ-বর্ণনা সত্যই উপভোগ্য। ফয়জুল্লাহ্ বিরহ-বধুরা শোক-সন্তপ্ত জয়নবের চিত্র আঁকিয়াছেন। কবির বর্ণনায় পাঠক একটি বেদনা-করুণ অবস্থার সম্মুখীন হন। শোক বা করুণরসের বর্ণনার একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। জয়নব শোকে-দুঃখে অভিভূত হইয়া বলেন ঃ

রবির প্রভাবে মোর ভরিল কাঞ্চুলি।
রবির প্রভাবে যেন বাঝি গেল ধূলি॥
রাশি রাশি জেবর নানা অলঙ্কার।
রুনু ঝুনু চরণেত না শুনিল আর॥
লোটন এরাকী খোঁপা খসি খসি পড়ে।
লুক দিল শশধর নবঘন আড়ে॥
লোহিত বরণ অক্ষি অরুণ সমান।
লুক দিল দিবাকর পাই অপমান॥

মুঘল আমলের কবি হওয়া সত্ত্বেও কবির শব্দচয়ন এবং বর্ণনা প্রশংসনীয়। সার্থক বর্ণনার জন্যই জয়নবের বিরহ-বেদনা ও বিলাপ সহজেই পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। এ-প্রসঙ্গে ডক্টর এনামুল হক সাহেবের উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'স্বাধীন বাংলার মুসলিম কবিদের মধ্যে শৈখ ফয়জুল্লাহ্ নানা কারণে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন'[১]। ফয়জুল্লাহ্র ন্যায় মর্সীয়া সাহিত্যের কবি মুহম্মদ খান, হায়াৎ মাহ্মূদ, হামিদ এবং জাফর তাঁহাদের স্ব স্ব কাব্যে শোক বা বিলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুহম্মদ খানের কাব্য-বর্ণিত হোসেনের মৃত্যুতে তদীয় পত্নী বীবী শাহেরবানুর বিলাপ এবং কবি জাফরের কাব্য-বর্ণিত হোসেনের মৃত্যুতে জননী ফাতেমার ও কাসেমের মৃত্যুতে নববধূ সখিনার বিলাপ হৃদয়স্পর্শী।

করুণ-রসের বর্ণনায় মুঘল আমলের বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের অধিকাংশ কবিই কমবেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কারবালার রণ-প্রান্তরে ইমাম হোসেন শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলে সমগ্র বিশ্বে যে-বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল, মুহম্মদ খান তাহার বর্ণনা দিয়াছেন ঃ

আচম্বিতে সূর্য যেন পড়িলেক খসি।
ধরণী পরশি আসি রহিলেক শশি॥

---

১ মু. বা. সা., ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৫৭, পৃঃ ৮৮।

স্বর্গ মর্ত্য পাতালে উঠিল হাহাকার।
কান্দেন্ত ফেরেস্তা সব গগন মাঝার॥
বিলাপিলা যতেক গন্ধর্ব বিদ্যাধর।
আরস কোরস আদি কম্পে থর থর॥
অষ্ট স্বর্গবাসী সবে করেন্ত বিলাপ।
ধিক্ ধিক্ কুফি সৈন্য অধার্মিক পাপ॥
এ সপ্ত আকাশ হৈল লোহিত বরণ
কম্পমান স্বর্য দেখি হোছেন নিধন॥
ক্ষীণ হৈল নিশাপতি হোছেনের শোকে।
মঙ্গল অরুণ বর্ণ রক্ত মাখি মুখে॥

কবি হায়াৎ মাহ্‌মূদের বর্ণনা এইরূপ ঃ

হোসেন পড়িল রণে স্বর্গ-মর্ত্য ত্রিভুবনে
উপজিল কম্পন ত্রিদেশে।
আরস কোরস নড়ে পৃথ্বি টলমল করে
শুনি শব্দ হাহাকার আকাশে॥
যতেক ফেরেস্তা মিলি আর যত হুরগুলি
কান্দে সবে গগন মণ্ডলে।
হরিষে বিষাদে কান্দে ভেস্তে বসি মহাম্মদে
আলি আসি ফাতেমা সকলে॥
দিবসের নাহি চিন্ তিনরাত্রি তিনদিন
গ্রহণ রহিল লাগি চান্দে॥

কবি হামিদের বর্ণনা ঃ

হুসন পড়িলা যদি ভূমির উপর।
রাহুএ গ্রাসিল যেন পূর্ণ শশধর॥
ভূমিকম্পে হৈয়া যেন ভূমি হৈল স্থির।
জলদে ঢাকিল যেন কিরণ রবির॥

অন্যত্র ঃ

নানা অস্ত্রে বাণ দুইএ কৈলা বহুতর।
হুসনের অঙ্গ হৈলা বাণেতে জর্জর॥
আলির পুতলি তনু কোমল ঘাইল।
বিশেষ পলাশ যেন বসন্তে ফুটিল॥
ধারা হৈআ রুধির পড়এ অঙ্গ হনে।
রঙ্গনের মালা যেন শোভে স্থানে স্থানে॥

জান্নাতবাসিনী বীবী ফাতেমা পুত্রের শাহাদৎ বরণে স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া কারবালায় হোসেনের মৃতদেহের নিকট শোক করিতেছেন। কবি জাফর বীবী ফাতেমার শোক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ফেরিস্তার মুখে বীবী শুনিলেন্ত এই উত্তর।
কারবালাতে শহীদ হইল পুত্র আমার হোচনজি॥
আহা পুত্র আমীর হোচন কারে ডাক মা বুলি।
পুত্র পুত্র করি বীবী বেআকুল হইল।
কান্দিতে কান্দিতে বীবী পৃথিম্বিতে নামিল॥

* * *

এত শুনি ফতেমাএ পুত্র লৈল কোলে।
পুত্র পুত্র করিআ গড়াইল খুলি তুলে॥
আহা পুত্র হোচন কি সুখে হেন গতি।
কাটিল তোমার হস্ত কোন্ সে দুর্মতি॥
শির কাটি শান্ত নহে কাটিল নয়ান।
দুই হস্ত কাটিলেক কিসের কারণ॥
বিনা দোষে পুত্র মোর বধে পাপিগণ।
পৃথিম্বি সহিল ভার কিসের কারণ॥

উপরোক্ত কবি চতুষ্টয়ের শোকবর্ণনায় মুহম্মদ খান ও হামিদ অপর কবি অপেক্ষা সিদ্ধহস্ত। শব্দ-চয়ন এবং ভাবগভীরতার ক্ষেত্রে

তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই ধরা পড়ে। কবি জাফরের বর্ণনায় কাব্য-শিল্পের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় না; তথাপি, তাঁহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় পুত্র শোকাতুরা জননীর চিরন্তন রূপ চিত্রিত। শৈখ ফয়জুল্লাহ্ এবং মুহম্মদ খানের তুলনায় হায়াৎ মাহ্মূদের বর্ণনা অত্যন্ত স্থূল। ভাষায় কবিত্বের অভাব; তাহাছাড়া আভিজাত্য নাই। হায়াৎ মাহ্মূদ বহুদিন সরকারী কাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহাকে প্রায়শঃ রাজকর্মচারিগণের সহিত মেলামেশা করিতে হইত। তৎসত্ত্বেও, তিনি কাব্যের ভাষায় মুঘল আমলের ভাষাগত আভিজাত্য আনিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার অক্ষমতার পরিচায়ক। হায়াৎ মাহ্মূদের উপরি-উল্লিখিত করুণ-রসের বর্ণনা উচ্চগ্রামে পৌঁছিতে পারে নাই, কিন্তু কাব্যের বহুস্থলে শোক-বর্ণনা সুন্দর হইয়াছে। হায়াৎ মাহ্মূদ খিমামধ্যে হোসেন-পরিবার-পরিজনের শোকাভিভূত মূর্ত্তির যে-চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কাব্যশিল্পে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। এখানে ভাষা অনেকটা সুন্দর। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্ঃ

দশে বিশে গলাধরি যায় গড়াগড়ি।
বিনয় করিয়া কান্দে সপ্তশত রাড়ি॥
হাহাকার রোল বিনে না শুনে শ্রবণে।
করুণা কল্লোল ধ্বনি উঠিল গগনে॥
মুকুল উদাস মাথে কান্দে উচ্চ রাও।
হায় হায় বুলি সবে বুকে মারে ঘাও॥
কুলসুম ছালেমা কান্দে করি হায় হায়।
প্রাণ পুত্র মৈল বলি হিয়া ধাবরায়॥

হায়াৎ মাহ্মূদের সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব করুণ-রস বর্ণনায়। প্রসঙ্গক্রমে, আলী আকবরের মৃত্যুর করুণ দৃশ্যের বর্ণনার কথা উল্লেখ-যোগ্য। কবি যেহেতু কাব্যের নামকরণ করিয়াছেন 'জারীজঙ্গনামা'

সেইজন্য তিনি কারবালার কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে মূল গায়েন বা বয়াতি কর্তৃক জারীয়লদের ধুয়া ধরাইয়া দিবার যথোপযোগী ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাব্য-কাহিনী জারিগানরূপে গাহিবার সময় জারীয়লদের যাহাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে না হয়, তৎপ্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি ছিল বলিয়া মনে হয়। আলী আকবরের যুদ্ধের করুণ-কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে হায়াৎ মাহ্‌মূদ ধুয়া সংযোজন করিয়াছেন ঃ

হায় হায় হায় আল্লা রণের ভিতর।
পানি পানি করি ফিরি আলী আকবর ॥

আলী আকবরের কাহিনীর খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া কবির করুণ-রস বর্ণনার নমুনা উপস্থিত করিতেছি ঃ

ধুয়া ঃ হায় হায় হায় ··· ···
পয়ার ঃ আকবর ঘোড়ার পৃষ্ঠে করে টলমল।
হায় হায় বলে মোকে আনি দেহ জল ॥
মুখেতে নাহিক রস গায়ে মোর বল।
হায় হায় মুই অতি হইনু বিকল ॥
যদি আজি পানি মুই পাইত তৃষ্ণায়।
হায় হায় খারিজীরে বধিত হেলায় ॥
খারিজী মারিয়া সব করিত বিনাশ।
হায় হায় যদি মোর খণ্ডিত পিয়াস ॥
রণভূমে খায় পানি কাফের যে যথা।
হায় হায় আকবর চলিয়া যায় তথা ॥
কাছে যায়া চায় পানি করিয়া বিনয়।
হায় হায় কেহ পানি তাহাকে না দেয় ॥
কাতর দেখিয়া তাথে মারিবারে ধায়।
হায় হায় চৌদিকে বেড়িল সবায় ॥

করুণরস-বর্ণনায় যে একটি স্থায়িভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহার নাম শোক। আলী আকবরের যুদ্ধের বর্ণনায় এই শোকের পরিচয় আছে।

কবি শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌র পরবর্তী কবিগণের মধ্যে দৌলত উজীর বাহরাম খানও একখানি 'জঙ্গনামা' রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়[২]। বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কবিগণের মধ্যে মুহম্মদ খানের কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয়। তিনি বেশ শিক্ষিতও ছিলেন। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দলীলায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রকাশ বিশিষ্ট। বস্তুতঃপক্ষে, তাঁহার সহিত এই আমলের অপর কোন কবির তুলনা চলে না। কি যুদ্ধ বর্ণনা, কি নরনারীর রূপ-বর্ণনা, কি করুণরস-বর্ণনা, কি আদিরসবর্ণনা যে-দিক দিয়াই বিচার করা যাক্ না কেন, মুহম্মদ খানের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত। এই সব বর্ণনায় তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, রূপকল্পনা ও নৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

হায়াৎ মাহ্‌মূদ তাঁহার পরবর্তী কবি। তিনি সাধারণ কবিত্বের অধিকারী। উৎকৃষ্ট ভাষার সহিত ভাব ও অলঙ্কারের মণিকাঞ্চন যোগ হইলে যে-উচ্চপ্রতিভার সাক্ষাৎ মিলে, হায়াতের কাব্যে তাহা নাই। কিন্তু শোকবর্ণনায় হায়াতের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। উভয় কবি কাব্য রচনাক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সাধুভাষাঘেঁষা বাংলা শব্দ অধিক ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক স্থলে তাঁহারা যুগ-প্রচলিত আরবী, ফারসী শব্দও কিছু কিছু প্রয়োগ করিয়াছেন। বর্ণনীয় বিষয়ের প্রকৃতি অনুধাবন করিয়া তাহার সজীবতা সৃষ্টির প্রয়োজনে তাঁহারা এইরূপ করিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহাদের ভাষা শক্তিসম্পন্ন ও

২ দৌলত উজির বাহরাম খাঁর কাব্যের খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় সে-সম্পর্কে আলোচনা বর্তমান পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হয় নাই।

বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। কবিদ্বয় নিজ নিজ কাব্য ঐ নামীয় ফারসী-গ্রন্থ হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দের বেপরোয়া ব্যবহার থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই ; বরং জনসাধারণের উপযোগী করিয়া বিশুদ্ধ সাধুভাষাসম্বলিত কাব্য-রচনা করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলীর কবিগণের ন্যায় মুহম্মদ খান নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য পাত্রপাত্রীর শৃঙ্গার ও সম্ভোগ বর্ণনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। নারীর রূপ ও দেহ বর্ণনায় বিশেষতঃ শৃঙ্গারের বর্ণনায় মুহম্মদ খান ভাষা ও ছন্দের সুনিপুণ প্রয়োগের এমন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন যে, তাহাতে বর্ণনার অশ্লীলতা ঢাকা পড়িয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের অন্তর্গত শৃঙ্গার-রসাত্মক-বর্ণনার সমালোচনা করিতে গিয়া ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভারতচন্দ্রের পূর্বসূরী বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কবি মুহম্মদ খানের 'মোক্তাল হোসেন' কাব্যের অন্তর্গত আদিরসাত্মক বর্ণনা সম্পর্কে প্রযোজ্য। তিনি বলিয়াছেন, 'বর্তমান কালে তাহা অশ্লীল বলিয়া মনে হইলেও অপূর্ব আদিরসাত্মক কাব্যরসের তরঙ্গে অশ্লীলত্ব ভাসিয়া গিয়াছে'[৩]। সত্যই, কবির বর্ণনভঙ্গি, উপমা-নির্বাচন, চিন্তাধারার সুষ্ঠুতা ও শিল্পদৃষ্টির ফলে কাব্যের অশ্লীলতা গৌণ হইয়া উঠিয়াছে। মুহম্মদ খান তদানীন্তন-কালের জনসাধারণের রুচি অনুযায়ী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আধুনিককালের পাঠক-পাঠিকার নিকট কাব্যের স্থান-বিশেষ রুচি-বিগর্হিত মনে হইলেও তাঁহারা অতি

---

৩ ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, কলিকাতা ১৯৫৬, পৃঃ ১৩৮

আগ্রহের সহিত এ-কাব্য পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, মুহম্মদ খানের কাব্যবর্ণিত ভাষা উৎকৃষ্ট। ইহার ফলে, এই কাব্য কয়েক শতাব্দীকাল যাবৎ বঙ্গভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকার নিকট সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ, সমগ্র বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের অপর কোন কবির রচনা কালের কঠিনতম স্পর্শ অতিক্রম করিয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলশ্রেণীর মানুষকে এমনভাবে আনন্দ বিতরণ করিতে পারে নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, মুহম্মদ খান শৃঙ্গার ও সম্ভোগের বর্ণনায় কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। কবি নিপুণ ভাষায় কামাতুর আবদুর রহমানের সহিত দুষ্টা যুবতী কর্তামার সম্ভোগের বর্ণনা দিয়াছেন। এই বিস্তারিত কামকলার চিত্র রুচিবিরুদ্ধ, কিন্তু সুন্দর। এ-বর্ণনা পড়িলে স্বভাবতই মনে হয়, বৈষ্ণব-পদাবলীর কবিগণের প্রভাব যেন কবি মুহম্মদ খানকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। দুই একটি উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

কাম ভাবে করে ধরি গলে আলিঙ্গন করি
বসাইল কোলের উপরে।
দুইজনে কোলাকুলি অঙ্গে অঙ্গে মেলামেলি
অধরে মধুর পান করে॥
কুচে দিল নৌখের রেখা যেন চান্দে দিল দেখা
কনক ঝুমের গিরি আগে।
হরিষে কণ্ঠেতে ধরি উরু পরে উরু করি
ঘন পিন চুম্বে অনুরাগে॥
তাড়ি আসিবার দেশ সাধন তাড়না শেষ
বসিয়া মদন সিংহাসন।
কর্তামা হরিষ পাই বিপরীত করে যাই
লাজ ভয় হরিষ বিধান॥
ধরিয়া নারীর গলে কেলি করে কুতুহলে
আমোদেতে পুরি গেল তনু।

বিপরীত কেশ নিশি শিশিরে ঘিরিল আসি
কাল মেঘে আশ্রা দিল ভানু ॥

আবু সামা ও মালিনী-কন্যার সম্ভোগ বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ; কিন্তু ইহাতেও মুহম্মদ খানের বর্ণনা-নৈপুণ্য ও ভাষামাধুর্য লক্ষণীয়। অনুরূপভাবে তাঁহার অঙ্কিত এজিদ ও দেলারামের সম্ভোগের চিত্রটি উল্লেখযোগ্য। এ-বর্ণনায় বাস্তবতা ও কাব্য-শিল্পের পরিচয় আছে। কবি হায়াৎ মাহ্‌মূদও তাঁহার কাব্যে সম্ভোগের একটি চিত্র আঁকিয়াছেন। তিনি আমীর মাবিয়ার সহিত তদীয় বৃদ্ধা পত্নীর কেলিকলার বর্ণনা দিয়াছেন ঃ

খট্টার উপর দোঁহে রঙ্গমন হয়া।
কেলিকলা ভুঞ্জে সুখে বৃদ্ধা নারী লয়া॥
মাবিয়া বসিল যদি বুড়ির সম্পাসে।
আচম্বিতে বুড়ি যেন চন্দ্রমা প্রকাশে॥
খোদার হুকুমে বুড়ি হইল যুবতী।
উজ্জ্বল করিল ঘর শরীরের জ্যোতি॥
ত্রিলোক জিনিয়া হৈল এ কাম মোহিনী।
শরীরের জ্যোতি যেন দেখি দিনমণি॥
তাহা দেখি মাবিয়ার মনে হৈল রঙ্গ।
কেলিকলা ভুঞ্জে সুখে যুবতীর সঙ্গ॥

মুহম্মদ খান সম্ভোগ-বর্ণনার কলাকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কাজেই, নারীর বিপরীত বিহারের সময়-কাল নিরূপণের ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রকার ভুলচুক করেন নাই। নর-নারীর সম্ভোগের এমন বিস্তৃত বর্ণনা মুঘল আমলের বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের অপর কবি হায়াৎ মাহ্‌মূদ ব্যতীত অন্য কাহারও কাব্যে নাই। শুধু তাহাই নহে, মুঘলপরবর্তী ইংরেজ আমলের কোন কবির কাব্যেও ইহা দেখা যায় না। হায়াতের কাব্যে

শৃঙ্গারের বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত। মুহম্মদ খান কামকলার পুংখানুপুংখ এবং বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন, হায়াৎ মাহ্‌মূদ তদ্রূপ দেন নাই। তৎসত্ত্বেও, হায়াতের বর্ণনাটি উপভোগ্য; কবিত্বের দিক দিয়া হায়াৎ মাহ্‌মূদ, মুহম্মদ খানের সহিত তুলনায় নিকৃষ্ট। শৃঙ্গার ও সম্ভোগের বর্ণনায় মুহম্মদ খান দ্বিতীয়রহিত। নারীর রূপ ও যুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রে হায়াৎ মাহ্‌মূদের সার্থক রচনার নিদর্শন অল্প-বিস্তর বিদ্যমান। মুহম্মদ খান করুণ ও বীররসের বর্ণনাতেও সিদ্ধহস্ত। তাঁহার করুণ-রসের বর্ণনা শৃঙ্গার বর্ণনার ন্যায়ই কোমল, সরস এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন। মুহম্মদ খান নারীর রূপ ও দেহ বর্ণনা এবং শৃঙ্গার বর্ণনায় যেন একজন বয়স্ক বৈষ্ণব কবি। দেলারাম, কর্তামা, জয়নব, সখিনা প্রভৃতি রমণীর দেহ ও রূপ বর্ণনায় তিনি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল উজাড় করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের ঈষৎউদ্ভিন্ন নব যৌবনের যথার্থ মূর্তি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কবি তাঁহাদের প্রত্যেকটি অঙ্গের অর্থাৎ মুখ, নাসা, ভুরু, অধর, দশন, কণ্ঠ, কুচ, দেহ, মাজা, উরু, অঙ্গুলি প্রভৃতির হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়াছেন। বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁহার সংস্কৃতমূলক ভাব, ভাষা, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ-কৌশলে বর্ণনীয় বিষয় পাঠকের নিকট ছবির মত প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করিয়া ভাবের সারল্য ও ভাষার প্রসাদগুণ 'মোক্তাল হোসেন' কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রূপবর্ণনায় কবিত্বরস স্বাভাবিকভাবেই স্ফূর্তি পাইয়াছে।

মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে নারীর রূপবর্ণনার এক বিশিষ্ট রেওয়াজ ছিল। শৈখ ফয়জুল্লাহ, দৌলত উজীর বাহরাম খান, দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশীমাগন ঠাকুর প্রমুখ মধ্য-যুগের মুসলিম কবি বাংলা কাব্যরচনার ক্ষেত্রে যেমন নারীর রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি কবি মুহম্মদ খানও মর্সীয়া সাহিত্যের অন্যতম কাব্য 'মোক্তাল হোসেন'-য়ে (মকতূল হুসৈন) নারী-

রূপের বর্ণনা দিয়াছেন। মধ্যযুগের কবিগণের রূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রে কমবেশী পার্থক্য চোখে পড়ে। কেহ কেহ নারীর সমস্ত অঙ্গের পুংখানুপুংখ বর্ণনা দিয়াছেন, কেহবা অল্প কথায় সারিয়াছেন, আবার কেহবা দুই একটি রেখাপাতে যৌবন-পুষ্ট নারীর রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কবি মুহম্মদ খান নারীর রূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁহার বর্ণনা বিস্তারিত ; সামান্য দুই এক কথা বলিয়া তিনি চিত্র অঙ্কন করেন না। ফলে, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যজনিত দোষ কাব্যের অনেক স্থানে লক্ষণীয়। মুহম্মদ খান হাসান-পত্নী বীবী জয়নবের রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ইন্দ্রের কামিনী জিনি স্বর্গের যে হুর জানি
আহ্লাদিত হইল বিস্তর।
নানাবস্ত্র পরে বালা অলঙ্কারে উজিয়ালা
কেশ নিশি মাঝে শশধর ॥
ঝুমুকে তারকাগণ উভয়ে লাগায় মন
নানা ফুল শিরের উপর।
শিরেতে নাগিনী খোঁপা শোভায় জাদের থোপা
মুখদল চান্দির কবরী ॥

* * *

নয়ন খঞ্জন দেখি ধাইল খঞ্জন পাখি
রাখিবারে আপনা পরাণ।
ভুরুযুগ ধনুর্বাণে কুমারী যাহাকে হানে
তার মর্ম হয় খান খান॥
দশন মুকুতা জ্যোতি বিজলী চমকে অতি
চমকি চমকি উঠে গায়।
অধরে বান্ধুলি খিতি অধিক ভাঙ্গিয়া অতি
শ্বেত চামরেতে করে বায় ॥

উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে কবি নারীরূপের এক বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন। কাব্যের অনেক স্থলে নারী-রূপের বর্ণনায় কবি বেশ সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। নারীর কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, মুহম্মদ খান অনেক ক্ষেত্রে পুরুষেরও রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে, হোসেন-পুত্র আলী আকবর এবং মুসলিমের পুত্রদ্বয় ইবরাহীম ও মুহম্মদের রূপ-বর্ণনার কথা উল্লেখযোগ্য। পুরুষের রূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি কোন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এ-বর্ণনা পড়িলে নারীরূপের বর্ণনা বলিয়া মনে হয়। এতৎসত্ত্বেও মুহম্মদ খান, আলী আকবরের রূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁহার চরিত্রের বলবীর্য ও পুরুষোচিত শক্তির উল্লেখ করায় তাহা সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়াছে। আলী আকবরের রূপ-বর্ণনা নিম্ন প্রকার ঃ

কুমারের রূপ দেখি ধন্য ধন্য কয়।
বলিল গন্ধর্ব এই মনিষ্য না হয়॥
চিকন চিকুর নিশি কস্তুরির গন্ধ।
মুখ জ্যোতি দেখি হয় সূর্যে জ্যোতিমন্দ॥
লাজ পাই নিশাপতি কলঙ্ক ইচ্ছিল।
এক মুখে সুর শশি লীলায় জিনিল॥
অমল কমল দল সুন্দর নয়ন।
অধর রক্তিমা ক্ষেপে মধুর বচন॥

অতঃপর, কবি তাঁহার বলবীর্যের পরিচয় দিয়াছেন ঃ

কোপে দক্ষিণের সৈন্যে প্রবেশে কুমার।
শতে শতে কাটে বীর উঠে হাহাকার॥
জিনিয়া দক্ষিণ সৈন্য বামে প্রবেশিল।
পিছের বাহিনী জিনি উম্মরে জিনিল॥
সর্ব সৈন্য জিনি বীর করে সিংহনাদ।
পরাজয় পাই সব গুনিল প্রমাদ॥

পক্ষান্তরে, কবি হায়াৎ মাহ্‌মূদ নারীর দেহ ও রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া কিছু বলেন নাই। তিনি সামান্য দুই একটি রেখা অঙ্কন করিতে প্রয়াসী। মুহম্মদ খান নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় নারী ও পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চিত্র আঁকেন। হায়াতের বর্ণনায় কল্পনার প্রসারতা ও প্রাচুর্য নাই। রূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁহার কল্পনা আবেগসমৃদ্ধ নহে। কবি-মনের যে-আবেগময় প্রকাশ ও রসোচ্ছলতা থাকিলে কাব্য ভাবৈশ্বর্যে শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে, তাহা হায়াতের কাব্যে নাই বলিলেই চলে। তিনি কবিকল্পনার সাহায্যে যেখানে 'চমৎকারিত্ব' সৃষ্টি করিতে পারিতেন, সেখানে সুযোগ পাইয়াও তাহার সদ্ব্যবহার করেন নাই। তিনি শাহাবানুর যে-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

তোমার নগরে আছে আবদুল্লা জবির।
তাহার বণিতা দেখি প্রাণ নহে স্থির ॥
রূপে গুণে হুর পরী কি দিব উপমা।
এহি রাজ্যে নারী নাহি রূপে তার সমা ॥
শাহাবানু নাম তার সংসারের নিধি।
আপনার হাতে কিবা নির্মাইল বিধি ॥

* * *

পালঙ্ক উপরে আছে বসিয়া যুবতী।
উজ্জল করিছে ঘর শরীরের জ্যোতি ॥

মুঘল আমলের অন্যান্য কবির মধ্যে জাফরের কাব্যে রূপবর্ণনা, যুদ্ধবর্ণনা ও শৃঙ্গারবর্ণনার কোন নিদর্শন নাই। বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌ 'জয়নবের চৌতিশা' কাব্যের চারিটি পংক্তিতে স্বামি-সোহাগিনী ও বিরহ-বিধুরা জয়নবের যে-সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা যথার্থই উচ্চ

কবি প্রতিভার পরিচায়ক। বিষপানে হাসানের মৃত্যু ঘটায় জয়নব শোকে বিহ্বলা। বিলাপের সময় তাঁহার চুলের খোঁপা খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। দুইটি চক্ষু লোহিত বর্ণ; নারীর এই বিপর্যস্তজীবনের চিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া কবি অলঙ্কার-প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলে, জয়নবের বিরহিণী-মূর্তি পাঠকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। ফয়জুল্লাহ্‌র এই বর্ণনা ঃ

> লোটন এরাকী খোঁপা খসি খসি পড়ে।
> লুক দিল শশধর নবঘন আড়ে॥
> লোহিত বরণ অক্ষি অরুণ সমান।
> লুক দিল দিবাকর পাই অপমান॥

ফয়জুল্লাহ্‌র কাব্যের ভাষা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা। তাঁহার ভাষা মনোরম। কিন্তু মুহম্মদ খান মুঘল আমলের কবিগণের মধ্যে নানা কারণে স্মরণীয়। তিনি জনগণের কবি; অথচ, কাব্যে প্রাকৃতজনের ভাষা তিনি গ্রহণ করেন নাই। প্রাকৃত-জনের ভাষা গ্রহণ করিলে কাব্যের মূল ভিত্তি আল্‌গা হইয়া যাইত; তাহা ছাড়া, তদানীন্তনকালে কাব্যরচনার অবলম্বন ছিল সংস্কৃত-বহুল সাধু বাংলা ভাষা। এ-ভাষা তখনকার দিনে সকলের পক্ষেই বোধগম্য ছিল। মুহম্মদ খান ব্যতীত দৌলত উজীর বাহরাম খান এবং পরবর্তীকালের কবি হামিদ ও হায়াৎ মাহ্‌মূদের কাব্যের ভাষাও সাধু বাংলা। ইহার আর একটি কারণ ছিল। কবিগণের আত্ম-পরিচয় প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা বিদেশাগত অভিজাত মুসলমানগণের বংশধর এবং নিজেরাও আমীর-ওমরা ধরণের মানুষ ছিলেন, অথবা আমীর-ওমরা না হইলেও তদানীন্তনকালের রাজ-দরবারের সঙ্গে তাঁহাদের অনেকেই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা শালীন এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন ছিলেন। কাজেই,

বাংলা ভাষায় তাঁহারা যখন কাব্য রচনা করিয়াছেন, তখন তাহাতে শালীন ও সাধু বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন[৪]।

কবি হায়াৎ মাহ্‌মূদ অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ। তাঁহার বাড়ি ছিল উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলায়। কাজেই, 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যের ভাষায় কিছু কিছু উত্তরবঙ্গের (রংপুরের) আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগ আসিয়াছে। মুহম্মদ খান এবং হায়াৎ মাহ্‌মূদের কাব্যে প্রচুর সংস্কৃতবহুল শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। হায়াতের ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-বৈশিষ্ট্য বিধৃত। তাঁহার এই কাব্যের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শব্দ-প্রয়োগ, বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগ এবং আরবী-ফারসী তদ্ধিৎ প্রত্যয়ের প্রয়োগ-কৌশল বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, হায়াৎ মাহ্‌মূদের 'জারীজঙ্গনামার' ভাষা সাধারণ ভাষা; অবশ্য উহাতে মানবিক উপাদান ও আবেদনের অভাব নাই। সম্ভোগ ও রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে হায়াৎ মাহ্‌মূদ তেমন উৎকর্ষের পরিচয় দিতে না পারিলেও শোক ও যুদ্ধবর্ণনায় তাঁহার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার যুদ্ধ ও শোকবর্ণনা মুহম্মদ খানের ন্যায় সরস ও প্রাণস্পর্শী। এই জাতীয় বর্ণনায় হায়াৎ মাহ্‌মূদের ভাষা সরল এবং প্রাকৃতজনোচিত। উভয় কবির তুলনামূলক যুদ্ধবর্ণনা (বীর রসের) দেওয়া গেল।

মুহম্মদ খানের বর্ণনা ঃ

যতেক নৃপতি আইল তত বাদ্য বোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্রে হিল্লোল॥

---

৪ অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত : 'লায়লী মজনু'র ভূমিকা পৃঃ ৫১

গজে গজে যুদ্ধ হৈল দন্তে পেশাপেশি।
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হৈল দোঁহে মেশামেশি ॥
ধনুকের অস্ত্রজালে ভরিল গগন।
ব্রহ্মঅস্ত্রে ধরি যুঝে অগ্নি বরিষণ ॥
খড়্গ চর্ম ধরি যুঝে ওঠে খরাখরি।
মল্লে মল্লে যুদ্ধ করে দোঁহে জড়াজড়ি ॥
কষাকষি ভুজে ভুজে নিমজ্জ ধারণ।
প্রাণ উপেক্ষিয়া যুদ্ধ করে সব জন ॥
অশ্ব পড়ে, গজ পড়ে পড়য়ে পদাতি।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ছাইল বসুমতি ॥

হায়াতের বর্ণনা নিম্ন প্রকার ঃ

পাইকে পাইকে যুঝে পদাতি পদাতি।
স্বারে স্বারে বাজিল বিষম যুদ্ধ অতি ॥
তর্জিয়া গর্জিয়া যুঝে আপনার বলে।
শত শত মুণ্ড কাটি পড়ে মহীতলে ॥
বীরগণ গদাধরি উভ করি ঝাড়ে।
গদার প্রহারে সেনা চূর্ণ করি পাড়ে ॥
চতুর্দিকে রণস্থানে যুদ্ধ হুলস্থূল।
মনুষ্য ঘোড়ার পায় স্বর্গে উড়ে ধূল ॥
পদধূলি আচ্ছাদিল রবির কিরণ।
দিবস হইল রাতি না যায় চিনন ॥

মধ্যযুগের বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের অপর কবিদের মধ্যে কবি শেরবাজ ও হামিদ ব্যতীত অপর কেহ যুদ্ধ-বর্ণনা দেন নাই। এই যুগের কবিগণ কোন কিছু সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়া সাধারণতঃ যে-অবাস্তব ও অতিলৌকিক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, যুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মুহম্মদ খান, হায়াৎ মাহ্‌মূদ ও হামিদ নিজ নিজ কাব্যে ইমাম হোসেনের প্রতি

সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং হোসেনের শত্রুপক্ষ এজিদের প্রতি আন্তরিক ঘৃণার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ফলে, হোসেন-পক্ষীয় এক একজন বীরের হস্তে হাজার হাজার শত্রুসৈন্য বিপর্যস্ত ও নাস্তানাবুদ্ হইয়াছে। কবিত্রয়ের যুদ্ধবর্ণনার ক্ষেত্রে এই অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত। যুদ্ধবর্ণনায় তাঁহারা সমান পারদর্শী হইলেও মুহম্মদ খানের ভাষার কারিগরী এবং বর্ণনায় ছন্দ-সুষমা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হায়াতের যুদ্ধবর্ণনাও সুন্দর; কিন্তু তাঁহার ছন্দ-শিথিলতায় বর্ণনা সর্বত্র গুরুগম্ভীর হইয়া উঠে নাই। কবি হামিদের যুদ্ধবর্ণনায় কবিত্বের স্ফূর্তি লক্ষ্যযোগ্য।

মুহম্মদ খান, হোসেনের রণ-সজ্জার চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। পরিবেশ-সৃষ্টির প্রয়োজনে কবি আরবী, ফারসী শব্দের সুন্দর প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; অথচ বর্ণনা সরল এবং প্রাকৃতজন-বোধ্য। শক্তিতে, বীরত্বে, আভিজাত্যে হোসেন যে রসূলের যোগ্য উত্তরাধিকারী, মুহম্মদ খানের বর্ণনায় তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। কবি-বর্ণিত হোসেনের যুদ্ধ-সজ্জা দেখুন:

মাণিক্য জড়িত কোলা শিরেতে শোভয়।
রসূলের পাগ তার উপরে পরয়॥
যেই জেরা গায়ে দিত আলী মহাবীরে।
সেই জেরা পরে বীর অঙ্গের উপরে॥
কোমরে সুবর্ণ পাটা জড়িত রতন।
মাণিক্যের কোলা শিরে করয় শোভন॥
মণিমুক্তাগাঁথা বীর গলে শোভে হার।
মধ্যদেশে বান্ধিল বাপের অসিধার॥

শত্রুপক্ষ হোসেনকে চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া হত্যা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া হোসেনের প্রতি অসংখ্য বাণ নিক্ষেপ করিল। কবি অলঙ্কার-বহুল ভাষায় পরিবেশটির চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন;

অথচ ভাষা বেশ সংযত ও বাক্য-প্রয়োগ পরিমিত। ইহা উন্নত কবিপ্রতিভার পরিচায়ক। নিম্নের উৎকলিত উদ্ধৃতি হইতে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাইবে।

না দেখায় দিগন্তর রবির প্রকাশ।
খদ্যোৎ সদৃশ বাণে ভরিল আকাশ॥
অতি উচ্চ বায়ে কম্পে ক্ষিতি টলমল।
ঘন ঘন উল্কা পড়ে অতি অকুশল॥
বরিষার মেঘে যেন বরিষার নীর।
প্রভাত সময় যেন পড়য় শিশির॥

মুহম্মদ খানের একটি বিশিষ্ট গুণ—অল্প কথায় চিরন্তন সত্য প্রকাশ করা। সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণের মধ্যে এই পদ্ধতি অধিক মাত্রায় অনুসৃত হইত। অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কতকগুলি প্রবাদবাক্য (**Epigram**) চিরন্তন সত্য প্রকাশ করায় তাহা যেমন জনসমাজে প্রচলিত, তেমনি মুহম্মদ খানের কতকগুলি প্রবাদবাক্য চিরন্তন সত্য প্রকাশ করিয়াছে। এই প্রবাদগুলির মধ্যে কবির পাণ্ডিত্য, মনীষা, সমাজতত্ত্ব ও মানবজীবন সত্যের গভীর পরিচয় লুক্কায়িত। কাব্যের মূল-বিষয়-বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবি এই প্রবাদবাক্যগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন, অথচ কাব্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যথা ঃ

১। নিধন পতির নারী দ্বন্দ্ব করে যুবা ছাড়ি
সংসারেতে ধনের সেবন।
ধনহীন মান নাই নিধনের অপমান
সংসারের এরূপ চলন॥
২। যেবা ধন করি দান না করে না খায়।
নপুংসকেতে যেন সুন্দরী নারী পায়॥

কৃপণের ধন যেন বৃদ্ধের যুবতী।
ছাড়িতে না পারে লোভে না ভুঞ্জে সুরতি।

৩। অনিত্য সংসার ভাই কৃপণের ধন।
তাহাতে অধিক শ্রদ্ধা না করে সুজন॥

৪। সুপুরুষে নিজ নারী পিছ নাহি ছাড়ে।
কাপুরুষে নারী ছাড়ি যায় দূরান্তরে॥

৫। জীবহীন দেহ আর পতিহীন নারী।
গন্ধহীন পুষ্প যেন বিধবা কুমারী॥

৬। তিলমাত্র অসতীর মান্য নাহি রয়।
এক বিন্দু গোচনায় দুগ্ধ নষ্ট হয়॥

৭। যদ্যপি শৃগাল হাতে সিংহ বন্দী হয়।
তথাপি সিংহে নাহি শৃগালে সেবয়॥

৮। অসতীর প্রেম জান মুখের পীরিতি।
অসার সংসার মনে ভাবি চাহ মতি॥

৯। সংসারের কর্ম জান যেই ইন্দ্রজাল।
সর্বক্ষণ কাহারও না থাকে মন্দ ভাল॥

১০। পরমন্দ কৈলে হয় মন্দ আপনার।
আগে ভাল দেখে শেষে না কর বিচার॥

মুহম্মদ খানের কাব্য হইতে এই প্রকার ভূরি ভূরি প্রবাদের উদাহরণ দেওয়া যায়। হায়াৎ মাহ্‌মূদের কাব্যে ক্বচিৎ প্রবাদ-বাক্য আছে। কবি জাফর এবং শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌র কাব্যে একটিও প্রবাদবাক্য নাই। কবি হামিদের কাব্যেও নাই; তবে প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য-বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। হামিদ ইমাম হাসানের সুসজ্জিত পুরীর যে-বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে কবি আমাদের ঘরের আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কবি-বর্ণিত

হাসানের পুষ্পকানন বাংলা দেশের পুষ্পকাননের কথা মনে করাইয়া দেয়। এই বর্ণনা ঃ

তবে তথা হনে মুছা করিলা গমন।
বসি আছঞি দেখিলা আলীর নন্দন॥
পুরীর সন্নিতে ফুলবন বানাইয়া।
পঢ়ঞি নানা শাস্ত্র বহুলে মিলিয়া॥
বসন্ত সময় নানা কুসুম প্রকাশ।
কাঞ্চন কুমুদ আদি মাধবী পলাশ॥
ফুটিল চামেলী মালি পারু নিশি রিশ।
মকরন্দ গন্ধে আবরিল দশ দিশ্॥
শতবর্ণ নাগেশ্বর রঙ্গন গুলাল।
যার গন্ধে ব্যাকুল হএ অলি পাল॥
সফরি গুলাল আদি মরুআ দমল।
পারিজাত সারি সারি গুয়া কোলাহল॥

কোন কোন কাব্যে বিশেষ বিশেষ উপমা, বিশেষ বিশেষ বাচনভঙ্গী প্রভৃতির প্রতি কবির প্রবণতা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মুহম্মদ খানের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি 'মোক্তাল হোসেন' কাব্যে একাধিক স্থানে একই ধরণের বর্ণনা এবং একই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কবি নায়ক-নায়িকা বা পাত্র-পাত্রীর চোখের অশ্রুকে 'মুক্তার মালা'-র সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন এবং বহুস্থলে তিনি এই 'মুক্তার মালা'-র বর্ণনা দিয়াছেন। মুক্তার মালার প্রতি কবির যে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। যেমন ঃ

ক। গাঁথিয়া মুক্তার-মালা নয়নের জলে।
লাজেতে অবলা বালা গদকণ্ঠে বলে॥

খ। এই মত কান্দেন্ত হোসেন মহাবল।
গাঁথিল মুক্তার মালা নয়নের জল॥

গ। আহা সহোদর বলি কান্দিয়া বিকল।
গাঁথিল মুক্তার মালা নয়নের জল।।

অনুরূপ ভাবে 'ঘাঘরের রুনুঝুনু' শব্দের মাধুর্য এবং 'চামরের' প্রতিও কবিমনের আকর্ষণ লক্ষণীয়। কবির এই বর্ণনা ঃ

ক সুবর্ণ লাগাম জিন অধিক সুন্দর।
ঘাঘরের রুনুঝুনু নাচায় চামর।।
পবন সদৃশ অশ্বে করি আরোহণ।
রূপে নব আবদুল্লা হাছেন নন্দন।।

খ। কনক বিচিত্র জিন সুবর্ণ লাগাম।
ঘাঘরের রুনুঝুনু শুনি অনুপাম।।
অশ্বের গলেতে শোভে সুবর্ণ চামর।
সাজিল কুমার অভিনব পঞ্চশর।।

গ। ঘাঘরের রুনুঝুনু দোলায় চামর।
উচ্চৈঃশ্রবা জিনি অশ্ব পরম সুন্দর।।

সমাজচিত্র

বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কবিগণের কাব্যে তাঁহাদের সমসাময়িক কালের সমাজচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই সমাজচিত্র প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানের। সাহিত্য সমাজ-জীবনের দর্পণ। তাহার মধ্যে দেশ ও সমাজ, ধর্ম ও সভ্যতার ছাপ না পড়িয়া পারে না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। যে-দেশে যেরূপ মানুষ বাস করে, সে দেশে তদনুরূপ সমাজ গঠিত হয়। বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কবির কাব্যে তাঁহাদের সমসাময়িককালের ধর্ম, সভ্যতা, রীতি-নীতির ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কবিগণ

বাঙালী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা এতদ্দেশীয় প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া, তাঁহারা ফারসী কাব্য অনুসরণ না করিয়া যেখানে স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের মনের অলক্ষ্যে আরবের ধূসর মরুভূমি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তৎস্থলে বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রকৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, আচারঅনুষ্ঠান স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বাংলার মুসলমান-সমাজ মোট পাঁচ শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত হইত। হিন্দুর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের ন্যায় মুসলমান-সমাজও সৈয়িদ, শেখ, পাঠান, মুঘল এবং বাঙালী এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সৈয়িদগণ হযরত রসূলের কন্যা বীবী ফাতিমার অধস্তন পুরুষ, শেখেরা আরব হইতে আগত ধনী ও বণিকগণ, তুর্কীস্তানের অধিবাসিগণ এদেশে 'পাঠান' এবং মধ্যএশিয়া হইতে আগত ব্যক্তিরা এদেশে 'মুঘল' নামে অভিহিত হন। এই চারি শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত মুসলমান ব্যতীত বাংলাদেশের অপরাপর অধিকাংশ মুসলমানকে 'বাঙালী' নামে আখ্যা দেওয়া হইত[৫]। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে, আরব ও পারস্য হইতে আগত ধনী ও বণিকগণ এদেশে 'শেখ' নামে পরিচিত। তাছাড়া, তুর্কীস্তান ও মধ্যএশিয়া হইতে আগত ব্যক্তিরা 'মুঘল' এবং আফগানিস্তানের লোকেরা এদেশে 'পাঠান' নামে অভিহিত হইতেন। অভিজাত বংশীয় তিন শ্রেণীর মুসলমান ব্যতীত বাংলাদেশের

---

৫ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ: আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য। ১ম সংস্করণ, ১৯৩৫, কলিকাতা, পৃঃ ৯১-৯২।

অপরাপর মুসলমানকে শুধু 'মুসলমান' নামে অভিহিত করা হইত। এই মুসলমানদের উপাধি ছিল সাধারণতঃ মণ্ডল, বিশ্বাস ইত্যাদি। তাহারা কেবল চাষাবাদ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহাদের সকলকে লইয়াই তৎকালের বাঙালী-সমাজ গঠিত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিবাহ-ব্যাপার এবং আরও কতকগুলি বিষয়ে মুসলমানগণের শাস্ত্রীয় বিধান শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তৎকালে বাংলাদেশের সমাজে যে-সকল প্রথা, রীতিনীতি, বসন-ভূষণ, প্রসাধন-অলঙ্কার প্রভৃতির প্রচলন ছিল, মুসলমান-সমাজে তাহার অনেকগুলি ছিল বিদ্যমান। সে যাহা হউক, এই যুগে মুসলমান-সমাজে বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যে-আচার-ব্যবহার অনুসৃত হইত, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। পাদটীকায় এই যুগের বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য হইতে বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক আচার সম্বন্ধে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা হইল।

বিবাহ ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের কোন যুবক বিবাহের পূর্বে প্রথমে দৈবজ্ঞ দ্বারা শুভলগ্ন ঠিক করিয়া লইতেন। অতঃপর, নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে বন্ধু-বান্ধবেরা সহর্ষ-চিত্তে বরের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। আজকাল যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে পূজা-পার্বণে অথবা আনন্দ-উৎসবে দ্বারে দ্বারে মঙ্গল কলস দিয়া ঘট দিবার প্রথা দেখিতে পাই, তদ্রূপ ঐ যুগে বিবাহের পূর্বে পাত্রের বাটীস্থ দরজার সম্মুখে দুই একটি সুবর্ণ কলস (মঙ্গলঘট) পানিতে পরিপূর্ণ করিয়া ও চন্দ্রাতপ তলে সারি সারি প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখার প্রথা ছিল। অতঃপর, পুরমহিলাগণ নানা সুগন্ধি দ্রব্য, তৈল এবং হরিদ্রা লইয়া গোসল দেওয়াইবার জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট বরের

নিকট গিয়া উপস্থিত হইতেন। গোধূলির সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা পাত্রকে তৈল-হরিদ্রা দ্বারা গোসল করাইতেন। তারপর, নানা মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া বর সুদৃশ্য চতুর্দোলায় চড়িয়া বিবাহ করিতে যাইতেন। বরযাত্রাকালে বরকে দেখিবার জন্য প্রতিগৃহের কুলবধূরা গুরুজনদের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া গবাক্ষের দিকে ধাবিতা হইতেন। ঐভাবে ছুটিয়া চলিবার সময় কাহারও শাড়ির আঁচল, কাহারও খোঁপা খসিয়া পড়িত, কাহারও বক্ষের বসন স্থানচ্যুত হইত, সেদিকে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ থাকিত না[৬]। বরযাত্রার সময় নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজান হইত।

---

৬ দৈবজ্ঞ লগন দিল শুভ দিন আসি হৈল
শুভ লগন জুম্মা রাত পাই ॥

* * *

পাত্র মিত্র বন্ধুগণ সব আনন্দিত মন
সুবর্ণ কলসী ভরি জলে।
অলিগণ পান করি দীপ দিল সারি সারি
রাখিলেক চন্দ্রপতি তলে ॥
শত শত রাজসুতা রূপে গুণে অদ্ভুতা
সুগন্ধি ও তৈল লৈয়া যায় ॥
হেম পাটে বসাইয়া নারীগণ আগুলিয়া
ঐ তৈল হরিদ্রা দিল গায় ॥

* * *

সুবর্ণ চৌদলে চড়ি নানা আভরণ পরি
যেন দেখি স্বর্গ বিদ্যাধর।

* * *

অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজেও যুবকযুবতীর বিবাহের পূর্বে প্রথমে শুভলগ্ন ঠিক করা হইত। তারপর বিবাহের সময় নহবত, ঢাকঢোল এবং সাদীয়ানা প্রভৃতি বাদ্য বাজান হইত; অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে গায়ক, বাদক ও নর্তকী আমদানী করিয়া ধুমধামের সহিত নাচগানের ব্যবস্থা করা হইত। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ খানাপিনা ও ভোজে আপ্যায়িত হইতেন। এতদ্ব্যতীত, বর্তমান সময়ের ন্যায় তখনও হলুদ-গোলাপী প্রভৃতি রং পিচ্‌কারী করিয়া বিবাহে যোগদানকারী ব্যক্তিদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও গাত্রে দেওয়া হইত[৬ক]।

তেজি গুরুজন ভিত যত কুলবধূ চিত
মগ্ন হয়ে যায় দেখিবার।

* * *

কাহারও অঞ্চল পড়ে কার খোঁপা খসি পড়ে
কার বুকে না থাকে অঞ্চল ॥
(মুহম্মদ খান : মোক্তাল হোসেন)

৬ ক আবদুল জব্বার তবে পাইয়া ছামান।
সাদীর লগন ক'রে ঘরে চলে যান ॥

* * *

শুনিয়া এমাম বলে মজলিস্ করিয়া।
সওয়া ঘড়ি লগন তাকে দিলেক করিয়া ॥

* * *

নওবত তুলিয়া দেহ খুব সাদীয়ানা;
খুব ভাতি কর গিয়া সাদীর ছামানা ॥
ভাড়ুয়া নাটুয়া লোক খেলুক আসিয়া।
জরদ গোলাপী রং পিচ্‌কারী করিয়া ॥

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত এ-দেশের মুসলিম-সমাজে রমণীরা যে-সকল অলঙ্কার ও পোশাক পরিতেন, তাহার অধিকাংশ অলঙ্কার ও পোশাক এখনও প্রচলিত। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এ-দেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা স্তরে পরিবর্তন দেখা দেয়। কিন্তু, মেয়েরা সাধারণতঃ পুরুষদের অপেক্ষা রক্ষণশীল বলিয়া তাহাদের মধ্যে এই পরিবর্তন তত বেশী প্রকটিত হয় নাই। যাহা হউক, বিভিন্ন সময়ে মুসলিম সমাজে যে-সকল অলঙ্কার ও পোশাক ব্যবহৃত হইত, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। পাদটীকায় বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য হইতে মেয়েদের অলঙ্কারাদি ও পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। উদ্ধৃতিগুলির নিম্নরেখ অংশগুলি এক সঙ্গে মিলাইয়া পাঠ করিলে বিভিন্ন যুগের অলঙ্কার ও পোশাকাদি সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিতেছি, তাহা জানা যাইবে।

অলঙ্কার ও পোশাক ঃ

ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান রমণীগণ গলায় স্বুবর্ণ হাসুলি,

দিবেক সবার গায় যে আসিবে হেথা।
এমাম করেন বেহা কৈবা এই কথা॥

*　　*　　*

যাইয়া দেখিল বান্দী বাজে সাদীয়ানা।
ঠাঁই ঠাঁই নাচ গীত পাকে খানাপিনা॥
বাইজীগণ নাচে গীত গায় রাগে রাগে।
রংয়ের পিচকারী ছাড়ে গায়ে এসে লাগে॥
ভাড়ুয়া রোমজানি কত করে নানা বাজি।
পুছিতে কহিল এমামের সাদী আজি॥

(ফকীর গরীবুল্লাহ ঃ জঙ্গনামা)

হস্তে অঙ্গুরীয়, বাজুতে বাজুবন্দ ও পায়ে নূপুর পরিতেন। চলিবার সময় পায়ের নূপুর রুনুঝুনু বাজিত। এই যুগে তাঁহারা কপালে সিন্দুর পরিতেন এবং চন্দনের ফোঁটাও দিতেন। তাঁহারা কস্তুরী প্রভৃতির দ্বারা শরীর সুগন্ধ করিতেন। মেয়েরা বক্ষ আবরিত করিবার জন্য কাঁচুলি (সংস্কৃত 'কঞ্চুলিকা' শব্দের অপভ্রংশ) নামক এক প্রকার স্তন-বন্ধনী ব্যবহার করিতেন। এই যুগের মুসলমান রমণীগণ 'লোটন' (ঝুলানো বা আল্গা) খোঁপা এবং ইরাক দেশের মেয়েদের মত 'ইরাকী' খোঁপা বাঁধিতেন[৭]।

সপ্তদশ শতাব্দীতেও মুসলমান রমণীগণ নানাবিধ অলঙ্কার ছাড়া অন্যান্য কতকগুলি উপকরণও ব্যবহার করিতেন। অলঙ্কারের মধ্যে তাঁহারা কর্ণে কর্ণ-মণি, কুণ্ডল বা কানফুল, নাকে

---

৭ সুবর্ণ হাসুলি মোর সিঁথের সিন্দূর।
সে দোসরকে কে হরিল পাএর নেপুর॥

*　　*　　*

হস্তের অঙ্গুরী মোর আর বাজুবন্দ।
হরিলেক হার মোর কস্তুরিক গন্ধ॥

*　　*　　*

রবির প্রভাবে মোর ভরিল কাঞ্চুলি।

*　　*　　*

রাশি রাশি জেবর নানা অলঙ্কার।
রুনুঝুনু চরণেতে না শুনিল আর॥
লোটন, এরাকী খোঁপা খসি খসি পড়ে।
লুক দিল শশধরে নবঘন আড়ে॥

(শৈখ ফয়জুল্লাহ : জয়নবের চৌতিশা)

বেশর ও নাকফুল, গলায় হার, হাতে কঙ্কণ, পায়ে নূপুর, কটিদেশে কিঙ্কিণী, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী প্রভৃতি অষ্ট অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। আধুনিককালে সমাজে নূপুরের ব্যবহার প্রচলিত নাই। নূপুরের ব্যবহার বর্তমানে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর ন্যায় এ-যুগেও তাঁহারা সিঁথিতে সিন্দুর পরিতেন। শুধু তাহাই নহে ; তাঁহারা প্রসাধনের সময় ভ্রূযুগলকে কাজল-রঞ্জিত করিতেন এবং কস্তুরী, আগর, চুয়া, চন্দন প্রভৃতি মুখমণ্ডল ও দেহ প্রসাধনে ব্যবহার করিতেন। বক্ষস্থল আবরিত করিবার জন্য তাঁহারা এ-যুগেও কাঁচুলি ব্যবহার করিতেন। মুসলমান রমণীগণ নানা ঢংয়ে খোঁপা বিন্যাস করিতেন। 'জাদ' নামক এক প্রকার খোঁপাভূষণ দ্বারা খোঁপাকে ভূষিত করার রীতি এই যুগে প্রচলিত ছিল। এই রীতি আধুনিক কালে পূর্ববঙ্গে এখনও প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত, মহিলাগণ নাগিনী খোঁপাও বাঁধিতেন। খোঁপা বিন্যাসের পর তাঁহারা শিরোভূষণরূপে সুগন্ধযুক্ত পুষ্প খোঁপায় গুঁজিয়া দিতেন। আজকাল মুসলমান রমণীগণকে খোঁপায় ক্বচিৎ পুষ্প ব্যবহার করিতে দেখা যায়। খোঁপা বাঁধা ছাড়াও কোন কোন মহিলা কেশ বেণী করিয়া বাঁধিয়া পিঠের উপর ঝুলাইয়া দিতেন। সপ্তদশ শতকের মুসলমান মহিলাদের অনেকেই কুসুম ফুলের রঙে শাড়ি রঙীন করিয়া পরিতে ভালবাসিতেন[৮]।

---

৮ অঙ্গের বসন ছিঁড়ে কাঙ্গন করে চুর।
ছিঁড়িল গলার হার মুছিল সিন্দুর॥
নাকের বেশর খুলি ফেলি দিল দূর।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল ধনি চলন্ত নেপুর॥
অষ্ট অলঙ্কার ত্যাগ কৈল দেলারাম॥
কস্তুরী, চন্দন, চুয়া ছিল যার গায়।
সুগন্ধি শীতল যত হরিল ধূলায়॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের মুসলমান মেয়েরা যে-সব অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন, তাহা যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীরই অনুকরণ, বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য হইতে ইহার প্রমাণাদি পাওয়া

কর্ণে শোভে রত্নমণি মৃদঙ্গ কমল বেণী
দশনে বিজুলী হাসি।

* * *

রতন কঙ্কণ করে অঙ্গেতে শোভন করে
অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী যে সাজে।
ক্ষীণমাজা সিংহ জিনি পদখানি কমলিনী
নূপুরের রুনুঝুনু বাজে ॥

* * *

কস্তুরী কঙ্কণ আগর চন্দন
ছাড়ি রঙ্গে বহে ধারা।
তিলেক ভাসিল কাঁচুলি ফাড়িল
ছাড়িল কুচযুগ হারা ॥

* * *

নেপুর কঙ্কণ ঝুনুঝুনু ঘন
বিজয়বাদ্য বাজে।

* * *

নেপুর কুণ্ডল বদালে অঙ্গদ কথন। (?)
নানা আভরণ পরি কস্তুরী চন্দন ॥

* * *

নেপুরের রুনুঝুনু জাগি উঠে ফলধেনু
কিঙ্কিণী রঙ্গিণী বাদ্য বাজে।

যাইতেছে। এই যুগের মহিলারা মাথায় জাদ্‌ ও পায়ে নূপুর পরিতেন। সিঁথায় সিন্দূরের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। তাঁহারা স্তন আবরিত করিবার জন্য কাঁচুলি ব্যবহার করিতেন। তৎপূর্ববর্তী যুগের নারীদের ন্যায় তাঁহারা নেতের শাড়িও (পট্টবস্ত্র ?) পরিধান করিতেন[১]।

কজ্জলে দেখি মুখ ভারি গুরু শাপে দুখ
কলঙ্ক ইচ্ছিল দ্বিজরাজে॥
ভাসিল কুসুম্ভরাগ শীতল কাটিল ভাগ
অভিমানে খসি পড়ে শাড়ি।
* * *
চাঁচর চিকুর বেণী সহজে চামর জিনি
পৃষ্ঠভাগে দোলে অনুপাম॥
* * *
ঝুমুকে তারকাগণ উভয়ে লাগায় মন
নানা ফুল শিরের উপর॥
শিরেতে নাগিনী খোঁপা শোভায় জাদের খোপা
মুখদল চান্দির কবরী।
* * *
সিঁথের সিন্দূর কে হরিল মোর
কে শাপিল পতি হানি।
(মুহম্মদ খান : মোক্তাল হোসেন)

১ ফাড়িল নেতের শাড়ি আর যত গেল ছিঁড়ি
ভাঙ্গি গেল চরণের নেপুর।
কাঞ্চুলি ছিঁড়িয়া যাএ ধূলাএ জড়িল গাএ
যৌলাম (?) হৈল সিঁথের সিন্দূর॥

সামাজিক অন্যান্য আচার-ব্যবহার

মুঘল আমলে এদেশে নানাপ্রকার খেলার প্রচলন ছিল। এগুলির মধ্যে দ্যূতক্রীড়া বা পাশাখেলা অন্যতম। ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গীয়-মুসলিম-সমাজে দম্পতিরা এক সঙ্গে বসিয়া পাশা খেলিতেন এবং খেলিবার সময় তাঁহারা মাঝে মাঝে পান চিবাইয়া ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিতেন। সেকালেও সম্ভ্রান্তঘরের নরনারীগণ উচ্চ খাটপালঙ্কে শয়ন করিতেন[১০]।

আধুনিককালের ন্যায় সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম-সমাজে বৈধব্য-জীবন নারী-জীবনের চরম অভিশাপরূপে গণ্য হইত। বিধবা হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা প্রথমেই সীমন্তের সিন্দূর মুছিয়া ফেলিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গলার চন্দ্রহার বা তুলরি, হাতের কঙ্কণ বা বলয়, বাজুতে বাজুবন্দ, নাকের বেশর, সিঁথায় সিঁথিপাটি, কানের কর্ণফুল, পায়ের নূপুর প্রভৃতি অষ্ট অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিতেন। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমস্ত সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিতেন। এমনকি চুয়া, চন্দন, কস্তুরী প্রভৃতি

খসিল মাথার জাদ জীবনের নাই সাধ
এই দুঃখ আমার নিবেদন।
(জাফর : শহীদে কারবালা)

১০ পাশা না খেলিএ প্রভু একত্রে বসিয়া।
পান না যোগায় প্রভু বাটাত ভরিয়া।।

* * *

উঞ্চল পালঙ্ক শয়ন একত্তরে।
(শৈখ ফয়জুল্লাহ্ : জয়নবের চৌতিশা)

প্রিয় প্রসাধন দ্রব্যের সঙ্গেও তাঁহার কোন সংশ্রব থাকিত না[১১]।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে কোন মুসলমানের বাড়িতে কোন অতিথির আগমন হইলে তিনি তাঁহাকে পান-সুপারী দিয়া সানন্দে অভ্যর্থনা জানাইতেন। এই সামাজিক আচার পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য-সমাজ হইতে এখনও লুপ্ত হয় নাই। চা-য়ের বদলে এখনও পানসুপারী অতিথি-অভ্যর্থনার অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে[১২]।

---

১১ পাদটীকার ৮ নম্বরের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

এবং

কি হইল হাতের তার কি হইল গলার হার
কি হইল করের কাঙ্কন।
বাজুবন্দ কি হইল কর্ণফুল খুলে নিল
বেশর হরিল কোন জন॥
গলার তুলরি কোথি আন অষ্ট গজমতি
চন্দ্রহার নাহি তোমার গলে।
হাছুলা পাছুলা কোথি কি হইল সিঁথিপাটি
কণ্ঠমালা কর্ণে নাহি দুলে॥
বসন মলিন দেখি কি হইল কাজল রেখি
মুখের তাম্বুল বিবর্জিত।
কস্তুরী চন্দন গাএ ধূলায় ধূসর ভাএ
কেশ বেশ কেন বিপরীত॥

(হামিদ : সংগ্রাম হুসন)

১২ বসিতে আসন দিল গৌরব করিয়া।
বাটা ভরি পান দিল সম্মুখে আনিয়া॥

(হায়াৎ মাহমুদ : জারীজঙ্গনামা)

বাদ্যযন্ত্র ঃ

মুঘল এবং ইংরেজ আমলের বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্রের প্রচলন ছিল। বাদ্যযন্ত্রগুলির অধিকাংশই ভারতীয়; তবে কিছু সংখ্যক পারস্য হইতে আমদানী। মুঘল আমলে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের সংবাদ নিম্নোদ্ধৃত চারটি কবিতাংশের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। যথা ঃ

দুই সৈন্য মুখামুখি হই গেল যবে।
বিবিধ বাদ্যের ধ্বনি উঠিলেক তবে॥
ঢাক, ঢোল, কাড়া, শিঙ্গা, দোসরি, মুঞ্জরি।
কাঁসি, করতাল, বাজে ডমরু ঝাঞ্জরি॥
মোরছা, খামচ, পটা, ভেউর, কর্তাল।
সারি সারি সানাই, বুগল বাজে ভাল॥
কম্পিত পৃথিবী ভেল দুন্দুভির ধ্বনি।
হস্তি-কান্ধে দামা বাজে ঘোরনাদ শুনি॥
বাজায় বিজয়রোল, তবল, নিশান।
দগড়েতে দিল কাঠি ভূমি কম্পমান॥
বিনা ধূমা বিমার (?) রবাব কবিলাস।
সারি সারি মধুর বেণু, শুনিতে উল্লাস॥

(মুহম্মদ খান : মোক্তাল হোসেন)

রবাব তাম্বুরা বাঁশী মধু বহে রাশি রাশি
সুস্বরে সানাই কাড়ে রাও।

(ঐ)

সানাই বুরঙ্গ দগড় কান্তা কাঁসি।
ঢাক ঢোল তুব্ব তুম্বি বাজে রাশি রাশি॥

কর্তালের বাদ্য তাতে বাজিল বিস্তর।
ঘোর মেঘে বলে যেন গগনের উপর।।
(হামিদ ঃ সংগ্রাম হুসন)

উলিদের সঙ্গে যায়া কৈল দরশন।
তব্বল সাদিনা বাদ্য বাজায় তখন।।
পঞ্চ শব্দ বাদ্য বাজে মদিনা ভুবন।
আনন্দে পুরিল লোক শুনিয়া স্বপন।।
দুন্দুভি সাদিনা বাজে ভেউর কর্তাল।
হরষিত হয়া যায় যুঝিতে সকাল।।
(হায়াৎ মাহ্মূদ ঃ জারী জঙ্গনামা)

নাকারা কর্তাল বাজে ভেউর তুরঙ্গ।
ভেউর তুরঙ্গ বাজা বাজে অতি রঙ্গ।।
(ফকীর গরীবুল্লাহ্ ঃ জঙ্গনামা)

অলঙ্কার-ব্যবহার ও তাহার আলোচনা

যেরূপ কেয়ূর-কুণ্ডলাদি লৌকিক ভূষণ সকল মনুষ্য শরীরের শোভা বর্ধন করে বলিয়া উহাদিগকে 'অলঙ্কার' (শোভা) শব্দে নির্দেশ করা যায়, সেইরূপ কাব্যের অঙ্গ-স্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভা বর্ধক ধর্মবিশেষকে কাব্যের অলঙ্কার কহে। ডক্টর সুধীর কুমার দাসগুপ্ত 'অলঙ্কার' শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে গিয়া বলেন যে, সংস্কৃত 'অল্ম্' শব্দের এক অর্থ 'ভূষণ'। অতএব, যাহা দ্বারা 'অল্ম্' বা ভূষণ করা হয়, তাহাই অলঙ্কার। 'অলঙ্কার' শব্দের ব্যাপক অর্থ সৌন্দর্যসৃষ্টি' কিন্তু সঙ্কীর্ণ অর্থ উপমা, অনুপ্রাস ইত্যাদি। অলঙ্কার যেখানে কাব্যের সৌন্দর্য বর্ধন করে, সেখানে তাহা কাব্যের শরীর-পদার্থেরই অভিন্নরূপ। এই রূপ বাদ দিলে রসের যথার্থ প্রকাশ সম্ভবপর নহে। এই অলঙ্কারের জন্য কবির সাধারণ ভাষাও

কাব্যের ভাষা, কাব্যের অভিন্ন সত্তারূপে পরিগণিত হয়। অলঙ্কার থাকিলে কাব্যের রূপ অলঙ্কারময় হয়; তাহা খসাইয়া লইলে কাব্যের রূপ অন্তর্হিত হয়; সেক্ষেত্রে কাব্য রূপহীন ও রসহীন তত্ত্ব বা তথ্যমাত্রে পর্যবসিত হইতে বাধ্য[১৩]। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানব-জীবনরহস্য উদ্ঘাটন করাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। সার্থক রচনার মধ্যে গভীর জীবনাদর্শ ও আকৃতির যে-সঙ্কেত নিহিত থাকে, কবি যদি সেই আকৃতি ও আদর্শ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার মারফত পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারেন, তবেই তিনি সার্থক; নচেৎ তিনি ঐশ্বর্যময় ভাষায় কাব্য রচনা করা সত্ত্বেও সার্থক হইতে পারিবেন না। সে যাহা হউক, মুঘল আমলে আলঙ্কারিক ভাষা-চাতুর্য উৎকৃষ্ট কবিত্বের নিদর্শনরূপে গণ্য হইত।

এই আমলের বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কবিগণের রচনায় অল্প-বিস্তর অলঙ্কার প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় বর্তমান। কবিদের রচনা হইতে কতকগুলি বিশিষ্ট অলঙ্কার নিম্নে প্রদত্ত হইল:

অনুপ্রাস:

ক। ঘর হৈল ঘোর মোর বিনি শশধর।
ঘোর করি ঘর মোর গেলা প্রাণেশ্বর॥
(শৈখ ফয়জুল্লাহ্: জয়নবের চৌতিশা)

খ। দ্বিতীয়ার চন্দ্র মোর প্রাণের দোসর।
দোসর ছাড়িয়া প্রভু গেলা এক সর॥ (ঐ)

---

১৩ ডক্টর সুধীর কুমার দাসগুপ্ত: কাব্যালোক (১ম খণ্ড), ১ম সংস্করণ, বাংলা ১৩৫২, পৃঃ ৫৯৩

গ। নিশি দিশি রবি শশী নাই আত্মপর।
ভাবুক ভাবিনী ভাবে হৈল একত্তর॥
(মুহম্মদ খান : মোক্তাল হোসেন)

ঘ। অমল কমলদল নয়ন যুগল ভাল
মুখ পূর্ণিমার শশধর। (ঐ)

ব্যাখ্যা :

উপরোক্ত ক উদ্ধৃতিটিতে 'ঘর' ও 'ঘোর' শব্দের পুনরাবৃত্তি হওয়ায় অনুপ্রাস অলঙ্কার হইয়াছে। অনুরূপভাবে 'দোসর' এবং 'সর'-এর মধ্যে 'সর'-এর পুনরাবৃত্তি, 'নিশি', 'দিশি', 'শশী', 'ভাবুক' 'ভাবিনী' 'ভাবে' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে 'শি' ও 'ভা' বর্ণের এবং 'অমল' ও 'কমল' শব্দের 'মল' এবং 'যুগল' ও 'ভাল'-এর মধ্যে 'ল'-এর পুনরাবৃত্তির জন্য অনুপ্রাস অলঙ্কার হইয়াছে।

ব্যতিরেক :

ক। ক্ষীণ মাজা সিংহ জিনি পদখানি কমলিনী
নেপুরের রুনুঝুনু বাজে।
(মুহম্মদ খান : মোক্তাল হোসেন)

খ। চিকন চিকুর নিশি কস্তরীর গন্ধ।
মুখজ্যোতি দেখি হয় সূর্যের জ্যোতি মন্দ॥ (ঐ)

গ। খোদার সৃজন বস্ত্র কেমন নির্মিল।
জিনিয়া সূর্যের জ্যোতি হইল উজ্জ্বল॥
কে কহিতে পারে সেই বসনের মূল্য।
ত্রিভুবনে ধন নাহি বস্ত্র সমতুল্য॥
(হায়াৎ মাহমুদ : জারীজঙ্গনামা)

ব্যাখ্যা ঃ

ক উদ্ধৃতিতে সিংহের কটির চেয়ে নারীর (সখিনার) কটি ক্ষীণ—এই উক্তিতে উপমানের (সিংহের কটি) চেয়ে উপমেয়ের (নারীর কটি) উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় ('জিনি' শব্দ লক্ষণীয়) ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়াছে। অনুরূপভাবে খ উদ্ধৃতিতে 'মুখের জ্যোতি' অপেক্ষা 'সূর্যের জ্যোতি'মন্দ—এই উক্তিতে উপমান 'সূর্যের' চেয়ে, উপমেয় 'মুখের জ্যোতির' উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে এবং গ উদ্ধৃতিতে উপমেয় 'বস্ত্র', উপমান 'সূর্য্যের জ্যোতি' অপেক্ষা উৎকর্ষাত্মক হওয়ায় ('জিনিয়া' শব্দ লক্ষণীয়) ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়াছে।

উপমা ঃ

ক। না দেখায় দিগন্তর রবির প্রকাশ।
খদ্যোৎ সদৃশ বাণে ভরিল আকাশ॥

(মুহম্মদ খান ঃ মোক্তাল হোসেন)

খ। ডাক দিয়া হোর বলে শুন নরগণ।
আমি হোর সিংহরূপ বিখ্যাত ভুবন॥ (ঐ)

গ। সেইক্ষণে বিছু আসি লিঙ্গেতে দংশিল।
আগুন সমান বিষ জলিয়া উঠিল॥

(হায়াৎ মাহ্‌মূদ ঃ জারীজঙ্গনামা)

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত উদ্ধৃতিত্রয়ে যথাক্রমে 'বাণ', 'হোর', ও 'বিষ' উপমেয়। উপমান—'খদ্যোৎ', 'সিংহ' ও 'আগুন'। ইহাদের সাদৃশ্য-বাচক শব্দ যথাক্রমে 'সদৃশ', 'রূপ' ও 'সমান'। সাধারণ ধর্ম

অনুপস্থিত। সুতরাং উপমার চারিটি অঙ্গের মধ্যে তিনটির স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় লুপ্তোপমা অলঙ্কার হইয়াছে।

ভ্রান্তিমান ঃ

হেন কালে এক দাসী আইল আচম্বিত ।।
হস্তে ঝারি করি জল ভরিতে লাগিল।
জল মধ্যে এইরূপ দেখিতে পাইল ।।
আকাশের চন্দ্র সূর্য জলেতে নামিল।
আকাশের বিদ্যাধর জলেতে আসিল ।।
শির তুলে দেখে দাসী ভাই দুইজন।
পড়িল হস্তের ঝারি হইল অচেতন ।।

(মুহম্মদ খান ঃ মোক্তাল হোসেন)

ব্যাখ্যা ঃ

উপমেয়—'ভাই দুই জন' উপমান—'চন্দ্রসূর্য' ও 'বিদ্যাধর'। দাসী জলমধ্যে সুশ্রী 'দুই ভাই-য়ের' প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাদিগকে 'চন্দ্র-সূর্য' ও 'বিদ্যাধর' বলিয়া ভুল করিয়াছে। তবে, ভ্রম বাস্তবিক নহে, কবিকল্পিত। সুতরাং এখানে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইয়াছে।

সমাসোক্তি ঃ

দেখিবারে না পাইনু বদন কমল।
না পাইনু করিবারে জীবন সফল ।।
এ বলিয়া পবনকে বলে সম্ভাষিয়া।
হোসেনকে আমার প্রণাম কহ গিয়া ।।
কহিও কুফার লোকে সত্যভঙ্গ করি।
আমাকে সংহারে সবে ধর্মভয় ছাড়ি ।।

(মুহম্মদ খান ঃ মোক্তাল হোসেন)

ব্যাখ্যা ঃ

এখানে অচেতন 'পবনের' (উপমেয়) উপর চেতন মানবীয় (উপমান) ধর্ম আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং, ইহা সমাসোক্তি অলঙ্কার।

অতিশয়োক্তি ঃ

আচম্বিতে উচ্চগিরি যেন পড়ে খসি।
ভূমিতে পড়িয়া গেল আকাশের শশী॥

(মুহম্মদ খান ঃ মোক্তাল হোসেন)

ব্যাখ্যা ঃ

আলোচ্য উদ্ধৃতিতে উপমান 'গিরি' ও 'শশী'। উপমেয়—মহাবীর ওহাব (অনুক্ত)। উপমেয় ওহাবের উল্লেখ না করিয়া উপমান 'গিরি' ও 'শশী' দ্বারাই ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া ইহা অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

রূপক ঃ

ক। বিন্ধিল বিচ্ছেদ-বাণ জর্জর হইল প্রাণ
চক্ষে জলধারা বহে ঘনে।

(হায়াৎ মাহ্মূদ ঃ জারীজঙ্গনামা)

খ। ভুরু-ধনু কটাক্ষেতে হানে পঞ্চবাণ।
থাকুক যুবক বৃদ্ধ দেখি মগ্ন মন॥

(মুহম্মদ খান ঃ মোক্তাল হোসেন)

ব্যাখ্যা ঃ ক উদ্ধৃতিতে উপমেয় 'বিচ্ছেদের' সঙ্গে উপমান 'বাণের' অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা রূপক অলঙ্কার। অনুরূপভাবে খ উদ্ধৃতিতে উপমেয় 'ভুরু'-র সহিত উপমান 'ধনু'র অভেদ কল্পিত হওয়ায় রূপক অলঙ্কার হইয়াছে।

উৎপ্রেক্ষা ঃ

ক। ত্রিলোক জিনিয়া হৈল এ কামমোহিনী।
শরীরের জ্যোতি যেন দেখি দিনমণি ॥
(হায়াৎ মাহ মূদ ঃ জারীজঙ্গনামা)

খ। হোসেনের বাণ চলে বিজলী সঞ্চার ॥
(মুহম্মদ খান ঃ মোক্তাল হোসেন)

ব্যাখ্যা ঃ

ক উদ্ধৃতিতে উপমেয় 'কামমোহিনী' ; উপমান--দিনমণি। 'যেন' বাচ্যোৎপ্রেক্ষা নির্দেশ করিতেছে। খ উদ্ধৃতির অর্থ হইতে সংশয়ের ভাবটি পাওয়া যায়—হোসেনের বাণ ছুটিয়া যাইতেছে। উহা যেন বিজলীর সঞ্চার করিতেছে। 'বিজলী সঞ্চার' শব্দের আগে 'যেন' বসাইয়া সংশয়ের ভাবটি ধরিতে হইবে। সুতরাং ইহা প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হইল।

অপহ্নুতি ঃ

দেখি আবু হোরেরা প্রশংসে মনে মনে।
নর নহে, হুর এই বুঝিনু ধরনে ॥
(মুহম্মদ খান ঃ মোক্তাল হোসেন)

ব্যাখ্যা ঃ

উপমেয়—নর, উপমান—হুর। 'নহে' শব্দ দ্বারা উপমেয়কে অস্বীকার করা হইয়াছে ; অতএব ইহা অপহ্নুতি অলঙ্কার।

অপ্রস্তুত প্রশংসা ঃ

ক। অমৃত মাখিলে নিমে তিত নাহি ছাড়ে।
লবণ ভূমিতে যেন বৃক্ষ নাহি ধরে ॥
(মুহম্মদ খান ঃ মোক্তাল হোসেন)

খ। যদ্যপি শৃগাল হাতে সিংহ বন্দী হয়।
তথাপি সিংহে নাহি শৃগালে সেবয় ॥
(মুহম্মদ খান : মোক্তাল হোসেন)

ব্যাখ্যা :

ক উদ্ধৃতিতে 'প্রস্তুত' অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ের অবতারণা না করিয়া কবি অবর্ণনীয় বিষয়ের দ্বারা তাহা প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। এই উক্তিতে বর্ণনীয় বিষয়—দুর্জন ব্যক্তিকে হিতোপদেশ দিলেও তাহার স্বভাব কদাপি বদলায় না। দুর্জন ব্যক্তি হাজার উপদেশেও সুজন হইতে পারে না, এই প্রাসঙ্গিক অর্থ ইহাতে বিধৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে। অনুরূপভাবে খ উদ্ধৃতিতে প্রাসঙ্গিক অর্থ—শক্তিমান ব্যক্তি দুর্বলের হস্তে ধৃত হইলেও সে দুর্বল ব্যক্তির দাসত্ব স্বীকার করে না। এই অর্থ বুঝাইবার জন্য অপ্রাসঙ্গিক শৃগাল-সিংহের বিষয় অবতারণা করায় এখানে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে।

প্রতীপ :

ভুবন-বিখ্যাত বীর আলীর সন্ততি।
তার সঙ্গে যুঝিতে অলিদের শক্তি নয় ॥
কোথায় মৃগেন্দ্র আগে গজেন্দ্র যে রয়।
(মুহম্মদ খান : মোক্তাল হোসেন)

ব্যাখ্যা :

উপমেয়—'আলীর সন্ততি' ও 'গজেন্দ্র' নিজেরা এত উৎকৃষ্ট যে ইহাদের উপমান 'অলিদ' ও 'মৃগেন্দ্র' নিস্ফল। কাজেই প্রত্যাখ্যাত। উপমান প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ইহা প্রতীপ অলঙ্কার হইয়াছে।

অলঙ্কারের বেশী উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে, মুঘল আমলের এই কবিগণের অলঙ্কার-প্রয়োগ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মুহম্মদ খান অন্যান্য কবি অপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। তিনি কাব্যের প্রায় সর্বত্র অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কারের মালা গাঁথিয়াছেন। তিনি যে অলঙ্কার-প্রয়োগ সম্বন্ধে খুব আত্মসচেতন ছিলেন তাহা নহে ; তথাপি তিনি রূপ-বর্ণনা, বীররসবর্ণনা (যুদ্ধ বর্ণনা), আদিরস বা শৃঙ্গার-বর্ণনায় সাধারণতঃ অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে সার্থক অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার-ব্যবহারের কথা কে না জানে। তিনি ছিলেন ছন্দকুশলী। তাঁহার সহিত মুহম্মদ খানের তুলনা দেওয়া ঠিক হইবে না ; কারণ দুইজনে দুই পৃথক সময় ও পৃথক কাব্য-ধারার কবি। তথাপি, মুহম্মদ খানের কবিপ্রতিভা ও অলঙ্কারপ্রয়োগ-নৈপুণ্যে মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। তিনি নরনারীর রূপবর্ণনায় জীব-জন্তু, পশুপাখী, বস্তু ও পদার্থকে উপমান, রূপক ও উৎপ্রেক্ষারূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কমলিনী, খঞ্জন-পাখী, তিলফুল, বিজলী, লতা, কদলী, গৃধিনী, শশী, কাজল, শ্রীকণ্ঠ, পদ্ম, ধনু, চামরী, বান্ধুলি, তাম্বুল, কুম্ভ, মদনের বাণ, মৃগ, মুক্তা, ভুজঙ্গিনী, কাটার, খগপতি, চম্পক, নলিনী, কস্তুরী, আগর, চুয়া, চন্দন প্রভৃতিকে কবি অলঙ্কারের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন্ কোন্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত কোন্ কোন্ বস্তুকে অলঙ্কার হিসাবে গ্রহণ করিলে তাহা শিল্পচাতুর্যের নিদর্শনরূপে পরিগণিত হইতে পারে, সেদিকে কবির দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। তৎকালে কাব্যে ব্যবহৃত অধিকাংশ অলঙ্কারের প্রয়োগ যেমন তাঁহার একটা বৈশিষ্ট্য, তেমনি এই ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার গণ্ডীও তিনি বহুস্থানে

ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন উপমা বেশ চমৎকার এবং স্বাভাবিক। যেমন—নারীরূপ বর্ণনায় তিনি শুধু একটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন,—'উজ্জ্বল করিছে ঘর শরীরের জ্যোতি'। অথচ এই একটি উপমাতে নারীর রূপ-সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার নিদর্শন।

তিনি যুদ্ধবর্ণনায় সাধারণতঃ সিংহ, ব্যাঘ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, পবন, গজ, কৃতান্ত, বজ্র প্রভৃতি উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। দুই এক স্থল ব্যতীত কবি সর্বত্র অলঙ্কার-প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঙ্গতি বজায় রাখিয়াছেন। যুদ্ধ-বর্ণনায় কবির উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষণীয়। কবি কাব্যের মধ্যে যেখানে বাংলা-দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, পশুপক্ষী, জীবজন্তু এবং আলো-বাতাসকে অলঙ্কারের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার স্বাভাবিকতা লক্ষ্যযোগ্য। কিন্তু, আরব-পারস্যের পরিমণ্ডল সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেগুলি সর্বত্র উপযোগী হয় নাই। বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের অন্তর্গত মধ্যযুগীয় কবিগণের রচনায় শুধু মধ্যযুগের কথাই বা বলি কেন, ইংরেজ আমলের কবিগণের রচনাতেও দেশীয় রীতিনীতি ও বস্তুপ্রধান অলঙ্কার প্রয়োগের পরিচয় আছে। বাঙালী কবি কারবালার অরুন্তুদ কাহিনীনির্ভর কাব্য রচনা করিতে গেলেও আজী-বনের সংস্কার ও দেশীয় শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তাধারা ও পরিবেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহা সম্ভবপরও ছিল না। তথাপি, একজন বাঙালী কবি হিসাবে মুহম্মদ খান কারবালা কাহিনীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া যেভাবে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়া-ছেন, তাহাতে পাঠক-পাঠিকার মন এক অনির্বচনীয় রসমাধুর্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। কারবালা-সংক্রান্ত কাব্যে বঙ্গদেশীয় পরিবেশের উপর নির্ভরশীল বহু অলঙ্কার ব্যবহৃত হওয়ায় বাঙালী পাঠকের মনে তাহার জাতীয়-জীবনের কথা নূতন করিয়া ছায়াপাত করিয়াছে; ফলে

তিনি তাঁহার অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে শিখিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে, মুহম্মদ খান উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহারের মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনার আভাস দেন নাই, তবে এগুলি সাহিত্যরসের ইঙ্গিত বহন করে। অলঙ্কার-শাস্ত্র এবং উহার আদর্শের প্রতি কবির শ্রদ্ধাবোধ ছিল গভীর।

শৈখ ফয়জুল্লাহ্‌র ক্ষুদ্র কাব্যখানির মধ্যে মাত্র কয়েকটি অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি অলঙ্কারবহুল ভাষায় জয়নবের বিলাপ বর্ণনা করায় তাহা সহজেই পাঠকের অন্তর স্পর্শ করিতে সমর্থ। কবি হায়াৎ মাহমূদ অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষা এবং বাচনভঙ্গি ছিল গতানুগতিক। যে-প্রতিভা থাকিলে কাব্য শিল্প-অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া জীবন-সত্য ও জীবন-রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে, হায়াৎ মাহমূদের তাহা ছিল না। কাব্যে অলঙ্কার ব্যবহার করিবার রুচি ও শিক্ষারও অভাব ছিল। এইজন্য অলঙ্কার-প্রয়োগে কবির দৈন্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এই কারণে তাঁহার কাব্য নীরস ও মাধুর্যহীন। সমগ্র 'জারীজঙ্গনামা' কাব্যে অল্প কয়েকটি অলঙ্কার প্রয়োগের পরিচয় আছে। হায়াতের উপমাগুলিও গতানুগতিক, লালিত্যহীন ও স্থূল। তাহাছাড়া, কোন বৈশিষ্ট্যও নাই। তাঁহার রচনায় জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আভিজাত্যের ছাপ নাই। এদিক দিয়া তাঁহার সমসাময়িক-কালের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের সঙ্গে তাঁহার কোন তুলনাই চলে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হওয়া সত্ত্বেও হায়াৎ মাহমূদের কাব্য বৈশিষ্ট্যহীন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে জীবন-সৃষ্টি ও কলাসৃষ্টির প্রতি যে-সার্থক প্রয়াস আছে, হায়াতের "জারীজঙ্গনামা" কাব্যে তাহার অভাব লক্ষণীয়। তথাপি, সত্যের অনুরোধে অস্বীকার করা যায় না যে, হায়াতের এ-কাব্য

এক সময়ে উত্তরবঙ্গের রসপিপাসু পাঠকের রসপিপাসার নিবৃত্তি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কবি জাফরের ক্ষুদ্র কাব্যে কয়েকটি উপমা ও উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত, অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নাই। অলঙ্কার-ব্যবহারে তাঁহার অবলম্বিত রীতি-পদ্ধতি এ-দেশীয়।

ফলতঃ, মুঘল আমলের বাংলা মর্সীয়া কাব্যধারার কবিগণের রচনা ও রীতি-পদ্ধতি তাঁহাদের উত্তর সাধকগণের কাব্যসাধনার পথ অনেকখানি সুগম করিয়া দিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালের বহু কবি এ-ধারার কাব্য রচনায় তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট ঋণী।

২। ইংরেজ আমলের কাব্যগুলির সাহিত্যিক আলোচনা

ক. মুঘল আমলের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাধুভাষায় রচিত মর্সীয়া সাহিত্য।

১। চরিত্র-চিত্রণ
২। বর্ণনা-কৌশল ও ভাষার গুণাগুণ

চরিত্র-চিত্রণ

ইংরেজ আমলে, মুঘল আমলের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাধু ভাষার অনুবর্তনে রচিত মুহম্মদ হামীদুল্লাহ খানের 'গুলজার-ই-শাহাদৎ' বা 'শাহাদৎ নামা' কাব্য উল্লেখযোগ্য। এ-কাব্যের মধ্যেও অলৌকিক আখ্যানভাগ ও অবাস্তব কাহিনীর অবতারণা আছে।

মুঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী সাধু ভাষায় কাব্যখানি রচিত হইলেও মুহম্মদ খান প্রমুখ কবির ন্যায় হামীদুল্লাহ খান চরিত্র-সৃষ্টি ও প্রকাশ-ভঙ্গির ক্ষেত্রে উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন নাই। কবি এ-কাব্যে কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই এবং তাহা অন্যান্য চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই ; কেন্দ্রীয় চরিত্র না থাকায় কাব্যখানি জমিয়া উঠে নাই। চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাব্যের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, তাহা 'ইমাম হোসেনের শাহাদতের কথা' শীর্ষক পরিচ্ছেদ হইতে কাব্যসমাপ্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 'গুলজার-ই-শাহাদৎ' কাব্যে হোসেন, এজিদ, হোর, ওবেদুল্লাহ জেয়াদ, (উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ) মাবিয়া, হানি ও এক বৃদ্ধা নারীর (তাহার নাম উল্লেখ নাই) চরিত্রে সামান্য বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। এ-কাব্যে অধিকাংশ নরনারীর জন্ম-কাহিনী এবং বংশ-পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে কবির স্বাভাবিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি চরিত্র-সৃষ্টির দিকে মোটেই মনোযোগ দেন নাই। পূর্বোল্লিখিত নরনারীর চরিত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নাই এবং কেহই রক্ত-মাংসের মানুষ হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই।

ঐতিহাসিক হোসেন বীর, সত্যসন্ধ এবং ধর্ম্মভীরু ; তিনি কুফাবাসীর আমন্ত্রণে অকুণ্ঠভাবে সাড়া দিয়াছিলেন বলিয়াই সবান্ধব আত্মদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; অথচ এই আত্মত্যাগের চিত্র কাব্যে নাই। ফলতঃ হামীদুল্লাহ খানের কাব্য-বর্ণিত হোসেন-চরিত্রে বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। তিনি কাব্যে হোসেনের যে-পরিচয় দিয়াছেন, হোসেনের কথাতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। হোসেন বলেন ঃ

"নির্বন্ধতে যাহা প্রভু লিখিল।
তাহার খণ্ডন কভু না ছিল॥"

তখন মনে হয়, হোসেন ভবিষ্যতের চিত্র দিব্যচক্ষে স্পষ্টরূপে দেখিতে

পাইয়াছিলেন, এ-কারণে প্রভুর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবার জন্যই তিনি কুফা যাত্রা করিয়াছিলেন। মাবিয়া চতুর ও দূরদর্শী ; তাঁহার অবর্তমানে সিংহাসন লইয়া বিবাদ বাধিবে, তাহা তিনি পূর্বাহ্নে বুঝিতে পারিয়া পুত্র এজিদের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার জন্য হোসেন প্রমুখ মদীনার তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বাধ্য করিবার চেষ্টা করেন। তিনি মদীনার গভর্ণরকে লিখিয়া জানাইলেন যে, বশ্যতা স্বীকার না করিলে 'সেই তিনজনের গর্দান মারিবাম'। ইহা তাঁহার ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তির অর্থাৎ বাদশাহ্‌র পক্ষে স্বার্থপরতা ও হীনতার পরিচায়ক। তিনি হাসানের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজের মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই দিক হইতে তাঁহার সহিত মহাভারত-বর্ণিত হস্তিনাপুরের রাজা কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রের মিল আছে। ধৃতরাষ্ট্র যেমন পঞ্চপাণ্ডবকে বঞ্চিত করিয়া দুর্যোধনকে রাজ্যদানের ষড়যন্ত্র করেন, তদ্রূপ বাদশাহ্‌ মাবিয়াও হাসান-হোসেনকে বঞ্চিত করিয়া পুত্র এজিদকে রাজ্য দিবার অভিলাষে কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাবিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সমগোত্রীয়। এখানে উভয়েই ধূর্ত ও নীতিভ্রষ্ট। স্বার্থপরতা নীতির উপরে জয়ী হইয়াছে। ওবেদুল্লাহ্‌ জেয়াদ কবির তুলিকায় নিষ্ঠুর ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষরূপে চিত্রিত। কবির ভাষায় ওবেদুল্লাহ্‌ জেয়াদ ঃ

অজানিত পুত্র জেয়াদের পুত্র শঠ।
ইব্লিস থাকিত তার মনের নিকট ॥
হৃদয়ে পাষাণ বহু জানিত সে ছল।
তার গুরু ইব্লিসে তাহাতে দিল বল ॥

কিন্তু, তাহার এ-নিষ্ঠুরতা পাঠকের মনে একটুও ঘৃণার উদ্রেক করে না। হামীদুল্লাহ্‌ খানের কাব্যে দুইজন পুরুষ এক একটি বিশেষ

গুণের ভার বাহক হিসাবে চিত্রিত। হানি দয়ালু এবং মনুষ্যত্ববোধ-সম্পন্ন। তাঁহার নিকট ইহকালের সুখের মূল্য নাই; পরকালের মুক্তিই কাম্য। এই জন্য রসূল-বংশধর মুসলিম বিপদে পড়িলে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি অকাতরে জীবন বলি দিলেন। রসূলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই হানিকে আত্মবিসর্জনে অনুপ্রেরণা দিয়াছে। এজিদ-পুত্র (সেনাপতি নহে) হোর আজন্ম পিতার নিকট লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াও রসূল-বংশধর হোসেনের মহাবিপদের সময় পিতার পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক হোসেনের দলে যোগদান করিয়া নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। হোর, পুত্র ও ভ্রাতাসহ দল ত্যাগ করিলেন, পিতাকে ত্যাগ করিলেন। তাহার পরিবর্তে তিনি কি পাইলেন? হোর জীবন-বিসর্জনের ভিতর দিয়া দেখাইলেন যে পার্থিব ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও সিংহাসন অপেক্ষা ত্যাগের মূল্য বেশী।

এই কাব্যে নারী চরিত্র-সৃষ্টিতেও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে নাই। জায়েদার মনে ধনসম্পত্তির লিপ্সা অত্যন্ত প্রবল। ধনের লিপ্সা তাঁহাকে এমনই উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি এজিদের প্ররোচনায় হাসানের প্রীতি-প্রণয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন ও তীব্র হলাহল প্রদান করিয়া স্বামিহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কবি জায়েদাকে পাপিষ্ঠারূপে চিত্রিত করিয়াছেন, 'সে পাপিনী এই পাপ যে করিল'। কিন্তু পাপের চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। জায়েদার মনের পরিবর্তন কিভাবে এবং প্রত্যক্ষত কাহার প্ররোচনায় সম্ভবপর হইল, তাহার কোন পরিচয় এ-কাব্যে নাই। কুফায় বিপদগ্রস্ত মুসলিমকে এক নারী (কাব্যে তাহার নামোল্লেখ নাই) সাহায্য করিয়াছিলেন; অথচ যে-পরিবেশে সেই নারীর অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। এ-চরিত্র সৃষ্টিতে কবির নৈপুণ্যের পরিচয় নাই। এতদ্ব্যতীত, এ-কাব্যে আরও যে-কয়েকটি চরিত্র

চিত্রিত হইয়াছে, সে গুলিও টাইপ চরিত্র। সেম্র, খোলি, নোওমান বিন বশীর, কাজী সরিহ্, জারিয়া, আবু দর্দ, হর্রা প্রভৃতি চরিত্র বৈশিষ্ট্যহীন।

—

বর্ণনা কৌশল ও ভাষার গুণাগুণ

মুঘল আমলের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষার অনুসরণে 'শাহাদৎনামা' রচিত হইলেও ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য নহে। হামীতুল্লাহ্র এ-রচনায় অপরিণত হস্তের নিদর্শন বর্তমান ; কবির কাব্য-বর্ণনা কোথাও উচ্চগ্রামে পৌছিতে পারে নাই। কবি-কল্পনা খুব গভীর বা ব্যাপক নহে ; শিল্প ও ভাষা-সৌষ্ঠবের পরিচয় দুই একটি স্থান ব্যতীত আর কোথাও নাই। কবি কোথাও ভুলিয়াও নারীর রূপ ও শোকবর্ণনা করেন নাই। ইমাম হোসেন কারবালার বিস্তীর্ণ রণ-প্রান্তরে যে-ভয়াবহ পরিবেশে সবান্ধব আত্মপ্রাণ বলি দিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে কোন বর্ণনাই কাব্যে নাই। কবি ইমাম হোসেনের একটি যুদ্ধ-বর্ণনা দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং মামুলি। যথা ঃ

তবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন্ত স্বয়ং।
দেখাইল রণে নিজ সাহসের রঙ্গ ॥
হস্তে খড়্গ লই মল্লে সিংহের গর্জনে।
কুকুরের ঝাঁকে যাই পড়িল তখনে ॥
সহস্র সহস্র কুকুরের ঝাঁক ছিল।
সিংহ ন্যায় ফাল দিয়া তাহাতে পড়িল ॥
একা এত মল্ল সঙ্গে লড়য়ে যে বীর।
সিংহ কথা পারয়ে থাকিতে মনস্থির ॥

হাজার হাজার মধ্যে এক বীর লড়ে।
এই মত প্রাণ রাখে সিংহে কথা ধরে॥
দশ নহে শত নহে হাজার হাজার।
এক সিংহে কি করিব তাহার মাঝার॥

বর্ণনা কবিত্বহীন, তবে ভাষা স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল। হামীদুল্লাহ্ খানের ভাষার স্বপক্ষে একটি কথা বলা যায় যে, তাঁহার ভাষা পূর্ববঙ্গের লোকপ্রচলিত ভাষা। কবি নিজে আরবী-ফারসী-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এতৎসত্ত্বেও, তিনি এই কাব্যখানি অনাবশ্যক বিদেশী শব্দ দ্বারা ভারাক্রান্ত করেন নাই, ভাষার ক্ষেত্রে কবির এখানেই কৃতিত্ব।

কবি অনেক স্থলে এক বিষয়ের বর্ণনা দিতে দিতে বিষয়ান্তরে গমন করিয়াছেন। ফলে, মূল বক্তব্য শ্লথ ও সঙ্গতিহীন হইয়াছে। যেমনঃ 'ইমাম হাসানের শাহাদত' বর্ণনায় কবি জায়েদার বিশ্বাসঘাতকতা প্রসঙ্গে 'নারীগণের প্রবঞ্চনা ও তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারের নিয়ম পদ্ধতির' বিবরণ টানিয়া আনিয়াছেন। এ-প্রকার বর্ণনা কাব্যের উৎকর্ষের পক্ষে উপযোগী হয় নাই। তাহা না হইলেও নারী-প্রকৃতির গোপন রহস্য উদ্ঘাটনে কবির প্রয়াস একান্তই মৌলিক। এ-সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্ত্রীয়ার প্রেমের পরে না ভুল কখন।
বক্ষে থাকি বক্ষ ছেদে পাই অন্য জন॥
জ্ঞানী লোকে নারীকে বিশ্বাস নাহি করে।
যার উরু নীচে যায় তার কথা ধরে॥
নরমেতে মাথে চড়ে বানরের ন্যায়।
দড় দেখি কুকুরের ন্যায় দূরে ধায়॥
কিছু কার্য না অর্পিলে এই নারী হাতে।
মন বাওরা হইব ধড়্ তোমা সাথে॥

নারী পরে বুঝি দিবা কিছু কার্যভার।
এই মতে নারী সঙ্গে কর ব্যবহার ॥
নারী নষ্ট হয় জান বাহির হইলে।
অনেক পুরুষ নানা দ্রব্যাদি দেখিলে ॥
যাহা দেখে তাহা চাহে মনে সে স্ত্রীয়ার।
বিশেষত সাজি গেলে যথায়ে ব্যাপার ॥
নব যুবা পুরুষ দেখিলে সে বুজ (?) পারে
মিলি মনোবাঞ্ছা সাধে ভিড়ের মাঝারে।

হামীদুল্লাহ্ খানের কাব্য-বর্ণনায় একটি বড় ত্রুটি লক্ষণীয়। কারবালা-যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় কাহিনী বর্ণনায় তিনি কারবালা যুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক অনাবশ্যক বিবরণ বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া প্রদান করিয়া পাঠকের ধৈর্য পরীক্ষা করিয়াছেন। মাবিয়ার কথা ও তাঁহার আচার-আচরণ, জেয়াদের কথা ও তাঁহার অবস্থা, মাবিয়ার রাজত্বের পূর্ব সম্ভাবিত প্রস্তাব, এজিদকে যুবরাজ করার কথা, মাবিয়ার বিশেষ কথা, মাবিয়ার বিশেষ বিশেষ কার্য ইত্যাদি পূর্ববর্তী ঘটনা এবং মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালেকের কথা, মোখতারের সন্ধি ইত্যাদি কারবালা-পরবর্তী প্রসঙ্গের অবতারণা থাকায় পাঠকের উৎসাহ স্তিমিত হয়। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার পূর্বসূরী মুহম্মদ খান প্রমুখ কবির অনুসৃত কৌশল অবলম্বন করেন নাই। মুহম্মদ খান, হায়াৎ মাহ্মূদ প্রমুখ মুঘল আমলের কবির কাব্য-কাহিনীর পূর্ব-বিবরণ কাব্যমধ্যে আভাসে-ইঙ্গিতে দুই একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের সাহায্যে বর্ণনা করিয়া পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। ফলে, তাঁহাদের কাব্যের আখ্যানভাগে যে-নৈপুণ্য ও সামঞ্জস্য বর্তমান, তাহা 'গুলজার-ই-শাহাদৎ' কাব্যে নাই। কাব্য-কাহিনীর বিচ্ছিন্নতা ইহাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকটিত। তাহা ছাড়া, কবির অঙ্কিত নরনারীর কথোপকথনের মারফত উপাখ্যান বর্ণনার প্রয়াস

নাই। কাব্যের অধিকাংশ স্থল উত্তম পুরুষে বর্ণিত। এ-কারণে, ইহাতে নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি হয় নাই।

কারবালায় হোসেনের শাহাদতের পর কবি-রচিত 'মর্সীয়া অর্থাৎ মনঃশোক আলাপন' শীর্ষক অংশটির বর্ণনাই সমগ্র কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা কবির রচনা বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। এই স্থলে কবি একটি মাত্র অলঙ্কার প্রয়োগে ইমাম হোসেনের মৃত্যুর করুণ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ঃ

সেই জলে জন্মিলেক এই পদ্ম শতদল।
শত্রুর দৌরাত্ম্য-ঘাতে সেই পদ্ম ঝরি যায়॥

কোন কোন স্থলে কবির ভাষা ও রচনা-সৌষ্ঠবের সামান্য পরিচয় আছে। দুইটি উদাহরণ দিলাম ঃ

ক। রোগ শোক দুঃখ চিন্তায় আমি আছি গোল।
তাতে মন-সমুদ্রেতে উঠয়ে কল্লোল॥

খ। পুষ্পগন্ধ বাহিরিয়া পুষ্পেতে না যায়।
সিন্ধু হতে মুক্তা পুনি সিন্ধুকে না পায়॥

মুঘল আমলের বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কবিগণের ন্যায় হামীদুল্লাহ খান কতকগুলি প্রবাদবাক্য ব্যবহার করিয়া চিরন্তন সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। তবে, এই প্রবাদ-বাক্যগুলিতে উচ্চ কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর নাই। দুই একটি প্রবাদবাক্যের উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

ক। নারী নষ্ট যে সদায় যায় ঘাটে বাটে।
ছেলে নষ্ট হাটে আর বধূ নষ্ট ঘাটে॥

খ। অতি ঘুণে ধরিলে সে বৃক্ষ হয় ক্ষয়।
অতি মেঘ বরিষণে পাহাড় ঢলয় ॥

গ। স্ত্রীয়ার প্রেমের পরে না ভুল কখন।
বক্ষে থাকি বক্ষ ছেদে পাই অনুজন ॥

ফলতঃ, ইংরেজ আমলে রচিত হামীদুল্লাহ্ খানের এই কাব্যখানি মুঘল আমলের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যধারার স্তিমিত নিদর্শন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে।

খ. মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া সাহিত্য।

১। ভাষা
২। চরিত্র-চিত্রণ
৩। বর্ণনা-কৌশল
৪। অলঙ্কার-ব্যবহার

ভাষা

মুঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজ আমলের মুসলমানী বাংলা ভাষার অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য বর্তমান। পদপ্রকরণ এবং শব্দগঠনের দিক দিয়া উভয় আমলের ভাষার মধ্যে তফাৎ নাই। এমনকি ধ্বনি-বিন্যাসের দিক দিয়াও ইহারা প্রায় এক। তফাৎ শুধু শব্দসম্ভারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ উরদূ (ফারসী) ও

হিন্দী শব্দ ব্যবহারে এই পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। মুঘল আমলের ভাষায় উরদূ ও হিন্দী শব্দের প্রয়োগ নাই ; অথচ মুসলমানী বাংলা ভাষায় উরদূ-হিন্দী শব্দের বেপরোয়া ব্যবহার থাকায় ইহাকে পূর্ববর্তী আমলের কাব্যের ভাষা হইতে পৃথক করিয়াছে। যাহা হউক, উরদূ-হিন্দী সংমিশ্রিত এই মুসলমানী বাংলাভাষা পশ্চিম বঙ্গের সৃষ্টি, পক্ষান্তরে মুঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষা পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানগণের সাহিত্য রচনার ভাষা। বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা হইতে (পৃষ্ঠা ১৮৫-২১১ দ্রষ্টব্য) আমরা দেখিয়াছি যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই সাধু বাংলা ভাষায় মর্সীয়া কাব্য রচিত হয়। দৌলত উজীর বাহরাম খান, মুহম্মদ খান প্রমুখ পূর্ববঙ্গের মুসলমান কবি এই সময়ে বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে সাধু বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই ভাষায় মর্সীয়া প্রভৃতি কাব্যাদি রচনা করিয়া জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কবিগণের সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশের ফলে ঐ আমলে সাধু বাংলা ভাষায় এক বিরাট সাহিত্য-ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে। মুহম্মদ খান প্রমুখ পূর্ববঙ্গের মুসলমান কবি সাধু বাংলাভাষা অবলম্বনে যখন মর্সীয়া সাহিত্য সহ বাংলা সাহিত্যের পূর্ণ সমৃদ্ধি দান করিয়াছিলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের সাহিত্য রচনার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। সে যুগের হিন্দু কবিদের রচিত পুরাণ-পাঁচালী পড়িয়াই ঐ অঞ্চলের মুসলমান পাঠক-সাধারণ কাব্যপিপাসা মিটাইতেন।

ষোল ও সতের শতকের মুঘল শাসকেরা হোসেনশাহী সুলতানদের ন্যায় মনেপ্রাণে বাঙালী বনিয়া যান নাই। তাঁহারা বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন বলিয়া তেমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, এদেশের উচ্চশ্রেণীর বাঙালী মুসলমানরাও বাংলা ভাষাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না। মুঘল

আমল হইতে সুবাদারের শাসন সুদৃঢ় হয়, রাজধানী দিল্লী-আগ্রার সহিত সুবে-বাংলার সম্বন্ধ পূর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হয়। রাজার জাতি, ভাষা ও আইন-কানুনের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। এতৎভিন্ন, উরদূ বহুদিন যাবৎ দিল্লীর অধিবাসীদের কথ্যভাষারূপে নির্দিষ্ট থাকায় সুবাদারের সহিত যাঁহারা দিল্লী হইতে রাজকার্যোপলক্ষে নিযুক্ত হইয়া বাংলা দেশে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও হুগলী অঞ্চলে আগমন করিতেন, তাঁহাদের মনে উরদূ-হিন্দী সংস্কৃতির ছাপ পুরামাত্রায় থাকিয়া যাইত। অতঃপর, বাংলাদেশে বসবাস করিবার সময় তাঁহাদের উরদূ-হিন্দী কথ্যভাষার সহিত বাংলা ভাষার যোগাযোগ ঘটে। নবাব মুর্শিদকুলি খান (১৭২৩-২৭) মুর্শিদাবাদে একটি শীয়া রাজবংশের পত্তন করেন। ইহাতে উরদূ (ফারসী) হিন্দী ভাষাভাষী বহু শীয়া মুসলমান উত্তর ভারত হইতে মুর্শিদাবাদ, হুগলী এবং আরও দুই একটি অঞ্চলে আসিয়া জমা হইতে ও বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের সকলের কথ্য বা মুখের ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানদের বাংলা ভাষার স্বাভাবিক গতি ও শ্রী নষ্ট হইয়া গেল এবং তৎস্থলে আধা উরদূ-হিন্দী ও আধা বাংলা শব্দ মিশ্রিত যে-ভাষার সৃষ্টি হইল তাহাই 'মুসলমানী বাংলা'। এই মুসলমানী বাংলা ভাষায় উরদূ-হিন্দী শব্দসম্ভারের বেপরোয়া ব্যবহার থাকায় ইহা মুঘল আমলের সাধু বাংলা হইতে পৃথক। মুসলমানী বাংলার মৌলিক পার্থক্য ইহাই।

পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানদের উরদূ-প্রীতির ফলে সেখানকার বাংলা ভাষায় উরদূ (এবং হিন্দী) ভাষার মিশ্রণ সপ্তদশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল।[১] ফকীর গরীবুল্লাহ্ এই নবসৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানী

---

১ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য। ১৯৩৫, পৃঃ ৮৬।

বাংলায় কারবালা সম্বন্ধীয় 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর কাব্য রচনার অগ্রদূত। তাঁহার পূর্বে এই ভাষায় অপর কোন মুসলিম কবি কাব্য রচনা করিলেও করিতে পারেন, তবে আজ পর্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। যাহা হউক, ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র উত্তর সাধকগণ তাঁহার অনুসরণে কয়েকখানি মর্সীয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া কাব্যগুলি এই ধারার বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাইতে পারে নাই। বরং এগুলি ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র অক্ষম অনুকরণে পর্যবসিত হইয়াছে। মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া কাব্যগুলির মধ্যে ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য; তবে মুঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলায় রচিত কাব্যাদির সহিত গরীবুল্লাহ্‌র রচিত কাব্যের তুলনা চলে না।

মুসলমানী বাংলা ভাষায় বহু মর্সীয়া কাব্য বিরচিত হওয়ায় স্বভাবতঃ মনে হইতে পারে যে, এইগুলি এই ধারার সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে বা সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, তাহা নহে। মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া কাব্য ভাব, ভাষা, বক্তব্য-প্রকাশ, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে মুঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলায় রচিত মর্সীয়া কাব্যের নিকট দাঁড়াইতে পারে না, তাহার প্রমাণ আমরা মর্সীয়া সাহিত্যের পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের দুই খ্যাতনামা মুসলমান কবির (মুহম্মদ খান ও ফকীর গরীবুল্লাহ্‌) রচিত কাব্যের ভাষায় স্পষ্ট দেখিতে পাই। উভয় কবির কাব্য হইতে, বীবী জয়নবের নিকট এজিদের বিবাহ-প্রস্তাব লইয়া ঘটকের উপস্থিতি সম্পর্কিত কয়েকটি পংক্তি তুলনা করিয়া দেখার জন্য এ-স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

মুহম্মদ খান	ফকীর গরীবুল্লাহ্
এত শুনি চলি গেল জয়নবের ঘরে।	এয়ছা কহে চলে গেল জয়নবের ডেরে।
দ্বারী জানাইল গিয়া দরবান গোচরে ॥	বুড়া বুঝে ডাকে বিবি আপনা হুজুরে ॥
অন্তঃপুর মধ্যে ডাকি আনিল কুমারী।	আনছারী যাইয়া রূপ জয়নবের দেখে।
বসিতে আসন দিল বৃদ্ধ মনে করি ॥	দেওয়ানা হইল বুড়া ঘন ঘন তাকে ॥
দেখি আব্ হোরেরা যে কন্যা রূপবতী।	কহিল আইনু আমি উকিল বাদশার।
স্তব্ধ হই স্বপন হেন দেখে মহামতি ॥	তোমার উপরে বড় খাহেস আমার ॥
শ্রীখণ্ড কপালে দেখে চন্দ্রে পাইল লাজ।	আমাকে কবুল যদি কর বিবিজান।
কলঙ্ক হইবে যদি দেখে দ্বিজরাজ ॥	রাখিব তোমারে আমি বহুত আসান ॥
মুখ দেখি পদ্মরাজে জলের মাঝারে।	জয়নব বলিল তুমি শুন মেহেরবান।
মধ্যে মধ্যে তিল বিন্দু পদ্ম ভৃঙ্গ করে ॥	মেছেল নাহিক হয় জইফ জওয়ান ॥
ভুরুযুগ ধনু মধ্যে নাই দেখে সীমা।	উম্মর হইল তেরা বাপ বরাবর।
মাঝে তিল বিন্দু দিয়া রাখিল মহিমা ॥	সরম নাহিক তুঝে কহিতে খবর ॥
খঞ্জন দেখিয়া আঁখি বনে দিল লুক।	শুনিয়া আনছারী এয়ছা সরম পাইয়া।
মধু বাণী শুনিলে তবে অধিক লাগে সুখ।	এজিদার বাত কহে বিবির লাগিয়া ॥
কেশ দেখি চামরী রহিল বন মাঝে।	শুন বিবি জয়নব এজিদ জোরওয়ার।
তিল কুসুমিনী ঝরে নাসিকার সাজে ॥	এজিদ এয়ছা কেবা হবে নামদার ॥

কবিদ্বয়ের উপরোক্ত পংক্তিগুলির ভাষার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, গরীবুল্লাহ্‌র ভাষা ফারসী-উরদু-হিন্দী মিশ্রিত এক সঙ্কর ভাষা ; পক্ষান্তরে মুহম্মদ খানের ভাষা ঐতিহ্যবাহী বিশুদ্ধ সাধু বাংলা। মুসলমানী বাংলা ভাষার ভাষাগত পরিবর্তন কাব্য-শিল্পের পক্ষে সহায়ক না হইয়া অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত

কবিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং কাব্য-সৌন্দর্যে মুহম্মদ খানের সহিত গরীবুল্লাহ্‌র কোন তুলনাই চলে না। উপর্যুদ্ধৃত ষোলটি পংক্তির মধ্যে মুহম্মদ খান দুই একটির বেশী বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার বক্তব্য সাবলীল ও প্রাঞ্জল। ইহার ফলে তাঁহার কাব্যের ভাব সহজেই বোধগম্য ও পাঠকের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ। পক্ষান্তরে, গরীবুল্লাহ্‌ মাত্র ষোলটি পংক্তির মধ্যে কমপক্ষে ঊনত্রিশটি ফারসী-উরদু-হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ভাষা শ্রী ও শক্তি হারাইয়া শ্লথ ও গতিহীন হইয়াছে। অনাবশ্যক ফারসী-উরদু শব্দ দ্বারা ভারাক্রান্ত হওয়ায় গরীবুল্লাহ্‌র রচিত কাব্যের দৈন্যই প্রমাণিত হইয়াছে। ভাবের ক্ষেত্রেও গরীবুল্লাহ্‌র রচনায় দৈন্য অধিক প্রকটিত। মুহম্মদ খানের রচনায় কল্পনার যে-ঐশ্বর্য, গভীরতা ও বলিষ্ঠতার ছাপ আছে, গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যে তাহা নাই। গরীবুল্লাহ্‌র উপরোক্ত পংক্তিগুলির মধ্যে বিদেশী শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্য থাকায় ইহার কাব্যগতভাব শক্তি ও লালিত্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। এতৎভিন্ন, মুহম্মদ খানের রচনায় যে-শালীনতা ও মার্জিত-রুচির পরিচয় বর্তমান, গরীবুল্লাহ্‌য় তাহার সম্পূর্ণ অভাব। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার রচনায় কুরুচির (vulgar) ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি সুন্দরী যুবতী জয়নবের নিকট বৃদ্ধ ঘটক আনসারীর প্রণয়-নিবেদন ও উন্মত্ততার চিত্র অঙ্কন করায় ইহা রুচিহীন হইয়াছে। গরীবুল্লাহ্‌র রচনায় এই রুচিহীনতা বর্তমান থাকায় ইহা কাব্যের অপকর্ষ সূচিত করিতেছে।[২] বস্তুতঃ মুঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষায়

---

২ গরীবুল্লাহ্‌র প্রবর্তিত 'মুসলমানী বাংলা' ভাষার প্রতি তৎকালে যে, লোকের তেমন শ্রদ্ধা ছিল না তাঁহার প্রমাণ আবদুর রহিম নামক এক কবিরচিত 'প্রেমলীলা' কাব্যে (প্রথম প্রকাশ ১২৬৮, কলিকাতা, ৯ নং ভবন গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত) পাওয়া যাইতেছে। আবদুর রহিম

রচিত মর্সীয়া কাব্যগুলির তুলনায় গরীবুল্লাহ্ প্রমুখ কবির মুসলমানী বাংলায় রচিত কাব্যগুলি নিকৃষ্ট।

সুতরাং ভাব, ভাষা, শালীনতা, চরিত্র-চিত্রণ—সকল বিষয়েই মুঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী সাধু ভাষার কাব্যগুলি হইতে ইংরেজ আমলের মুসলমানী বাংলায় রচিত কাব্যগুলির মৌলিক পার্থক্য বর্তমান।

চরিত্র-চিত্রণ

মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ফকীর গরীবুল্লাহ্ 'জঙ্গনামা' কাব্যে নরনারীর চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে কমবেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এ-কাব্যেও প্রধান চরিত্রগুলি

সাধু বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং উরদূ-হিন্দী মিশ্রিত বাংলা ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিয়া ইহাকে 'হেয় বাঙ্গালা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যথা :

বাখানি তাহার তরে উত্তম পুস্তক করে
লেখে শুদ্ধ বাংলা ভাষায়॥
এইরূপে গ্রন্থকার আছে কত শত আর
ভাল বটে সবার পুস্তক।
উত্তম পণ্ডিত তারা কবিতা গগন তারা
দেহ মধ্যে যেমন মস্তক॥
হেয় ভাষা বাঙ্গালার আছে কত গ্রন্থকার
তাদিগেও গুণি বলে মানি।
যেমন এরাদতুল্লা আর নাম গরীবুল্লা
গ্রন্থরূপে সবারে বাখানি॥

॥ প্রেমলীলা ॥

ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত ; অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে অনেক চরিত্রই ইতিহাস-বহির্ভূত। কবি-কল্পনা এবং অন্যান্য উৎস হইতে এগুলির সৃষ্টি। মুঘল আমলের মর্সীয়া সাহিত্যের কবিদের ন্যায় তাঁহার রচিত কাব্যেও চরিত্র-সৃষ্টি ও প্রকাশ-ভঙ্গি অলৌকিকত্বের পরিচায়ক। গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যে অলৌকিক কাহিনী আগাগোড়াই রহিয়াছে। সাধারণ মানুষের জীবনের অন্তরালেও তিনি বিরাট অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি-সঙ্কেত দেখাইয়াছেন। গরীবুল্লাহ্‌ হোসেনকে কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে অঙ্কন করিয়াছেন ; অথচ এই চরিত্রে অসাধারণত্বের ছাপ বর্তমান। হোসেন ব্যতীত অন্যান্য প্রধান ও অপ্রধান চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রেও কবি অসামান্যতা দান করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে দুর্বলতারও অভাব নাই। বিপদে-আপদে তিনি যেমন সাধারণ মানুষের ন্যায় শোকাকুল হইয়া অশ্রুপাত করেন, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রেও অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনিই গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যের নায়ক। কিন্তু, এই নায়ক-চরিত্র চিত্রণে কবি অলৌকিক ও অবাস্তব বিষয়-বস্তুর অবতারণা করায় চরিত্রের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। হোসেন সত্যের জন্যই যুদ্ধ করিয়াছেন ; তিনি মহাবিপদে পতিত হইয়াও অধর্মের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই। ইহা তাঁহার ন্যায় শক্তিমান পুরুষের উপযুক্ত বটে। এখানে কোন অস্বাভাবিকতা নাই। এস্থলে হোসেন শক্তিমান এবং শৌর্য-বীর্যে মহিমময়। কিন্তু, যখনই হোসেন তরবারীর এক এক আঘাতে শত্রু-পক্ষের হাজার হাজার সৈন্যকে যমালয়ে পাঠাতেছেন ('হাজার হাজার শির কাটে একদমে') তখন বুঝা যায়, এ-চরিত্রে অসাধারণত্বের ছাপ যথেষ্টই আছে। এস্থলে চরিত্রের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এ-চরিত্রের ত্রুটি ইহাই।

অন্যান্য প্রধান চরিত্রের মধ্যে মাবিয়ার চরিত্র মন্দ ফুটে নাই। তিনি পুত্র এজিদের ভোগ ও তৃপ্তির জন্য কপটতা ও শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। তিনি নিরপরাধ আবদুল জব্বারের সর্বনাশ করিয়াছেন। ছলে-বলে-কৌশলে জব্বারের সহিত তদীয় সুন্দরী-পত্নী জয়নবের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইতে না পারিলে এজিদের জয়নব-রত্ন লাভের কোন সম্ভাবনা নাই মাবিয়ার এই সঙ্কল্প জব্বারের সোনার সংসার ছারেখারে দিয়াছে। মাবিয়া দামেস্কের বাদশাহ্ হওয়া সত্ত্বেও পুত্রের জন্য নীচতা ও কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ-হেন মাবিয়ার চরিত্রে গরীবুল্লাহ্ মনুষ্যত্ববোধেরও পরিচয় দিয়াছেন। এজিদ জয়নব লাভে ব্যর্থমনোরথ হইয়া হাসান-হোসেনের উচ্ছেদ সাধনের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলে মাবিয়া বলিলেন, 'এমামের তরে তুমি এয়ছা বাত কহ, তওবা করিয়া তুমি কানে হাত দেহ'। এ-ক্ষেত্রে মাবিয়ার অন্তরের মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় দিয়া গরীবুল্লাহ্ তাঁহাকে সাধারণ মানুষরূপে চিত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজিদ-চরিত্রে উদ্দাম প্রণয়-লিপ্সা, ধর্মবোধের প্রতি ঔদাসীন্য এবং কঠোর প্রতিহিংসা বর্তমান। ধর্মবোধ ত দূরের কথা, সাধারণ মনুষ্যত্ববোধও তাঁহার চরিত্রে দেখা যায় না। কাব্যের প্রথমে কবি তাঁহাকে জয়নবের রূপ লালসায় উন্মাদ ও কামুকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, 'আশেকে আমার জিউ হইল কাবাব'। জয়নবকে লাভ করিবার যে-অদম্য লিপ্সা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে, জয়নবকে হারাইয়া সেই লিপ্সাই ইমাম হাসান-হোসেনকে হননের প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এজিদের ধারণা, তাঁহারাই তাঁহার জয়নব-রত্ন লাভের অন্তরায়। সুতরাং যেমন করিয়াই হউক ভ্রাতৃদ্বয়ের উচ্ছেদ-সাধন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এজিদ সব সময় অন্তরালে অবস্থান পূর্বক হীন যড়যন্ত্রের জাল বিস্তার

করিয়া তাঁহাদের হত্যাসাধন করিয়াছেন এবং নবী-বংশ ধ্বংস করিয়াছেন। তাহাতেও এজিদের মনের ঝাল মিটে নাই; তিনি হোসেনের ছিন্ন শির হোসেনের অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা-কন্যা ফাতেমাকে খোরমা প্রদানের অছিলায় প্রদান করিয়া চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন। গরীবুল্লাহ্‌র এই চরিত্র-চিত্রণে পাঠকের মন শুধু ঘৃণা-মিশ্রিত বিষাদে পূর্ণ হয়।

গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা'-য় নারীচরিত্র পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা বেশী ফুটিয়াছে। নারী-হৃদয়ের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যই ইহার মূল কারণ। জয়নব সতী-সাধবী এবং পতিপ্রেমে প্রেমময়ী। তিনি জব্বারের সংসার আলো করিয়া অবস্থান করিতেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সমস্ত বিশ্ব তাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হইল।

> কান্দিয়া হয়রান বিবি বলে হায় হায়।
> কেননা মউত মোরে দিলেক খোদায়॥
> দরিয়ায় ভাসাইল খসম আমার।
> কেনারা নাহিক দেখি না জানি সাঁতার॥

তিনি পরে হাসানের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া অতীতকে ভুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু, হাসানের মৃত্যুতে তিনি পুনরায় শোকাভিভূতা হন। তৎসত্ত্বেও, তিনি তাঁহার ভাগ্যবিধাতাকে অভিসম্পাৎ করেন নাই। চরম বিপদেও জয়নব ধীর, স্থির এবং অবিচলিত। সপত্নী কদবানু স্বামী হাসানকে বিষপানে হত্যা করিয়াছেন জানিয়াও জয়নব তাঁহার সহিত কলহ-বিবাদে রত হন নাই। ইহা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কবি কদবানুকেও প্রথমে নিরীহ ও স্বামি-সোহাগিনীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু বৃদ্ধা

কুটনী ময়মুনার মিথ্যা প্ররোচনায় কদবানুর ন্যায় স্বামি-সোহাগিনী ও প্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীও যেভাবে হাসানকে বিষ দিয়া হত্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে না। কবির চরিত্র-চিত্রণে কদবানুকে একটি নির্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন বালিকা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। নারী চরিত্রগুলির মধ্যে বৃদ্ধা কুটনী ময়মুনার চরিত্রই উজ্জ্বলতম। সে অত্যন্ত অর্থলোভী ও কুটবুদ্ধিসম্পন্না। ছলনায় সে পারদর্শিনী। কদবানুর মন অপরিণত বয়স্কা বালিকার ন্যায় সরল। কাজেই, ময়মুনার প্ররোচনায় তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ময়মুনা বৃদ্ধা নারী; অথচ এই অর্থ-পিশাচীর নারী-হৃদয়ের কোন পরিচয় কাব্যে নাই। গরীবুল্লাহ্ ইচ্ছা করিয়াই ময়মুনাকে যেন পাথররূপে গড়িয়াছেন; কারণ, তাহা না হইলে হাসান-হত্যার সমস্ত দায়িত্ব কদবানুর উপর গিয়া পড়ে। যথার্থ বলিতে কি, ময়মুনার জন্যই কদবানু-চরিত্র ভাল ফুটে নাই।

গরীবুল্লাহ্ অল্প কথায় সখিনার চরিত্র আঁকিয়াছেন। কিন্তু এ-চরিত্র সুষ্ঠু হয় নাই। একাদশ বৎসর বয়স্ক বালক কাসেমের সঙ্গে তদপেক্ষা কম বয়স্কা এক বালিকা সখিনার বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইবার পর তখন তখনই তাঁহাদের মধ্যে যে-গাঢ় প্রেমের সঞ্চার হইল, তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক। কবির চিত্রিত বালক কাসেম যেইমাত্র তন্নিম্ন বয়স্কা বালিকা পত্নীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া যুদ্ধে গমনে উদ্যত, অমনি ঐ বালিকা-বধূ সখিনা বলিয়া উঠিলেন:

অনাথিনী করে যাবে দুনিয়া ভিতরে।
আমার দরদ কেবা করিবে সংসারে॥

তখন দেখা যায়, কবি অপরিণত বয়স্কা সখিনার দেহমনে যুবতী জনোচিত যৌনবোধ জাগাইয়া তুলিয়া তাহাকে যেভাবে প্রগল্ভ

করিয়া ফুটাইয়াছেন, তাহা হাস্যকর হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে, গরীব্‌ুল্লাহ্‌ সখিনা চরিত্র অঙ্কনে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন নাই। এ-কাব্যে কাসেম চরিত্রও ভাল ফুটে নাই। বীবী শাহেরবানু ইমাম হোসেনের উপযুক্ত পত্নী এবং জীবন-সঙ্গিনী। স্বামীর সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে হোসেনের ছায়া-সঙ্গিনীও বটেন। তিনি একাধারে আদর্শ পত্নী, আদর্শ জননী এবং আদর্শ মুসলিম রমণী। অল্প কথায় বর্ণিত হইলেও বীবী শাহেরবানুর এই মহিয়সী রূপ গরীব্‌ুল্লাহ্‌র কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে। পুত্র আলী আসগর এবং স্বামী হোসেনের মৃত্যুতে পুত্রস্নেহাতুরা জননী এবং স্বামি-প্রেমে সৌভাগ্যশালিনী পত্নী শাহেরবানুর ক্রন্দন এবং বিলাপে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মিলে।

চন্দ্রভান ব্রাহ্মণের আত্মোৎসর্গের চিত্র এ-কাব্যে সার্থকরূপে অঙ্কিত। ইমাম হোসেনের ছিন্ন শির রক্ষার নিমিত্ত চন্দ্রভানের সপরিবারে আত্মত্যাগের কাহিনী শুধু রসোত্তীর্ণ হয় নাই, ইহা গরীবুল্লাহ্‌র 'জঙ্গনামা' কাব্যে খানিকটা 'চমৎকারিত্ব' উৎপাদন করিয়াছে। সম্ভবতঃ এই সুন্দর উপাখ্যানটিতে আকৃষ্ট হইয়াই পরবর্তী কালের বিখ্যাত লেখক মীর মুশার্‌রফ হুসেন তৎরচিত 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থের আজর কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। চন্দ্রভান হযরত রসূলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল থাকায় হোসেনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মর্মবেদনা প্রাপ্ত হন এবং যেয়াদের নিকট হইতে শির ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া সপরিবারে আত্মবিসর্জন দেন। চন্দ্রভান চরিত্রে রসূলের প্রতি যেমন অবিচলিত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি আত্মদানের মহৎ অনুভূতিও বিদ্যমান। চন্দ্রভান অমুসলিম হইলেও যে-কারণে মুসলমান হোসেনের জন্য হাসিমুখে প্রাণবলি দিয়াছেন, তাহাতে জাতিভেদের প্রশ্ন অবান্তর।

ইমাম হোসেনের খুল্লতাত ভ্রাতা মোসলেম (মুসলিম) হোসেনের দৌত্য লইয়া কুফায় গমন করিয়াছিলেন। কুফার জনসাধারণের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মোসলেম বিপদে নিপতিত হন ; ফলে তাঁহাকে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়। মোসলেম ভ্রাতৃআজ্ঞা পালনে অবিচলিত ও নিষ্ঠাবান। তাঁহার চরিত্রে বীরত্ব, ত্যাগ ও ধর্মাধর্মবোধের ছাপ আছে। কিন্তু ইহাতে অসাধারণত্বের পরিচয় থাকায় এ-চরিত্র স্বাভাবিক হয় নাই। অনুরূপভাবে ওহাব, ওহাবের মাতা, আলী আকবর, রহমান প্রভৃতির চরিত্র-চিত্রণ সুষ্ঠু ও সুন্দর হয় নাই। ইঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্রে অবাস্তব ও অস্বাভাবিক কাহিনীর অবতারণা লক্ষ্যযোগ্য। বীরত্বের এক একটি মূর্তিরূপে গরীব্‌ল্লাহ তাঁহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কোন বীর বা বীরাঙ্গনার চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া অলৌকিকতা বর্জন করিতে পারেন নাই ; এই জন্যই ওহাবের মাতার ন্যায় এক বৃদ্ধাকেও কবি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্না বীরাঙ্গনারূপে চিত্রিত করিতে দ্বিধা করেন নাই। ফলে, কাব্যে চিত্রিত অধিকাংশ নর-নারীর চবিত্রই স্বাভাবিক হয় নাই। এগুলি প্রায়ই বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

মোহাম্মদ হানিফার আখ্যায়িকা কাব্যের এক তৃতীয়াংশ স্থান জুড়িয়া আছে। কাব্যের এই বিখ্যাত চরিত্র সৃষ্টিতে কবি অলৌকিক কবিকল্পনা ও অবাস্তব কাহিনীর এমন সংযোগ সাধন করিয়াছেন যে, তাহা পড়িয়া মনে হয় হানিফা মর্ত্যের মানব নহেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অনন্যসাধারণ ও অতিমানবোচিত। হোসেনহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত কবি এই চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু বাস্তবের সহিত তাহার কতটুকু সামঞ্জস্য বিধান হইল, সেদিকে তিনি মোটেই খেয়াল করেন নাই। হানিফার একমাত্র লক্ষ্য এজিদ-নিধন। এজিদকে পরাজিত ও হত্যা করিবার প্রেরণায় তিনি উন্মত্ত। সেই নিধন-পর্ব যখন সমাপ্ত হইল, তখন গরীবুল্লাহ্‌ কাব্যের যবনিকা

টানিয়াছেন। বুঝিতে কষ্ট হয় না, প্রতিশোধ নিয়ন্ত্রিত শক্তিরূপে কবির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল। এইজন্য হানিফা চরিত্র সার্থক-সৃষ্টি হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রে অল্প-বিস্তর বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। হোসেনের রেকাব-বর্দারের মানিক চুরির জন্য লোভ, হযরত আলীর পালিত-পুত্র আবদুল্লাহ্ দিনারের নীচতা, সাহাবা ছালের হৃদয়ের মহত্ত্ব ও হোসেন-পরিবারবর্গের প্রতি গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা, আবদুল্লাহ্ যেয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা ও নীচতা প্রভৃতির মধ্যে গরীবুল্লাহ্ সাধারণ নরনারীর জীবনের দোষ, ত্রুটি ও মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অঙ্কিত বহু চরিত্র বৈশিষ্ট্যহীন। উম্মে সালেমা, মেরুয়া, ছিছমার, জাফর, জাবের, দ্বিতীয় ওহাব, মুছা আনসারী প্রমুখ টাইপ (দোষ বা গুণের প্রতিনিধি) চরিত্রের মধ্যে অন্যতম।

মুসলমানী বাংলায় রচিত গরীবুল্লাহ্‌র কাব্য ব্যতীত অন্যান্য মর্সীয়া কাব্যও অতিলৌকিকতার লক্ষণাক্রান্ত। ইহার পরিচয় কবিগণের চরিত্রসৃষ্টি ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে বিদ্যমান। এইজন্যই তাঁহাদের অঙ্কিত চরিত্রগুলির অধিকাংশই অতিমানব; গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যের চরিত্রগুলির সঙ্গে অন্যান্য কবির চিত্রিত চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যে হোসেন চরিত্রে যে-বৈশিষ্ট্যের ছায়াপাত হইয়াছে, জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশীর কাব্য দুইখানিতে তাহা নাই। কবিদ্বয় তাঁহাদের কাব্য দুইখানিতে হোসেনকেই নায়ক ও কেন্দ্রীয়-চরিত্ররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। অথচ এই চরিত্র-সৃষ্টিতে উভয় কবি নিজ নিজ কাব্যে সঙ্গতিবিধান করিতে পারেন নাই। তাঁহারা হোসেনকে অতিমানব করিয়া আঁকিয়াছেন। ইসহাক উদ্দীনের চিত্রিত হোসেন অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির। হোসেনের চরিত্রে অলৌকিকতার ছাপও প্রচুর।

মোটকথা, এই চরিত্রটি তিনি ফুটাইতে পারেন নাই। ইসহাক উদ্দীন যুদ্ধের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন ; কিন্তু এই চরিত্র-চিত্রণে পূর্বাপর সঙ্গতি না থাকায় তাহা অর্থহীন হইয়াছে। ফলতঃ প্রায় সব কবিই হোসেন-চরিত্র-অঙ্কনে নাটকীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই। বর্তমান যুগে রচিত এবং পাশ্চাত্ত্য আদর্শে প্রভাবান্বিত হওয়ায় একমাত্র কাযী আমীনুল হকের 'জঙ্গে কারবালা' কাব্যে হোসেন-চরিত্র-চিত্রণের সার্থক প্রয়াস লক্ষ্যযোগ্য। কাযী সাহেব সংযত-বাক্। হোসেনের হৃদয়-মনের সমস্ত শক্তি ও দুর্বলতা, জীবনের ট্র্যাজেডি পূর্বাপর সঙ্গতির সহিত এমন সহজ ও অকুণ্ঠরূপে উদ্‌ঘাটিত যে, ইংরেজ আমলের মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া কাব্যের মধ্যে গরীবুল্লাহ্‌র কাব্য ভিন্ন তাহা অপর কাহারও রচনায় দেখা যায় না। তৎসত্ত্বেও, কাযী আমীনুল হকের চিত্রিত হোসেন ও অন্যান্য কোন কোন চরিত্র অবাস্তব কবিকল্পনা হইতে মুক্ত নহে।

গরীবুল্লাহ্‌র অঙ্কিত মাবিয়ার চরিত্রের সঙ্গে জনাব আলীর মাবিয়ার আংশিক সামঞ্জস্য আছে। জনাব আলী মাবিয়াকে অতি নীচ ও চক্রান্তকারী শাসকরূপে আঁকিয়াছেন। মুহম্মদ মুনশী ও জনাব আলীর এজিদের সহিত গরীবুল্লাহ্‌র এজিদের মিল আছে। রাধাচরণ গোপ ও ইসহাক উদ্দীনের কাব্যে এজিদের ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় থাকিলেও তাঁহার ধর্মজ্ঞানতিরোহিত কামান্ধ রূপ অঙ্কিত হয় নাই। কামান্ধ এজিদ যে জয়নব-রত্ন লাভে বঞ্চিত হইয়াই প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন এবং কারবালার ভয়াবহ যুদ্ধের সূত্রপাত করিলেন তাহা গরীবুল্লাহ্, মুহম্মদ মুনশী ও জনাব আলীর কাব্যে যেমন বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ অন্য কোন কাব্যে হয় নাই।

গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যে কোতামের (ঐতিহাসিক 'কাত্তাম') চরিত্র চিত্রিত হয় নাই। জনাব আলী, মুহম্মদ মুনশী, ইসহাক

উদ্দীন ও আমীনুল হক তাঁহাদের স্ব স্ব কাব্যে কোতাম বা কেতামের চরিত্র আঁকিয়াছেন। কবিগণ একই দৃষ্টিকোণ হইতে এই নারী চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সে যুবতী ও রূপবতী; কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহার পিতৃ ও ভ্রাতৃঘাতক হযরত আলীর প্রতি জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার জন্য সে নিজের দেহ দান করিতেও কুণ্ঠিত নহে। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুলযম, কোতামের রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অঙ্কশায়ী করিবার লালসায় তাহার বশীভূত হইয়া প্রভু-হত্যা করিয়াছে। আবদুর রহমানের বিশ্বাসঘাতকতা ও মনুষ্যত্বহীনতার চিত্র কবিগণ ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু জনাব আলীর অঙ্কিত আবদুর রহমানের মনে আলী-হত্যার পূর্বে যে-দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা মুহম্মদ মুনশী বা অপর কোন কবির কাব্যে নাই। আবদুর রহমান প্রথমে আলী-হত্যা করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিল ঃ

বান্দী কি দেরেম দেয়া নহে কাম ভারী।
কিন্তু মোরতজার শির কাটিতে না পারি ॥
দুনিয়ার বিচে এয়ছা আছে কোন্ জন।
মোরতজা আলির সেই কাটিবে গর্দান ॥

অথচ, কোতামের দেহভোগে প্রলুব্ধ হওয়ার পরক্ষণেই তাহার মনুষ্যত্ববোধ আলী-হত্যার নেশায় পরিণত হইয়াছে। তখন তাহাকে বলিতে শুনি ঃ

তেরা লাগি মোরতজার কাটিব গর্দান ॥
তোমার লাগিয়া দিন দুনিয়া উড়াব।
তেরা লাগি আকবত খারাব করিব ॥

ফলতঃ আবদুর রহমানের চরিত্র-সৃষ্টিতে জনাব আলীর মৌলিকতার পরিচয় আছে।

গরীবুল্লাহ্‌র শাহাবানুর সহিত জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশীর চিত্রিত জায়েদার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। গরীবুল্লাহ্‌র শাহাবানু প্রথমদিকে হাসানের নিরীহ পত্নীরূপে চিত্রিত হইলেও কুটনীর প্ররোচনায় সে পরে প্ররোচিত হইয়া কলঙ্কিত হয়। পক্ষান্তরে, জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশীর জায়েদা প্রথম হইতেই স্বামী হাসানের প্রতি হিংসাপরায়ণ। কিন্তু তাহার এই হিংসুটে স্বভাবের চিত্র দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হয় নাই; কবিদ্বয়ের বর্ণনায় শুধু এইটুকু জানা যায় যে, জায়েদা পাপীয়সী ও অর্থগৃধ্নু। অর্থ-লোভে সে 'দয়া ধর্ম মহব্বত ত্যাজিয়া আপন' স্বামীকে হত্যা করিয়াছে। জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশীর কাব্যে কুটনীর ভূমিকা গৌণ; জায়েদার ভূমিকাই মুখ্য। কিন্তু যাহার জন্য জায়েদা স্বামীকে হত্যা করিয়াছে সে পুরস্কার সে পায় নাই। তখন সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে। জায়েদার চরিত্র-চিত্রণ যথার্থ হয় নাই। কবিদ্বয় কোনমতে দায়িত্ব সমাধা করিয়াছেন।

গরীবুল্লাহ্‌র চিত্রিত ময়মুনা কুটনী ও কাজী আমীনুল হকের আয়ছুনী কুটনী একই মনোধর্ম হইতে অঙ্কিত। গরীবুল্লাহ্‌র ময়মুনা কুটনীর প্ররোচনায় কদবানু যেমন বিষ-প্রয়োগে হাসানকে হত্যা করিয়াছেন, আমীনুল হকের জায়েদাও তেমনি কুটনী আয়ছুনীর কুপরামর্শে স্বামিহত্যা করেন। কিন্তু স্বামি-হত্যার পূর্ব-মুহূর্তে আমীনুল হকের চিত্রিত জায়েদার মনে যে-দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, গরীবুল্লাহ্‌র কদবানু চরিত্রে তাহার আভাসমাত্র নাই। আধুনিক কালের কবি হওয়ায় আমীনুল হকের জায়েদা-চরিত্র অনেকটা সুষ্ঠু ও সুন্দর। জনাব আলীর জয়নব-চরিত্র গরীবুল্লাহ্‌র জয়নবের অনুরূপ। তবে জনাব আলী এই চরিত্র-অঙ্কনে গরীবুল্লাহ্‌র ন্যায় কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আবদুল জব্বারের চরিত্রে মনুষ্যত্ব-বোধের ছায়াপাত হইয়াছে; সে অর্থলোভী হইলেও জয়নবকে

তালাক দিবার পূর্বে ক্ষণিকের জন্য দ্বিধা করিয়াছে ; কিন্তু অর্থের লালসায় মনুষ্যত্বের পরাজয় দেখাইয়া জনাব আলী জব্বারকে রক্ত-মাংসের মানুষ রূপে অঙ্কন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

মুসলমানী বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্যের কবিগণ তাঁহাদের কাব্যমধ্যে ভাল ও মন্দ এই দুই শক্তির সংঘর্ষের চিত্র আঁকিয়াছেন। হোরের চরিত্রে এই সংঘর্ষের পরিচয় আছে। গরীবুল্লাহ্ হোর চরিত্র অঙ্কন করেন নাই। মুহম্মদ মুনশী, জনাব আলী ও আমীনুল হকের কাব্য-বর্ণিত হোর এজিদের সেনাপতি ; এজিদের অর্থেই তাঁহার দেহ পরিপুষ্ট ; কিন্তু তাঁহার মনের অন্তঃস্থলে হযরত রসূলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সব সময়ই জাগ্রত ছিল। কাজেই, এজিদের সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও যখন হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইল, তখন হোরের মনে ভাল-মন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিল। তাঁহার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সংঘর্ষে কবিগণ মন্দের পরাজয় দেখাইয়াছেন। হোর এজিদ পক্ষ ত্যাগপূর্বক হোসেনের দলে যোগদান করিয়া আত্মপ্রাণ বলি দিয়াছেন। ন্যায় ও সত্যের জন্য আত্মবলিদানের মধ্য দিয়া মানুষের মুক্তি সম্ভবপর, এই সুনীতির দোহাই দিয়া কবিগণ হোরের আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়াছেন।

জনাব আলী, ইসহাক উদ্দীন, আমীনুল হক প্রমুখের কাব্যে কাসেম-সখিনার উপাখ্যান নাই। এই উপাখ্যান বর্ণনায় গরীবুল্লাহ্‌র সহিত মুহম্মদ মুনশীর সাধর্ম্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গরীবুল্লাহ্‌র সখিনা এবং মুহম্মদ মুন্শীর সখিনা এক নহে ; ইহাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। গরীবুল্লাহ্‌র সখিনা বালিকা বধূ ; মুহম্মদ মুনশীর সখিনা বয়স্কা যুবতী ; তাঁহার কাশেমও বয়স্ক যুবক। সুতরাং তাঁহার চিত্রিত নব-দম্পতির প্রেম ও বিরহের কাহিনী অবান্তর বা অস্বাভাবিক হয় নাই। পক্ষান্তরে, গরীবুল্লাহ্‌র চিত্রিত বালিকা সখিনার দেহেমনে যৌনবোধ উদ্রেক করায় তাহা

অস্বাভাবিক হইয়াছে। জনাব আলী এবং মুহম্মদ মুনশীর কাব্যদ্বয়ে এমন দুইটি পুরুষ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, যাহাদের নিষ্ঠুরতা, শঠতা এবং অর্থ-লিপ্সা পাঠকের মনে ঘৃণার উদ্রেক না করিয়া পারে না। ইহাদের একজন আবদুল্লাহ্ জেয়াদ, অপরজন নরপিশাচ হারেস। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ ছিলেন কুফার শাসক। এজিদকে যদি কারবালা যুদ্ধের অন্যতম নায়করূপে গ্রহণ করা যায়, তবে জেয়াদ তাঁহার অন্যতম দোসর। আবদুল্লাহ্ জেয়াদের কূটবুদ্ধি, কর্মতৎপরতা, শঠতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশীর রচনায় মিলিতেছে। হোসেনকে হত্যা করিয়া, তাঁহার পরিবার-পরিজনকে নানা লাঞ্ছনা দিয়াও আবদুল্লাহ্ যখন তৃপ্ত হন নাই, তখন তিনি হোসেনের ছিন্ন শিরের উপর অমানুষিক হিংস্রতায় বেত্রাঘাত করিয়াছেন। তাঁহার নিষ্ঠুর চরিত্র-চিত্রণের ব্যাপারে উভয় কবি কৃতকার্য হইয়াছেন।

অর্থলোভে মানুষ যে কত উন্মত্ত হইতে পারে, তাহার চিত্র হারেসের উপাখ্যানে অঙ্কিত। হারেস সাধারণ মানুষ; সে দরিদ্র, কিন্তু তাহার ঘরে এক পুণ্যবতী স্ত্রী বর্তমান। সাধারণ মানুষ অর্থ-লালসায় যে-কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে, তাহার পরিচয় জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশী নিজ নিজ কাব্যে প্রদান করিয়াছেন। হারেস অর্থের জন্যই মোসলেমের দুই বালক-পুত্র এমনকি নিজের স্ত্রী, পুত্র এবং গোলামকে হত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু যে-অর্থের জন্য আপন-পর এতগুলি নর-নারী হত্যা করিয়া সে তাহার হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছে, সেই অর্থ সে পায় নাই। তাহা ছাড়া, যেহেতু হারেস একজন ভয়ানক লোক, সেইহেতু কবি তাহাকে জেয়াদ মারফত হত্যা করাইয়া তাহার শাস্তি বিধান করিয়াছেন। জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশীর রচনা-কৌশলে হারেস চরিত্র মন্দ ফুটে নাই।

তিনজন কবি হারেস ও আবছুল্লাহ জেয়াদের চরিত্রের বিপরীত-ধর্মী করিয়া স্ব স্ব কাব্যে হানি ও জেল দারোগা কাজী সরিহ্‌র চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। এই ছুইটি চরিত্র অঙ্কনে জনাব আলী, মুহম্মদ মুনশী ও ইসহাক উদ্‌দীনের একই মনোভাবের ছাপ আছে। কুফায় মোসলেমের জন্য হানি আত্মদান করিয়াছেন এবং মোসলেম-পুত্রদ্বয়ের নিরাপত্তার জন্য কাজী সরিহ্‌ বিপদের ঝুঁকি নিজের মাথায় লইয়া তাহাদিগকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া দিয়া নিজে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন। পরের হিতার্থে হানি ও সরিহ্‌ জীবন দান করিয়া যে-মনুষ্যত্বমহিমা প্রকটিত করিয়াছেন, জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশীর রচনায় তাহা ভাল ফুটে নাই; তবে ইসহাক উদ্‌দীনের রচনায় ইহা অনেকটা প্রাণ পাইয়াছে। গরীবুল্লাহ্‌ ও ইসহাক উদ্‌দীনের কাব্যে তুয়া বীবীর চরিত্র অঙ্কিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, জনাব আলীর কাব্যের তুয়া বীবীর সহিত মুহম্মদ মুনশীর চিত্রিত তুয়া বীবীর মিল আছে। যে-তুয়া নবী-বংশধরের (মোসলেমের) বিপদে সহায়তার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, অল্প কয়েকটি রেখাপাতে জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশী তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়াছেন।

জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশীর কাব্যে হানিফা-সংক্রান্ত কোন উপাখ্যান নাই। কিন্তু ইসহাক উদ্‌দীন হানিফা-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রিত হানিফা অতিমানব। গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যের হানিফার সঙ্গে ইসহাক উদ্‌দীনের অঙ্কিত হানিফার পুরাপুরি মিল আছে। হানিফা কবি-কল্পনার সৃষ্টি; তাঁহার চরিত্র অস্বাভাবিকতার রঙে রঞ্জিত।

অন্যান্য অপ্রধান ও টাইপ (দোষ বা গুণের প্রতিনিধি) চরিত্রের মধ্যে জনাব আলীর সাদেক জাফর, সীমার লাইন, খুলি, মুহম্মদ মুনশীর আবুল খোনক, মসিব খাজাই, কছির, ইসহাক

উদ্‌দীনের এহিয়া, সানান, সীমার, মোক্তার, রাফিয়া (মহিলা), আমিনুল হকের আলী আকবর, মোক্তার, খুলি, বৃদ্ধপীর, হেন্দা, হান্নানা (বাঁদী) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত মুসলমানী বাংলায় রচিত কাব্যগুলির মধ্যে কবিগণ আরও অসংখ্য অবান্তর চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন যেগুলি এস্থলে আলোচনার অযোগ্য। কাজেই, আমি বৈশিষ্ট্যবর্জিত চরিত্রগুলিকে আমার বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করি নাই। মোটকথা, এই আমলের কবিগণের রচিত কাব্যগুলি যথার্থ পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি হইয়া উঠে নাই। চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে মুঘল আমলের মর্সীয়া সাহিত্যের কবিদের কাব্য অপেক্ষা ইংরেজ আমলে মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া কাব্যগুলি ম্লান ও দীপ্তিহীন।

বর্ণনা-কৌশল

মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া সাহিত্যের প্রথম কবি হিসাবে গরীবুল্লাহ্ 'জঙ্গনামা' কাব্যে যে-ভাব, ভাষা, কবি-কল্পনা ও বর্ণনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণ তৎকালীন জনসাধারণের রোমান্টিক রসপিপাসা মিটাইবার জন্য যেমন ইসলামের প্রথম যুগের যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীকে রস-কল্পনায় পরিপুষ্ট করিয়া কাব্য-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তেমনি গরীবুল্লাহ্ ও তাঁহার অনুবর্তী কবিগণও ফারসীকাব্য-কাহিনীর সহিত যদৃচ্ছা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কাব্যাদি রচনায় যত্নবান হন। গরীবুল্লাহ্, জনাব আলী প্রমুখ ইংরেজ আমলের কবি। ইসলামের ইতিহাসের হযরত আলী, আমীর হামযা, হাসান, হোসেন (হুসৈন), মুহম্মদ হানিফা, কাসেম, আলী আকবর, মোসলেম (মুসলিম) প্রভৃতি বীর যোদ্ধার যুদ্ধবিগ্রহ ও কীর্তি-কাহিনী

রূপকথার ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্য পঞ্চাশ গজ উচ্চতা বিশিষ্ট বীরগণের হাজার মণ ওজনের গোর্জ-হস্তে যুদ্ধ ও আশীমণ লোহার জেরা গায়ে দেওয়ার মত উদ্ভট ও অবাস্তব ব্যাপারও মর্সীয়া কাব্যের কবিগণ বর্ণনা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু এই সকল উদ্ভট্ ও অদ্ভুত কাহিনী সন্নিবেশের ফলে পুঁথিগুলি যে স্বভাবতই বাস্তবাদর্শ ও জীবন-সত্য হইতে স্খলিত হইয়াছে, কবিগণের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না; অথবা ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহাদের মনোজগতে বাস্তবতার মূল্য ছিল নগণ্য। গরীবুল্লাহ্ ও অন্যান্য কবির কাব্য হইতে উদ্ভট্ ও অবাস্তব বর্ণনার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

ক। বল্লকিয়া নামে ছিল এক পাহালওয়ান।
তার পরাক্রম কিছু না হয় বয়ান্॥
পঁয়তাল্লিশ গজ তার শরীর প্রমাণ।
ছের যেন বিছালী বোঝা মাথায় কৃপাণ॥
দুই চক্ষু যেন তার নাকারার খোল।
মেঘে যেন শব্দ করে তার মুখের বোল॥

(গরীবুল্লাহ্ ঃ জঙ্গনামা)

খ। ঘোড়ার সওার এক আইল আচম্বিতে॥
গোম্বায় কাক্কের যেন দুই চক্ষু ঘোরে।
শও মণ লোহার টোপ আছে ছের পরে॥
পাহাড়ের থাম যেন তার দুই বাহু।
পর্বত সমান গিধি আঁখি যেন লহু॥

(ঐ)

গ। আশী মণ লোহার টোপ দিলেন মাথায়।
হাজার মণের জেরাবক্ত দিল গায়॥

বান্ধিল কোমরবন্দ চব্বিশ মণের।
হাজার মণের গোর্জ লিল হাতে ফের॥
(সাদ আলী ও আঃ ওহাব : শহীদে কারবালা)

ঘ। আছিল হাজার মণ হাতে তার তেগ।
কাসেম উপরে মারে হৈয়া বেদেরেগ॥

ঙ। জেরা বক্তপোষ বান্ধে বিরাশী হাজার।
হাজার মণের গোর্জ ফাঁসি আবদার॥
আশী মণ লোহার টোপ দিল শির পরে।
নেজা তীর কামান তার শও মণ ধরে॥

মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া কাব্যগুলির মধ্যে এই সকল অলৌকিক ও অস্বাভাবিক কাহিনী সংস্থাপনের মূলে যে-কারণ নিহিত, তাহা এইস্থলে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভাষার আলোচনার ক্ষেত্রে আমি ইতঃপূর্বে বলিয়াছি যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে উরদূ ভাষা উত্তর ভারতে কথ্যভাষারূপে চালু হইলে তাহা পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং বাংলা ভাষায় উরদূ-হিন্দী শব্দ অবাধে ব্যবহৃত হইতে থাকে। যাহা হউক, এই সময় হইতে ঈরাণী সাহিত্যের শী'য়া ভাবধারার সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে অষ্টাদশ শতকের গোড়াতে বাংলা দেশেও কাব্য ও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এ-দেশের কবিগণ ফারসী-হিন্দী মিশ্রিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করিতে শুরু করেন। ঈরাণী শী'য়া ভাবধারা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা কাব্যগুলির মধ্যে স্বভাবতঃই রোমান্টিক কবি-কল্পনা ও অবাস্তব পরিমণ্ডল অনুপ্রবেশ করে। অতঃপর, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে (১৭০৪) মুর্শিদাবাদ মুঘল সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে নির্দিষ্ট হইলে, ধীরে ধীরে দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন

ঘটিতে থাকে এবং বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের জীবনে এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। নবাবী ঐশ্বর্যের লালসা-তপ্ত পরিবেশে জীবন-পরিক্রমা তখন জীবন-শিল্পে পরিণতি লাভ না করিয়া জীবন-সম্ভোগে রূপান্তরিত হইল[১]। তথাপি জনসাধারণের রস-পিপাসা একেবারে নির্মূল হয় নাই। তাহাদের এই কাব্য-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য দেশের সাহিত্যিক ও কবিগণ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন জনসাধারণের রুচি অনুযায়ী প্রণয় উপাখ্যান ও অন্যান্য কাহিনীমূলক কাব্যগুলির উদ্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে, জনরুচির সহিত এই কাব্যগুলির আন্তর-ধর্মের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। এগুলি সবই ইংরেজ প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এবং গঙ্গারাম-রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণে'[২] তদানীন্তন কালের বাঙালী সমাজের ক্ষীয়মান অবস্থা ও মর্মান্তিক অভিঘাতের স্বাক্ষর বর্তমান। এতৎভিন্ন, কোম্পানী যুগের অনিশ্চয়তাবোধ ও বাঙালীর ভাগ্য-বিড়ম্বনার ছাপ তরজা, খেউর, আখড়াই, হাফ আখড়াই, টপ্পা ও কবিগানের মধ্যে বিধৃত। মুসলমান পুঁথি রচয়িতাগণও মুসলমান জনসাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্যমূলক পুঁথি রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনের নানা দৈন্য ও অধঃপতন যখন অত্যন্ত প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহা ঢাকিবার জন্য পুঁথিকারগণ বাস্তবতা-বর্জিত কল্পনা এবং রোমান্টিক বিষয়-বস্তু আমদানী করিলেন।

---

১ নিরঞ্জন চক্রবর্তী : ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য। ১ম সংস্করণ ১৮৮০ শকাব্দ, চৈত্র, পৃষ্ঠা ১০

২ রচনাটির বিস্তৃত পরিচয় ডক্টর সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ২য় সংস্করণ, ১৯৪৮, পৃঃ ৮৬৫-৮৭০ দ্রষ্টব্য।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা হারাইয়া দেশের মানুষ যে-সময়ে একান্তভাবে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল, তখন গরীবুল্লাহ্ প্রমুখ কবি কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। সময়ের চাহিদা অনুসারে স্বভাবতই তাঁহারা নিজ বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং সেই হিসাবেই হামযা, হযরত আলী, মুহম্মদ হানিফা, হাসান, হোসেন, কাসেম, আব্বাস প্রমুখ বীর পুরুষকে কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্র বা নায়করূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহিরাগত পীর, ফকীর ও সাধু-দরবেশগণের অলৌকিক কেরামতি ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বীর-চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে কবি-মানসকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। কবিগণ পুঁথিগুলির মধ্যে যে-সমাজের কথা বলিয়াছেন, সে সমাজ আজ নাই; যে-মানুষের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, সে মানুষ বার তের শত বৎসর পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে। তথাপি উবায়দুল্লাহ্, যেয়াদ, হারেস, ময়মুনা ও এজিদের ক্রূরতা আজও সকলের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে; হোসেন, কাসেম, আলী আকবর, হানি, সরিহ ও মুসলিমের আত্মত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা অন্তরে অনুপ্রেরণা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা জাগায়; হোর, চন্দ্রভান, ওহাব প্রমুখের মনুষ্যত্ববোধ পাঠকমনে অনুভূতি সৃষ্টি করে। কাব্যে এই সকল বীরপুরুষ সম্পর্কিত ইত্যাকার বর্ণনায় গরীবুল্লাহ্, রাধাচরণ গোপ, জনাব আলী, মুহম্মদ মুনশী, ইসহাক উদ্দীন, আমীনুল হক প্রমুখ কবি অলৌকিক ও অবাস্তব কবি-কল্পনার বাড়াবাড়ি করিলেও প্রেম, প্রীতি, মানবতা, বীরত্ব ও মহত্ত্বের সমাবেশ কাব্যগুলির মধ্যে পুরাপুরি বর্তমান।

গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যের ভাষা অলঙ্কার-প্রধান নহে। তিনি কোন ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে সহজ ও শ্রুতিমধুর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। নারী বা পুরুষের রূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি আবেগ বা উচ্ছ্বাসের পরিচয় দেন নাই। অনেক স্থলে তাঁহার

বর্ণনায় সংযম প্রশংসনীয়। যেমন ঃ জয়নবের সৌন্দর্য-বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি সংযত-বাক্। তিনি বলেন ঃ

জব্বারের কবিলা জয়নব তার নাম।
অতিশয় রূপবতী গুণে অনুপাম॥

গরীবুল্লাহ্‌র ভাষা তদানীন্তনকালের লোক-প্রচলিত ভাষা নহে ; অথচ ফারসী-উরদূ-হিন্দীবহুল বাংলায় লিখিত পুঁথিগুলি জনসাধারণের বোধগম্য ছিল। কবি বাংলা ভাষা ব্যতীত এই সকল ভাষাতেও দক্ষ ছিলেন। গরীবুল্লাহ্‌র অনুসৃত রীতি অবলম্বনে বহু কবি মর্সীয়া কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য ও লালিত্যের দিক দিয়া কেহই তাঁহার সহিত তুলিত হইতে পারেন না। তাঁহার ভাষা নিতান্ত আটপৌরে ; অথচ এই ভাষায় যে-বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে, তাহা অন্য কাহারও নাই। তাঁহার ভাষায় মৌলিকতা এবং নূতনত্ব আছে ; তাছাড়া তাঁহার কাব্য কবিত্বহীন নহে ; সর্বত্র না হইলেও অনেক স্থলে তাঁহার বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। শোক, যুদ্ধ ও নারী-রূপ-বর্ণনায় গরীবুল্লাহ্‌র কৃতিত্ব অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা বেশী। তিনি মুসলমানী বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করিলেও সর্বত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে অনাবশ্যক ফারসী-উরদূ-হিন্দী শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। গরীবুল্লাহ্‌র করুণ-রস বর্ণনার নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

হোসেনের কোলেতে যে ছাওয়াল আছিল।
হোসেনে না লেগে তীর ছাওয়ালে লাগিল॥
এয়ছাই খেদঙ্গ তীর মারিল কুফর॥
লাগিল লাড়কার বুকে হয়ে গেল পার॥
দেখিয়া এমাম শাহা বলে আহা আহা।
না বাঁচিবে শাহেরবানু দেখে যদি ইহা॥

দেখিয়া শাহেরবানু লাড়কার হাল।
পটকান খাইয়া পড়ে দেওয়ানার হাল॥
বুকে হাত মেরে কান্দে বিবি শাহেরবানু।
কাফেরের হাতেতে বাছারে হারাইনু॥
হায় হায় কান্দে বিবি ছের পিঠে হাতে।
অভাগা দুঃখিনী ডাকে দুধ খাওয়াইতে॥
কেমনে লাগিল বাছা তোর গায়ে তীর।
তোমারে দেখিয়া প্রাণ হইল চৌচির॥

জনাব আলী, মুহম্মদ মুন্শী প্রমুখের রচিত কাব্যগুলিতে সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা উচ্চগ্রামে পৌঁছিতে পারে নাই। তবে নারীরূপ বা করুণ-রসের বর্ণনার ক্ষেত্রে জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশীর কৃতিত্বের পরিচয় বর্তমান। অবশ্য তাঁহারা এস্থলে পূর্বসূরী গরীবুল্লাহ্‌কেই অনুসরণ করিয়াছেন। গরীবুল্লাহ্‌র বর্ণনায় কোথায়ও কোথায়ও মুঘল আমলের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাধু ভাষার অনুসরণ রহিয়াছে—অথচ সে বর্ণনভঙ্গি গতানুগতিক নহে। তাঁহার রচনায় ফারসী-উরদূ-হিন্দী শব্দের মিশ্রণ সত্বেও বাংলা শব্দের প্রাচুর্য থাকায় ভাষা স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও মাধুর্য হারায় নাই। পক্ষান্তরে, জনাব আলী, মুহম্মদ মুনশী, ইসহাক উদ্দীন প্রমুখ উত্তর সাধকগণের ভাষা অত্যন্ত নীরস এবং শ্রীবর্জিত। তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব কাব্যে যুদ্ধবর্ণনা, শোকবর্ণনা, এমনকি নারী-রূপের বর্ণনার ক্ষেত্রেও ফারসী-উরদূ-হিন্দী শব্দ অধিক প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলে, কাব্যগুলি স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারাইয়াছে। এইস্থলে দুই একটি উদ্ধৃতি দিলে গরীবুল্লাহ্‌র সহিত অন্যান্য কবির ভাষাগত পার্থক্য এবং বর্ণনা-বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে। গরীবুল্লাহ্‌র পাঁচ বৎসর বয়স্কা বালিকা হোসেন-কন্যা ফাতেমার রূপবর্ণনা করিয়াছেন ঃ

পাঁচ বছরের সেই ফাতেমা তার নাম।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন রূপে অনুপাম॥

বদন বিকাশ রূপে যেন চন্দ্রমালা।
অধর বিম্বক ফুল কোকিলের ভাষা॥
নয়ন কুরঙ্গ ভুরু সুসাজ সুজন।
বড় শোভা করে যেন তাহার নয়ন॥
কানেতে কনক চাঁপা শোভা মনোহর।
শিরেতে শোভিত কেশ মলিন চামর॥
কমললোচন জিনি বাহু সুললিত।
পাও দোন শোভা যেন খঞ্জন চলিত॥
কেশরী জিনিয়া শোভা করে মধ্যদেশ।
হুর পরী কদাচ না পায় হেন বেশ॥
কিবা রূপ শোভা করে তাহে দুই উরু।
যেন উলটিয়া পড়ে কদলীর তরু॥
ক্ষণে ক্ষণে দুই পায়ে চম্পক অঙ্গুলি।
জেওরাতে শোভা যেন করিয়াছে মিলি।

কিন্তু জনাব আলীর 'শহীদ-ই-কারবালা' কাব্যে গরীবুল্লাহ্‌র ভাষা-মাধুর্য এবং শব্দপ্রয়োগকৌশল অনুপস্থিত। তিনি তাঁহার পূর্বসূরীর অনুসৃত রীতি অনুসরণে কাব্য রচনা করিলেও তাহা ফারসী-উরদূ-হিন্দী শব্দের বাহুল্য প্রয়োগে শালীনতা নষ্ট করিয়াছে। ইহাতে কাব্য উপভোগ্য হইয়া উঠে নাই। তথাপি তাঁহার ভাষা সহজ এবং প্রাঞ্জল। অনেক স্থলে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বের পরিচয় বিদ্যমান। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র ব্যবহৃত ভাষার সহিত জনাব আলীর ভাষার তারতম্য ধরা পড়িবে। জনাব আলীর সৌন্দর্য-বর্ণনার একটা নমুনা দেওয়া হইল ঃ

দেখিলেন এক শাহাজাদীর কারণ।
মতির মহল বিচে অতি সুগঠন॥
জওহর নেগারের কাছে মছলন্দে বসিয়া।
নূরানী তাকিয়া পরে ঠেস লাগাইয়া॥

দিয়াছে নূরের এক তাজ ছের পরে।
তার জ্যোতি সারা ঘর ঝল্‌মল্‌ করে॥
এই কান বিচে দুই দুলিতেছে দুর।
যার চমকেতে ঘরে বরষিতেছে নূর॥
তামাম বেহেস্ত গেল গোলজার হইয়া।
গোলশান হয়েছে মত্ত সে গোল দেখিয়া॥
আশকে অস্থির যত বেহেস্তের হুর।
যত বাগ বেহেস্তের নূর আলা নূর॥

মুহম্মদ মুনশী, ইসহাক উদ্‌দীন প্রমুখের কাব্যের ভাষা বৈশিষ্ট্যহীন। তাঁহাদের রচিত পুঁথিগুলিতে কবিত্বের অভাব লক্ষণীয়, তবে ভাষা সর্বত্র গতিশীল। রূপবর্ণনা, যুদ্ধবর্ণনা ও শোকবর্ণনার ক্ষেত্রে কবিগণের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে খুব কম পার্থক্য চোখে পড়ে। উপরোক্ত কবিগণের কাব্যের ভাষা কবি জনাব আলীর ভাষার অনুরূপ। জনাব আলীর ন্যায় মুহম্মদ মুনশীও মূল উরদূ গ্রন্থ 'আনাসারে শাহাদাতায়েন' অবলম্বনে 'শহীদ-ই-কারবালা' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাব্যদুইখানির ঘটনা, ভাষা এবং রচনা-সৌষ্ঠবের ক্ষেত্রে বেশ সামঞ্জস্য আছে। কবি ইসহাক উদ্‌দীন এবং আমীনুল হক পূর্ববর্তী কবিগণের অনুসৃত মূল কাব্য হুবহু অনুসরণ করেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহাদের ভাষাও নিতান্ত গতানুগতিক এবং নীরস।

মুহম্মদ মুনশী এবং ইসহাক উদ্‌দীনের ভাষা যে জনাব আলীর ভাষার অনুরূপ, নিম্নোদ্ধৃত উদ্ধৃতিই তাহার প্রমাণ। যথা ঃ

মুহম্মদ মুনশী॥

দেখিলেন বসে এক শাহজাদীর তরে।
মতির মহল্ল বিচে অতি সুবাহারে॥

জরির মছলন্দ ডালি আছেন বসিয়া।
ঠেস লাগাইয়া আছে নূরানী তাকিয়া॥
নূরের দিয়াছে তাজ ছেরের উপরে।
সারাঘর তার জ্যোতে উজালা যে করে॥
আর দুই কানে দুই দুর দুলিতেছে।
তাহার চমকে ঘরে নূর বরষাইতেছে॥
সারা বেহেস্ত গেছে হইয়া গোলজার।
সে গোল দেখিয়া গোল খুশী বেশুমার॥
বেশুমার যত বাগ জ্যোতিতে নূরের।
আশকে অবশ যত হুর বেহেস্তের॥

ইসহাক উদ্‌দীন॥

তারপরে গেল আবু এক গলি পর।
গান বাজা শুনে এক দরজার ভিতর॥
পরে সেই ঘর হৈতে নাজনি ছুরত।
নেকালিল আজব এক হাসিন আওরত॥
কি কব বিবির কথা আওরত এমন।
পূর্ণিমার চান্দ মত ছুরত রৌশন॥
কেতাম বলিয়া নাম সেই আওরতের।
ওম্মর হইল তার চৌদ্দ বছরের॥
হাসিন যৌবনপূর্ণ আছিল সে বিবি।
কুফাতে জাহের ছিল ছুরতের খুবি॥
তারে যে দেখিত সেই পাগল হইত।
তাহার ইশ্‌কেতে কত মরিয়া যাইত॥

মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া কাব্যগুলির মধ্যে রূপ-বর্ণনার ক্ষেত্রে ফকীর গরীবুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। শুধু রূপবর্ণনার কথাইবা বলি কেন, যুদ্ধবর্ণনা ও শোকবর্ণনার ক্ষেত্রেও

তিনি ইংরেজ আমলের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার যুদ্ধবর্ণনার নমুনা দেখুন ঃ

ঝাণ্ডা ও নিশান কত এনে খাড়া কৈল।
ভেউর করনাল আদি বাজিতে লাগিল ॥
অপূর্ব নাকারা অষ্ট ধাউতের বাজে।
শুনিয়া লড়াই বাজা চলে রণ মাঝে ॥
বড় বড় কামান দাগায় দুড়দুড়।
নবীন মেঘেতে যেন ডাকে গুড় গুড় ॥

উপরোদ্ধৃত পংক্তিতে 'কামান' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'কামান' মুঘল আমলের যুদ্ধাস্ত্র। তখন হইতে ইংরেজ আমলেও কামানের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সুতরাং ইংরেজ আমলের কবি গরীবুল্লাহ্ কারবালার যুদ্ধবর্ণনায় 'কামান' আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। যাহা হউক, কারবালার বীর পুরুষগণের বীর্যবত্তার বর্ণনা এবং তাঁহাদের চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে কবি বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। যুদ্ধ-বর্ণনায় কবির পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হইলেও তাহা বাস্তবানুগ নহে, মূলতঃ কাল্পনিক। কবি যেখানেই বাস্তব ঘটনার পরিচর্যা করিয়াছেন, সেখানে তিনি কল্পনার এত রঙ্ ফলাইয়াছেন যে, তাহাতে প্রকৃত ব্যাপার জানিবার উপায় নাই।

ইংরেজ আমলের একেবারে শেষের দিকে যখন বাংলা সাহিত্যাদর্শ অত্যন্ত মার্জিত এবং তাহা বাস্তবতার উপর ভিত্তি করিয়া উন্নতির স্বর্ণচূড়ায় আরোহণ করিয়াছে, তখন মুসলমানী বাংলা ভাষায় অন্যান্য কবির কয়েকখানি মর্সীয়া কাব্য রচিত হইলেও কাহিনী, ভাব-কল্পনা এবং ভাষার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। পরিবর্তন ত দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা অর্থাৎ মুহম্মদ ইসহাক উদ্‌দীন এবং কাযী আমীনুল হক পূর্বসূরিগণের ভাব ও ভাষার অনুকরণ ও অনুসরণ করায় এবং যুদ্ধ ও করুণ

কাহিনীর সুদীর্ঘ বর্ণনা দেওয়ায় কাব্যগুলি 'দামামার বাদ্যধ্বনি'তে পর্যবসিত হইয়াছে ও 'অশ্রুর প্রবাহে' ভাসিয়া গিয়াছে। ফলে, কাব্য দুইখানি রসানুভূতি ও মনোহর শিল্প-সত্তায় মণ্ডিত হয় নাই।

'জঙ্গনামা' গরীবুল্লাহ্‌র মৌলিক কাব্য নহে; ফারসী 'মকতুল হুসৈন' কাব্যের বাংলা অনুবাদ। কিন্তু কবির ফারসী-উরদূ-হিন্দী শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং মুসলিম সমাজের প্রতি হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি 'জঙ্গনামা' কাব্যখানির উপর সৌন্দর্যের প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছে। কবি ফারসী কাব্যের অনুসরণ করিলেও বহুস্থলে তাঁহার নিজস্ব ভাব-কল্পনা ও চিন্তাধারার ছাপ মুদ্রিত হইয়াছে। গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যে ললিত ভাব ও কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার অভাব নাই; কিন্তু তিনি একটি সুন্দর মালা গাঁথিয়া তুলিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে ভাষা শ্লথ ও গতানুগতিক। যুদ্ধবর্ণনা এবং শোক বর্ণনায় কবি সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। তবে এ-কাব্যে গরীবুল্লাহ্‌ যে-আদর্শকে বড় করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। মুসলমানী বাংলায় তিনি কাব্য রচনা করিলেও বহুস্থলে খাঁটি বাংলা ভাষা অনুসৃত হইয়াছে। ইহাতে কাব্যখানি বহুকাল যাবৎ বাঙালী জনসাধারণ কর্তৃক সাদরে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার বিশুদ্ধ সাধু বাংলা ভাষা প্রয়োগের সামান্য একটা নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

একদিন মোহাম্মদ নবী পয়গম্বর।
ঈদের মসজিদে গেল নামাজ পড়িবার ॥
নামাজ পড়িয়া নবী উঠিয়া চলিল।
ফাতেমা যেখানে সেথা আসিয়া পৌছিল ॥
ঘরেতে ফাতেমা বিবি কান্দেন বসিয়া।
রসুল বলেন মাতা কান্দ কি লাগিয়া ॥

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় কাব্য রচনা

করিয়াছেন। তিনি ফারসী, হিন্দী উত্তমরূপে জানিতেন; ফলে এই সকল ভাষার শব্দাবলী তাঁহার কাব্যে অনেক স্থলে আসিয়া গিয়াছে। ভারতচন্দ্রও গরীবুল্লাহ্‌র ন্যায় বহু ভাষার সংমিশ্রণে 'চণ্ডী নাটক' লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন[৩]।

মুহম্মদ মুনশীর কাব্যের বর্ণনা-বৈশিষ্ট্য জনাব আলীর কাব্যের বৈশিষ্ট্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর নহে। উভয় কবিই যুদ্ধের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন; কিন্তু নারীরূপের বর্ণনাকে তাঁহারা দীর্ঘ করেন নাই। আমীনুল হকের কাব্যের ভাষা বৈশিষ্ট্যহীন হইলেও দুই এক স্থলে তাঁহার বর্ণনা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে। নারীরূপের বর্ণনায় তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। ইহাতে স্বাভাবিক কবিত্ব ও ভাষা-মাধুর্য লক্ষণীয়। যথা:

যুবতী আওরত ইনি কোতাম নামেতে।
জগৎ মোহিত ছিল যাহার রূপেতে।।
বয়স পনর ছিল নাজনী আকার।
পুরুষের মন ভুলে ছুরতে তাহার।।
খঞ্জর গামিনী রূপ চন্দ্রিমা জিনিয়া।
আজব সুন্দরী ছিল মুল্লুক জুড়িয়া।।
যৌবন হয়েছে পূর্ণ গোলাপ যেমন।
অন্তর উতালা হয় দেখে যেই জন।।

কবিগণের বর্ণিত অধিকাংশ নারীই রূপবতী। গরীবুল্লাহ্, আমীনুল হক প্রভৃতি কবি অনেক স্থলে নারী-রূপের সোজাসুজি বর্ণনা দিয়াছেন। এ-সম্পর্কে আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত, তাঁহারা রমণীর রূপ সোজাসুজি বর্ণনা না করিয়া অপরের

---

৩ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৩।

উপর তাহার প্রভাব দেখাইয়া তাহার মাধুর্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গরীবুল্লাহ্‌র চিত্রিত জয়নব সুন্দরী। তাঁহার সৌন্দর্য এমন চিত্তাকর্ষক যে, এজিদের বিবাহের ঘটক ঃ

আনছারী যাইয়া রূপ জয়নবের দেখে।
দেওয়ানা হইল বুড়া ঘন ঘন তাকে ॥

আমীনুল হকের কাব্য-বর্ণিত কুটনী আয়ছুনীও যখন জায়েদাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলে ঃ

এমন রূপসী নারী নবীন যৌবন।
কেন কাটাইতেছ এ হালে জীবন ॥
তোমার মতন বিবি লায়েক রাজার।
রাণীর সুযোগ্য তুমি রূপেতে তোমার ॥
মুল্লুকে মুল্লুকে তব রূপের বর্ণনা।
শুনিয়া অনেক বাদশা আছেন দেওয়ানা ॥

ইহা কুটনীর শুধু চাটুবাক্য নহে, ইহাতে নারীরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আছে। ইসহাক উদ্‌দীনের কাব্যে যুদ্ধ ও শোকবর্ণনার বাড়াবাড়ি গোচরীভূত। কোন কোন স্থলে তাহা সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার বর্ণনা গতানুগতিক ও মামুলী। বাক্-সংযম ও শিল্পসৃষ্টির দিকে কবির কোন খেয়ালই ছিল না। তিনি বহু স্থলে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

কবিগণ সাধারণতঃ যুদ্ধের বর্ণনায় ভেউর, কর্ণাল, নাকারা, তবল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এবং বন্দুক, তোপ, তীর, কামান, ঢাক, জুলফিক্‌কার, তলোয়ার, খঞ্জর, নেজা, ছুরি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। গরীবুল্লাহ্‌র যুদ্ধবর্ণনার সামান্য নমুনা ইতঃপূর্বে দিয়াছি ; এক্ষণে অন্যান্য কবির কাব্য হইতে দুই একটি যুদ্ধবর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, তাঁহাদের কবিধর্ম ও ভাব-

কল্পনার মধ্যে প্রচুর সামঞ্জস্য বর্তমান। জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশীর যুদ্ধবর্ণনা কল্পনায় অনুরঞ্জিত ; কিন্তু ভাষায় ঐশ্বর্য নাই। যথা ঃ

জনাব আলী ॥

এলাহী ভাবিয়া মর্দ কোমর বান্ধিল।
জোলফিক্কার হাতে লিয়া বাহির হইল ॥
চৌদিকে ঘিরিয়া আছে দুশ্মন সওয়ার।
সে এয়ছা গর্জে আর বলে মার মার ॥
হাঁকিয়া হায়দরি হাঁক আল্লা আল্লা বলে।
বাঘ যেন সান্ধাইল ছাগলের পালে ॥
বিজলী চমকায় যেয়ছা তলওয়ার চালায়।
দশ বিশ দুশ্মনেরে মারিয়া গিরায় ॥
দফা দফা করে মারিয়া তলওয়ার।
একেবারে করে দেয় জাহান্নাম সার ॥
যেদিকে কুঁদিয়া পড়ে মোসলেম জওয়ান।
দাপটে জমিন হেলে ভয়ে কাঁপে জান ॥

মুহম্মদ মুনশী ॥

যখন মোসলেম শাহা আওয়াজ শুনিল এহা
কেতাবেতে এয়ছাই জেকের ॥
ঘোড়ার টাপের শব্দ আর নাকারার বাদ্য।
লস্করের শুনে সোরসার।
জোস আইল দেল পরে জানের না আশ করে
সঁপে জান রাহেতে আল্লার ॥
আর দু লাড়কারে লিয়া এক জনে সাথে দিয়া
ভেজে কাজী সরিহের ঘরে।
এলাহী ভাবিয়া মর্দ জানের না করে দর্দ
কোমর বান্দিল তারপরে ॥

জোলফিকার লিয়া হাতে আইল মর্দ বাহিরেতে
গোস্বায় অজুদ জ্বলে গেল।
চৌদিকে দুশমন যত ঘিরে আছে শত শত
শের এয়ছা গর্জিতে লাগিল ॥

আমীনুল হকের কাব্য, জনাব আলী ও মুহম্মদ মুনশীর কবি-ধর্ম এবং ভাব-কল্পনার অনুসরণেই রচিত। তবে, যুদ্ধ-বর্ণনায় আমীনুল হক বহু ক্ষেত্রে বাংলা শব্দ অধিক ব্যবহার করিয়াছেন। মুসলমানী বাংলায় রচিত কাব্যগুলির মধ্যে তাঁহার কাব্যের যুদ্ধবর্ণনা-কৌশল লক্ষণীয়; একটি উদাহরণ দেওয়া হইল। যথা ঃ

আকবর মারিল নেজা জোরেতে খেঁচিয়া।
মেজর উড়ায় তাহা শিরে ঢাল দিয়া ॥
দুই জনের পরে নেজা দুই জনে মারে।
ঝনাঝন্ শব্দ হয় ঢালের উপরে ॥
বাহিরিল অগ্নিশিখা দুই নেজা দিয়া।
বহু নেজা মারে তারা গোস্বায় জ্বলিয়া ॥
দুই জনে নেজা ছাড়ি লয় পরে তেগ।
মারিতে লাগিল জোরে হই বেদেরেগ ॥

মুসলমানী বাংলায় রচিত কাব্যগুলির বর্ণনা-কৌশল সম্পর্কে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

অলঙ্কার-ব্যবহার

মুসলমানী বাংলায় রচিত কাব্যে কবিগণ অল্প-বিস্তর অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন। এই ধারার কবিগণ কেহই প্রতিভাশালী ছিলেন না; কাজেই অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেহই পারদর্শিতা

অর্জন করিতে পারেন নাই। এতদ্দেশীয় পরিবেশের প্রভাব এই কাব্যগুলির মধ্যে পড়িয়াছে অধিক। কবিগণ সাধারণতঃ এ-দেশীয় গাছপালা, পশুপক্ষী, মৎস, লতাপাতাবৃক্ষ প্রভৃতিকে উপমা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। উপমাগুলির অধিকাংশই গতানুগতিক এবং লালিত্যহীন। গতানুগতিক উপমার কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল। যেমন ঃ

ক। অগাধ জলেতে যেন ডুবে পানকৌড়ি। (গরীবুল্লাহ্)

খ। যেমন কৃপণ আছাড়ে ধান্যবিড়া।
হাড় গোড় গেল গিধির চূর্ণ হয়ে হেড়া॥ (ঐ)

গ। এইরূপে তেগবাজী করে পাহালওয়ান।
ঝড়েতে গিরায় যেয়ছা কলার বাগান॥ (জনাব আলী)

ঘ। ধূপেতে তন্দুর যেন গরমেতে জ্বলে।
আহা কৈলে মুখ হইতে ধূমা যে নেকালে॥ (মুহম্মদ মুন্‌শী)

ঙ। জলহীন মাছসম ধড়্‌ফড়্ করি।
হুঁশহারা জমিনেতে যায় গড়াগড়ি॥ (আমীনুল হক)

কবিগণের ব্যবহৃত এইরূপ অসংখ্য উপমা প্রয়োগের ফলে কাব্যগুলির মধ্যে কোন বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয় নাই ; তাহা এক-ঘেঁয়ে হইয়াছে। তবে গরীবুল্লাহ্‌র উপমা-অলঙ্কার একেবারে বৈচিত্র্যহীন নহে। যথা ঃ

ক। পূরবে উদয় হৈল যেন পূর্ণ শশী।
খ। নব মেঘের ঘটা যেন শোভে ভূমিতলে।
গ। আশমান উপরে যেন মেঘের তুফান।
ঘ। বয়স নয় সাল তার শিশু মূর্তিমান।

ঙ। দেখিল উজালা ঘর মানিক প্রকাশে :
পূর্ণিমার চান্দ যেন উদয় আকাশে ॥

ইংরেজ আমলের সব কবিই কমবেশী অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ইসহাক উদ্দীন অন্য সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি 'আগুন' ও 'কলার বাগান'-এর উপমা এত অধিক ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। যে-প্রতিভা থাকিলে ফারসী-উরদূ-হিন্দী শব্দের অবাধ ও চমকপ্রদ মিশ্রণে ও সার্থক অলঙ্কার-প্রয়োগে কাব্য শ্রীমণ্ডিত ও রসময় হইয়া উঠে তাহা তাঁহার ও অপর কাহারও ছিল না। মুসলমানী বাংলায় রচিত মর্সীয়া কাব্যগুলির ভিতর হইতে কয়েকটি সার্থক অলঙ্কারের উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হইল।

যমক :

ক দ্ আঁখি হৈয়াছে লাল মুখেতে ভাঙ্গিছে লাল
কহিলেন ভায়ে আন গিয়া।
(গরীবুল্লাহ : জঙ্গনামা)

খ। এহাতক লড়িলেন হোসেনের লাল।
খুনেতে কাপড় সব হয়ে গেল লাল ॥
(মুহম্মদ মুনশী : শহীদে কারবালা)

ব্যাখ্যা :

ক উদ্ধৃতিটির প্রথম 'লাল' অর্থ রক্তবর্ণ এবং দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখের লালা। একই 'লাল' শব্দ অবিকলরূপে একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া যমক অলঙ্কার হইয়াছে। অনুরূপভাবে খ উদ্ধৃতিটির প্রথম 'লাল' অর্থ প্রাণ-প্রিয় এবং দ্বিতীয় 'লাল' শব্দের অর্থ রক্তবর্ণ। এখানেও একই শব্দ

অবিকলরূপে একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় যমক অলঙ্কার হইয়াছে।

<u>সমাসোক্তি</u> :

ওহে হাওয়া বল মোর সালাম হাজার।
জাতে পাকে মোস্তফার রওজা মাঝার॥
মোসাফেরি হালে থাকি বিদেশে আসিয়া।
কি দুঃখেতে মারা যাই বলিও যাইয়া॥
ওহে হাওয়া তুমি বিনা কেহ নাহি আর।
হোসাইনকে বল গিয়া অবস্থা আমার॥
বল গিয়া যা করিল কুফী মোর সাথে॥
শত মানা তাহার তরে কুফা না আসিতে॥

(আমীরুল হক : জঙ্গে কারবালা)

ব্যাখ্যা :

এখানে অচেতন 'হাওয়া'-র (উপমেয়) উপর চেতন মানবীয় (উপমান) ধর্ম আরোপ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা সমাসোক্তি অলঙ্কার।

<u>ব্যতিরেক</u> :

সে রূপ পূর্ণিমার চাঁদ নূরের মূরত।
যার আগে রবি শশী লজ্জিত সতত॥

(জনাব আলী : শহীদে কারবালা)

ব্যাখ্যা :

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে হোসেনের 'রূপ' 'রবি-শশী'কে সর্বদা লজ্জা দেয়—এই উক্তিতে উপমান 'রবি-শশী' অপেক্ষা উপমেয় 'রূপ'-এর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা ব্যতিরেক অলঙ্কার।

<u>অনুপ্রাস</u> ঃ

হোসেন আমার জান আমি তার জান।
তাহারে সঁপিলে রবে কিরূপেতে জান ।।

(সাদ আলী ও আঃ ওহাব ঃ শহীদে কারবালা)

ব্যাখ্যা ঃ

এখানে 'জান' বর্ণচয় বারংবার বিন্যাসের দ্বারা ধ্বনিগত সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা অনুপ্রাস।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইংরেজ আমলে রচিত আধুনিক বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচিত হইবে।

গ। আধুনিক বাংলায় রচিত মর্সীয়া সাহিত্য (১৮০০-১৯৪৭)

(i) গদ্য

ইংরেজ আমলে আধুনিক বাংলা গদ্যেও মর্সীয়া সাহিত্য রচিত হয়। মীর মুশার্রফ হুসৈনের 'বিষাদসিন্ধু' এই ধারার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত, ফজলুর রহমান চৌধুরীর 'মহরম চিত্র' (১৯১৭) এবং ডাঃ লুৎফর রহমানের 'ছেলেদের কারবালা'-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে যেহেতু 'বিষাদসিন্ধু' এই গদ্যধারার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সে-কারণে বর্তমান পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থ সম্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হইল।

মীর মুশার্রফ হুসৈন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার কুমারখালির অন্তর্গত গৌরীতটস্থ লাহিনীপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আত্মচরিত 'আমার জীবনী'

হইতে জানা যায় যে, ছাত্রজীবনেই তাঁহার সাহিত্য সাধনার উন্মেষ হয়। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালির 'গ্রামবার্তা'-সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙ্গাল হরিনাথ তাঁহার সাহিত্যগুরু। মীর সাহেব দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ক্ষুদ্রবৃহৎ ছাব্বিশখানি পুস্তকের প্রণেতা।[১] 'বিষাদসিন্ধু' (মহরম-পর্ব) বাংলা ১২৯১ সালে (১৮৮৫) প্রকাশিত হইলে সাহিত্যিক-মহলে সাড়া পড়িয়া যায়। বাংলা ১২৯৪ সালে 'উদ্ধারপর্ব' এবং ১২৯৭ সালে 'এজিদবধপর্ব' প্রকাশিত হয়। বস্তুতপক্ষে একমাত্র 'বিষাদসিন্ধু-ই' তাঁহাকে বাংলাদেশের পাঠকসমাজের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়াছে। মীর সাহেবের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩), 'গোজীবন' (১৮৮৯), 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০), 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯), 'আমার জীবনী' (১৯০৮-১০), 'বিবি কুলসুম' (১৯১০) প্রভৃতি সমধিক বিখ্যাত। তিনি বাংলা ১৩১৮ সালে (১৯১২) মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মীর মুশার্রফ হুসৈনের 'বিষাদসিন্ধু' গদ্য ভাষায় লিখিত। কিন্তু ইহার কাহিনী এবং বিষয়বস্তু যে মুঘল আমলের ঐতিহ্যবাহী সাধু বাংলা ভাষায় রচিত মর্সীয়া কাব্য ও ইংরেজ আমলের মুসলমানী

---

১ ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক চরিত মালা'-য় (২য় খণ্ড, চরিতমালা সংখ্যা ২৯, পৃঃ ৩৭-৪৫) ২৫খানি পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু 'বিবি কুলসুম' (মীর এবরাহীম হোসেন কর্তৃক ১ নং ফাষ্ট লেন, আহীর পুকুর, কলিকাতা হইতে বাং ১৩১৭ সালে প্রকাশিত), গ্রন্থের শেষের দিকে বিজ্ঞাপনে মীর সাহেব নিজেই তৎপ্রকাশিত ২৬ খানি গ্রন্থের নাম প্রদান করিয়াছেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ত্রিশ খানি পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (মু. বা. সা. ১ম মুদ্রণ ১৯৫৭, ঢাকা, পৃঃ ৩০৭)।

বাংলায় রচিত মর্সীয়া কাব্যগুলি হইতে অনুসৃত হইয়াছে, তুলনা করিয়া দেখিলে সে-সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তবে, মীর সাহেবের রচনানৈপুণ্যে কারবালার বিষাদময় কাহিনী পূর্ববর্তী কবিগণের রচিত কাহিনী অপেক্ষা হৃদয়স্পর্শী। 'কারবালার বিষাদকরুণ কাহিনীকে আরও বিষাদময় ক'রে তোলার দিকে পুঁথি-কাররা বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন, মীর সাহেব সে বেদনাকেই মুসলমানদের জাতীয়-বেদনা হিসেবে অভিব্যক্তি দেবার জন্যে 'বিষাদ সিন্ধু' রচনা করেন। মুসলমানদের এই জাতীয় বেদনাকে গভীরতা দেবার এবং সুদূরপ্রসারী ক'রে তোলবার জন্যেই তিনি বিষাদের এক সমগ্র রূপ ধ্যান করেছেন'[২]। বস্তুতপক্ষে, তিনি নিপুণ তুলিকাস্পর্শে অনেক অসম্ভব ঘটনাকেও সম্ভাব্যতার সীমায় টানিয়া আনিয়াছেন এবং পাঠকের উদ্ভত অবিশ্বাসকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে এমন কতকগুলি অবান্তর ঘটনার সমাবেশ আছে যেগুলি বাদ দিলেও ইহার গতিপ্রবাহ ব্যাহত হইত না।

মীর সাহেব পূর্বসূরী কবিদের রচিত মর্সীয়া কাব্যের অনুসরণে 'বিষাদসিন্ধু' রচনা করায় তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে অসাধারণত্বের ছাপ প্রচুর বিদ্যমান। মীর সাহেবের প্রধান চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক; কিন্তু অপ্রধান চরিত্রগুলির অধিকাংশই ইতিহাস-বহির্ভূত; এগুলির উৎস লেখকের কল্পনা ও নানা কিম্বদন্তী। অনেক ক্ষেত্রে মীর সাহেব ঐতিহাসিক চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে নিজস্ব ভাব-কল্পনা ও চিন্তাধারার এত বেশী রঙ্ ফলাইয়াছেন যে, তাহাদিগকে ঐতিহাসিক

---

২ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্সান: বা. সা. ই। ঢা. বি., ১৯৫৬, পৃঃ ৭৫।

চরিত্ররূপে চিনিবার উপায় নাই। ইতিহাস-প্রধান ঘটনা ও কাহিনী যতই পুরাতন ও প্রাচীন হইবে, তাহার পটভূমিকায় গ্রন্থ রচিত হইলে তাহা লেখকের কল্পনায় ততই বিচিত্রবর্ণে অনুরঞ্জিত হয়। কাজেই, কারবালা যুদ্ধ-সম্পর্কিত এই গ্রন্থ-রচনায় লেখকের কল্পনা-প্রবণতার পরিচয় আছে অনেক। সুতরাং, যে-দেশে ইমাম হোসেন, এজিদ, মোহাম্মদ হানিফা বাস করিতেন সেদেশ আরব-পারস্য নহে—কল্পনার অমরাপুরী।

বন্ধুর ছদ্মবেশে আবদুল্লাহ্ যেয়াদের ষড়যন্ত্র, স্বর্গীয় দূত ও পয়গম্বরগণের হোসেনের মৃতদেহের নিকট আগমন ও শোকপ্রকাশ, পর্বতমালা কর্তৃক মোহাম্মদ হানিফাকে বেষ্টন এবং হানিফার বন্দিবাস—এই সব কাহিনীতে বাস্তবতার লেশমাত্র নাই; ইহারা অপ্রত্যাশিত, অলৌকিক এবং অনন্যসাধারণ।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কারবালা যুদ্ধের মূল কারণ—রাজনৈতিক। মুআ'বিয়া-পুত্র এজিদকে হাসান-হোসেন খলীফা বলিয়া স্বীকৃতি না দেওয়ায় কারবালা যুদ্ধের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠে। তথচ মীর মুশার্রফ হুসৈন পূর্বসূরী কবি মুহম্মদ খান, গরীবুল্লাহ্ প্রমুখের অনুকরণে দেখাইয়াছেন যে, এই যুদ্ধের পশ্চাতে মূল উৎস প্রেম। বিশেষতঃ এই সময়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কুন্দ-নগেন্দ্রনাথ, রোহিণী-গোবিন্দলাল, প্রতাপ-শৈবলিনী প্রভৃতি নর-নারীর মারফত রূপজ মোহের প্রবল দাহ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কাজেই, তিনি তাঁহার গ্রন্থেও বর্ণনা করিয়াছেন যে, জয়নাবের রূপ-লালসায় প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহাকে অঙ্কশায়ী করিবার দুর্নিবার আকাংক্ষায় এজিদ উন্মত্ত; কিন্তু জয়নাব তাঁহাকে বিবাহ না করিয়া হাসানকে পতিত্বে বরণ করায় এজিদের ক্রোধানল হাসান-হোসেন নিধনে প্রজ্বলিত হয়। শুধু তাহাই নহে, নারীর রূপ-লালসাই তাঁহাকে নবী-বংশ ধ্বংস

করিবার জন্য উন্মত্ত করিয়া তুলে[৩]। এই প্রসঙ্গে এজিদের উক্তি স্মরণীয়ঃ

'হাসানের এত বড় সাহস! এত বড় স্পর্ধা! ভিখারিণীর পুত্র হইয়া রাজরাণীর পাণি-গ্রহণ! যে জয়নাব রাজরাণী হইত, সেই ভিখারিণী-পুত্র তাহারই পাণিগ্রহণ করিয়াছে। আমি উহার বিবাহের সাধ মিটাইয়া দিব। জয়নাবকে লইয়া সুখভোগ করিবার সমুচিত প্রতিফল দিব। কে রক্ষা করিবে? কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? এজিদ জগতে থাকিতে জয়নাবকে লইয়া সে কখনই সুখী হইতে পারিবে না........ .. মহাআসক্তির আগুনে এজিদের অন্তর সর্বদা জ্বলিতেছে। যদি আমি মাবিয়ার পুত্র হই, তবে হাসান-হোসেনের বংশ একেবারে নিপাত না করিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিব না'। (মহরম পর্ব, নবম প্রবাহ)

অন্যস্থলে জয়নাবের উক্তি লক্ষণীয়। জয়নাব বলিতেছেনঃ

'হায় আমার নিজ জীবনের আদি-অন্ত ঘটনা মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত সপ্রমাণ হইবে, এই হতভাগিনীই বিষাদসিন্ধুর মূল। জয়নাবই এই মহা প্রলয়কাণ্ডের মূল কারণ। হায়! হায়!! আমার জন্যই নূরনবী মোহাম্মদের পরিবার-পরিজন প্রতি এই সাংঘাতিক অত্যাচার।' (এজিদবধ পর্ব, তৃতীয় প্রবাহ)

ইহার পরে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, মীর সাহেব বীবী জয়নাবকেই কারবালা যুদ্ধের মূল উৎস বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

এজিদ 'বিষাদসিন্ধু'র শ্রেষ্ঠ চরিত্র। কিন্তু এ-এজিদ মীর সাহেবের কল্পলোকের সৃষ্টি। এজিদ প্রথমে নারীর রূপজমোহমুগ্ধ

---

৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬।

প্রেমিক। অতঃপর, সে ব্যর্থ প্রেমে দগ্ধীভূত হইয়া শত্রু ধ্বংসের নেশায় উন্মত্ত। লেখক এজিদের উন্মত্ততার চিত্র আঁকিয়াছেন; এজিদ শক্তিমদে মত্ত হইয়া সকলকে অস্বীকার করিয়াছেন। মীর সাহেব এজিদ ও অন্যান্য নরনারীর হৃদয়ের নানা প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি এজিদের মনের ক্রোধকে সমগ্রভাবে দেখিয়াছেন এবং সেই প্রবৃত্তির অত্যধিক অনুশীলনের পরিণাম চিত্রিত করিয়াছেন। লেখকের নিকট এজিদের ক্রোধ শুধু প্রবৃত্তি বলিয়া মনে হয় নাই; তাহাকে তিনি শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এজিদ কবি মধুসূদনের রাবণ ও হেমচন্দ্রের বৃত্রের ন্যায় বিশাল ও শক্তিমান। পক্ষান্তরে, হোসেন-চরিত্র এজিদের তুলনায় অনুজ্জ্বল। মীর সাহেব হোসেনের প্রতি অকুণ্ঠ সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে কার্পণ্য করেন নাই; কিন্তু এজিদের শৌর্য, বীর্য ও পরাক্রমের নিকট তাহা তেমন গুরুত্বলাভ করে নাই। 'বিষাদ-সিন্ধু'র এক একটি প্রবাহে বিষাদের আবর্তন অপেক্ষা শক্তিমদগর্বী এজিদের ক্রোধের স্ফুলিঙ্গই বেশী প্রজ্বলিত হইয়াছে। তিনি নবী-বংশ ধ্বংস করিয়াছেন।

'বিষাদসিন্ধু'-কে উপন্যাস হিসাবে গ্রহণ করিলে দেখা যায়, 'মহরম পর্বে' লেখকের যে-শিল্পচাতুর্য, বাক্-সংযম, মননশীলতা ও কাহিনীর গাঢ়বদ্ধতার পরিচয় বিদ্যমান পরবর্তী দুইটি পর্বে তাহা অনুপস্থিত। এই দুই পর্বের কাহিনী সংস্থানে শিথিলতা ও বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্যযোগ্য। চরিত্রগুলি বর্ণনাবহুল, তাহারা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। তাছাড়া, বহুক্ষেত্রে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হওয়ায় এ-অংশের রচনা শিল্পমণ্ডিত হয় নাই। এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ 'এজিদবধ পর্ব'। গ্রন্থের প্রারম্ভে নায়ক এজিদের মনোভাব বর্ণিত হইয়াছে এবং কি করিয়া কারবালা যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে পারে, তাহারও বৃত্তান্ত উপন্যাসের প্রথম ভাগে

(মহরমপর্ব) আছে। অতঃপর, ধীরে ধীরে আখ্যায়িকায় নানা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। মহরমপর্বে কাহিনীর সূত্রপাত ও দ্বন্দ্বের যে-পরিচয় আছে 'উদ্ধারপর্বে' তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। যে-এজিদের জন্য এত যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা-ধ্বংস, সেই এজিদ যখন হানিফার ভয়ে পলায়ন করিলেন, তখন গ্রন্থের যবনিকাপাত করিলে শিল্প-সত্তা বজায় থাকিত। কিন্তু তাহা না করিয়া গ্রন্থকার 'এজিদবধপর্বের' অবতারণা করিয়াছেন এবং ইমাম পরিবারকে বন্দিগৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া ও এজিদ-হানিফার জীবনের অস্বাভাবিক পরিণতি দেখাইয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। 'এজিদবধপর্ব' সন্নিবেশের ফলে গ্রন্থের শিল্পকলা যে ক্ষুণ্ণ হইল, মীর সাহেব সেদিকে খেয়াল করেন নাই। বস্তুতঃ, 'এজিদবধপর্বে' লেখক নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এই অংশটি প্রাণহীন।

সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে অতিকথন, ঘনঘটাপূর্ণ ঘটনা ও অসংবদ্ধ আখ্যান মাঝে মাঝে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। বহুস্থলে বাক্-সংযমের অভাব পীড়াদায়ক হইয়াছে। ভাষা সহজ, সরল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন ; কিন্তু লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতির বর্ণনা-বাহুল্যে রচনা অনেক ক্ষেত্রে অতিকথন দোষে দুষ্ট। এ-কারণে, 'বিষাদসিন্ধু'র কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৎসত্ত্বেও, লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির বর্ণনাগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ইহা একাধারে ইতিহাস আশ্রিত রোমান্টিক উপাখ্যান ও গদ্য মহাকাব্য।

'বিষাদ-সিন্ধু'-র এ-সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও গতিশীল ও আকর্ষণীয় ভাষায়, নাটকীয় ভঙ্গিতে নর-নারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার চিত্র অঙ্কনে মীর সাহেবের কৃতিত্ব অবিসম্বাদিত। তিনি যেমন জায়েদার দুঃখ, আঘাত ও অন্তর্বেদনাকে তাঁহার মনের বিস্তীর্ণ সহানুভূতি দিয়া অঙ্কন করিয়াছেন, তেমনি এজিদের হিংসা ও

ক্রোধকে বরণ করিয়া তাহাকে গ্রন্থমধ্যে উপস্থিত করিয়াছেন। যে-জয়নাবের জন্য কারবালা যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়াছে, সেই স্বামি-হীনা জয়নাবের রুদ্ধ বেদনাকে তিনি বাণীময় রূপ দিয়াছেন। এ সব নরনারীর চরিত্র-সৃষ্টিতে লেখকের দরদী মনের পরিচয় পরিস্ফুট। ঘটনার দিক হইতে মায়মূনার ষড়যন্ত্র, জায়েদার স্বামি-হত্যা, আজরের সপরিবারে আত্মদান, কাসেম-সখিনার বিবাহবন্ধন ও চিরবিচ্ছেদ প্রভৃতির বর্ণনা মীর সাহেবের সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন। 'বিষাদসিন্ধু' যে এখনও বাংলা সাহিত্যের একখানি জনপ্রিয় গ্রন্থ, তাহার মূলে আছে এই সজীবতা।

ফলতঃ মুসলিম গৌরবগাথা মীর সাহেবের জীবনকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। তাই, 'বিষাদ-সিন্ধু' ভাব, ভাষা, শব্দবন্ধ, গ্রন্থন-নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি লেখকের সর্বজনীন অনুভূতিতে বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের গদ্যধারার এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। জগৎ ও জীবন, সত্য ও সুন্দর উদ্ঘাটিত করিবার ক্ষেত্রে মীর সাহেবের কৃতিত্বের জন্যই 'বিষাদসিন্ধু' আজও হিন্দু-মুসলমানের প্রিয় গ্রন্থ।

গ। আধুনিক বাংলায় রচিত মর্সীয়া সাহিত্য
(১৮০০-১৯৪৭)

(ii) পদ্য

ইংরেজ আমলে আধুনিক বাংলায় মর্সীয়া কাব্যও অনেক রচিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা মর্সীয়া কাব্যের কবিগণের মধ্যে আবুল মা'আলী মুহম্মদ হামিদ আলী, মতীয়ুর রহমান খান, কায়কোবাদ, আবদুল বারী, আবদুল মুনায়েম, সৈয়্যিদ ইসমাঈল হুসৈন সিরাজী, মুহম্মদ ইবরাহীম, মীর রহমত আলী, দমসের আলী

তালুকদার ও আজীজুল হাকিমের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় 'বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য' আজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

এক. আবুল মা'আলী মুহম্মদ হামিদ আলী (১৮৬৫-১৯৫৩) : ইনি চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে (পোষ্টঅফিস—জালালীহাট) বাংলা ১২৭২ সালে (১৮৬৫) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফাইন্যাল মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুমিল্লা জেলা স্কুল, নোয়াখালি জেলা স্কুল, কুষ্টিয়া ও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে সহকারী শিক্ষকের (মৌলভীর ?) পদে অতি দক্ষতার সহিত কার্য করেন। আরবী-ফারসী শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিলেও তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষাতেও ছিলেন পারদর্শী। তিনি 'কাসেমবধকাব্য', 'জয়নলোদ্ধার কাব্য', 'সোহরাববধ কাব্য', 'কবিতাকুঞ্জ' প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কবির কবিত্ব-উন্মেষের মূলে আছে ভ্রাতৃ-বিয়োগ। কবি ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যুতে মুহ্যমান হইয়া সর্বপ্রথম 'ভ্রাতৃ-বিলাপ' রচনা করেন[১]। বিশেষ উল্লেখ্য যে, হামিদ আলী মাইকেল মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'কাসেমবধকাব্য' ও 'জয়নলোদ্ধারকাব্য' নির্মান করেন এবং কাব্য দুইখানি মুসলিম পাঠক-পাঠিকার প্রশংসা অর্জন করে। কবির প্রায় সব কাব্যই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রীতি-ভালবাসায় সিক্ত। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য দুইখানি আধুনিক বাংলা মর্সীয়া কাব্যগুলির অন্যতম। মুসলিম পাঠক-পাঠিকার জন্য স্বতন্ত্র

---

১ কাসেমবধকাব্যের 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য। ১ম সংস্করণ, ১৯০৫।

সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কবি হামিদ আলী এই কাব্য দুইখানি রচনা করিয়াছিলেন[২]। 'কাসেমবধকাব্য বা শাহাদতে ইমাম কাসেম' কাব্যের বিষয় —কারবালার ভীষণতম যুদ্ধ, নবী পরিজনের শোচনীয় দুর্গতি ও সখিনার মর্মভেদী বিলাপ। কাব্যখানি ছয় সর্গে সমাপ্ত এবং আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

মুঘল আমলের মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণ যে-শিল্পচেতনা ও ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হইয়া কাব্যাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ইংরেজ আমলের আধুনিক বাংলার কবিগণের মধ্যে সেই চেতনাই ক্রিয়া করিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) প্রমুখের আবির্ভাব ও বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক রীতির প্রবর্তন* ও অনুবর্তন একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এইসব কবি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী-নির্ভর মহাকাব্য ও খণ্ড কাব্যাদি রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে এ-সময়ে কোন মহৎ ও উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই; তাঁহাদের পক্ষে ইহা সম্ভবপরও ছিল না। তথাপি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বাংলা দেশ জুড়িয়া বাঙালী মুসলমান জনসাধারণের মানসিক গতি পরিবর্তনের একটা সাড়া পড়িয়া যায় এবং সমগ্র মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত

---

২ পূর্বোক্ত।

* মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-কীর্তি ক্লাসিক 'মেঘনাদবধকাব্য' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়।

হয়[৩]। এই মানসিকতার ফলে মুসলিম বাংলা সাহিত্যে মীর মুশার্‌রফ হুসৈন[৪], কবি কায়কোবাদ, হামিদ আলী, মতীয়ুর রহমান খান, সৈয়্যিদ সিরাজী, আবদুল মুনায়েম প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক কারবালা কাহিনীকে কাব্য ও সাহিত্য রচনার উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, সমাজদেহে চেতনা-সঞ্চারের নিমিত্ত ইঁহাদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কবিগণ জাতীয় অধঃপতনের যুগে ধর্মীয়বোধে অনুপ্রাণিত হইয়া লেখনী চালনা করিয়াছিলেন।

কবি হামিদ আলীর 'কাসেমবধকাব্য' ও 'জয়নলোদ্ধারকাব্য' মাইকেল মধুসূদনের প্রবর্তিত ক্লাসিক রীতির অনুসরণে লেখা। 'রাম-রাবণের যুদ্ধের অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে যেমন 'মেঘনাদবধ' লিখিত, সেইরূপ এজিদ ও ইমামদিগের মধ্যে যে সকল যুদ্ধাদি হয়, তাহার অনেকগুলি ঘটনা হইতে এক একটি ঘটনা অবলম্বনে এ-কাব্য লিখিত'[৫]। কারবালার মর্মন্তদ কাহিনীর অংশমাত্র অবলম্বনে মুঘল আমলের কোন কোন কবি কাব্য রচনায় প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা 'কাশিমের যুদ্ধ', 'কাশিমের লড়াই', 'হানিফার লড়াই' প্রভৃতি কাব্য পাঠে অবগত হওয়া যায় (দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৃষ্ঠা ১৯২-২০০ দ্রষ্টব্য)। আধুনিক বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কবিগণের রচিত এগার খানি ক্ষুদ্রবৃহৎ কাব্যের মধ্যে আবুল মা'আলী মুহম্মদ হামিদ

---

৩ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্‌সান: বা. সা. ই., ঢা. বি., ১৯৫৬, পৃঃ ১৭।

৪ কারবালা-কাহিনী অবলম্বনে তাঁহার রচিত গদ্যগ্রন্থ 'বিষাদ-সিন্ধু' সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

৫ 'কাসেমবধ কাব্যের' ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ১ম সংস্করণ ১৯০৫।

আলীর কাব্য দুইখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা কবি কারবালার ঘটনার প্রতি আধুনিক পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; দ্বিতীয়তঃ, কাব্যান্তর্গত চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা-বিন্যাস ও অলঙ্কার-প্রয়োগকৌশলের ক্ষেত্রে তিনি মধু-কবির কাব্যরীতির অনুবর্তন করেন। 'কাসেমবধকাব্য' ও 'জয়নলোদ্ধার কাব্যের' প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৯০৫ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্য প্রকাশিত হয়। সুতরাং সময়ের দিক হইতে বাংলা মহাকাব্য রচনার যুগে হামিদ আলী কারবালা ট্র্যাজেডি অবলম্বনে ক্লাসিক রীতিতে কাব্য লিখিলেন। হামিদ আলীর আদর্শ ছিলেন কবি মধুসূদন। তিনি বহু স্থলে মধু-কবির 'মেঘনাদবধকাব্যে'র অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'মেঘনাদবধের কয়েক স্থলে মাধুর্যের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহা অনুকরণ করিয়াছি'[৬]। তবে, ভাষা ও শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে মধুসূদনের ন্যায় তিনি সংস্কৃতঘেঁষা শব্দ অধিক ব্যবহার করেন নাই।

কারবালার কাহিনী স্বভাবতই করুণ। এই করুণ-কাহিনীর অংশ মাত্র অবলম্বনে এ-কাব্য রচিত হইলেও ইহার উপজীব্য প্রেম-মূলক আখ্যান। ক্লাসিক রীতিতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও ইহাতে রোমান্টিক উচ্ছ্বাস প্রবল। কাব্যের এই রোমান্টিক গীতিময় উচ্ছ্বাসের জন্য 'কাসেমবধ কাব্যে' বীররস প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। তবে, মধ্যে মধ্যে কবির সংযত বর্ণনা ও কবিত্ব প্রশংসার যোগ্য। 'মেঘনাদবধকাব্যে'র নায়ক মহাবীর রাবণের ন্যায় কারবালা ট্র্যাজেডির নায়ক ইমাম হোসেনের জীবনে নিয়তির অমোঘ বিধানকে কবি 'কাসেমবধকাব্যে' মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সত্যই, ঘটনা-সংস্থান এবং বর্ণনাগুণে কবি মানব-ভাগ্যের করুণ চিত্র আঁকিয়াছেন।

---

৬ পূর্বোক্ত।

হোসেন শক্তিধর ; তিনি নিজের সর্বনাশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু সে সর্বনাশ রোধ করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। তিনি কুফার পথে যাত্রা করিয়া নিয়তির বিধানে পথ ভুলিয়া বিস্তীর্ণ মরুভূমি কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। সত্যের জন্য শত্রুসৈন্যের মোকাবিলা করিতে গিয়া তাঁহার বন্ধু-বান্ধব-অমাত্যবর্গ প্রাণ দিলেন ; নববিবাহিত কাসেম আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিলেন। পুরনারীদের হাহাকার ও শিশুদের আর্ত চীৎকারে রণভূমি মুখর হইয়া উঠিল। মহাবীর হোসেনের চূড়ান্ত সর্বনাশ সাধিত হইল। কিন্তু তিনি মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিলেন না। তাঁহার এই চরম সর্বনাশের মধ্যে মানব-ভাগ্যের বলিষ্ঠ রূপ ও চাঞ্চল্য হামিদ আলী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এ-ক্ষেত্রে মধুসূদনের কাব্যের ভাব-কল্পনার প্রভাব স্পষ্টভাবে অনুভূত হইলেও হামিদ আলীর স্বকীয়তা বিদ্যমান।

'কাসেমবধকাব্যে' সমগ্র কারবালা-কাহিনী অনুসৃত হয় নাই, বরং ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তর্নিহিত আবেগ এ-কাব্যের প্রাণ। কাব্যের মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার—এজিদ (ইয়াযীদ) চরিত্রের করুণ দিক। জয়নাবের রূপশিখা এজিদের অন্তরে যে-লালসার বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থতার ঘৃতাহুতিতে তাণ্ডবমূর্তি ধারণ করিয়াছে। আবার এই ভয়াবহ ধ্বংসের মধ্যে পুরুষের এই পৈশাচিক ক্ষুধা ও লালসার প্রলয় নৃত্যের মধ্যে জীবনের এক করুণ অথচ মধুর রূপ কবি অবলোকন করিয়াছেন। এক দিকে জীবনের প্রদাহ—অন্যদিকে তাহারই প্রশান্তি[৭]। এই প্রদাহ ও প্রশান্তি অর্থাৎ মানব-জীবনের পরস্পর বিরুদ্ধ মনঃপ্রকৃতির রহস্য হামিদ আলী উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

---

৭ ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান : 'হামিদ আলীর কাশেমবধ কাব্য'। মা. মো. ৩০ শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ পৃঃ ৯৮ ; এবং সা-প, ঢাকা বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৭, পৃঃ ১০৭।

ইমাম হোসেন এ-কাব্যের নায়ক ; কিন্তু কাসেমের মৃত্যু (পঞ্চম সর্গ) হোসেনের ভাগ্যের অনিবার্য পরিণামকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। কাব্যের কেন্দ্রীভূত চরিত্র হোসেন ব্যতীত জয়নাব, এজিদ, ওহাব, সখিনা, কাসেম, জয়নুল আবেদীনের চরিত্র মন্দ ফুটে নাই। চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে হামিদ আলীর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। কাসেম ও সখিনার মনে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এবং আশা-নিরাশার যে-ভাব জাগিয়াছে, কবির বর্ণনায় তাহা সুপরিস্ফুট। সদ্যবিবাহিত দুই তরুণ-তরুণীর ক্ষণিক আনন্দের উপলব্ধির মধ্যে কবি চিরন্তন নরনারীর আন্তর-মাধুর্যের সন্ধান দিয়াছেন।

'কাসেমবধকাব্যে'-র কাহিনী নাতিদীর্ঘ ; কিন্তু প্রত্যেক দৃশ্য নাটকীয় ও গতিশীল। চরিত্র পরিস্ফুটনের জন্য কাব্যে এই গতিশীলতা অপরিহার্য। হামিদ আলী কোথাও অবান্তর ঘটনার বর্ণনা দেন নাই ; ফলে কাহিনীর গতি কোথাও বিলম্বিত হয় নাই। কিন্তু অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও এ-কাব্য ত্রুটিহীন নহে। মাঝে মাঝে ছন্দে ত্রুটি লক্ষ্যযোগ্য। কবি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'-র উপমা ও রচনা-কৌশল বহুক্ষেত্রে অবলম্বন করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি সর্বত্র ধ্বনিসাম্য বজায় রাখিতে পারেন নাই।

তৎরচিত আধুনিক বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের অপরগ্রন্থ 'জয়নলোদ্ধার কাব্য'। ইহা আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ; কাব্যখানি ৭৬ পৃষ্ঠায় পঞ্চম সর্গে সমাপ্ত। মোহাম্মদ হানিফা কর্তৃক এজিদ-নিধন এবং দামেস্ক কারাগার হইতে জয়নুল আবেদীনের মুক্তিলাভ এ-কাব্যের উপজীব্য। জয়নুল আবেদীনের মুক্তিলাভের কোন বর্ণনা এ-কাব্যে নাই ; এ-টুকু পাঠককে কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করিতে হয়। 'কাসেমবধকাব্যে'-র পরে 'জয়নলোদ্ধার কাব্য' রচিত হয় বলিয়া ইহাতে কবি-প্রতিভার পরিণতির স্বাক্ষর থাকাই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু কাব্যান্তর্গত চরিত্রে দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ এবং জটিলতা নাই।

প্রথম সর্গে ইমাম হাসানের বিধবা-পত্নী জয়নাবকে অঙ্কশায়ী করিবার যে-অদম্য ইচ্ছা এজিদের মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, পরবর্তী চারি সর্গের মধ্যে তাহার পরিণতি নাই। এজিদের জয়নাব-লাভের ইচ্ছার সঙ্গে কাব্যের পরবর্তী দৃশ্যের কোন সম্পর্ক নাই। চতুর্থসর্গে মোহাম্মদ হানিফার রণ-সজ্জা এবং পঞ্চম সর্গে এজিদের মৃত্যু-বর্ণনায় কাব্যগত ঐশ্বর্য স্ফূর্তি পায় নাই। ভাষা ও বর্ণনা সুন্দর ; কিন্তু ঘটনা সন্নিবেশে মৌলিকতা নাই। ছন্দের মধ্যে মাঝে মাঝে ত্রুটি প্রকটিত। ফলতঃ, 'কাসেমবধ কাব্য'-এর তুলনায় হামিদ আলীর এই কাব্যখানি নিকৃষ্টতর। ইহাতে কবি-প্রতিভার পরিণতির ছাপ নাই। ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তর্নিহিত যে-গতি ও অনুভূতি 'কাসেমবধ কাব্যের' প্রাণ, 'জয়নলোদ্ধার' কাব্যে তাহা অনুপস্থিত। এ-সব দোষ সত্ত্বেও পঞ্চম সর্গের বর্ণনায় বীররস উৎসারিত। কিন্তু কাব্যের শেষের দিকে বীররস অপেক্ষা এজিদের করুণ মৃত্যু-দৃশ্য পাঠকের চিত্তে গভীর বেদনার ছাপ মুদ্রিত করিয়া দেয়। কবি এজিদের চিত্র আঁকিয়াছেন :

বিভৎস চীৎকার সহ মেলি চক্ষুদ্বয়
কহিলা এজিদ ;—'একি ? অগ্নি ?—অগ্নিময়
চারিদিক ! এ যন্ত্রণা উহু ! ভয়ঙ্কর
নরক ! নরক !! আহা ! কোথা যাব আমি ?
কোথায় মারওয়ান, উহু কোথায় সমুর ?
আবদুল্লা জেয়াদ কোথা ? কোথায় জয়নাব ;
কোথায় রূপের মোহ, বিরহ বিচ্ছেদ ?
কোথা ভালবাসা জ্বালা, কলহ জিঘাংসা ?
কোথা সে কারবালা হত্যা ? কোথায় ফোরাত ?
পিপাসা, পিপাসা আহা ! জল কোথা জল ?'
বলিতে বলিতে স্বরে অস্ফুটিত চক্ষু
মুদিয়া আসিল পুনঃ। ধীরে স্নেহভরে

বারিবিন্দু প্রদানিয়া কহিলা হানিফ,
স্থির হও পাবে শান্তি কর অনুতাপ।
(পঞ্চম সর্গ)

কারবালা যুদ্ধে হোসেন-হত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কবি তাঁহার অনুতাপের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া এ-কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন।

দুই. মতীয়ুর রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৭)। কবি মতীয়ুর রহমান খান ও কবি কায়কোবাদ (১৮৫৯-১৯৫১) বাংলা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে আবুল মা'আলী মুহম্মদ হামিদ আলীর প্রায় সমসাময়িক। কবি কায়কোবাদ ইঁহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার পারিল গ্রামে মতীয়ুর রহমান খানের জন্ম। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা মফিজুর রহমান খান মারা যান। মতীয়ুর রহমানের পিতামহ নাদির আলী খান কার্যোপলক্ষে প্রথমে চট্টগ্রাম ও পরে সন্দ্বীপে যান এবং সন্দ্বীপে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। অল্প বয়সেই মতীয়ুর রহমানের কবিত্বের উন্মেষ হয়। তিনি পরিণত বয়সে দিল্লীর মুখ্‌লেসিয়া একাডেমীতে কিছুকাল সহকারী শিক্ষকের পদে চাকুরী করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন[৮]।

মতীয়ুর রহমানের লিখিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, রসরচনা, ব্যঙ্গকবিতা প্রভৃতির মধ্যে 'এজিদবধ কাব্য' ও 'মোসলেমবধ কাব্য' শীর্ষক রচনা দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

৮ আবদুল কাদির : 'মতীয়ুর রহমান খানের সাহিত্য সাধনা'। বা. এ. প.; ভাদ্র—অগ্রহায়ণ, ১৯৬৪ সাল, পৃঃ ১১ - ১২।

'এজিদবধ কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটি মাত্র সর্গে রচিত একটি প্রকাণ্ড খণ্ড কবিতা। ইহার প্রথমাংশের (প্রথম পল্লব) সন্ধান পাওয়া গিয়াছে*। প্রথমাংশে হোসেন-পরিবারবর্গের প্রতি এজিদের রূঢ় ব্যবহারের পরিচয় এবং দামেস্কাধিপতি এজিদের রাজ-সভার বর্ণনা আছে। কবির বর্ণনাগুণে দামেস্কাধিপতির রাজসভার আলেখ্য চিত্রিত। মতীয়ুর রহমান খান ইহাতে মধুসূদনের ক্লাসিক রীতির সার্থক ও নিপুণ অনুবর্তন করিয়াছেন। ইহাতে সমাসবদ্ধ শব্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগের দ্বারা গভীর পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস আছে। কবিতার শুরু হইতেই পরিবেশ গুরুগম্ভীর। যথা ঃ

'বীর কুল তিষাম্পতি বীরেন্দ্র কেশরী
মহাবাহু মহেম্বাস আলীর নন্দন
হোসেন, দুরন্ত রণে কারবালা প্রান্তরে
মহারণ বীরেশ্বর যুঝিয়া বিক্রমে
অরাতির প্রহরণে পড়িলা ;—যেমতি
অকালে অমরত্রাস, অভিমন্যু শূর
সুভদ্রা নন্দন কুরু সপ্তরথি রণে।
কিম্বা যথা থার্মপিলি শিখরি-সঙ্কটে
অসংখ্য দ্বিষতে যুঝি স্পার্টার কুমার
ডুবিল অনন্ত পরিপন্থী পারাবারে।
হায়রে! স্বনামধন্য বীরবৃন্দ যত
নবী বংশ অবতংশ—পাত্র মিত্র সহ
কক্ষচ্যুত গ্রহপ্রায় অযথা যেমতি
কুসুম কোরক শুষ্ক দধ্যাতাত করে—
হইলা নিধনপ্রাপ্ত একে একে একে!

* ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭শে আগষ্ট তারিখের "মিহির ও সুধাকরে" প্রকাশিত।

রচনার সর্বত্র হিন্দু পুরাণ ও ঐতিহাসিক কাহিনীর উপমাদি প্রয়োগ কবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কবির অপর খণ্ড কবিতার নাম 'মোসলেম বধ'। ইহার অংশ-মাত্র মাসিক 'প্রচারকে' বাংলা ১৩০৮ সাল, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সমগ্র রচনাটি দুইটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে বর্ণমাত্রিক দীর্ঘ ত্রিপদী এবং দ্বিতীয় পর্বে পয়ারছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমাম হোসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ওকেল-নন্দন মোসলেম, হোসেনের দৌত্য লইয়া কুফায় গমন করিলে তিনি সেখানে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। 'মোসলেম বধ'-এর এই কাহিনী মতীয়ুর রহমান মধ্যযুগের কবি মুহম্মদ খানের 'মোক্তাল হোসেন' কাব্যের অন্তর্গত 'মুসলিমবধ পর্ব' (চতুর্থ পর্ব) হইতে গ্রহণ করিয়াছেন[১]। তবে মতীয়ুর রহমান খানের ভাষা তাঁহার নিজস্ব। উভয়পর্বে ব্যবহৃত ছন্দে কোন নূতনত্ব নাই। এই খণ্ডকাব্যে হযরত মুসলিমের হত্যা-কাহিনী করুণরসের অবতারণা করিয়াছে :

মোস্লেম বলিল আজি মুক্ত সমদ্বার,
'শহীদ'—সম্পদ্ আজি দিল করতার।
এ বলিতে আর এক পাপী দুরাচার,
তাঁহার ললাটে শিলা করিল প্রহার।
ঝলকে রুধির গলে ঝাপিল বদন,
সন্ধ্যা সমাগমে যথা লোহিত তপন।
আর এক জন শিলা মুখে প্রহারিল,
দশন মুকুতা পাঁতি ভাঙ্গিয়া পড়িল।

---

১ উভয় কবির রচনার মধ্যে কাহিনীগত সামঞ্জস্য বিদ্যমান; এমন কি মতীয়ুর রহমান খান মধ্যযুগের কবি মুহম্মদ খানের কাব্যগত শব্দও কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন।

চাহিয়া মক্কার দিকে ওকেল-নন্দন,
হোসেন স্মরিয়া কাঁদে বিরস বদন।

* * *

প্রাচীরে দিলেন ঠেস পুনঃ মহাত্মন,
হেনকালে পৃষ্ঠে শেল হানে একজন।
সেই ঘায়ে মোসলেম পড়িল ভূমিতল,
ধাইয়া বেড়িল আসি যত পরবল।

তিন. কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১)। ইনি আধুনিক বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁহার পূর্ণ নাম মুহম্মদ কাযেম আল্ কুরয়শী। তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগ্‌লা পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি-রচিত অসমাপ্ত আত্মচরিত হইতে তাঁহার বংশ ও পূর্বপুরুষের পরিচয় অবগত হওয়া যায়[১০]। তাঁহার পিতা-মাতার নাম যথাক্রমে—ইমদাদ আলী ও জোমরত উন্নিসা। ইমদাদ আলী ছিলেন আরবী, ফারসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তিনি প্রথমে ফরিদপুর এবং পরে ঢাকা আসিয়া আদালতে ওকালতী শুরু করেন। কায়কোবাদ তদীয় পিতামাতার প্রথম সন্তান[১১]। বাল্যকালে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। কবিতার প্রতি তাঁহার প্রবণতা এই সময় হইতেই লক্ষ্য করা যায়। জীবনের সূচনা হইতেই তিনি নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।

---

১০ মুহম্মদ আবদুল খালেক কর্তৃক কায়কোবাদ-আত্মচরিতের ইংরেজী তর্জমা। 'মহাশ্মশান কাব্যে সংযোজিত ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৬।

১১ পূর্বোক্ত।

মাত্র বার বৎসর বয়ঃক্রম-কালে পিতা ইমদাদ আলী মারা গেলে তিনি সঙ্কটে পড়েন এবং আগ্‌লা পূর্বপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে গিয়া বাস করিতে থাকেন। অতঃপর, পিতৃবন্ধু আযিমজানের সহায়তায় ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ঢাকা মাদ্রাসায় ভর্তি হন ও পড়াশুনা করিতে থাকেন।

এনট্রান্স পরীক্ষার পূর্বেই তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া ডাক বিভাগের চাকুরীতে নিযুক্ত হন। সরকারী কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জীবনব্যাপী কাব্যসাধনায় মগ্ন ছিলেন[১২]। ছাত্র-জীবনে রচিত কয়েকটি কবিতার সঙ্কলন 'বিরহ বিলাপ' ও 'কুসুমকানন' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তরুণ কবির রচিত কাব্য দুইখানি পাঠ করিয়া গিরিবালা নাম্নী এক ব্রাহ্মণ কুমারী তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। গিরিবালার প্রণয় হইতে তরুণ কবি এক বেদনাময় অভিজ্ঞতা ও কাব্যপ্রেরণা লাভ করেন। 'অশ্রুমালা' (১৮৯৫-৯৬) কবির তৃতীয় কাব্য। ইহা প্রকাশিত হইলে তিনি কবিখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মোমেনশাহীর ধনবাড়ির জমিদার নবাব আলী চৌধুরীর অর্থানুকূল্যে শ্রেষ্ঠকাব্য 'মহাশ্মশান' প্রকাশিত হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কবি হিসাবে তিনি মধুসূদন-হেম-নবীনের সহিত স্থান লাভের যোগ্য। তাঁহার অন্যান্য কাব্যের মধ্যে 'শিবমন্দির' (১৯২১) 'অমিয়ধারা' (১৯২৩), 'শ্মশানভস্ম' (১৯৩৮) উল্লেখযোগ্য। 'মহাশ্মশান' রচনার পূর্বে 'সুধাকর ও ইসলাম প্রচারক'-এর সম্পাদক মুনশী রিয়াজ উদ্‌দীন আহমদ মুহর্রম সম্পর্কে একখানা কাব্য নির্মাণের জন্য কবিকে অনুরোধ জানান।

১২ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৭।

বন্ধুর এই অনুরোধের ফল 'মহরম শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য'[১৩]। ইহা ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

কায়কোবাদ ছিলেন প্রধানতঃ গীতিকবি। স্বজাতিহিতৈষণা ও স্বজাতিপ্রেম তাঁহার কাব্য-রচনার মূলে অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাহী কবি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাব্যভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই[১৪]। এই প্রসঙ্গে কবির নিজের উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন ঃ

'বঙ্গবাসীর সাহিত্য-মন্দিরে আজকাল অনেক নূতন লেখক জুটিয়াছেন, আমি সে দলের নহি। আমি পুরাতন দলের লোক। আমাদের দলের নবীন, হেম, মধুসূদন, দীনেশ, অক্ষয় বড়াল, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণ চলিয়া গিয়াছেন'[১৫]।

কায়কোবাদ শেষ-জীবনে ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ ঢাকা আগমন করেন এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিরানব্বই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

'মহরম শরিফ বা আত্মবিসর্জন কাব্যের' রচনাকাল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত, ২৯ সর্গে ৩৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা আগাগোড়া অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দে রচিত। 'মহরম শরিফ' কারবালার

---

১৩ 'মহরম শরিফ' কাব্যের ২য় সংস্করণ 'কৈফিয়ত' দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১-২ এবং ২২।

১৪ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্সান ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫১।

১৫ শিবমন্দির, ২য় সংস্করণ "ভূমিকা" দ্রষ্টব্য।

ঐতিহাসিক কাহিনীর ছন্দোবদ্ধ রূপায়ণ। কবির নিকট কাব্যসত্য বড় নহে, কাজেই কাব্যসত্য ক্ষুণ্ণ করিয়া তিনি ইতিহাসের সত্যকে অবলম্বন করিয়াছেন[১৬]। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই কাব্যকে 'মহাকাব্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১৭]। যথার্থ বলিতে কি, কাব্যগত-কাহিনী মহাকাব্য রচনার উপযুক্ত; কিন্তু এপিকসুলভ কবিকল্পনা, ঘটনাসংস্থান, চরিত্রসৃষ্টি, ভাষার গাম্ভীর্য এবং ব্যঞ্জনা প্রভৃতির অভাব থাকায় ইহা 'মহাকাব্য' পদবাচ্য হইতে পারে না। কবির বর্ণনায় সংযমের অভাব; কাব্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে সর্বত্র সমন্বয় সাধিত হয় নাই। শব্দ-চয়নে সঙ্গতিবোধ ও যাথার্থ্য নাই। রচনাশৈলী ও বাগ্‌বিন্যাস অতি সাধারণ স্তরের। অনেক স্থলে ছন্দের ত্রুটি পীড়াদায়ক; সেখানে ভাষা নিছক গদ্য। কাব্যের ভাষায় ক্লাসিক রীতির যে-অনুবর্তন থাকিলে কাব্য মহা-কাব্যের স্তরে উন্নীত হইতে পারে, 'মহরম শরিফে' তাহা নাই। কাব্য মধ্যে অঙ্কিত চরিত্রগুলিও ভালরূপে ফুটে নাই। অধিকাংশ চরিত্রই টাইপ (দোষ বা গুণের প্রতিনিধি)। হাসান ক্ষমার জীবন্ত প্রতীক। তিনি বিষ প্রদানকারী অনুতপ্ত আসাদকেও ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি বলেন:

ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও চরণ আসাদ,
মানব হইয়া আমি কেন না ক্ষমিব
মানবে? প্রধান গুণ ক্ষমাই ত ভবে
মানবের? এর তুল্য কি গুণ জগতে?

---

১৬ মহরম শরিফ, ২য় সংস্করণের 'কৈফিয়ত' দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৬।

১৭ 'মহরম শরিফ সমালোচনা'। মহরম শরিফ কাব্যের ২য় সংস্করণে সংযোজিত, পৃঃ ৩।

ক্ষমাগুণ নাই যার, সে নহে মানব,
পশু সে, বিধাতা নিজে ক্ষমার সাগর।
(১ম খণ্ড, ৯ম সর্গ)

তৎসত্ত্বেও এ-কাব্যের সর্বত্র পাঠকের কৌতূহল সমভাবে জাগ্রত থাকে। ইহার অন্তর্নিহিত করুণরস সুন্দরভাবে উৎসারিত হইয়াছে। মানব-মনের ব্যথা-বেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি অনেকাংশে সফলকাম হইয়াছেন। কাব্যের মধ্যে বীররসের পরিচয়ও বর্তমান। কিন্তু করুণরস মুখ্য হওয়ায় বীররস প্রাধান্য লাভ করে নাই। প্রাকৃতিক-স্বভাব বর্ণনায় কবির দক্ষতা আছে। মানব-হৃদয়ের সহিত প্রকৃতির সহানুভূতির সংযোগ বিধানের ক্ষেত্রে কায়কোবাদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

বিষপান করিয়া হাসানের মৃত্যু (১ম খণ্ড, ত্রয়োদশ সর্গ), কুফায় হযরত মোসলেমের (মুসলিম) শিশু পুত্রদ্বয়ের হত্যা (২য় খণ্ড, দ্বাদশ পর্ব), কারবালা রণাঙ্গনে শত্রুসৈন্যের হস্তে নিষ্ঠুরভাবে হোসেনের মৃত্যু (৩য় খণ্ড, চতুর্থ সর্গ) প্রভৃতি ঘটনার করুণ চিত্র কবি এই কাব্যে অঙ্কিত করিয়াছেন।

চার. আবদুল বারী। ইনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত মাইজদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবিজীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে সাহিত্য-জগতে 'কারবালা' হস্তে এই তাঁহার প্রথম পদক্ষেপ। কাব্যখানি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবি স্বয়ং ইহার প্রকাশক ছিলেন[১৮]। আবদুল বারীর সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না; কাজেই

১৮ আবদুল বারী প্রণীত এই কাব্য নোয়াখালীর মাইজদী হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

কাব্যপ্রকাশের ব্যাপারে তাঁহাকে অনেকের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল[১৯]।

'কারবালা' কাব্যখানি আট সর্গে মোট ২১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। কাব্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কবি বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কোন কোন সর্গে (যেমন অষ্টম সর্গ) একাধিক ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কাব্য পাঠ কালে যাহাতে পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে সেদিকে তাঁহার প্রখর লক্ষ্য ছিল। কাব্যের উপজীব্য কারবালা কাহিনীর বিস্তৃত ঘটনা নহে; বরং বিরাট কাহিনীর অংশ মাত্র; অর্থাৎ ইমাম হোসেনের শিবির সন্নিবেশ, যুদ্ধ এবং তাঁহার আত্মত্যাগের বিবরণ লইয়া এ-কাব্য রচিত। কাব্য হিসাবে ইহা শ্রেষ্ঠ রচনা নহে; ইহার সুর কোথায়ও উচ্চগ্রামে বাঁধা হয় নাই। কি ভাষা, কি ছন্দ, কি প্রকাশভঙ্গি যে দিক দিয়াই বিচার করা যাক না কেন, ইহার দুর্বলতা স্পষ্ট। তবে ভাষাগত প্রাঞ্জলতা এবং অকৃত্রিম ভাবাবেগের জন্য করুণ রস স্বাভাবিকরূপেই উৎসারিত হইয়াছে। কায়কোবাদের 'মহরম শরিফ'-এর ন্যায় আবদুল বারীর এ-কাব্যে সংযমের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কাব্যের সর্বত্র কবিত্ব সুলভ না হইলেও অনেক ক্ষেত্রে কবি কৃতিত্বের অধিকারী।

চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবির কৃতিত্ব আছে। হোসেন, শাহেরবানু, কাসেম, সখিনা, মোসলেম প্রভৃতির চরিত্র মন্দ ফুটে নাই। চতুর্থ সর্গে শাহেরবানুর চরিত্রে চিরন্তন মাতৃমূর্তি ফুটাইয়া তোলার ক্ষেত্রে কবির দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। শাহেরবানুর এই মাতৃমূর্তি নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে চিত্রিত মাতৃরূপিণী সুভদ্রার কথা মনে করাইয়া দেয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে কাসেম-সখিনার

---

১৯ 'কারবালা' কাব্যের অন্তর্গত 'গ্রন্থকারের নিবেদন'- দ্রষ্টব্য।

উপাখ্যান এবং অষ্টম সর্গে হোসেনের আত্মোৎসর্গ পাঠকের মনে গভীর বেদনা-করুণ ভাব সৃষ্টি করে। প্রয়োজনবোধে কবি প্রচলিত আরবী, ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন[২০]। দুই এক স্থলে হিন্দী শব্দের প্রয়োগ আছে।

পাঁচ. সৈয়্যিদ ইসমাঈল হুসৈন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)

আধুনিক বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের কবিগণের মধ্যে ইনি সমধিক খ্যাত। তিনি প্রধানতঃ গদ্য সাহিত্যের শক্তিশালী লেখক; এতৎ-সত্ত্বেও, কবিতা ও কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সৈয়্যিদ সিরাজী পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের অধিবাসী। পিতার নাম খোন্দকার আবদুল করিম। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার কবিত্বের উন্মেষ হয়। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ ভ্রমণ-কাহিনী—সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সতের খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নহে[২১]। তৎ-রচিত অপ্রকাশিত কাব্যগুলির অন্যতম কাব্য 'মহাশিক্ষা'। ইহার রচনাকাল ১৮৯৮ হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ[২২]। আধুনিক বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের ইসিহাসে এত বড় কাব্য অপর কোন কবি লেখেন নাই।

---

২০ 'কারবালা' কাব্যে লিখিত 'গ্রন্থকারের নিবেদন' দ্রষ্টব্য।

২১ মদীয় 'সৈয়্যিদ ইসমাঈল হুসৈন সিরাজী' প্রবন্ধে কবি সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য। বা. এ. প., ভাদ্র—অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, পৃঃ ৫১-৭৫।

২২ 'অভাগা বঙ্গের কবি শোকার্ত সিরাজী
অনাহারে অনিদ্রায় সহি নানা ক্লেশ
সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষে বিধি কৃপা বশে
এইখানে মহাশিক্ষা করিলেক শেষ।'

(মহাশিক্ষা—শেষ সর্গ)

কারবালা ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কবি এই বিরাটকায় মহাকাব্য 'মহাশিক্ষা' প্রণয়ন করেন। 'মহাশিক্ষা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হইলেও ইহার 'বন্দনা' ও 'প্রথম সর্গ' সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল[২৩]। ঘটনার নাটকীয় সংস্থানের ক্ষেত্রে কবি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'-এর অনুকৃতি লক্ষণীয়। কাব্যখানি জাতীয় উন্নয়নমূলক[২৪]। সমগ্র কাব্যখানি অক্ষর মাত্রিক অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দে লিখিত। কাব্যগত ভাষা, ছন্দ এবং শিল্প-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। তবে, অনেক স্থলে উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি থাকায় কাব্য-শিল্প ব্যাহত হইয়াছে। এ-কাব্যে এজিদ, ইমাম হোসেন, জরিনা বেগম, নাগিনা, জয়নাল প্রভৃতি চরিত্র মন্দ ফুটে নাই। কাব্যে বীর ও করুণ রস স্ফূর্ত হইয়াছে। কবির বর্ণনা-নৈপুণ্যের পরিচয় স্বরূপ রাজধানী দামেস্কের ঐশ্বর্য-বর্ণনার অংশ-মাত্র উদ্ধৃত করা গেল ঃ

সুদৃঢ় পাষাণময় সমুচ্চ প্রাচীরে
বলয়িত বৃত্তাকারে দামেস্ক নগরী
তোরণে তোরণে শোভে লৌহের কপাট ;
প্রহরী নিয়ত রাজে—ভীম দরশন
উলঙ্গ কৃপাণ পাণি কৃতান্ত উপম।
চৌদিকে পরিখা শোভে সরিৎ সদৃশ।
সুগভীর সুবিস্তৃত—তর্ তর্ তরে
নিয়ত বহিছে স্রোত গভীর কল্লোলে।
প্রান্তরে শোভিছে দুর্গ, স্পর্ধি ব্যোমপথ
বিরাট বিশাল যেন ধবল শেখর।

---

২৩ আল ইসলাম ১৩২২, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা।
২৪ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্সান ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৪

নভোস্পর্শী শীর্ষে তার বৃহৎ পতাকা
(রক্তবর্ণ) উড়িতেছে হেলিয়া দুলিয়া
মন্দ সমীরণ ভরে, —মহোরগ যথা
মহাসাগরীয় স্রোতে খেলে মনোসুখে।
অঙ্কিত পতাকা পৃষ্ঠে উজ্জল সুবর্ণে
তারাময় চন্দ্রকলা সুন্দর শোভন।
বিচরিছে দুর্গ মাঝে সমরী নিচয়,
নানা প্রহরণধারী,—বীর্যমদ ভরে
মত্ত করিদল সম গর্বে অনুক্ষণ।
শুভ্র চন্দ্রালোকে আজি আমোদে মাতিয়া,
বিশাল দুর্গ প্রান্তরে,—অযুত সৈনিক
করিতেছে নানা ক্রীড়া বীর জনোচিত।

ছয়. আবদুল মুনায়েম (১৮৮৭-১৯৪০)। কবি আবদুল মুনায়েম চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ফতেপুর (হাট হাজারী) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। যতদূর জানা গিয়াছে, কবি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনি সৈয়িদ ইসমাঈল হুসৈন সিরাজীর সমসাময়িক কালের মানুষ। স্কুলে পাঠ করিবার সময় হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতে শুরু করেন। তাঁহার প্রকাশিত কাব্যের মধ্যে 'শূন্যারোহণ', 'বাল্যপ্রসূন', 'পঞ্চ-শহীদ কাব্য'-এর সন্ধান জানা যায়[২৫]। 'পঞ্চশহীদ কাব্য' গ্রন্থ-কারের চতুর্থ রচনা; ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। তিনি নানা গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যের ভিতর দিয়া যেভাবে সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবন ফুটাইয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা

---

২৫ 'পঞ্চশহীদ কাব্যের' (১ম সংস্করণ, ১৯১৯) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন[২৬] তাহা প্রশংসনীয়। কবি মুনায়েমের বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য বিষয়ক কাব্যের নাম 'পঞ্চশহীদ কাব্য'। এই কাব্যে মুহর্রম সম্পর্কিত পাঁচ জন শহীদের আত্মদানের চিত্র (দ্বিতীয় সর্গ হইতে ৬ষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত) অঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি সর্গের বর্ণনীয় বিষয় স্বয়ং সম্পূর্ণ ; এ-কারণে, এ-কাব্যকে খণ্ড কবিতার সমষ্টি বলিলে বিন্দুমাত্র অন্যায় হইবে না কাব্যখানি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইমাম হাসান, আলী আসগর, আবদুল ওহাব, মহাবীর কাসেম ও ইমাম হোসেন—এই পাঁচ জন শহীদ 'পঞ্চশহীদ কাব্য'-এর অন্তর্ভুক্ত। এ-কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হইলেও সর্বত্র অক্ষর বৃত্ত অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দের রীতি অনুসৃত হয় নাই। কবি বাঁধাধরা কোন নিয়ম অনুসরণ করেন নাই। ভাষা ও কবিত্ব সর্বত্র উচ্চগ্রামে পৌঁছে নাই। তবে কাব্যখানি সুখপাঠ্য। মাঝে মাঝে ভাষা ও ভাবের দীপ্তি আছে। অনেক স্থলে তিনি কবি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যের' সার্থক অনুকরণ করিয়াছেন। হাসানের মৃত্যুতে কবি মুনায়েম বলেন ঃ

> মদিনা গৌরব রবি গেলা অস্তাচলে,
> ইমাম হোসেন শশী ভাতিল অম্বরে
> মদিনার ; ভ্রাতৃশোকে তীক্ষ্ণ শেল করিয়া মন্থন।

ইহা যেন মধুসূদনের প্রতিধ্বনি—'লঙ্কার গৌরব রবি গেলা অস্তাচলে'। তৃতীয় সর্গে আলী আসগরকে শত্রুসৈন্যগণ বিষাক্ত তীর নিক্ষেপে নিহত করিলে কবি বলেন ঃ

> হায়রে শোণিত ধারা অজস্র ধারায়
> বহি দরদরি হায় সুরঞ্জিত করি
> ইমামের শুভ্র বস্ত্র তিতিল বসুধা।

---

২৬ পূর্বোক্ত।

ইহাতে ইমাম হোসেন মধুসূদনের রাবণের ন্যায়ই খেদোক্তি করিতেছেন ঃ

হায় বিধি
এই ছিল মনে ? সকলি তোমার ইচ্ছা
তব বাঞ্ছা হউক পূরিত।

কোন্ মুখে
হায় ! মৃত পুত্র কোলে করি ফিরিব
শিবিরে কি কয়ে বুঝাব হায় শহর
বানুরে, আর আর পুরবালাগণে ?

'পঞ্চ শহীদ কাব্য'-এর ৩য় সর্গে চিত্রিত ইমাম হোসেন চরিত্র 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর ৮ম সর্গে অঙ্কিত রাবণ চরিত্রের অনুরূপ। আবদুল মুনায়েমের কাব্যের উপরোক্ত পংক্তিগুলিতে ভাষা ও ছন্দের নিপুণ প্রয়োগ-কৌশলে প্রাক্তনের হস্তে মানব-ভাগ্যের পরাজয় বরণের চিত্র করুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ৫ম সর্গে মহাবীর কাসেমের অকাল মৃত্যুতে হোসেনের বিলাপ 'মেঘনাদবধ কাব্যের' (৯ম সর্গ) ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার চিতাশয্যা গ্রহণের পর লঙ্কাধিপতি রাবণের বিলাপের কথা মনে করাইয়া দেয় ঃ

ছিল আশা প্রাণের
কাসেম, স'পি রাজ্য ভার তোমা, মুদিব
নয়নদ্বয় অনন্ত শয়নে, আশার
প্রদীপ মম নিভিল অকালে, বিধির
নির্বন্ধ হায়। কে পারে বলিতে ? দুর্ভাগ্য।

মধু-কবির প্রভাব 'পঞ্চ শহীদ কাব্যে' যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও কবির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। অনেক স্থলে তাঁহার শব্দ যোজনা সুন্দর। যেমন ঃ

ক। সুকোমল হৈমকান্তি করিল রঞ্জিত।
খ। নীলাম্বর বক্ষশোভা নক্ষত্র যেমনি।

গ। আজিকার রণে নারিবে টলাতে
দেব, রক্ষ, যক্ষ নরে।

ঘ। হায়রে রুধির ধারা দর বিগলিত
অজস্র ধারায় ভাসে ইমাম শরীরে।

সাত. মুহম্মদ ইব্‌রাহীম (১৮৮২-১৯৫৬)। আলোচ্য কবি পাবনা শহরের কৃষ্ণপুরের (বর্তমানে মোকসেদপুর) অধিবাসী ছিলেন। তিনি একাধারে সাহিত্যিক ও সমাজ-সংস্কারক। সরকারী-কার্যে আজীবন ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি অক্লান্তভাবে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কবি-রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'জান্নাতের ঝরণা' ও 'শহীদের খুন'-এর[২৭] সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। 'শহীদের খুন' কারবালা ঘটনার অংশ-মাত্র অবলম্বনে রচিত একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। এ-কাব্যের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। ইহাতে কবি-প্রতিভার কোন পরিচয় নাই। ভাষাও গতানুগতিক। তবে, বর্ণনায় করুণ-রস উৎসারিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই[২৮]।

আট. আজীজুল হাকীম (১৯০৮-১৯৬২)। ইনি ঢাকা জেলার রাইপুরা থানার অন্তর্গত হাসনাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঢাকায় ১৯৬২ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারীতে ইন্তিকাল করেন। 'ভোরের সানাই', 'মরুসেনা', 'মরুহারা', 'পথহারা', 'বিদগ্ধ দিনের

---

২৭ ১ম সংস্করণ, ১৩৪০ আশ্বিন, প্রকাশক: শ্রীগুরু প্রসাদ ভট্টাচার্য ৫৭।১ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ।৵০।

২৮ মৎ কর্তৃক লিখিত 'একজন অজ্ঞাতনামা মুসলিম কবি—মোহাম্মদ ইব্রাহীম' প্রবন্ধে কবির বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য। সওগাত, অগ্রহায়ণ ১৩৬৬, পৃঃ ৯-১৪।

প্রান্তর', 'আজাজিলনামা' (ব্যঙ্গ কবিতা), 'সঞ্চয়ন' প্রভৃতি কাব্য প্রণয়ন করিয়া তিনি কবিখ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার অনুবাদ-গ্রন্থ 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' সর্বসাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়াছে। 'মরুসেনা' কাব্যখানি কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি[২৯]। মরুসেনা, জয়নব, কাসেম ও সখিনা—এই চারিটি কবিতা এ-কাব্যের উপজীব্য। কবিতাগুলি ক্ষুদ্র হইলেও সুখপাঠ্য এবং সরস। কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব এ-কবিতাগুলির মধ্যে স্পষ্ট লক্ষ্যযোগ্য। কবিতাগুলিতে বেদনাকরুণ ভাব স্ফূর্ত হইয়াছে। এই স্থলে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল :

> খঞ্জর হাতে ও কে নরাধম বসিল তোমার বুকে ?
> সীমার ? সীমার ? পাষাণ পাষাণ তুই যে রে লোকে লোকে
> বিশ্ব ভুবন কাঁদিয়া মরিছে হেরি তোর অপকাজ
> হোসেনের শির দেহে নাই আর পড়ুক বিশ্বে বাজ।
> কাঁদ কারবালা কাঁদগো বিশ্ব কাঁদ অনন্ত কাল
> হা হোসেন—হা হোসেন রবে বুনিয়া ব্যথার জাল।
>
> (মরুসেনা : পৃ: ৫)

নয়. মীর রহমত আলী (জন্ম ১৮৯৮)। কবি ঢাকা জেলার নরসিংদী থানার অন্তর্গত রসূলপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মীর আশ্‌রাফ আলী। বাল্যকালেই তাঁহার কবিত্বের উন্মেষ হয়। ইনি একাধারে কবি, গায়ক ও চিত্রকর। তৎরচিত 'মুহর্রম কাব্য', 'জীবন্ত সমাধি' ও 'লায়লী মজনু' (উপন্যাস) সুধি-সমাজে সমাদৃত।

---

২৯ ১ম সংস্করণ ১৯৩৩ ; প্রকাশক : আবদুল হামিদ মিয়া, খানপুর, নারায়ণগঞ্জ।

'মুহর্রম কাব্য' আধুনিক বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন[৩০]। ইহা ষড়বিংশ সর্গে বিভক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৪। কারবালা কাহিনীর বিস্তৃত ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। সমগ্র কাব্যখানি অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দে লিখিত। কিন্তু পূর্বসূরী কবি হামিদ আলী ও আবদুল মুনায়েমের রচনার ন্যায় রহমত আলী 'মুহর্রম কাব্য'-এ উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ভাষা গতানুগতিক। ছন্দের ত্রুটি কাব্যসৌন্দর্য নষ্ট করিয়াছে। নর-নারীর চরিত্র-চিত্রণে কবির নৈপুণ্যের পরিচয় নাই। চরিত্রগুলির মধ্যে জব্বার, এজিদ, মাবিয়া, মারওয়ান, জায়েদা, মায়মুনা, মোসলেম, অলিদ, হারেস, ওহাব, কাসেম ও ইমাম হোসেন উল্লেখের দাবী রাখে। বীর ও করুণরস এ-কাব্যে স্ফূর্তি পাইয়াছে। অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস বহু স্থলে কাব্যের রসহানি করিয়াছে। তবে, আবেগ উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি থাকায় সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে গীতিময় সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

দশ. দমসের আলী তালুকদার (১৮৭৮-১৯৩৩)। বগুড়া জেলার অন্তর্গত দুপ্‌চাঁচিয়া থানার অধীন হেড়ুঞ্জ নামক গ্রামে কবির জন্ম। তাঁহার পিতার নাম দারাজ উল্লাহ্‌ তালুকদার, মাতা জমিলা খাতুন[৩১]। তিনি ছিলেন সাহিত্যগত প্রাণ। বাংলা সাহিত্যকে তিনি যথার্থই ভালবাসিতেন। বাং ১৩২৫ সালে 'হাসনবধ কাব্য' প্রকাশিত হয়,[৩২] এবং ১৩৪০ সালের

---

৩০ নব সংস্করণ, ১৯৪৯; প্রকাশিকা: মোসাম্মৎ হাজেরা খাতুন। নরসিংদী, ঢাকা।

৩১ কবি-ভ্রাতা মুহম্মদ আবদুর রহমান তালুকদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩২ ১ম সংস্করণ, ৬১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কুন্তলীন প্রেস, শ্রীপূর্ণ চন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত, সন ১৩২৫ সাল। মূল্য ৸০ আনা। কাপড়ের বাঁধাই ১৲ টাকা।

৪ঠা চৈত্র তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। কাব্যখানি মোট ৯টি সর্গে বিভক্ত; মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৪। এই কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া আশুতোষ শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ নামক জনৈক সমালোচক ভূমিকায় বলিয়াছেন, "......... কবির ইহাই প্রথম উদ্যম। প্রথম উদ্যমেই কবি অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন।" শাস্ত্রী মহোদয়ের এ-উক্তি যথার্থ বটে, কারণ 'হাসনবধ কাব্যে' কবির ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষিত হইলেও প্রতিভার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। কাব্য-রচনায় দমসের আলী নানা ধরণের ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ছন্দ-ব্যবহার সর্বত্র সুষ্ঠু হয় নাই; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণনা সুন্দর। যেমন এজিদের রাজসভার বর্ণনা:

বসিছে দামেস্করাজ রত্নসিংহাসনে,
ধরিয়াছে ছত্রধর সুবর্ণের ছাতা,
শোভিছে কিরীট শীর্ষ মণিময় তেজে।
স্ফটিকে গঠিত মরি দরবার গৃহ,
মণিমুক্তা আভরণ তাহে আচ্ছাদিত,
শোভিছে স্ফটিক ঝাড় কিবা মনোহর
শোভে যথা মুক্তাহার কামিনীর গলে
ঢুলায় চামর ধীরে ক্রীতদাসীবালা,
উঠিছে মঙ্গলগীতি অতি মৃদুস্বরে,
বাজিছে মঙ্গল-ভেরী সুমধুর রোলে,
করিছে শ্রবণ তৃপ্ত মোহিছে হৃদয়;
ভাসিছে দামেস্ক-রাজ আনন্দ-সাগরে।

মাঝে মাঝে উপমা, উৎপ্রেক্ষা-প্রয়োগ তাঁহার কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। যথা:

১। খুলি ধীরে
হৈম দ্বার, দেখা দিলা বিভাবসু অহো

মনোহর বেশে। সাজিল কৌতুকে মরি
হেরিয়া নাথেরে স্বীয় নলিনী সুন্দরী।

২। কহিলা মধুর স্বরে দূত প্রতি সতী,
বাজিল সে ধ্বনি অহো শ্রবণ-বিবরে ;
বসন্ত কোকিল কণ্ঠ মধুমাখা অতি,—
কিংবা যথা বীণা-যন্ত্র বাজে সপ্ত-স্বরে।

৩। উঠিল উলঙ্গ অসি ধাঁধিয়া নয়ন,
খেলে যথা ঘনতলে চঞ্চলা চপলা,
ছিন্ন মুণ্ড জায়েদার পড়িল ভূতলে।

মাইকেলী-রীতির অনুকরণ বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। কবির অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে এজিদ, মাবিয়া, জব্বার, জয়নব, জায়েদা ও মায়মুনা প্রধান।

—

ষষ্ঠ অধ্যায়*

পল্লী সাহিত্যে মর্সীয়া

১। জারী গানের সংজ্ঞা ও উৎপত্তি

বাংলা দেশের বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলসমূহে সচরাচর মুহর্‌রম মাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ নর্তন-কুর্দন সহযোগে কারবালা কাহিনীর বিশেষ বিশেষ বিষাদান্ত্য অংশ অবলম্বনে যে-গীতিকা গাহিয়া থাকে, তাহাকে 'জারীগান' বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, বাংলার জারীগান পাক-ভারতীয় শী'য়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানের মর্সীয়া গানের প্রতিরূপ। বস্তুতপক্ষে, মুহর্‌রমের মর্মস্পর্শী ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ফারসী ও উরদূ ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষাতেও যে-সাহিত্য করুণ ভাব লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, জারীগান তাহারই এক বিশিষ্ট রূপ। যথার্থ বলিতে কি, জারীর বিরাট ভাণ্ডারকে বাদ দিয়া বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য কখনই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে 'বাংলা মর্সীয়া গজলের' কথা স্মরণীয় (বর্তমান গ্রন্থের পৃঃ ৪০ দ্রষ্টব্য)। زاری শব্দটি ফারসী। ইহার অর্থ 'ক্রন্দন' 'বিলাপ'। বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলে

---

* ইংরেজ আমলের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ধারা হিসাবে 'পল্লী সাহিত্যে মর্সীয়া'কে আমি বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। এই হিসাবে বর্তমান আলোচনাকে পঞ্চম অধ্যায়ের অঙ্গীভূত করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তাহা না করিয়া আলোচনার সুবিধার জন্য পৃথক অধ্যায়রূপে সাজাইয়াছি। —লেখক।

যে-জারীগান গাওয়া হয়, তাহা 'ক্রন্দন' বা 'বিলাপ' অর্থ হইতেই উদ্ভূত। কারণ, কারবালা-প্রান্তরে ইমাম হুসৈন এবং তাঁহার সহচরগণের নির্মমহত্যার করুণ-কাহিনীর অংশবিশেষ অবলম্বনে এই শোকগীতি বা ক্রন্দন-গীতি বিরচিত ও গীত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে 'জারী' (যারী) আখ্যা দেওয়া হয়।

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন 'জারীর' সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ

'জারীগান হযরত হুসাইন ইব্‌নে আলীর শাহাদৎ বরণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ········এই গানে অত্যাচারী শক্তির নিষ্ঠুর জুলুম ও উৎপীড়নের বিবরণ পাওয়া যায়[১]।

তাঁহার এই উক্তি ঠিক নহে, কারণ জারীগান ইমাম হুসৈনের শাহাদৎ বরণের 'কাহিনী' অবলম্বনে রচিত নহে—বরং কাহিনীর 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ' লইয়া রচিত। এতদ্ব্যতীত, এই গানে অত্যাচারী শক্তির নিষ্ঠুর জুলুম ও উৎপীড়নের 'বিবরণ' পাওয়া যায় না। 'বিবরণ' অর্থে যাহা বুঝায় জারী গানে তাহা নাই। 'জারী' মূলতঃ কারবালা কাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষাদাত্মক অংশ অবলম্বনে বিরচিত হইলেও ইহার মধ্যে পূর্বাপর কোন সঙ্গতি নাই। অত্যাচারী শক্তির নিষ্ঠুর জুলুম ও উৎপীড়নের 'বিবরণ' শুধু মর্সীয়া কাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়—জারীগানে নহে।

যাহা হউক, এ-কথা সর্ববাদীসম্মত যে, কারবালা কাহিনী বহুকাল যাবৎ মুসলিম জনসাধারণের ধর্মীয় জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ইহা বাংলা দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত অগণিত জনসাধারণের অন্তরে আলোড়নের

---

১ মাহেনও, মাঘ ১৩৬৬, ১১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৩।

সৃষ্টি করে ; ফলে প্রতি বৎসর মুহর্রম মাসে ইমাম হুসৈনের শাহাদতের স্মৃতি অবলম্বন করিয়া শীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ এবং তৎপ্রভাবে প্রভাবিত সুন্নী মুসলমানগণ মাতমজারী করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই মাতমজারী হইতেই পল্লী বাংলার এই ক্রন্দন বা বিলাপ-সঙ্গীতের উদ্ভব। এই গান পূর্ব বাংলার এক নিজস্ব সম্পদ[২]।

বাংলা দেশে জারীগানের উৎপত্তি কোন্ সময় হইতে হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বর্তমান জারীগানের প্রথম প্রচলন হইবার কোন মুখ্য বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও গৌণ বা পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। আমরা জানি, ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে কবি শৈখ ফয়জুল্লাহ্-রচিত 'জয়নবের চৌতিশা' নামক একখানি বাংলা মর্সীয়া জাতীয় কাব্য রচিত হয়। যতদূর মনে হয়, এই সময়ে 'জয়নবের চৌতিশা' এবং অজ্ঞাতনামা কবিদের রচিত 'সখিনার চৌতিশা', 'সখিনার বিলাপ', 'জয়নবের বিলাপ' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিগুলি মুহর্রম মাসে মধ্যযুগের পাঁচালীর[৩] ঢংয়ে আসরে গাওয়া হইত। ইহার পরবর্তীকালে রচিত মুহম্মদ খানের 'মোক্তাল হোসেন' কবি হামিদের 'সংগ্রাম হুসন' এবং হায়াৎ মাহ্মূদের 'জারীজঙ্গনামা' কাব্য যে পাঁচালীর ঢংয়ে লিখিত হইয়া

---

২ আবদুল কাদির: 'বাংলার পল্লীগ্রামে বৌদ্ধ সাধনা ও ইসলাম'। বিচিত্রা ২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা চৈত্র ১৩৩৫, পৃঃ ৫৫৬-৫৭।

৩ মধ্যযুগের পাঁচালী ছিল মূলতঃ কাব্য। এগুলি ঠিক গানের জন্য রচনা করা হইত না, কিন্তু আসরে গীত হইত। ইহা সাধারণতঃ অক্ষর মাত্রিক পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। কিন্তু পরবর্তীকালের দাসু রায়ের (১৮০৬-৫৭) পাঁচালী প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গান। গাহিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার গান রচিত হইত।

জারীরূপে তৎকালে আসরে গীত হইত, কবিগণের উল্লিখিত 'ধুয়া', 'ঘোষা', 'রাগ-রাগিণী' প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে তাহা নিশ্চিতরূপেই জানা যায়[৪]। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর এই সমস্ত কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ায় গ্রামবাসীরা জারীগানের কতকগুলি পালার নাম দিয়াছিল 'ইমামচুরি', 'শহীদে কারবালা', 'সখিনার বিবাহ', 'সখিনার বিলাপ', 'মুসলিম বধ', 'জয়নাল উদ্ধার'। জারীর এই পালাগুলি বর্তমানকালেও পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে প্রচলিত। সুতরাং বাংলাদেশে জারীগানের উৎপত্তি যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে হইয়াছে, পরোক্ষ প্রমাণ হইতে তাহা জানা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর লেখক জয়নারায়ণ ঘোষালের কাব্য পাঠে অবগত হইতে পারা যায় যে, তৎকালে বাংলাদেশের অন্যান্য লোক-সঙ্গীতের সহিত জারীগানও আসরে বা আখড়ায় গাওয়া

---

৪ মুহম্মদ খানের সময়ে (সপ্তদশ শতাব্দীতে) যে এদেশে জারী ও মর্সীয়া গাহিবার রীতি প্রচলিত ছিল, কবির উল্লেখ হইতে তাহা স্পষ্টতই জানা যায়। এই সময়ে শীয়া-সুন্নী মুসলমানগণ জারী ও মর্সীয়া গাহিবার সময় হযরত আলী ও ইমাম হুসেনের শাহাদৎ সম্পর্কিত গুণ-বর্ণনা প্রসঙ্গে অপরাপর তিন খলীফার নিন্দাবাদও করিত। কবি এ-সম্পর্কে জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন :

জারি মরচিয়া বহু পাপ না করিবে।
আছহাবগণে গালি কভু নাহি দিবে ॥ (মকতুল হুসৈন)

এইজন্য মুহম্মদ খান নূতন আকারে গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার কাব্য-কাহিনীও পাঁচালীর ঢংয়ে জারী-রূপে গীত হইত।

হইত[৫]। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) অনেক পূর্ব হইতেই বাংলা দেশে জারীগানের প্রচলন ছিল[৬]। এতৎভিন্ন, 'সঙ্গীত রত্নাকর' নামক বটতলার প্রকাশিত পুস্তকে লিখিত আছে যে, ইংরেজ কোম্পানীর আমলে রাজধানী কৃষ্ণনগরে নানা অনুষ্ঠানে চণ্ডীগীত, পাঁচালী, কবি, পীরের গীত প্রভৃতির সহিত জারীগানও গীত হইত[৭]। পশ্চিমবঙ্গে এই জারী-গান যে এক সময়ে গীত হইত এবং সেখানে তাহা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহার সবচেয়ে পুরাতন নমুনা অধুনা আবিষ্কৃত পশ্চিমবঙ্গের এক খণ্ডিত পুঁথিতে মিলিতেছে। গানটি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

শ্রীশ্রীএলাহী

ধুয়া ঃ তারে নারে নারে নারে নারে নারে না ॥

কারবালাতে যখন হোছেন খলখয়ে শহীদ হল
হোছেনের শির নিয়ে কাফের দামেস্কাবাদে এল।
ছের নিঞে ত কাফের গেল নেজায় চাড়িঞা ॥
কারবালাতে হোছেনের ধড় থাকিল পাড়িঞা ॥ ১ বন্দ ॥

আবেদিনে তউক দিঞায় দিলেক উটের সহর
বিবিদের সব চাদর ছিনে করিলেক সওার।
পরিবারকে··· ··· ধরিয়া
দামেস্কাতে রাখিলে কারাগার দিঞা ॥ ২ বন্দ ॥

---

৫ তথ্যটি মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। মাহেনও, মাঘ, ১৩৬৬, ১১শ বর্ষ, ১০ সংখ্যা পৃঃ ৩।

৬ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য ঃ সা. প. প.। ২য় সংখ্যা ১৩১২, পৃঃ ৮১।

৭ পূর্বোক্ত ঃ পৃঃ ৮১-৮২।

পরিবার রহিল তামাম দামেস্কায় কয়েদ হঞা
মদিনার কথা কিছু শোন তোমরা মন দিঞা।
হোছেনের বেটি ছোগরা ছিল মদিনায় হঞে উদাস
একেলা ছিলেন বিবি কেউ ছিল না তাহার পাশ ॥ ৩ বন্দ ॥

রাত দিন ছিলেন ছোগরা দরজার চৌকাট ধরে
যতেকেও নেগাছে যেত শুধাইতেন কেন্দে তারে।
কোথা হতে এসো তোমরা কোথা যাহ চলিয়া
দেখেছ কেউ আনাত্তে মোর বাবাজীকে ফিরিয়া[৮] ॥ ৪ বন্দ ॥

আধুনিককালে প্রচারিত দুইটি পল্লীগীতির মধ্যে বিখ্যাত জারী-গায়ক পাগলা কানাই-এর নাম পাওয়া যাইতেছে[৯]। তাঁহার

---

৮ ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল : পুঁথি পরিচয়, ১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী পুঁথির নম্বর ৩৭২, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮, পৃঃ ১৭৩-১৭৪। এবং ডক্টর সুকুমার সেন : ইসলামি বাংলা সাহিত্য। বর্ধমান সাহিত্য সভা কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৫৮, পৃঃ ১৭৩।

৯ পল্লীগীতি দুইটি এ-স্থলে উল্লেখ করিলাম :

ক. নামটি আমার মেহের চাঁদ কালীশঙ্করপুর বাড়ি,
আমি দেশে বিদেশে গেয়ে বেড়াই জারী।
শুনি আকাশের এক মেলা হইয়াছে ভারী ;
তাতে বায়না নিয়ে পাগলা কানাই গেতে গেছে জারী।

খ. গিয়াছে ঘুনির জাহের পাগলা তাহের আর আর জান মোল্লা।
আসানউল্লা, সোনা, ফেদু, তরিবল্লা, কোরবান মোল্লা।
গেছে রোসন খাঁ, নৈমুদ্দি মুন্‌শী আর সুলতান মোল্লা
এরা কয় দলেতে পাগলা কানাই-র সাথে দিচ্ছে পাল্লা
তারা সব চালাক চতুর কানাই বড় কল্লা।

(সা. প. প., ২য় সংখ্যা ১৩১২, পৃঃ ৮১)

সময়ে এদেশে জারীগানের ব্যাপকতা সম্বন্ধেও আভাস পাওয়া যায়। পাগলা কানাই-এর আবির্ভাব-কাল আনুমানিক ১৮১০-১৫ খ্রীঃ ধরিলে[১০] নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দেড় শত বৎসর পূর্বে জারীগান বাংলা দেশের জনসাধারণের চিত্ত বিনোদন করিত। সুতরাং, এই সময়ের বহু পূর্বকাল হইতে জারীর উৎপত্তি হইয়াছিল।

২। মূল সুর

'জারী' করুণ-রসাত্মক গান। ইহাতে ব্যথার সুর যেমন গভীরভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ অন্য কোন গানে হয় না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ইহার তীব্র আবেদন। শুধু করুণরসের আবেদনই ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে, যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত বলিয়া জারীগানে অনেক স্থলে বীররস স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে উৎসারিত হইয়াছে। এ-সম্পর্কে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'বীর-রসাত্মক এই কাহিনীর উপর একটি করুণ কাহিনী আছে, তাহা ইমাম হোসেন ও হাসানের হত্যা। অতি দুস্তর মরুপ্রান্তরে শত্রু-সৈন্যের অবরোধের মধ্যে অসহায় শিশুর এক বিন্দু তৃষ্ণা বারির জন্য যে আর্তি এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এক দিক দিয়া যেমন ইহার মানবিক আবেদন সার্থক করিয়াছে, আবার অন্য দিক দিয়া ইহার বীর রসাত্মক পট-ভূমিকার উপর সুন্দর বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়াছে'[১১]। ইমাম হুসৈনের

---

১০ ডক্টর মযহারুল ইসলাম: কবি পাগলা কানাই। ১ম প্রকাশ ১৩৬৬ ভাদ্র, ঢাকা, পৃঃ ১৫।

১১ বাংলার লোক সাহিত্য। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ১৯৫৭, কলিকাতা, পৃঃ ২২১।

হত্যা-কাহিনী ব্যতীত কারবালা রণাঙ্গণে আরও যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়াও অসংখ্য জারীগান রচিত হইয়াছে। এই গান গাহিবার সময় জারীয়লদের কণ্ঠ অনুতাপ ও শোকে ভাঙিয়া পড়ে। মনে হয়, কারবালার এক প্রান্তে ইমাম-পরিবারের তাঁবুর মধ্যে যে-করুণ শোক প্রবাহিত হইয়াছিল, বাংলা দেশের জনসাধারণ তাহা আজও ভুলিতে পারে নাই। হাসান-পুত্র কাসেমের সহিত সখিনার বিবাহ, বিবাহের পর মুহূর্তে কাসেমের যুদ্ধযাত্রা, মৃত্যু ও সখিনার বৈধব্য-বরণ এবং হুসেনের শিশু-পুত্র আলী আসগরের বিষাক্ত তীর নিক্ষেপে মৃত্যু প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে পল্লী কবিদের রচিত জারীগানগুলিতে করুণ রস উৎসারিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে জারীর একটি[১২] নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

ধুয়া (দিশা) ঃ হায়রে খোদা হায়, আজ কি হলো হায় ;
নিভিল দিনের চেরাগ সোনার মদিনায় ॥
দুধের শিশু আলী আসগর পিপাসায় হয়ে কাতর ;
দে পানি দে পানি বলে ধূলাতে লুটায় ॥
পানির বদলে শেল বিঁধে কলিজায় ॥
সেই মরা শিশু এনে শাহের বানুর কোলে দিয়ে ;
বলে শাহে ঠাণ্ডা পানি পিলায়েছি তায় ॥
নিভিল দিনের চেরাগ সোনার মদিনায় ;
হায়রে খোদা হায়····· ·····হায় ॥ ধুয়া[১৩]

---

১২ আরও কয়েকটি নমুনা বর্তমান অধ্যায়ের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১৩ এই গানটি কুমিল্লার পল্লীকবি কমর আলীর নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। জারীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিচয়াত্মক রূপ

চতুর্দশ শতাব্দী হইতে বাংলা সাহিত্য রচনার আদর্শ ছিল পাঁচালী। এই পাঁচালী কোন উৎসবাদি উপলক্ষে আসরে গান করা হইত[১৪]। তখনকার দিনে জনসাধারণের কাব্যরস কুতূহল মিটাইবার প্রয়োজনে কবিগণ পাঁচালীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। মুসলমান কবিগণও এই পাঁচালীর ছাঁদেই কাব্য রচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন[১৫]। বাঙালী চিরদিনই সঙ্গীতপ্রিয়; কাজেই, তাহার ধর্মপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গীতপ্রিয়তা যুক্ত হইয়া কবিদের কাব্য রচনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঁচালী-কাব্যের অনুসরণে পূর্ববঙ্গে যে-বিরাট ইসলামী বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূলেও ছিল এই ধর্ম ও সঙ্গীত-

---

১৪ "......the most known are the Panchalis, which are sung at the festivals and sold in numerous editions and by the thousands. The Panchalis are recitations of stories chiefly from Hindu Sastras, in metre, with music and singing they relate to Vishnu and Siva, intermixed with pieces in the style of Anacroeon. (J. Long: A Descriptive catalogue of Bengali works. 1855)

১৫ কবি মুহম্মদ খান তাঁহার 'মোক্তাল হোসেন' কাব্য পাঁচালীর ছাঁদে রচনা করিয়াছিলেন, কবির উক্তি হইতেই তাহা বুঝা যায়। যথা:

ক. মুহম্মদ খান কহে পাঁচালী পয়ার।
শুনিতে উদ্গার যেন অমৃতের ধার॥

খ. শুন কহি পাঁচালী রচিনু যে কারণ।

গ. মুহম্মদ খানে কয় পাঁচালী পয়ার।
শুনে গুণিগণ মনে আনন্দ অপার॥

প্রিয়তা[১৬]। ধর্ম ও সঙ্গীতপ্রিয়তার সংমিশ্রণ হইতেই সম্ভবতঃ জারী গানের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। পাঁচালী-কাব্য ঠিক গান হিসাবে রচিত না হইলেও তাহা আসরে গান করা হইত; কিন্তু আগাগোড়াই গান করা হইত না। মধ্যে মধ্যে গায়েন কাব্যের বর্ণনাময় অংশ দ্রুত তালে আবৃত্তি করিত। তাহার বাম হস্তে চামর, ডান হস্তে মন্দিরা এবং পায়ে নূপুর থাকিত। অন্ততঃ দুইজন পালি বা দোহার থাকিত। কখনও কখনও গানের আসরে মৃদঙ্গ-বাদককেও দেখা যাইত[১৭]। এই পাঁচালী সাধারণতঃ অক্ষর মাত্রিক পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ত্রিপদীর সহিত ধুয়া বড় একটা দেখা যাইত না। যাহা হউক, ইহা হিন্দু পাঁচালী। পক্ষান্তরে মুসলমানী পাঁচালী হিন্দু পাঁচালী অপেক্ষা ভিন্নতর ছিল। কিন্তু জারীগানের সহিত হিন্দু পাঁচালীর সাদৃশ্য দেখা যায়—মুসলমানী পাঁচালীর নহে।

জারীগান সাধারণতঃ মুহর্রম মাসে গাওয়া হয়। এই সময়ে পল্লীর মুসলমান যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোলাহল পড়িয়া যায়। মুহর্রমের শুরুতেই তাহারা দল গঠন করে এবং গ্রামের কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে নকল দরগাহ্ তৈরী করে। মুহর্রমের জারী গাহিবার উদ্দেশ্যে অনেক গ্রামে বীবী ফাতিমার কৃত্রিম স্থায়ী দরগাহ্ তৈরী করিতে দেখা যায়। এই দরগাহ্‌র নাম 'বীবী ছায়বানীর দরগাহ্'। জারী গায়কদের 'দোহার' বা 'জারীয়ল' (খেলোয়াড়) বলা হয়। প্রধানের নাম 'ডাইনা'। ইহাদের নির্দিষ্ট কোন

---

১৬ ডক্টর মযহারুল ইসলাম: কবি হেয়াত মামুদ, রাজশাহী, ১৯৬১, পৃঃ ২০০-২০১।

১৭ ডক্টর সুকুমার সেন: বা. সা. ই, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ ১৯৪৮, পৃঃ ৮৫।

সংখ্যা থাকে না। কমপক্ষে ৫।৭ জন হইতে ২০।২৫।৩০ জন জারীয়ল দলে থাকে। জারীয়ল-দলে ধুয়া ধরার জন্য কখনও কখনও দুই তিনটি ছোটছেলের একটি দলও থাকে। এই দলের নাম জ্বিল। জারীগান সাধারণতঃ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃত্তাকারে নর্তন-কুর্দন সহযোগে গাওয়া হয়। জারীতে 'ধুয়া'[১৮] নামক একটি অংশ আছে। জারীর ধুয়ার অন্য নাম 'দিশা'। প্রত্যেক গানে দিশা থাকিবেই। কোন কোন দিশা ঘটনা-প্রবাহ বা কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্যহীন, এবং কতকগুলি আবার সম্পর্কযুক্ত। জারীর বিষয়-বস্তু লইয়া কাহিনী বর্ণনা করিবার জন্য যে একজন মূল গায়েন থাকে, তাহার নাম 'বয়াতী'। বয়াতী তালে তালে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় কাহিনী বলিয়া যায় এবং মাঝে মাঝে দিশা ধরাইয়া দেয়। নর্তন-কুর্দনের তালে তালে হাত তালিও দেওয়া হয়। হাতের তাল জারীগানের তাল অনুসারে নানা প্রকারের হইতে পারে। গানের সময় মাঝে মাঝে সুরের টানও দেওয়া হয়। সাধারাণতঃ ইহাতে বাদ্যযন্ত্রের আবশ্যক হয় না। নর্তন-কুর্দনের ভঙ্গিতেই জারীয়লদের দিশা ও বয়াতীর বয়াতের তাল রক্ষিত হয়।

---

১৮ ধুয়া: 'ধুয়া' সংস্কৃত 'ধ্রুবা' শব্দজ। অর্থ 'স্থায়ী'। জারীগানে দোহার যে-অংশটি বার বার আবৃত্তি করে তাহাকে 'ধুয়া' বলে। ধুয়াকে আদ্য, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধুয়ায় শ্রেণীভাগ করা যায়। সুরের গতি-প্রকৃতি অনুসারে ভাব প্রধান, সুর প্রধান ও কথা প্রধান এই তিন ভাগেও বিভক্ত করা যায়। ইহার আয়তন ক্ষুদ্র; কিন্তু ইহার মধ্যে গানের সমস্ত আবেগ ও ভাবঘনতা বিদ্যমান। 'ধুয়া' জারী গানের অংশ নহে; শুধু জারীর সুরকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়। জারী গানের মধ্যে যে-কয়টি পদবন্ধ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের শেষে ইহাকে গান করা হয়। ইংরেজীতে ইহার নাম '**Refrain**'।

জারীয়লদের বেশভূষার পারিপাট্য নাই। সজ্জা অতি সাধারণ ধরণের। পরণে ধুতি, গায়ে গেঞ্জী বা অন্য কোন জামা, হাতে রুমাল ও পায়ে মেখুর (নূপুর) থাকে। "বয়াতীই প্রথমে জারীয়লদের একটি দিশা ধরিয়ে দেয়। কিছু অংশ গাইবার পর সে আবার দিশার সহিত তাল মিলিয়ে দিশা আরম্ভ করিয়ে দিয়ে নিজে একটু বিশ্রাম নেয়। এমনিভাবে আসরে গান এগিয়ে চলে[১৯]।" গানের মধ্যে যদি কোথাও গভীর শোক প্রকটিত হইয়া উঠে, তবে সেখানে গানের বিশেষ সুর ঝঙ্কার তুলিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে মোহ সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে, জারীগানের যত কিছু মনোহারিত্ব, যত কিছু কবিত্ব-প্রকাশ—সমস্তই সুরের মধ্যে।

জারীগানের শুরুতে বন্দনা গাওয়া চিরাচরিত রীতি। এই বন্দনা কখনও দীর্ঘ, কখনও সংক্ষিপ্ত হইতে পারে। জারীগানের বন্দনায় কখনও কখনও ইসলামী উপাদানের সহিত অনৈসলামিক উপাদান লক্ষ্য করা যায়। এ-বন্দনা নিম্ন প্রকারের :

পূবেতে বন্দনা করি পূবের ভানুশ্বর
একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিগে পশর।
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীরনদী সাগর।
যেখানে বাইতো ডিঙ্গা চান্দ সদাগর।
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
যেখানে রাইখ্যাছে আলীর মাল্লামের পাথর।
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা হেন স্থান
উদ্দিশে জানায় গো ছেলাম মমিন মুসলমান।

১৯ রওশন ইজদানী : মোমেনশাহীর লোক সাহিত্য। ঢাকার বাঙ্লা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ ১৩৬৪, ফাল্গুন, পৃঃ ২৮।

ইহার পশ্চিমের কথা কহনও না যায়
আঁড়িয়ে রান্ধিলে ভাত বরাঙ্কণে খায়॥

অনেক বয়াতী এই পর্যন্ত গাহিয়া সভাস্থ ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে সালাম জানাইয়া মূল গান শুরু করে। আবার কেহ কেহ দীর্ঘ বন্দনা গায়। বন্দনার শেষাংশে বয়াতী আসরে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে সালাম জানায়। অতঃপর, মূল গান শুরু হয়। জারীগানগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট কোন ছন্দ নাই, সর্বত্র মিল নাই। ভাষার মধ্যে সমতা ও শালীনতা নাই, কিন্তু গান হিসাবে গীত হইবার সময়ে ইহা সজীব হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় মধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে। অধুনা প্রচলিত অসংখ্য গান কবে এবং কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছিল, বলা শক্ত। তবে পল্লীর জনসাধারণের মুখে মুখে এগুলি প্রয়োজনের সময় গীত হওয়ায় ইহা জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে।

আধুনিক 'জারীর' অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এই ব্যাপকতা আধুনিক জারীর বৈশিষ্ট্য। কাজেই, হাল আমলে 'জারী' অর্থে শুধু মুহর্‌রম সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষাদান্ত অংশ অবলম্বনে গীতিকাকেই বুঝায় না—অন্য যে-কোন বিষয় উপলক্ষে জারীগানের সুরে রচিত ও গীত গানকে 'জারী' আখ্যা দেওয়া হয়। এখনকার যে জারী, তাহাতে সুরের প্রাধান্য বেশী ; বিষয়-বস্তুর প্রাধান্য নাই। জারীর এই বিশেষ সুর, যে-কোন গানে প্রযুক্ত হইলে তাহা যখন জারী হয়, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, জারীর সুর অন্য গানের সহিত এক নহে। পল্লীর ধর্ম-বিপ্লব, রাজনৈতিক গোলযোগ, সামাজিক হট্টগোল বা কোন প্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামাদি কেন্দ্র করিয়া সাধারণতঃ এই গান রচিত হয়।

জারীর বিষয়বস্তু অনুসারে ধুয়া ব্যবহৃত হয়। খোদা বা রসূলের নামের জারী গাওয়া হইলে তদনুসারে ধুয়া ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, রঙ্গরসিকতামূলক জারীতে রঙ্গরসের ধুয়া ব্যবহার করাই

রীতি[২০]। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন 'পাকিস্তানের জারী'* গাহিবার সময় সংক্ষিপ্তভাবে আল্লাহ্, ও বাবী ফাতিমার বন্দনা করিবার পর পরই মূল-কাহিনী শুরু করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে রচিত জারীর ন্যায় কারবালা বিষয়ক জারীও বর্তমানে যে-কোন সময়ে গীত হয়, কিন্তু মুহর্রমের জারী মুহর্রম মাসে যেমন জমিয়া উঠে, তেমন অন্য কোন সময়ে (বা আসরে) জমে না। যথার্থ বলিতে কি, মুহর্রমের জারীগানে যে তীব্র আকূতি, বেদনানুভূতি ও গভীর আবেগ শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে ভরিয়া তোলে, তদ্রূপ অন্য কোন গানে হয় না। কাজেই, আধুনিক জারী গানের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্র অধিকতর সম্প্রসারিত হইলেও তাহার মূল সুর ও শিল্পের বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

---

২০ খোদা বা রসূলের নামের জারীতে সাধারণতঃ নিম্ন প্রকার 'ধুয়া' ব্যবহৃত হয়। যথা:

ক. ওরে আমার আল্লা, কি যে লিখেছ বান্দার কপালে।

খ. কে বুঝিতে পারে তোমার খেলারে আল্লা
কে বুঝিতে পারে তোমার খেলা।

গ. নিদানের ভরসা আমার আল্লারে
হারে নিদানের ভরসা আমার আল্লা॥
(তসের আলী: জারী সঙ্কলন, ১৩৫৮, পৃঃ /০ ও ৵০)

রসরসিকতাপূর্ণ জারীর ধুয়া সাধারণতঃ নিম্ন প্রকার হয়। যথা:

ক. কৈ গেলি গো দাদীজান
দাদায় আইল চাকের থেইক্যা তামুক সাইজ্যা আন্।

খ. রঙ্গে রসে নয়া বধূ হাসেরে
ওরে রঙ্গে রসে নয়া বধূ হাসে॥

* নমুনা বর্তমান অধ্যায়ের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

জারীর সুর বরাবরই অত্যন্ত করুণ এবং মর্মস্পর্শী। এ-কারণে, ইহা জনসাধারণের অন্তরকে অতি সহজেই উত্তেজিত ও আলোড়িত করিতে সমর্থ। আজও যে জারীগান সর্বসাধারণের নিকট অতিশয় জনপ্রিয় সঙ্গীতরূপে আদৃত, তাহার কারণ—জারীর করুণ সুরমূর্চ্ছনা। জারীগানের অন্তর্নিহিত মানবিক আবেদনও এই জনপ্রিয়তার একটি অন্যতম কারণ।

৪। রসের দিক হইতে জারীগানের আলোচনা

বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের ধারায় জারীগান অন্যতম। রসের দিক হইতে ইহার বিচার করিলে দেখা যায়, ইহার আদর জাতি ও দেশের পক্ষে অপরিহার্য। জারী প্রধানতঃ গ্রাম্য-কবির রচিত সঙ্গীত। পল্লীর সর্বসাধারণই ইহার পালক। এই গানগুলির ভিতর জাতির অতীত গৌরব, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারাগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। বাংলা লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গানের মধ্যে যে-সকল বৈশিষ্ট্য সচরাচর দেখা যায়, জারীগানেও তাহা অল্প-বিস্তর বিদ্যমান। বাংলা দেশের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও জারীগানের মূল্য অত্যন্ত বেশী।

জারীগানের মধ্যে মানব-জীবনের সহজ, সরল পরিচয় নিহিত আছে, জাতি ইহা হইতে অনুভূতি ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষা লাভ করিতে পারে। কারণ, ইহার মধ্যে গভীর সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক সম্পদ্ ওতপ্রোতভাবে লুক্কায়িত। দেশে গণ-শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রেও এ-ধরণের প্রাণবান সম্পদ্গুলির মূল্য অপরিসীম। এতদ্ব্যতীত, দেশপ্রেম প্রচারের ক্ষেত্রে জারীর গুরুত্ব কম নহে।

বর্তমানে জারীগান দেশাত্মবোধ জাগাইবার জন্য একটা প্রশস্ত মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে 'পাকিস্তানের জারীর' কথা উল্লেখ করা যায়।

ইমাম হুসেন সম্পূর্ণ অসহায় ও নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুর সম্মুখীন হইয়া ন্যায়, সত্য ও আদর্শের নিমিত্ত অবিচলিত চিত্তে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই মহান শিক্ষা চিরদিনই দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বিপদে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগের মহান পরাকাষ্ঠা দর্শনে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের মন নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

মানুষ স্বভাবতঃ তাহার জীবনকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। নানা বিপরীত মনোভাব, আচরণ ও কথাবার্তাকে একটি ছন্দোময় সুষমায় গাঁথিতে চায়। তেমনি মানুষের সমষ্টিগত যে সমাজ-জীবন, সেও সমাজের নানা পথগামী বিচিত্র মনকে ছন্দোময় শৃংখলায় আনিয়া সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে চায়। দলবদ্ধ সামাজিক নৃত্যগীত সেই উদ্দেশ্য সাধনের একটি প্রধান উপায়। জারীগান নর্তন-কুর্দনের সহিত যুক্ত হওয়ায় ভিন্নপথগামী নানা মনকে শৃংখলাবদ্ধ করিতে সাহায্য করে। জারীতে নৃত্যের অংশ থাকায় চিত্তবিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে পরস্পর ঐক্য ও প্রীতি-বন্ধনের কাজ সুদৃঢ় হয়। জারীগান জাতির নৈতিক সৌন্দর্য-শক্তিরও আধার। এগুলির মধ্যে দেশ ও জাতির পুরুষানু-ক্রমিক ভাবধারার নিবিড় যোগসূত্র রহিয়াছে। দেশের বর্তমান মানুষ তাহার যুগযুগান্তের ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায় বা কাহিনীর এবং পূর্বপুরুষের বীর্যবত্তার পরিচয় জানিতে পারে।

যথার্থ বলিতে কি, জারীগানের চর্চায় জাতির পুনরুজ্জীবন লাভ হয়, জাতির আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়। ইহার অনুশীলনে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একটা ঐক্যের ভাব সৃষ্টি হয়; সে

অতীতকে শ্রদ্ধা করিতে শিখে ; জাতির যে একটা নিজস্ব অবদান আছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে। ফলতঃ মানুষের সমাজ-সচেতনতার ব্যাপারে জারীগানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

জারীগান যুগে যুগে পল্লী বাংলার আপামর সাধারণের ভাব ও রসচর্চাকে জাগ্রত রাখিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ইহা জনসাধারণের চিত্তকে শুধু যে আহার, বিহার ও স্বার্থসাধনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে দেয় নাই তাহা নহে, তাহাকে ছন্দ ও সঙ্গীতের বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তি দিতেও চেষ্টা করিয়াছে।

—

ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

মুহর্রমের জারী গানের নমুনা

(১)**

ধুয়া (দিশা) : আল্লা হায় হায়দারের শোকে পরাণ জ্বলে ;
আছগর বালক পিয়াছা লুটেন হুছনজীর কোলে ॥

আল্লা— হুছনজী কোলে লইয়া শিশু আপনার
পানি মাংগিতে যাইন ফোরাতের কিনার ॥
আল্লা হায়……। ধুয়া।

** জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর ও অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আল্লা · যদি আল্লার বান্দা আর নবীর উম্মত হও
এক কাতরা পানি আমার শিশুর মুখে দেও ;
হায় হায়— পানি বন্ধ করি তোমরা সবে পানি খাও ;
পানির কারণে আমার ছাওয়াল মারা যায়।
আল্লা হায়……। ধুয়া।

আল্লা— উম্মরকে বলিলা ছাহেব বিবাদ আমার সাথে,
কি গোনা করিল মোর দুধের বালকে ;
হায় হায়— শুনিয়া কহিল পাপী শুন শাহা পীর
পানির বদলে যাও খাইয়া এক তীর।
আল্লা হায় ·…। ধুয়া।

আল্লা— এ বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কাফের বেদীন
বালকের গলার মাঝে মারল এক তীর ;
হায় হায়— তীর খাইয়া দুধের ছাওয়াল হৈলা অচেতন
খিমায় লইয়া যাইন ইমাম হুছন।
আল্লা হায়……। ধুয়া।

আল্লা — আছগরের লাশ হায় কোলেতে লইয়া
কান্দিতে লাগিলা ছাহেব বেতাব হইয়া ;
হায় হায়— ডান হাতে তীর মুইঠ বামেতে ধরিয়া
শিশুর গলার তীর লইলা খেচিয়া।
আল্লা হায়……। ধুয়া।

আল্লা— খুলিতে গলার তীর মাইলা যবে টান,
দুই আংগী বুজিয়া বালক তেজিলা পরাণ ;
হায় হায়— লহুয়ে নাওয়াইয়া হুছন পরাইলা কাফন
কারবলাতে লইয়া যাইন করিতে দাফন।
আল্লা হায়……। ধুয়া।

আল্লা— কবর খুদাইলা ছাহেব হৈয়া জারে জার,
দফন করিলা হায় হায়—শিশু আপনার।

হায় হায়— হুর পরী কৈবার লাগৈন শুন হুছনজী
আছগর বালক দফন করি কোলে লইবায় কি ?
আল্লা হায় ···· । ধুয়া।

(২) *

দিশা : কাসেমে কয় বিদায় কর আমারে
অন্তর জ্বলিয়া গেল পানির কারণে।
প্রভু হে, ওহে প্রভু দয়াময় প্রেমেরি ভাণ্ডার।
প্রেমের কারণে সৃষ্টি করিছ সংসার॥
প্রভু যারে ভালবাসে কষ্ট দেয়গো তারে
প্রভুর মহিমারে মন কে বুঝিতে পারে॥
তোমার নাম তোমার কাম তোমার মেহেরবাণী।
দরিয়া শুকাইতে পার, পাহাড়েতে পানি।
কাসেমে··· । ধুয়া।

ইমাম হোসেন কারবালাতে আছিল যখন।
পানি বিনে ইয়ারবৃন্দ শহিদ হয় তখন॥
এমন সময় ভাবেন হোসেন শিবিরে বসিয়া।
কারে দিব কাফেরগণের সম্মুখে পাঠাইয়া॥
কাসেমে······। ধুয়া।

হেন সময় হাসান-পুত্র কাসেম যাইয়া ;
পিতৃব্যপদ চুম্বন করে বলেন দাঁড়াইয়া॥

---

* মৈয়মনসিংহ জেলার চরপাড়া-নিবাসী আবদুল আজীজ খোন্দকারের নিকট হইতে ২নং গানটি সংগৃহীত।

বিদায় কর তাত মোরে যুদ্ধে যাই এখন।
শত্রুকুল নির্মূল আমি করি গিয়া রণ॥
কাসেমে……… । ধুয়া।

(৩) ***

দিশা : হায়রে আগুন লাগল কলেজায় ;
কাসেম যায় রে রণ করিতে, কান্দে সখিনায়।
ও মনরে, কাসেমের তঙ্গহীন ;
ঘোড়ার মুখে লাগায় জিন।
জায়েদা ডাকিয়া বলে
বাপ কাসেম ! বলি তোরে
তোমার ডান পাশে যে একটি কবচ দেখা যায়।
হায়রে আগুন……… । ধুয়া।

ও মনরে, এই কথা কাসেম শুনি
কবচ খুলিয়া দেখিল ;
এমন বিপদ কালে
কি আছে কবচে
কি বিপদ ঘটায় বিধাতায়
হায়রে আগুন…… … । ধুয়া।

ও মনরে, কাসেম কান্দিয়া বলে
মাগো আমি বলি তোরে
রণের সাজন সাজাও আমায়
হায়রে আগুন…… । ধুয়া।

*** ঢাকা জেলার নরসিংদী থানার অন্তর্গত রসুলপুর গ্রাম-নিবাসী আলী আসগর সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত।

এ কথা জায়েদা শুন্‌ল
বাবা বলি ডাক দিল—
রণের সাজন সাজাবে তোমার চাচায়
হায়রে আগুন.......... । ধুয়া।

এই কথা কাসেম শুন্‌ল
চাচা বলি ডাক দিল—
কলেজা জ্বলে পানির পিপাসায়।
হায়রে আগুন.......... । ধুয়া।

(৪) ***

দিশা : আর আইও না মহরমের চাঁদ
আইও না দুনিয়ায়।
বার না বৎসরের সময় লাড়ী হল সখিনায়
আর আইও না মহরমের চাঁদ,
আইও না আর দুনিয়ায়
সখিনা কান্দিয়া বলে, মাগো আমি বলি তোরে
কেন বিয়া দিলি মোরে দাস্ত কারবালায়।
এক ঘণ্টায় লাড়ী হল বীবী সখিনায় ;
হাসানবানুর গলা ধরি উঠল সখিনা কান্দিয়া
মাগো আমার কি হবে উপায়।
আর আইও.......... । ধুয়া।

এ কথা হাসানবানু শুনে সখিনারে নিল বুকে
কান্দ না কান্দ না মাগো আমি বলে যাই ;

*** ঢাকা জেলার নরসিংদী থানার অন্তর্গত রসুলপুর গ্রাম-নিবাসী আলী আসগর সাহেবের নিকট হইতে ৪নং গান সংগৃহীত।

এ কথা সখিনা শুনে, বোরখা দিল মাথায় টেনে
কাসেমের কাছে চলে যায়।
আর আইও.........। ধুয়া।

(৫) ***

দিশা : সখিনা কান্দে হায় গো হায়,
আমার ঐ শূন্য ময়দান দেখা যায় ;
রণ করতে গেল বাবা ফোরাতের কিনারায়।
খালি পিঠে আইল ঘোড়া বাবাজি রইল কোথায় ?
হাসানবানুর গলা ধরি কান্দে বিবি সখিনায়
মাও লাড়ী, ঝিউ লাড়ী হইলাম সোনার মদিনায়।
আমার শূন্য.......। ধুয়া।

সখিনার কান্দন শুনে সাত শত নর-নারী কান্দে
হায় গো হায়—
এই যে পুরুষ ছাড়া বংশ আল্লায় করল দাগু কারবালায়।
আমার শূন্য......। ধুয়া।

জয়নালকে কোলে লইয়া কান্দে বিবি শাহেরায়
হায় মাত্তম হায় মাত্তম জারি করে বিবি জায়েদায়।
আমার শূন্য.......। ধুয়া।

(৬) *

হায় হোসেন, হায় হোসেন
হায় হায় প্রাণ যায়॥

*** পূর্বোক্ত আলী আসগর সাহেবের নিকট হইতে ৫ নং গান সংগৃহীত।

* মৈয়মনসিংহ জেলার চরপাড়া-নিবাসী আবদুল আজীজ খোন্দকারের নিকট হইতে ৬ নং গানটি সংগৃহীত।

কান্দে বিবি শাহেরবানু
এই শোক আমার কে দিল।
মারিয়া দুধের-ই বালক
বসতি শূন্য করিল॥
হায় হোসেন ……। ধুয়া।

আমি কারে বা পিলামুরে দুধ
আমার কোলশূন্য করিল।
কারে বা দোলাব রে দোলায়
দোলনা ছাড়া আমায় কে করিল॥
হায় হোসেন………। ধুয়া।

মনে ভাবি হায় রে দোলনা
আমিই তোরে বানাইছি।
গহীন সাগরেতে দোলনা
আজি হৈতে ভাসাইছি॥
হায় হোসেন…। ধুয়া।

এখনই দেইখ্যাছিরে যাদু
এই দোলনায় তুমি দুলিতে
এখনই দেইখ্যাছিরে যাদু
শিশুর সনে তুমি খেলিতে॥
হায় হোসেন……। ধুয়া।

উঠ যাদু কথা বলো
ডাক রে মা মা বলিয়া।
অভাগিনীর জীবন জুড়াই
মা ডাক তোমার শুনিয়া॥
হায় হোসেন……। ধুয়া।

ফুলের শয্যা ছাড়িয়া রে যাদু
ধূলির শয্যায় শুইয়াছি।
উঠিয়া তুমি বসরে যাদু
কোন্ খেলা তুমি খেলিত্যাছ ॥
হায় হোসেন......। ধুয়া।

কাক কালো কোকিল কালো
আরও কালোরে ভ্রমরা।
এয়ছা কালো মায়ের কলিজা
পুড়িয়া হৈল রে আঙ্গেরা ॥
হায় হোসেন.... । ধুয়া।

পাকিস্তানের জারী গান*

বন্দি খোদা, বন্দি রসুল, বন্দি ফাতেমা ;
ভাঙ্গা নৌকায় ধরলাম পাড়ি লাগাও কিনারা।
ভুক লাগিলে দিও খানা পিয়াসে দিও পানি ;
আন্ধার কবরে জ্বলবে নূরের রৌশনী।
বন্দনা বলিতে আমার অনেক হবে দেরী ;
মন দিয়া শুনেন সবে পাকিস্তানের জারী।
পাকিস্তানের পাক জবান লিখেছে ইকবাল
খোদা মেহেরবান তাই পাকিস্তান হয়েছে বহাল
ধন্য কবি ধন্য ইকবাল ধন্য তোমার বাণী
তোমার লেখা পাকিস্তান আজ সারা দুনিয়ায় শুনি।
পূবে পশ্চিমে শুনি ডাইনে আর বাঁয়,
সারা দুনিয়ার ঘরে ঘরে বাতাসে ছড়ায়।

---

* 'পাকিস্তানের জারী' গানটি তসের আলীর 'জারী সঙ্কলন' হইতে উদ্ধৃত। নিউ এজ পাবলিকেশন, ২য় মুদ্রণ ১৩৫৮, পৃঃ ১০৭।

বনের পাখি সেও সুখী পাকিস্তান নাম শুনে ;
বলে, স্বাধীন দেশে করব বাস পাকিস্তানের বনে।
কোন অভাব থাকবে না ভাই পাকিস্তানের দেশে
সুগন্ধি তেল লাগাবে বৌয়ের দীঘল কেশে।
বৌয়ের মাথায় দীঘল চুল ঝাইড়া বান্ধে খোঁপা
খোঁপার উপর তুইল্যা দিবে পদ্মমুখীর জবা।
পাকিস্তানের ফুল ফুটেছে গন্ধ উড়ে যায়
রঙ্গ রসে বধূ হাসে আল্‌তা দিয়ে পায়।
রৌদ্রে পুড়ি মেঘে ভিজি তাতে নাইক দুখ
ঘরে এসে চেয়ে দেখি বৌয়ের সুন্দর মুখ।
পাকিস্তানের পাটের জমি পাকিস্তানের তুলা
নয়া বৌ ধান ঝাড়ে হাতের সোনার কোলা।

বাংলা মর্সীয়া গজল

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ (?) শতাব্দীর রচনা।

॥ মোস্‌লেমের উক্তি ॥

হায় আল্লা একি হৈল নসিবের হাল মেরা।
কুফিরা দুষমন যত ঘিরিয়া লইল তারা॥

[১]

না জেনে কেনে আইনু,
বিপাকেতে মারা গেনু,
পুত্র ধনে হারাইনু,
আপনি পড়িনু ধারা।
(হায় আল্লা এ কি হৈল…)

[২]

হযরত হোসেন তরে,
কহিনু মিনতি করে,
ভেজনা সেথায় মোরে,
বদকাল দেখেছি বড়া।
(হায় আল্লা এ কি হৈল…)

[৩]

কুফা শহর না যাইব,
কাহেক জান গোঙাইব,

[৪]

আমি প্রাণে বাঁচিব না,
তুমি ভাই হেথা এসো না,

দুঃখেতে শেষ পচতাইব,
প্রাণে আমি যাব মারা।
(হায় আল্লা এ কি হৈল…)

করিতেছি আগে মানা,
প্রাণের ভাই তু পেয়ারা।
(হায় আল্লা এ কি হৈল…)

[৫]

আখেরি সালাম লেহ,
গোনা মাফ করে দেহ,
তক্‌দীরের দুঃখ সহ,
গেনু মারা গেনু মারা।
(হায় আল্লা এ কি হৈল…)

[৬]

তব খুন বদলেতে,
বখ্‌শা যাব হাশরেতে,
রাখি এহা একিনেতে,
নবীর উম্মৎ ছাড়া
(হায় আল্লা একি হৈল…)

হোসেনের উক্তি

(যুদ্ধের পর)

কি হাল হইল আজি কারবালার ময়দানেতে।
বিনা পানি পেরেশানী কেউ ফেরে না সালামতে ॥

[১]

দেখ ওগো হোর মেরা,
আল্লাতালার পেয়ারা,
পেয়াসেতে প্রাণে সারা,
শহীদ হৈল নিমেষেতে।
(কি হাল হৈল আজি)

[২]

কওসারের পানি লিয়া
গোসল করিবে গিয়া,
গোনা হৈতে পাক হৈয়া
লেখা গেল দফতরেতে।
(কি হাল হৈল আজি)

(খোন্দকার আবদুল কাদির)

গ্রন্থের উপসংহার

হাসান-হুসৈনের আত্মত্যাগের গুণবর্ণনা প্রসঙ্গে আরব-পারস্যে 'মর্সীয়া' রচনার প্রচলন হয় এবং তথা হইতে ভারত ও বাংলাদেশে উরদূ ও বাংলা ভাষায় এই সাহিত্য রচনার ধারা অনুসৃত হইতে থাকে। হযরত রসূলের ওফাতের পর তাঁহার প্রতিনিধিত্ব লইয়া নব-দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে 'শীয়া' ও 'সুন্নী' নামক দুইটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। শীয়াগণের মতে, হযরত রসূলুল্লাহ্‌র পরে হযরত আলীই ন্যায়সঙ্গত খলীফা বা প্রতিনিধি। সুতরাং তাহারা অর্থাৎ শীয়ারা অপরাপর খলীফা অপেক্ষা হযরত আলীর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে এবং এই হিসাবে আলীর পরে আলী-পুত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হুসৈন মুসলিম জগতের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধি; আবূ বকর, উ'মর ও উ'সমানের খিলাফৎ সম্পূর্ণ বেআইনী। যাহা হউক, এই খিলাফৎ লইয়া যে-দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহাতে কারবালা রণাঙ্গনে মুআবিয়া-পুত্র খলীফা ইয়াযীদের সৈন্যদলের হস্তে ইমাম হুসৈন সহচরগণসহ নৃশংসভাবে নিহত হন। ইমাম হুসৈনের শাহাদৎ উপলক্ষে শীয়া কবিদের দ্বারা যে-মর্সীয়া কাব্য ও কবিতা রচিত হইতে থাকে, তাহা প্রথমে দক্ষিণ ভারতে শীয়া-শাসিত বীজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে এবং পরে মুঘল আমলে উত্তর ভারতের বহু অঞ্চলে ঈরাণ হইতে আগত শীয়া কবি, সাহিত্যিক ও ব্যবসায়ীদের মারফত অনুসৃত হইতে থাকে।

বহুদিন যাবৎ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শীয়া শাসক, দরবেশ, কবি-সাহিত্যিক, বণিক-ব্যবসায়ী প্রভৃতির কর্মতৎপরতা ও প্রভাবের ফলে শীয়া আদর্শ ও সংস্কৃতি জনসমাজে বিস্তৃত হয়। মুঘল আমলে সুবাদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীর রাজকার্য ব্যপদেশে বাংলা

দেশে আগমন ও বসতিস্থাপন এবং ঈরাণ প্রভৃতি রাজ্য হইতে শীয়া দরবেশগণের সমুদ্রপথে সোজা বঙ্গে আগমন ও ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টার ফলে বাংলা দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জনসমাজে শীয়া ভাবধারা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শীয়া ভাবধারার ব্যাপক প্রভাব-বিস্তার এবং সুন্নী মুসলমানের মনে ধর্মবোধ ও অনুভূতি জাগ্রত থাকার কারণে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বহু বাঙালী কবি-সাহিত্যিক মধ্যযুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কারবালায় ইমাম হুসৈনের আত্মত্যাগ সম্পর্কিত কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া বাংলা ভাষায় এক বিরাট 'মর্সীয়া সাহিত্য' সৃষ্টি করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এতদ্দেশীয় সুন্নী মুসলমান নর-নারীর ধর্মীয়-জীবনের সহিত রসূলবংশধর ইমাম হুসৈনের শাহাদৎ-কাহিনী অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত বলিয়া পল্লী-বাংলার অগণিত লোককবি মুসলিম জনসাধারণের সমবেদনা ও ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য এই করুণ কাহিনীকে লোকসঙ্গীতে অর্থাৎ জারীগানে রূপদান করিয়াছেন। গানের মাধ্যমে গীত হয় বলিয়া কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনী অতি সহজে পল্লী-বাংলার জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ। যাহা হউক, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের অন্যতম লোকসঙ্গীতরূপে 'জারীগান' বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। বস্তুতপক্ষে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বাংলা মর্সীয়া সাহিত্যের' স্থান যে বিশিষ্ট, তাহা বলাই বাহুল্য।

★

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

মুহর্রমের অনুষ্ঠান

১। শীয়া : ইমামবাড়া ও অনুষ্ঠানাদি

৬১ হিজরী সনের ১০ই মুহর্রম তারিখে ইমাম হুসৈন কার-বালার রণাঙ্গণে শহীদ হইলে তাঁহার নৃশংস হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে সমগ্র মুসলিম জগৎ শোকে-দুঃখে অভিভূত হয়; এবং সেই সময় হইতে শোকচিহ্ন ধারণ এবং সর্বত্র বিলাপের রীতি প্রচলিত হয়। ইসলাম ধর্মভুক্ত মুসলমানদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শীয়া সম্প্রদায় ইমাম হাসান ও হুসৈনের বিষাদময় স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ প্রতি বৎসর আনুষ্ঠানিকভাবে মুহর্রম উৎসব পালন করে[১]। অন্যান্য দেশের অনুষ্ঠানের তুলনায় পাক-ভারতীয় শীয়াগণের

---

১ মুহর্রমের বিষাদময় ঘটনার প্রচলিত কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া "The Miracle Play of Hasan & Husain. London 1879" লিখিত হইয়াছে। লেখক Colonel Sir Lewis Pelly; তিনি

অনুষ্ঠানের কিছু পার্থক্য আছে। "Dictionary of Islam" গ্রন্থের লেখক পারস্যের শীয়াদের মুহর্‌রম অনুষ্ঠান পালন করিতে দেখিয়া যে-মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা সর্বদেশের শীয়াগণের অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রযোজ্য। তিনি বলেন, ইমাম হুসৈন তাঁহার (লেখকের) চোখে বীরপুরুষ; কিন্তু শীয়াগণের কাছে তিনি 'শহীদ'। হুসৈনের ভাগ্য-বিপর্যয়, কারবালার মরুভূমিতে তাঁহার বিপদ, তাঁহার অসীম সহিষ্ণুতা, অনমনীয় শক্তি ও মনোবল, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আল্লাহ্‌র প্রতি সুগভীর অনুরাগ প্রভৃতির কথা পারস্যবাসী শীয়া-গণ অতি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, ইহা তাহাদের যেরূপ উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়া থাকে, তাহা সময় অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। যাহারা তাঁহাকে (হুসৈনকে) কারবালায় হত্যা করিয়াছিল, এই শোক-উৎসবের মারফত শীয়াগণ তাহাদের কথা ঘৃণাভরে উচ্চারণ করে। কাজেই, হুসৈন-হত্যার জন্য যাহারা মূলতঃ দায়ী তাহাদের কার্য-কলাপের নিন্দাবাদ না করার জন্য শীয়াগণ সমস্ত মুসলিম [সুন্‌নী] সমাজকেই অবজ্ঞা করিয়া থাকে[২]। যাহাহউক, মুহর্‌রমের পর্বানুষ্ঠানের জন্য তাহাদের নির্দিষ্ট গৃহ আছে। এই নির্দিষ্ট গৃহ ইমামবাড়া, তাজীয়াখানা (শোকাগার) অথবা আশুরখানা নামে অভিহিত হয়। গৃহস্থ শীয়াদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা সচ্ছল তাহাদের বাড়িতে একখানি ঘর তাজীয়াখানার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হয়। সমস্ত বৎসর এই ঘরে অন্য কোন কার্য করার রীতি নাই।

গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, **Collected from oral tradition.** গ্রন্থখানি ২ খণ্ডে সমাপ্ত।

২ **T. P. Hughes: Dictionary of Islam. London, 1885 p. 407.**

মজলিশ অনুষ্ঠানে মিম্বরে বসিয়া জাকেরের (বক্তার) বক্তৃতা।

(পরিশিষ্ট—পৃঃ ৶৹)

মুহর্রমের প্রথম চন্দ্রদর্শনের সন্ধ্যাকাল হইতে মুহর্রম-উৎসব আরম্ভ হয়, এবং তৎপরদিনের প্রাতঃকাল হইতে মুহর্রম মাসের প্রথম দিন গণনা করা হয়। সেইদিন হইতে প্রথম "দশদিন" পর্বদিন বলিয়া গণ্য। মুহর্রমের দশম তারিখের দিনটি 'আশুরার' দিন নামে কথিত। এই পর্ব বা অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ অলম্-পাঞ্জা, তাবুত, তাজীয়া, মিম্বর, পানসাল্লা, টাটিয়া প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। মুহর্রমের পাঁচ ছয় দিন পূর্ব হইতে যে-তাজীয়াখানা নির্মিত হয়, তাহাতে মুহর্রমের প্রথম দিন হইতে যথারীতি উৎসব শুরু হয়। তাজীয়াখানায় একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। এই স্থানে মুহর্রমের প্রথম দশ দিন মজলিশ-অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় "সুরা ফাতেহা" পাঠের দ্বারা এই মজলিশ-অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে ইমাম হুসৈনের নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জাকের (বক্তা) যে-বক্তৃতা করেন, তজ্জন্য একটি মিম্বরের প্রয়োজন হয়। মিম্বর একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিতে হয়। মিম্বরের সম্মুখবর্তী বিস্তৃত প্রাঙ্গনে শীয়াগণ সমবেত হয়। "ফাতেহাখানি" পাঠের পর ইমাম হুসৈন ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের জীবন-কাহিনী ও শাহাদৎ সম্পর্কে তিন ব্যক্তি একসঙ্গে অনুচ্চ কণ্ঠে মর্সীয়া ও "সুজখানি" পাঠ করে। মজলিশের মধ্যস্থলে এক হাত বিশিষ্ট কাষ্ঠনির্মিত একটি ছোট চৌকি কাপড়ের গেলাফ (ঢাকনী) দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়। এই চৌকির সম্মুখভাগে বসিয়া ঐ তিন ব্যক্তি পুস্তক হইতে হুসৈনের শাহাদাৎ সম্পর্কে জিক্র (উচ্চারিত কণ্ঠে কায়মনোবাক্যে স্মরণ করা) করেন। অতঃপর, জাকের মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া বা বসিয়া প্রথমে মৃতব্যক্তির প্রশংসাসূচক বক্তৃতা করিতে থাকেন; তৎপর হুসৈন এবং অন্যান্য শহীদদের সম্পর্কে ভূমিকা করেন।

ভূমিকার পর অঙ্গভঙ্গিসহ খেদোক্তিসূচক স্তুতি করিয়া তিনি খুৎবা পাঠ করেন এবং ইসলামের যে-আদর্শের জন্য ইমাম হুসৈন আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে জাকের বক্তৃতা দেন[৩]। ক. জাকেরের বক্তৃতার সময় শ্রোতৃমণ্ডলী হাহাকার করিয়া উঠে; কেহবা বুকে করাঘাত করিতে থাকে। জাকেরের পানি পিপাসা নিবৃত্তির জন্য তাঁহার সম্মুখে গ্লাশপূর্ণ পানি রাখা হয়। "নৌহা" পাঠের সময় শীয়াগণ মিম্বরের সম্মুখভাগ হইতে আসিয়া তাজীয়া ও তাবুতের সন্নিকটবর্তী হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমে সম্মুখবর্তী স্থান হইতে এক ব্যক্তি "নৌহা" পাঠ করে। নৌহা পাঠকালে তাহারা বুকে করাঘাত করিয়া "হুসৈন" "হুসৈন" শব্দে চীৎকার করিতে থাকে। এই ভাবে মাতম অনুষ্ঠান শুরু হয়। কেহ কেহ বিলাপ ও সজোরে ক্রন্দন করিতে থাকে[৪]। মাতম আরম্ভের পূর্বে সরবত প্রভৃতি তবারুক (সিন্নী) হিসাবে সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই মাতম অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে নহবৎ খানা* হইতে কাড়ানাকাড়া

৩ Gibb & Kramers ed : S. E. I. 1953. p. 590.

Compare : (i) T. P. Hughes : Dictionary of Islam. London. 1885. p. 624.

(ii) G. E. Gover : The Indian Antiquary, June 7, 1872. p. 165.

ক. ঐতিহাসিক ব্রাউন ইমাম হুসৈনের শাহাদৎ সম্বন্ধীয় ঘটনা লইয়া লিখিত বিষাদ-করুণ অংশগুলি শীয়াদের দ্বারা মুহর্‌রম মাসে আবৃত্তি করা বা পাঠ করার নাম দিয়াছেন 'রওজা-খানি' (Rawda Khwani)। বিখ্যাত পারস্য-কবি হুসৈন ওয়ায়েজ কাসেফী (মৃ° ১৫০৪-৫) মুহর্‌রম মাসে আবৃত্তির জন্য রচনা করেন 'রওজাতুস্ শুহদা' (Rawdatu'sh-Shuhada)। (A Literary History of Persia, vol IV, 1953, p. 181)

৪ Charles E. Gover : The Indian Antiquary, June 7/1872, p. 167.

* নহবৎখানা : ইমামবাড়ার উত্তরদিকে অবস্থিত বাদ্যধ্বনির জন্য যে-ঘর নির্দিষ্ট থাকে তাহাকে নহবৎখানা বলে।

মজলিশ-অনুষ্ঠানে মিম্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জাকেরের
নৌহাপাঠ। (পৃঃ ।০)

বাজিয়া উঠে। মুহর্‌রম মাসের প্রথম তারিখ হইতে দশই তারিখ পর্যন্ত প্রতি রাত্রিতে মাতম অনুষ্ঠানের সময় এই বাদ্যধ্বনি করা হয়।

নৌহাখানি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শীয়াগণ তালেতালে বুকে করাঘাত করিতে থাকে। সুন্‌নীদের মৌলুদ-অনুষ্ঠানের ন্যায় কখনও কখনও গোলাপপানি ছিটাইয়া এই অনুষ্ঠানকে উপভোগ্য করিয়া তোলা হয়। পয়লা মুহর্‌রম হইতে আটই মুহর্‌রম পর্যন্ত যে-রীতি-পদ্ধতি অনুসারে মজলিশ-অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়, নয়ই তারিখে তাহা অনুসৃত হয় না ; বরং এই দিনে অনুষ্ঠানের পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তিত অনুষ্ঠান 'আল্‌বেদা' (বিদায়) অনুষ্ঠান নামে অভিহিত।

রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় মজলিশ-অনুষ্ঠান আরম্ভের পূর্বে মজলিশগৃহ ঝাড়-বাতি, লাল্‌ প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা রোশনাই (আলো) করা হয়। এতদ্ব্যতীত লাল, নীল, সাদা, হলুদ, সবুজ প্রভৃতি বর্ণের 'হাণ্ডি' (কাঁচের নির্মিত কারুকার্যখচিত গোলাকার পাত্র বিশেষ) অনেকগুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার অভ্যন্তরে বিজলীবাতি বা মোমবাতি জ্বালাইয়া মজলিশ-গৃহ আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। 'লৌকি' নামক কাগজ-নির্মিত এক প্রকার গোলাকার উপকরণ তৈরী করিয়াও তাহার অভ্যন্তরে মোমবাতি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে মজলিশ-গৃহ আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠে। লৌকিগুলি নানা প্রকার রঙীন কাগজ দ্বারা তৈরী। মুহর্‌রমের মজলিশ-অনুষ্ঠান প্রায় দুই ঘন্টার জন্য স্থায়ী হয়। মজলিশের কার্যসূচী দুইভাগে বিভক্ত :

১। নৌহা-ই-খানি

২। মাতম-ই-খানি

মাতম-ই-খানির পর 'জাকের' (বক্তা) জিয়ারতনামায় আরবী

ভাষায় উৎকীর্ণ অংশ পাঠ করেন। ইহাকে 'সালাম পাঠ' বলে। জাকেরের সালাম-পাঠের সময় উপস্থিত শীয়াগণ দুই হাত তুলিয়া খুদার নিকট মুনাযাত করে। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই মজলিশ-অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মিছিল (শোভাযাত্রা) অনুষ্ঠান শীয়াগণের মুহর্রম অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। কাজেই, মুহর্রমের সপ্তম দিবস হইতে নবম দিবস পর্যন্ত অলম্ মিছিল বাহির হয়। মিছিল দুই প্রকারের ঃ—

ক। অলম্ মিছিল এবং

খ। তাবুত মিছিল।

তাবুত মিছিল কেবল ১০ই মুহর্রম প্রাতঃকালে বাহির করা হয়; কারণ, এই দিন ইমাম হুসৈনের শাহাদতের দিন। কাজেই, সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড স্মরণার্থে শীয়া মুসলমানগণ হুসৈনের তাবুত মিছিল বাহির করে। সাতই এবং আটই মুহর্রমের অলম্ মিছিল বাহির হইলে শীয়াগণ মাতম করিতে করিতে এবং মর্সীয়া গাহিতে গাহিতে অপর তাজীয়াখানার উদ্দেশ্যে গমন করে। আটই তারিখের মিছিলের বৈশিষ্ট্য—ইহাতে অংশ গ্রহণকারী কাহারও কাহারও নিকট চর্মনির্মিত মশক দৃষ্ট হয়। কারণ, হযরত আব্বাস ফোরাত নদী হইতে পানি আনয়নের উদ্দেশ্যে মশক সহ যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহার 'অলম্' এবং 'মশকের' প্রতীকরূপে শীয়াগণ এই দিনের মিছিলে 'লস্করী-অলম্' বাহির করে। সপ্তম এবং অষ্টম দিবসে মাতম অনুষ্ঠানে ছুরির ফলাযুক্ত শিকল দিয়া কোন কোন শীয়া পৃষ্ঠদেশে বারবার আঘাত করিয়া মাতম করে; এই প্রকার মাতমের নাম 'জিঞ্জীরি মাতম'। এতদ্ব্যতীত, আর এক প্রকার মাতম অনুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত আছে, ইহার নাম 'মাতমে কামা'। কারণ, মাতমকারীগণ ছোট ছোট তরবারী-

অলম্ মিছিল। (পৃঃ ।৵০)
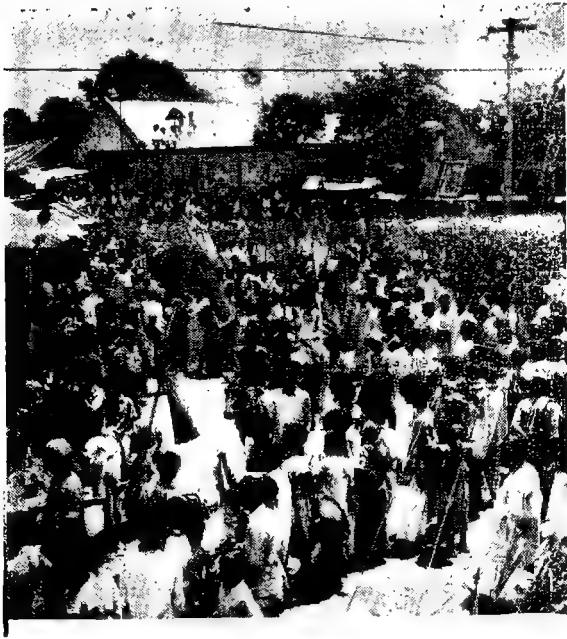
তাবুত মিছিল। (পৃঃ ।৶০)

-জাতীয় ধারালো এক প্রকার অস্ত্রদ্বারা মাথার উপরিভাগে আঘাত করিয়া মাতম করে। আঘাতের ফলে তাহাদের মাথা রক্তে রঞ্জিত হয়। 'কামা-মাতম' প্রধানতঃ ভারতের লক্ষ্ণৌ সহরেই প্রচলিত।

নয়ই মুহর্‌রমের রাত্রি অর্থাৎ দশই মুহর্‌রম তারিখে অলম্‌সহ মিছিল বাহির হয়। এই রাত্রি একটু গভীর হইলে মিছিল বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া এক নির্দিষ্ট ইমামবাড়ায় উপস্থিত হয়। এখানে সারারাত্রি জাগিয়া শীয়াগণ মাতম করে। এইভাবে মাতম করাকে 'শব-বেদারী' বলে। রাত্রিতে মাতম-অনুষ্ঠানের সময় কখনও কখনও আলো নির্বাপিত করা হয়; তখন খুব জোরে মাতম্ এবং ক্রন্দন চলিতে থাকে। মাতম্-অনুষ্ঠানের এই নির্দিষ্ট স্থানকে 'সাফে মাতম' বলে। প্রাতঃকালে প্রত্যেক ইমামবাড়া হইতে মিছিল বাহির হয় এবং শীয়াগণ নগ্নপদে ও নগ্নশিরে মাতম করিতে করিতে নির্দিষ্ট কারবালা * অভিমুখে গমন করে[c]। দশই মুহর্‌রমের মিছিল-অনুষ্ঠান সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, "দশমীর রাত্রিকালে (আলম্-ই-কাশিম ভিন্ন) সমস্ত আলম্ বা পতাকা ও তাবুত বা তাজীয়া লইয়া সকলে 'শবগস্ত' বা 'রাত্রি-পর্যটন' উৎসব সম্পন্ন

* কারবালা: কারবালা একটি নির্দিষ্ট স্থান। ইহা জন কোলাহলপূর্ণ শহর হইতে একটু দূরে অবস্থিত; সেখানে একটি পুকুর এবং প্রকাণ্ড মাঠ আছে। দশই মুহর্‌রম অথবা চেহলমের দিনে তাজীয়া বা তাবুত এই কারবালাতে আনয়ন-পূর্বক গোরের অনুরূপ অংশ দুইটি খুলিয়া রাখিয়া অন্যগুলি পুকুরের পানিতে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করা হয়। কেহ কেহ পানিতে ঠাণ্ডা করিয়া ফিরাইয়া আনে; আবার কেহ কেহ পানিতে ফেলিয়া দেয়; আর যাহারা তাজীয়া ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যায়, তাহারা তিন দিন পর ফাতিহা পড়িয়া ঝালরদার কাগজগুলি খুলিয়া লইয়া পরবর্তী বৎসরের জন্য তুলিয়া রাখে।

c **Compare: Taylor's Topography. pp. 246-247 (Quoted by Dr. A. H. Dani in Dacca, published in 1956, Dacca, p. 62)**

করেন। এই সময় ভারি ধূম হয়; সমস্ত রাস্তায় আলোকমালা জ্বলিতে থাকে। ......তৎপরদিন মুহর্‌রমের ১০ই তারিখ; একাদশী তিথি, শাহাদৎ-কা-রোজ অর্থাৎ জীবনোৎসর্গের দিন বলিয়া গণ্য। এই দিন প্রাতঃকাল হইতে পূর্বরাত্রিমত মহাসমারোহে সকলে তাজীয়া, আলম্ প্রভৃতি লইয়া কারবালা অভিমুখে ধাবিত হয়। এই দিন কারবালায় অতিশয় জনতা হইয়া থাকে। তাজীয়া, আলম্ প্রভৃতি সরোবরের কিনারায় রাখিয়া রুটি, সরবত, বুটী, খিচুড়ী, পোলাও ও মিষ্টান্নাদির উপর হোসেন ও অপরাপর ধর্মবীরের নামে ফাতিহা দিয়া তাহা উপস্থিত সকলকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার কতকাংশ অতি পবিত্র প্রসাদ ভাবিয়া গৃহে আনা হয়।" (বিশ্বকোষ, চতুর্দশ ভাগ, কলিকাতা ১৩০৯ বাং; পৃঃ ৩৩৬ : নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ও প্রকাশিত)।

তাজীয়াখানাতে সাতই হইতে দশই মুহর্‌রম পর্যন্ত লোকের অত্যন্ত ভীড় জমে। মানুষের ভীড়ে তাজীয়াখানা সরগরম হইয়া উঠে। শীয়া-মুসলমানগণের নিকট মুহর্‌রম একটি মহৎ অনুষ্ঠান; কিন্তু এই উৎসব দর্শনের নিমিত্ত গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত ও অজ্ঞ সুন্‌নী মুসলমানদের মধ্যেও অভূতপূর্ব উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। শীয়াগণের ন্যায় সুন্‌নী নর-নারীও কেহ বা নিজ নিজ আকাংক্ষা পূরণ, কেহবা সন্তান কামনা, কেহবা পরমাত্মীয়ের রোগ-আরোগ্য লাভার্থে ইমাম হুসৈনের দোওয়া প্রার্থনা করিয়া তাজীয়ার উপর সিন্‌নী বিতরণ করে। হুসৈনের দোওয়ার মাহাত্ম্যে তাঁহাদের আকাংক্ষা পূর্ণ হইবে এই অভিলাষে শীয়া নর-নারীগণ অসঙ্কোচে তাজীয়া সেজ্‌দা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সুন্‌নী মুসলমানের নিকট তাজীয়া সেজ্‌দা করা মহাপাপ কার্য; কিন্তু শীয়াগণের দেখাদেখি, দূরবর্তী পল্লী-অঞ্চলসমূহের শতশত নর-নারী অসঙ্কোচে তাজীয়া সালাম ও সেজ্‌দা করে। তাজীয়াখানায় শীয়া-সুন্‌নী মুসলমানদের এই ভাবে

তাজীয়া সেজ্দা করিতে দেখিয়া স্বভাবতঃই হিন্দুগণের দুর্গাপূজার কথা মনে হয়। বাহিরের দিক হইতে দুর্গোৎসবের সঙ্গে মুহর্রম উৎসবের যথেষ্ট মিল আছে। দেশের বহু স্থানে নদী বা পুকুরের পানিতে আচার-অনুষ্ঠান পালনের যে-বিধি আছে, তাহা মূলতঃ স্বদেশজাত। ভারতীয় শীয়াগণের মধ্যে ইমাম হুসেনের শবাধার (তাবুত) পানিতে নিক্ষেপ করার প্রথা হিন্দু প্রভাবের ফল বলিয়া মনে হয়। এমন কি, শোকব্রত উপলক্ষে পোশাক-পরিচ্ছদ পরার রীতিও প্রাচীন আদর্শের প্রভাবজাত [৬]।

লাল, নীল ও সবুজ কাগজনির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাজীয়াগুলি তাজীয়াখানায় সিন্নী রূপে প্রদত্ত হয়। ইহার সঙ্গে পাট-কাঠিতে প্রস্তুত 'সেহ্‌রা' লাগানো থাকে। কোন নিকট-আত্মীয় অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হইলে, কিংবা হুসেনের নিকট মানসিক করিয়া তাহা সিদ্ধ হইলে কেহ কেহ ক্ষুদ্র আকৃতি-বিশিষ্ট অলম্-পাঞ্জাও তাজীয়াখানায় অর্পণ করে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, অনেকে মাটির প্রস্তুত দুলদুল ঘোড়া, মোমবাতি ও অন্যান্য নানা প্রকারের উপকরণ সিন্‌নী রূপে হুসেনের উদ্দেশ্যে প্রদান করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, কেহ কেহ লোবান ও ধূপশলাকা তাজীয়াখানায় স্বহস্তে অগ্নি-সংযোগ করে। সুগন্ধি দ্রব্যগুলি অগ্নিতে পুড়িয়া তাজীয়াখানাকে আমোদিত করে।

তাজীয়াখানায় সিন্‌নী দেওয়া, সালাম ও সেজদা করা শীয়া নর-নারীর নিকট অতীব পুণ্যকার্য। পক্ষান্তরে, সুন্‌নীগণ ইহা 'বেদয়াৎ' * বা 'শের্‌ক' (খুদার সহিত তুলনা বা অংশীদার করা) বলিয়া মনে করে। শীয়া স্ত্রীলোকেরাও কৃষ্ণবর্ণের

---

৬ Gibb & Kramers : S. E. I., 1953. p. 591.

* বেদয়াৎ অর্থ— ধর্মেতে নূতন সংযোগ। (New Innovation in religion.)

বোরকা পরিধান করিয়া অনুষ্ঠান-ব্রত সমাধা করিবার নিমিত্ত তাজীয়াখানার পার্শ্বদেশে জমায়েত হয় এবং যথারীতি কার্য সমাপ্ত করিয়া প্রস্থান করে।

মুহর্রমের সর্বশেষ অনুষ্ঠানের নাম 'তাবুত-ই-আসগরিয়া'। কিন্তু ইহা সব স্থানে প্রতিপালিত হয় না। ইহা সাধারণতঃ রবিয়াল আউয়াল মাসের দুই তিন তারিখের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান আল্ হুসৈনের দুগ্ধপোষ্য শিশু আলী আসগরের করুণ-মৃত্যু উপলক্ষে প্রতিপালিত হয়। আশুরার দিনে আলী আসগরের মৃত্যু হয়। কিন্তু উৎসব আশুরার দিনে অনুষ্ঠিত হয় না। তাহা কয়েক দিন পরে অনুষ্ঠিত হয়। 'তাবুত-ই-আসগরিয়ার' মিছিলে অলম্ এবং কাঠের একটা ছোট দোল্না থাকে। কৃষ্ণবর্ণের একটা মশারী এবং ফুল দিয়া ঐ কাঠের দোলনা সজ্জিত করা হয়। ছোট ছোট বালকেরা ভিস্তিদের ন্যায় পোষাক পরিধান করিয়া চামড়ার মশক-পূর্ণ দুগ্ধের সরবত মিছিলের লোকজনকে পরিবেশন করে। তাহারা ঐ সময় নিম্নলিখিত অংশ আবৃত্তি করে ঃ

'ছবিল হ্যায় হযরত আলী আসগর ছির খার্কী
ছবিল হ্যায়, ছিস্‌মা বাচ্চাকী।' ইত্যাদি

ঢাকা শহরে আলী আসগরের নামে একটি আঞ্জুমান (সমিতি) প্রতিষ্ঠিত আছে। এইস্থানে প্রতি বৎসর নয়ই মুহর্রম তারিখে অপরাহ্নে একটি "তাবুত শোভাযাত্রা" বাহির হয়। ইমাম হুসৈনের সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্র কারবালার রণক্ষেত্রে যেভাবে হোরমলা ইবনে কাহেলের বিষাক্ত তীরে মৃত্যু বরণ করেন, তাহা স্মরণ করিয়া শীয়াগণ এই দিন মাতম অনুষ্ঠান পালন করে। অতঃপর, মাতম শেষ করিয়া সকলে কারবালাতে গিয়া ফুল, ঝালর, সেহ্‌রা প্রভৃতি উপকরণ পানিতে ভিজাইয়া ঠাণ্ডা

করে ।

মুহর্রমের প্রথম দশ দিন শীয়া নর-নারীগণ কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া থাকে। তাহারা এই সময়ে মাথার চুলে তেল মাখে না ; মাছ-মাংস খায় না, আমোদ-প্রমোদ করে না, পায়ে জুতা পরে না। ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ তিন দিন (৭ই, ৮ই ও ৯ই) তেল ও ঘি বর্জিত খাদ্যদ্রব্য আহার করে।

এই অনুষ্ঠানের সময় বহু বালক-বালিকা এমন কি প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত দুর্, বাদ্দি, কাফ্নি তাওফ প্রভৃতি অঙ্গে ধারণ করিতে দেখা যায়। শীয়াদের বিশ্বাস, বীবী সখীনার কানে এক প্রকার কানবালা ছিল। আশুরার দিনে ইয়াযীদ-পক্ষীয় সৈন্যগণ লুট-তরাজের সময় তাঁহার কর্ণ-দেশ ছিন্ন করিয়া 'দুর্' (কানবালা) অপহরণ করে। শীয়াগণ এই ঘটনার স্মৃতি উপলক্ষে দুর্ ব্যবহার করে। দুর্ সবুজ পাথরযুক্ত এক প্রকার কানবালা। 'বাদ্দি' অর্থে বুঝায়, লাল-সবুজ-কালো রঙের এক প্রকার মোটা সূতা। ইহা গলায় পরা হয়। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের শীয়া মুসলমানগণের মধ্যে বাদ্দির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ সম্পর্কে বলা হয়, জয়নুল আবেদীন এবং ইমাম হুসেনের পরিবার-পরিজনদের এই প্রকারে বন্ধন করিয়া দামেস্কে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বাদ্দির সঙ্গে এক টুক্রা লাল-সবুজ বর্ণের কাপড় শীয়াগণ গ্রীবাদেশে জড়াইয়া লয়। ইহারই নাম 'কাফ্নী'। 'তাওফ' এক প্রকার হাসুলী বিশেষ। কথিত আছে, শত্রুসৈন্য জয়নুল আবেদীনকে বন্দী করিয়া কুফা হইতে দামেস্কে লইয়া যাইবার সময় তাঁহাকে কষ্ট দিবার জন্য তাঁহার গ্রীবাদেশে লোহার হাসুলী ঝুলাইয়া দিয়াছিল। উহার স্মৃতি রক্ষার্থে শীয়াগণ রৌপ্যনির্মিত একটি 'তাওফ্' বা 'হাসুলী' ব্যবহার করে।

অনুষ্ঠানের সময় এই উপকরণগুলির ব্যবহার তাহাদের নিকট অতি পুণ্যকার্য। অনেক সময় মানসিক থাকিলে তাহারা এগুলি ব্যবহার করিতে প্রস্তুত থাকে এবং তাহাদ্বারা তাহাদের বিপদ দূর হয়। মুহর্রমের প্রথম দশ দিন শীয়াগণ সাধারণতঃ পান খাওয়া বন্ধ করে। সেই জন্য তাহারা ধনিয়া, মৌরী ভাজিয়া লয়। তাছাড়া, সুপারী ও নারিকেলের শাঁস কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ঐ ভাজা ধনিয়া ও মৌরীর সহিত মিশ্রিত করে। এগুলির সঙ্গে অন্যান্য মশলা দিয়াও তাহারা পানের পরিবর্তে খায়। এই দ্রব্যের নাম বুন্ধুনিয়া। বুন্ধুনিয়া রাখার জন্য কাপড়ের এক প্রকার থলিয়া তৈয়ার করা হয়। এই থলিয়াকে বলে 'বাটুয়া'। ভারতের পশ্চিম-অঞ্চলেও এই বাটুয়ায় করিয়া পান ও মশলা রাখার রীতি আছে।

ইমাম হুসৈনের শাহাদতের তিন দিন পর অর্থাৎ মুহর্রমের ত্রয়োদশ দিনে 'সিইউম' অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে হুসৈনের নামে সরবত, শর্করা, ও সিন্নী বিতরণের ব্যবস্থা আছে। 'দশওয়া' (শাহাদতের পর দশম দিবসে) দিবসেও সিইউমের ন্যায় অনুরূপ অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। এইভাবে বিশওয়া, তিশওয়া এবং চেহ্‌লুম[৭] অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়। চেহ্‌লম দিনের পূর্বরাত্রিতে (১৯শে সফর) প্রত্যেক ইমামবাড়াতে মাতম মজলিশ অনুষ্ঠিত হয়; এবং পরদিন সকাল বেলা তাজীয়াখানা হইতে অলম্, তাবুত, ফুল প্রভৃতি সহযোগে শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় তাজীয়াখানায় প্রত্যাবর্তন করে। এইদিন

৭ চেহলমের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য—নব্য ভারত, ঊনবিংশ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩০৮ সাল বাং, শ্রী ধর্মানন্দ মহাভারতী; পৃঃ—২৫৬—২৬৪;

অলম্। (পৃঃ ৮০)
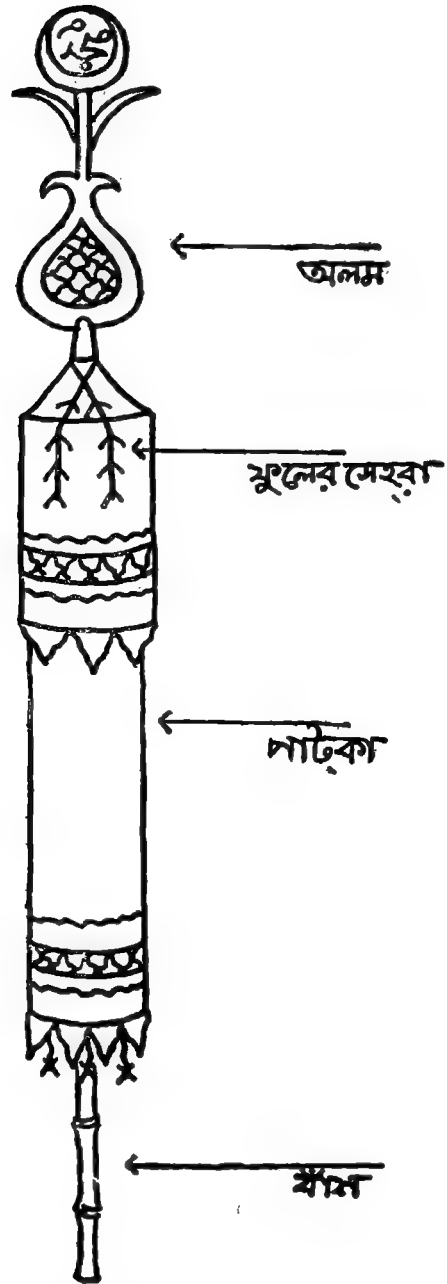
দুলদুল ও বাহির করা হয়। অতঃপর, চেহলমের দিনে অনেকেই কারবালায় ফাতেহা পাঠ করে। সর্বশেষে জিয়ারতে আরবাইন পড়া হয়। চেহলমের এই অনুষ্ঠান "তাবুত-ই-আল্ হুসৈন" নামে অভিহিত। ইহা অবিকল দশই মুহর্রমের অনুষ্ঠানের ন্যায়।

ইমামবাড়া বা আশুরখানার দ্বার বার মাসই অর্গলমুক্ত থাকে। লোকে প্রায় সব সময় জিয়ারত প্রভৃতি কার্যোপলক্ষে আগমন করে। এতৎভিন্ন, সমস্ত বছরে প্রতি মাসের বৃহস্পতি-বারে এই ইমামবাড়াতে মজলিশ-অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। প্রতি মাসের এই মজলিশ-অনুষ্ঠান 'নও চাঁন্দের মজলিশ' নামে কথিত।

মুহর্রম অনুষ্ঠানের উপাদান ঃ

ক। অলম্ ঃ

'অলম্' অর্থ ঝাণ্ডা বা পতাকা। হুসৈনের পতাকা স্বরূপই সর্বত্র অলমের ব্যবহার প্রচলিত। মুহর্রম অনুষ্ঠানে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসৈনের বিষাদময় স্মৃতি উপলক্ষে শোভাযাত্রা বাহির হইলে তাহাতে বহু প্রকারের পতাকা বা নিশান বহন করা হয়[৮]। ইহা জাতীয় বিজয়-চিহ্ন। 'সাধারণতঃ দুই প্রকারের অলম্ দেখা যায়।

৮ T. P. Hughes : Dictionary of Islam. London. 1885. p. 624.

মহী ও মুরাতিব। মহী মৎস্য চিহ্ন-যুক্ত আর মুরাতিবগুলি জরি, লাল বা সাদা কাপড় দিয়া সাজান হয়[৯]। আর এক প্রকারের অলম্ আছে। ইহা পারস্য-দেশী; "সারতাওক অলম্"। অলম্-গুলি সচরাচর তামা, পিতল বা লোহা দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে; স্থান বিশেষে স্বর্ণরৌপ্য অথবা মনি-মাণিক্যজড়িত অলম্ তৈরী হয়। স্বর্ণকারের গৃহে অলম্ নির্মিত হইলে মহাসমারোহে বাদ্যসহ দণ্ডের উপর আঁটিয়া দেওয়া হয়। অলম্ স্থাপন কালে ধূপধূনা জ্বালান হয়; এবং হাসান-হুসৈনের নামে সরবতের উপর 'ফাতেহা' পড়া হয়। তাজীয়ার সহিত অলম্ লাগান হয়। অলমের সঙ্গে কাপড়ের তৈয়ারী একটি সবুজ এবং একটি লাল পট্কা থাকে। পট্কা বিভিন্ন কারুকার্যখচিত। এই পট্কা মখমল ও জড়ির কাজ করা, আবার কখনও ইহা সিল্কের কাপড়ের উপর কারুকার্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে। একটি বাঁশের বা কাঠের দণ্ডের উপর-দিকে অলম্ সংযুক্ত থাকে; এই সংযোগস্থলে পাট্টা (বস্ত্রখণ্ড) বন্ধন করা হয়। সাদা বা যে-কোন রঙের ফুলের সেহ্রা (দুইটি বা চারিটি ফুলের ছড়যুক্ত) মুহর্রমের প্রথম দশ দিন প্রত্যহ বাঁধা হয়। আবার কোথাও কোথাও চল্লিশদিন পর্যন্ত মুহর্রম-অনুষ্ঠান পালনের সময় সেহ্রা লাগানো হয়। পরে শুক্না ফুলগুলি আশুরা বা চেহ্লমের দিনে কারবালায় লইয়া ঠাণ্ডা করা হয়।

মুহর্রমের সপ্তম দিনে তাজীয়াখানা হইতে বিভিন্ন প্রকারের অলম্ বাহির করা হয়। এক অলম্ লইয়া চলিবার সময় পথে যদি অপর কোন অলমের দেখা পাওয়া যায়, তবে দুইটি অলম্‌কে এক সঙ্গে স্পর্শ করানোর রীতি আছে। অলম্ তাজীয়াখানা

---

৯ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত: বিশ্বকোষ। চতুর্দশভাগ, কলিকাতা ১৩০৯, পৃঃ ৩৩৫।

পাঞ্জা। (পৃঃ ৮৶০)

হইতে বাহির করিবার সময় শীয়াগণ মর্সীয়া গাহিতে থাকে এবং সেই সময় ধূপধূনা জ্বালান হয়। মুহর্রমের সময় সব ইমামবাড়াতেই বিভিন্ন কারুকার্যখচিত পট্টিকাযুক্ত অলম্ সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে, ইহাকে 'অলম্ ইস্তাদা' বলে। 'ইস্তাদা' অর্থ লাগানো।

পূর্বেই বলিয়াছি, হুসৈনের পতাকা-স্বরূপ সর্বত্র অলমের ব্যবহার প্রচলিত। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন: 'ভারতবর্ষের বিভিন্ন পীর, সাধু, ধর্মের জন্য প্রাণত্যাগকারীর নামেও অল্ম প্রচলিত হইতে দেখা যায়। যেমন: পাঞ্জা-ই-হায়দর, পাঞ্জা-ই-মর্তুজা-আলী, পাঞ্জা-মুশকিল-কুশা, আলম-ই-আব্বাস, আলম-ই-কাসিম, আলম-ই-আলী আকবর ইত্যাদি' [১০]।

খ। পাঞ্জা:

ইহাও অলম্ জাতীয় জিনিস। পাঞ্জা কতকটা উপরোক্ত অলম-এর ন্যায়। প্রতি ইমামবাড়া ও মিছিলে 'অলম-পাঞ্জা' ব্যবহৃত হয়। পাঞ্জা অনেক সময় কারুকার্যবর্জিত হয়। ইহার মধ্যভাগে আল্লাহ্‌র নাম ও পাঁচ পাঁচ আঙ্গুলে পাঞ্জাতনের নাম উৎকীর্ণ থাকে। কুর'আনের 'আয়েত' (শ্লোক) ও 'কালাম' পাঞ্জার গাত্রদেশে খোদাই করা হয়। কোন কোন অলম-পাঞ্জায় রকমারী শিল্পকার্যের নিদর্শন বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে, ইহার গঠন অদ্ভুত ধরণের; ইহা দেখিতে অনেকটা মানুষের হৃৎপিণ্ডের ঠিক উল্টানো পৃষ্ঠের ন্যায়; পাঞ্জা পিতল বা তামার তৈয়ারী; ইহার উপরি ভাগে পাঁচ পাঁচটি বর্শাফলক-আকৃতি আঙ্গুল থাকায় এই পতাকার নামকরণ হইয়াছে 'পাঞ্জা'। পাঞ্জার কেন্দ্রস্থলে কুর'আনের একটি শ্লোক উৎকীর্ণ করা হয়। নিম্নভাগ একখণ্ড কৃষ্ণবস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকে।[১১]

---

১০ পূর্বোক্ত, পৃঃ—৩৩৫।

১১ "It is a peculiar form, having an immense brass head

গ। ছড়্ বা লস্করী অলম্ঃ

ইহা এক বিশেষ ধরণের অলম্। কারবালা যুদ্ধক্ষেত্রে অলমদার (পতাকাবাহী) হযরত আব্বাস এই লস্করী অলম্ সঙ্গে লইয়া ফোরাত নদী হইতে পানি আনয়ন-উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন। ইহা আটই মুহর্রমের অনুষ্ঠান; কারণ এই তারিখটি হযরত আব্বাসের মৃত্যুবার্ষিকী বলিয়া গণ্য।

এই প্রকার অলমের জন্য সাধারণতঃ বিশ ত্রিশ হাত দীর্ঘ একটী বাঁশের দণ্ডের প্রয়োজন। বাঁশের দণ্ডের উপরিভাগে অলম্ লাগানো থাকে। বাঁশ এবং অলমের সম্মিলিত স্থলে পট্কা এবং সেহ্রা বন্ধন করা হয়। কালো কাপড় দিয়া তৈয়ারী ছোট একটী মশক (চামড়ার প্রস্তুত পাত্র বিশেষ) দুই একটী তীর দ্বারা বিদ্ধ থাকে। ইহা অলমের সঙ্গে অথবা অলম্ ও বাঁশের সংযোগস্থলে বন্ধন করা হয়। বাঁশের দণ্ডের সঙ্গে একটি লম্বা সাদা কাপড়ের পতাকা থাকে। এই পতাকা বহন করিবার অসুবিধা হেতু কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে বাঁশের দণ্ডের সঙ্গে জড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল বলিয়া শীয়াগণের বিশ্বাস। সেইজন্য, ইহা সাধারণতঃ বাঁশের দণ্ডের সঙ্গে জড়ানো অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। পতাকার কাপড় জড়ানোর পর অবশিষ্ট কাপড় এক জায়গায় জমা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহা বহনের সুবিধার জন্য ছোট বাল্তির আকৃতি বিশিষ্ট চামড়ার তৈয়ারী একটী ডোল্চি বাঁশের নিচে লাগানো হয়। এই ডোল্চির

---

in the shape of a heart upsidedown, and from the apex project the five spear-heads which give the standard its name. In the centre of the brass-heart is written a sentence from the Koran. The lower part of the Panja is also hidden in black cloth." ('The Muharram' by Charles E. Gover in 'The Indian Antiquary,' June 7/1872. p. 165.)

লস্করী অলম্। (পৃঃ ১২)
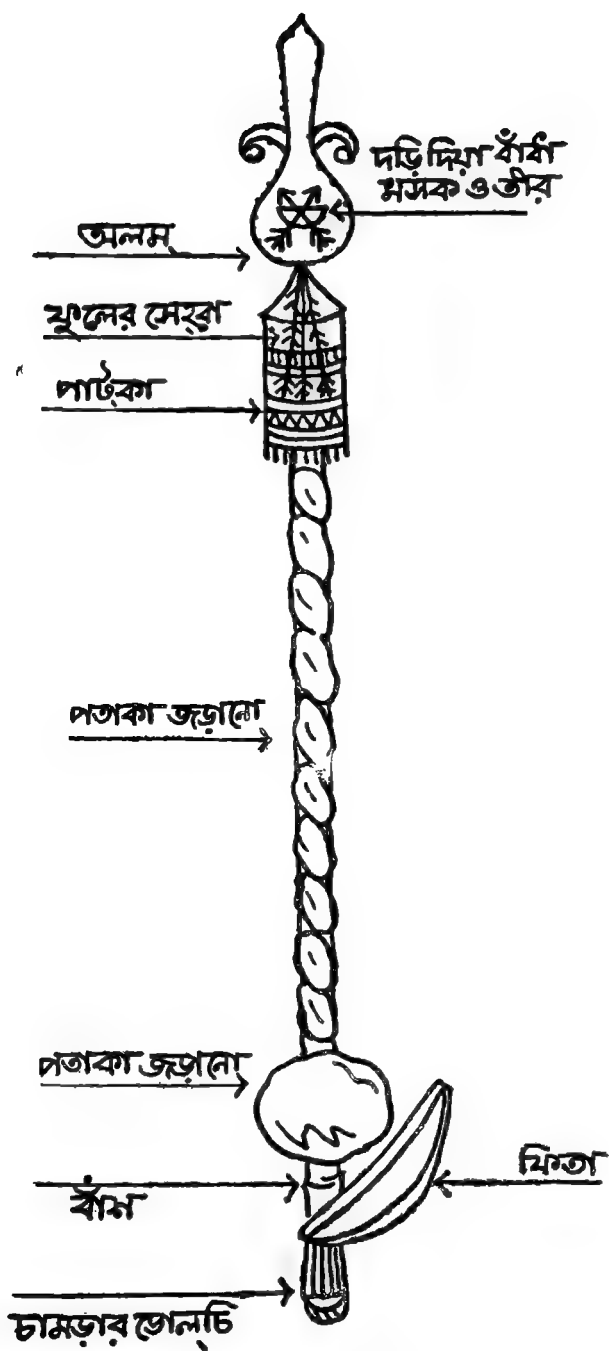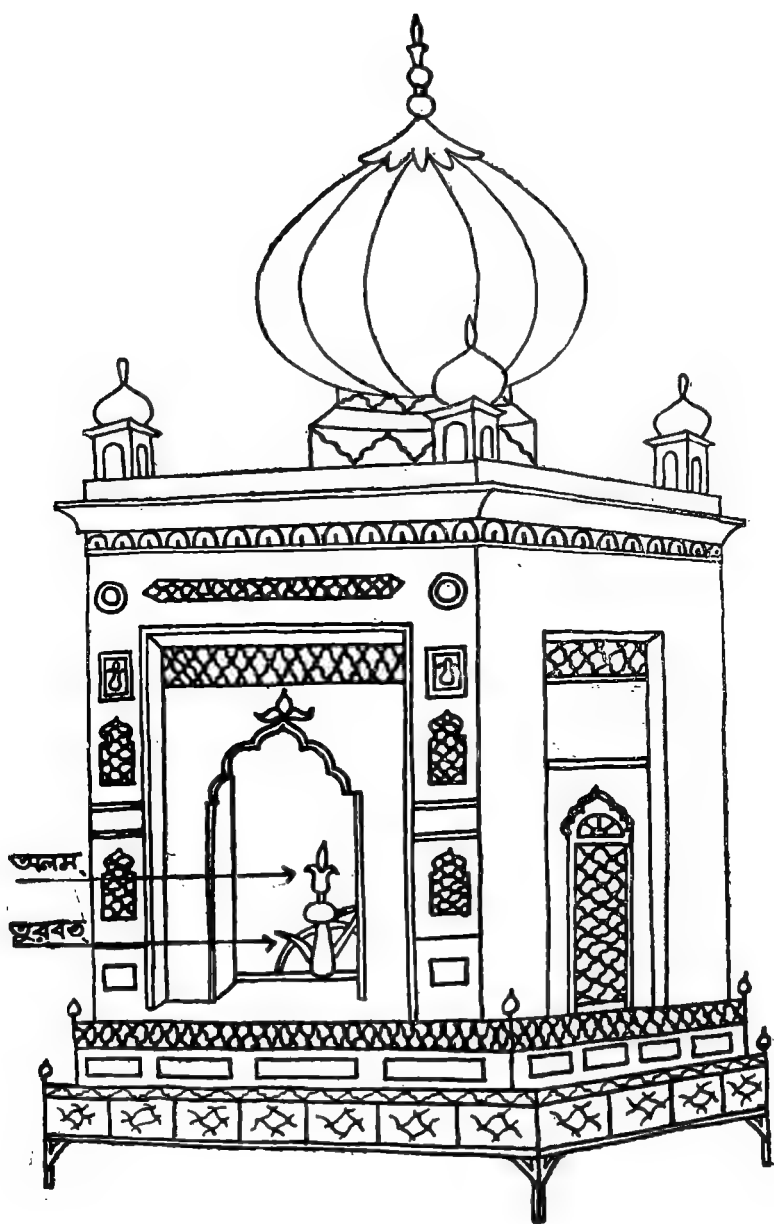
তাজীয়া। (পৃঃ ১/০)
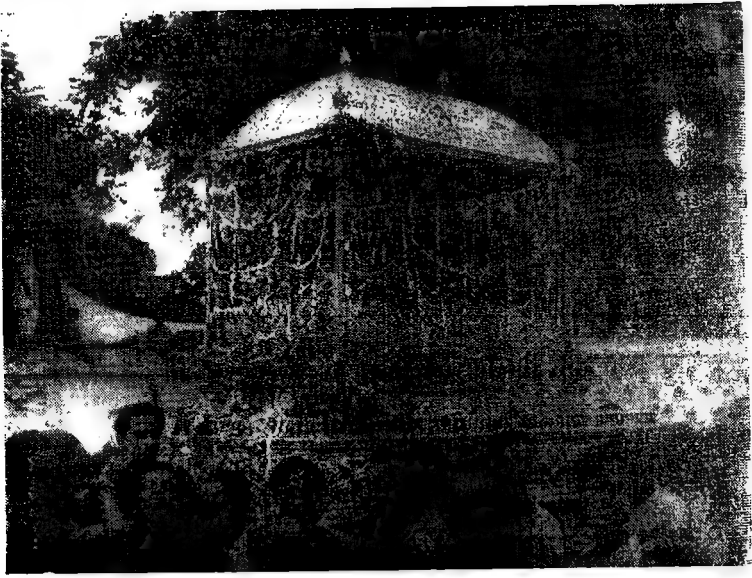
জারিহ্। (পৃঃ ১৴০ তারকা-চিহ্নিত পাদটীকা)

সঙ্গে চামড়া বা শক্ত কাপড়ের ফিতা থাকে। ইহা আটই মুহর্‌রম তারিখে সাজানো হয়। অতঃপর, দশই তারিখে আশুরার মিছিলে বাহির করা হয় এবং পরে নির্দিষ্ট কারবালাতে লইয়া গিয়া ঠাণ্ডা করার রীতি প্রচলিত।

ঘ। তাজীয়া ঃ

তাজীয়া* (ত'জীয়হ্) সাধারণতঃ ইমাম হাসান ও হুসৈনের মাযারের (কোন কবরের উপরিভাগে নির্মিত গম্বুজবিশিষ্ট ঘর মাযার নামে কথিত হয়) অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট। অন্যকথায় বলা যায় ঃ হাসান-হুসৈনের সমাধির যে-প্রতিমূর্তি তৈরী করিয়া শীয়াগণ মুহর্‌রম-অনুষ্ঠানে তাজীয়াখানায় স্থাপন করে অথবা শোভাযাত্রায় বাহির করে, তাহাই 'তাজীয়া' নামে কথিত। ইহা সাধারণতঃ বাঁশের বাতা দিয়া ফ্রেম করিয়া বা সরু কাঠের ফ্রেম বসাইয়া তাহার উপর কারুকার্যখচিত কাগজ, নানা মূল্যবান ধাতব পদার্থের ঝালর লাগাইয়া দেওয়া হয়। কখনও কখনও তুলা বা কাপড় দিয়াও তাজীয়া নির্মিত হয়। তারপর নানাবিধ উপকরণ জ্বালাইয়া আলোকসজ্জা করা হয়। শীয়াগণের সাধ্যশক্তি অনুসারে কখনও কখনও ইহার আকার বড় করা হয়। ইহার নির্মাণ-কার্য বেশ শ্রমসাধ্য[১২]। 'বিশ্বকোষের' সঙ্কলক নগেন্দ্র নাথ বসু বলেন ঃ "মহরম কালে মুসলমানগণ সামান্য উপকরণে হুসেন ও

---

* 'তাজিয়া' প্রকৃতপক্ষে ইমাম হাসান-হুসৈনের রওজার বহির্দৃশ্যের অনুরূপ প্রতিকৃতি। পক্ষান্তরে, 'জারিহ্' অর্থে কবরের ভিতরকার দৃশ্যকে বুঝায়।

১২ "A representation or model of the tomb of Hasan and Husain at Karbala, carried in procession at the Muharram by the Shiahs. It is usually made of a light

হাসনের কবরের যে-প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিয়া বহিয়া বেড়ায়, ভারত বর্ষে তাহাকেই 'তাজিয়া' কহে" (বিশ্বকোষ ঃ সপ্তমভাগ, কলিকাতা। ১৩০৩, পৃঃ ৬০৫)। 'Shorter Encyclopaedia of Islam'-এর সম্পাদকদ্বয়ও নগেন্দ্র বাবুর উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন[১৩]।

যাহা হউক, তাজীয়ার উপরিভাগে একটি বড় গম্বুজ ও তাহার চতুষ্কোণে চারিটি ছোট গম্বুজ থাকে। ইহার অভ্যন্তরে পাশাপাশি দুইটি মাযারের অনুকৃতি—একটি লালবর্ণের ও অপরটি সবুজবর্ণের কাগজ দ্বারা সযত্নে মোড়ানো হয়। এই দুইটির নাম 'তুরবৎ-ই-হাসান' (সবুজটি) এবং 'তুরবৎ-ই-হুসৈন' (লাল রঙেরটি)। 'তুরবৎ' ফারসী শব্দ, ইহার অর্থ কবর। কোন কোন তাজীয়া আবার কাগজের উপর রূপার নক্সাকরা পাট মুড়াইয়া নির্মাণ করা হয়। দশই মুহর্রমের অনুষ্ঠানের পর রূপার তৈরী এই পাটগুলি খুলিয়া লওয়া হয়। তাজীয়ার উপরে একটি এবং চারিপাশে চারিটি অল্‌ম লাগানো থাকে। রৌপ্যনির্মিত দুই দুইটি জুলফিক্‌কার** আড়াআড়িভাবে লাগানো থাকে। তাজীয়ার সম্মুখবর্তী স্থানে চারিটি জুল্‌ফিক্‌কার দুই দিকে দুইটি করিয়া রাখা হয়। ইহার দুইটি পিতল ও দুইটি রূপার তৈরী। অলম্‌ এবং

---

frame of wood-work, covered with paper, painted and ornamented and illuminated within and without. It is sometimes of considerable size and of elaborate execution according to the wealth of the owner." (T. P. Hughes : Dictionary of Islam. London 1885, p. 631)

১৩ Gibb & Kramers : S. E. I. 1953. p 590.

** জুলফিক্কার ঃ ইহা দুধারী তলোয়ার। হযরত আলী ইহা সর্বপ্রথম যুদ্ধে ব্যবহার করেন বলিয়া কথিত।

জুল্‌ফিক্‌কার লাগানোর ক্ষেত্রে সর্বত্র এই রীতি অনুসৃত হয় না। চারিটি জুল্‌ফিক্‌কারের মধ্যে আবার দুইটিতে পাঞ্জা লাগানো থাকে। রৌপ্যনির্মিত জুলফিক্‌কার দুইটি মুহর্রমের সময় ঘর হইতে বাহির করিয়া তাজীয়ার সহিত লাগানো হয়। কিন্তু পিতলের দুইটি বারমাস ইমামবাড়ায় তাজীয়ার সহিত সংলগ্ন থাকে। আটই, নয়ই এবং দশই মুহর্রম তারিখে ইমামবাড়া হইতে তাজীয়ার মিছিল বাহির হইলে এই চারিটি জুলফিক্‌কার মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাওয়া হয়। এগুলি প্রায় ১৪ ফুট লম্বা।

তাজীয়া সর্বপ্রথম মুহর্রম মাসের প্রথম তারিখে প্রত্যেক ইমামবাড়াতে সজ্জিত করিয়া অলম্‌, পাঞ্জা, লস্করী অলম্‌ প্রভৃতি রাখা হয়। মুহর্রমের প্রথম দশ দিন এই তাজীয়ার চতুর্দিকে প্রত্যহ ফুলের সেহ্‌রা বাঁধা হয়। আশুরা অর্থাৎ দশই মুহর্রমের দিন এই তাজীয়া মিছিলের সহিত নির্দিষ্ট কারবালায় লইয়া গিয়া খাল খনন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে রাখা হয় এবং পানি ঢালিয়া ঠাণ্ডা করা হয়। কোন কোন স্থানে মাটি খনন করিয়া তাজীয়া দাফন করার রীতি প্রচলিত। তাজীয়াতে ব্যবহৃত পিতল, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুনির্মিত অলম্‌, পাঞ্জা খুলিয়া লওয়া হয়। তাহা বারমাস ইমামবাড়াতে সংরক্ষিত হয়। কিন্তু বাঁশ, কাপড়, কাগজ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত অংশগুলি শুধু যে ঠাণ্ডা করা হয় তাহা নহে, দাফন করার রীতিও প্রচলিত। কোথাও কোথাও নিকটবর্তী নদীতে বাঁশ, কাপড় ও কাগজনির্মিত অংশগুলি ভারী কোন পদার্থ বাঁধিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হয়। আবার যেখানে চল্লিশ দিন ব্যাপী মুহর্রম অনুষ্ঠান প্রতি-পালিত হয়, সেখানে চেহলমের দিনে তাজীয়া বাহির করিয়া কারবালায় ঠাণ্ডা করাই বিধি।

তাজীয়ার সম্মুখবর্তী স্থানে বার তেরফুট লম্বা ও চার ফুট চওড়া একটি কাষ্ঠনির্মিত চকি থাকে। এই চকির উপর নেওয়াজ অর্থাৎ সিন্নি, আগরবাতি, সেহ্‌রা, মোমবাতি প্রভৃতি রাখা হয়।

তাজীয়ার উপরে জরির কারুকার্যখচিত মখমলের দুইখানি সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। দশই তারিখে এই সামিয়ানা মিছিলে লওয়া হয় না। তাজীয়ার সম্মুখবর্তী স্থানে কাঁচের দুইটি ঝাড় থাকে, আবার ইহার সঙ্গে ছয়টি করিয়া লালা (বাতি দিবার উপকরণ) সংযুক্ত করা হয়; ইহাকে রোশনাই করিবার জন্য মোমবাতি অথবা বিজলীবাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। রাত্রিতে ইমামবাড়া রোশনাই করিবার জন্য চতুর্দিকে কয়েকটি মেরডিং (মৃদঙ্গ অর্থাৎ খোলের আকৃতিবিশিষ্ট লম্বা কাঁচের পাত্র বিশেষ) স্থাপন করা হয়। ইহার ভিতর কুপি বা মোমবাতি জ্বলিতে থাকে।

'তাজীয়া' কথাটি দুনিয়ার বহুস্থানে প্রচলিত। পারস্যদেশে মুহর্‌রমের সময় অলৌকিক বর্ণনাযুক্ত যে-নাটকাদি রচিত ও অভিনীত হয় সেগুলি তথায় 'তাজীয়া' নামে পরিচিত। ইরাকে তাজীয়ার নাম সাধারণতঃ 'সাবীহ্‌'। কারণ, মুহর্‌রমের সময় অভিনেতাগণ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় নিজেদের সাজ-সজ্জা দ্বারা প্রস্তুত করে। অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সর্বসাধারণের জন্য নির্ধারিত গৃহ, পান্থনিবাস, এমনকি মস্‌জিদেও মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত, ইমামবাড়াতে বিশেষভাবে মঞ্চ নির্মিত হয়। মঞ্চের অভিনেতাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড তাবুত, আলো জ্বালাইবার একটি পাত্র, হুসৈনের তীর, বল্লম, বর্শা ও প্রতীকযুক্ত পতাকা রাখা হয়[১৪]।

---

১৪ In Irak it is usually called shabih,. because actors make themselves 'like' the dramatis personæ. The Stage is

তাবুত। (পৃঃ ১।৴০)
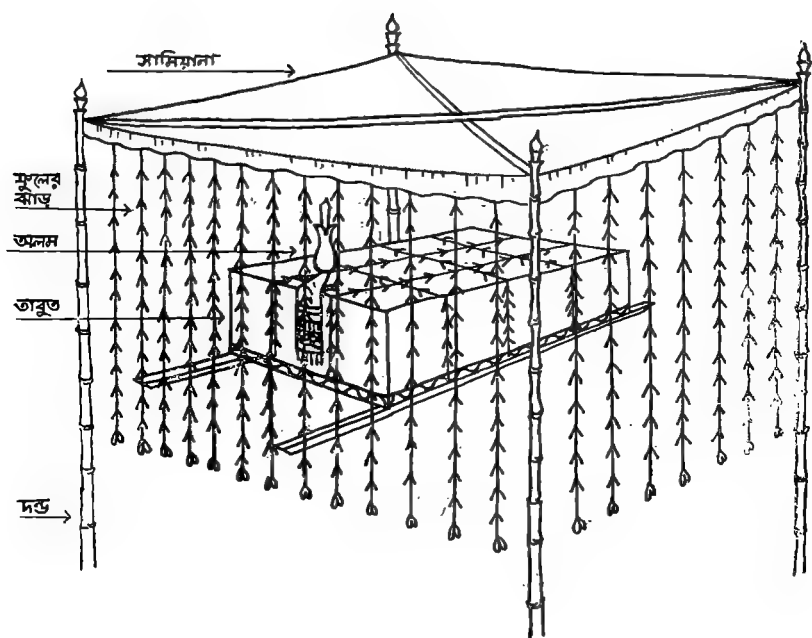
আমেরিকা মহাদেশেও 'তাজীয়া' শব্দের প্রচলন আছে। এদেশ হইতে যে-সমস্ত কুলি উক্ত মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছে, তাহারা আমেরিকায় 'তাজীয়া' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকে। মুহর্‌রম এই কুলিদিগের প্রধান পর্ব; হিন্দু কুলিগণও মুহর্‌রমকে প্রধান পর্ব বলিয়া গণ্য করে। মুহর্‌রম মাসে শীয়াগণই যে শুধু তাজীয়া নির্মাণ করে তাহা নহে, অনেক ফকির এবং অন্যান্য লোকজনও বিবিধ পরিচ্ছদ ও বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তাজীয়ার পশ্চাৎবর্তী হয়। আবার অনেক অব্রাহ্মণ মারাঠী সরদারকেও তাজীয়া প্রস্তুত করিতে দেখা যায়[১৫]।

শীয়াগণ যে-স্থানে তাজীয়া নির্মাণ করিয়া ইমাম হুসৈন এবং অন্যান্য শহীদানের শোক-উৎসব প্রতিপালন করে, তাহা 'তাজীয়াখানা' বা 'শোকাগার' নামে কথিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, লক্ষ্ণৌ, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদের তাজীয়াখানার প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত।

ঙ। তাবুত ঃ

'Dictionary of Islam' গ্রন্থের লেখক 'তাবুত' শব্দের দুইটি অর্থ নিরূপণ করেন। তিনি বলেন, তাবুত অর্থে বুঝায় প্রথমতঃ, মৃতদেহ সমাধিস্থ করার শবাধার বা শব বাহনের খাটিয়া

---

created in public places, in caravanserais, even in mosque and in imambaras especially erected for the festival. The chief properties required for the stage are a large tabut with receptacles for holding lights, also Husain's bow, lance, spear and banner. (Gibb & Kramers : Shorter Encyclopaedia of Islam. 1953. p 590)

১৫ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ঃ বিশ্বকোষ। ৭ম ভাগ, ১৩০৩, পৃঃ ৬০৫।

এবং দ্বিতীয়তঃ, ইমাম হুসৈনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অবিকল অবস্থা[১৬]। প্রকৃতপক্ষে, ইহা একটি বাক্সের আকৃতিবিশিষ্ট ; সাধারণতঃ ইহা বাঁশ বা কাঠের ফ্রেম দ্বারা তৈরী করা হয়। বহনের সুবিধার্থে ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া কাঠের বা বাঁশের দণ্ড লাগানো হয়। সাধারণতঃ ইহা চারিজন লোক বহন করে। সুতরাং 'তাবুত' লাশ বহন করিবার খাটিয়া*। ইহা কৃষ্ণবর্ণ বা শ্বেতবর্ণের কাপড়ের খোল দিয়া আবৃত থাকে। এই খোলকে 'গেলাব' বা 'পোরসেস্' (আবরণ) বলে। তাহার উপর অলম্ এবং পট্‌কা লাগানো হয়। অলমের সঙ্গে ফুলের সেহ্‌রা বন্ধন করা হয়, এবং তাবুতের উপরে ফুলের চাদর (সাদা ফুলের ঝাড় বা ছড় দিয়া চাদরের মত তৈরী) ব্যবহৃত হয়।

'তাবুত' আশুরা ও চেহ্‌লমের রাত্রিতে সজ্জিত করা হয়। অতঃপর, পরের দিন ইহা মিছিলে বাহির করা হয়। মিছিলে বাহির করিবার সময় চারিদিকের চারিটি দণ্ডের সঙ্গে কাপড়ের একটা সামিয়ানা (ছায়া দিবার জন্য) ব্যবহার করিবার রেওয়াজ আছে। সামিয়ানার দণ্ড চারিটি সাধারণতঃ কাঠের তৈরী ; ইহাকে আবার রূপার পাত দ্বারা মুড়াইয়া দেওয়া হয়। লোকের অবস্থা সচ্ছল না হইলে বংশদণ্ড ব্যবহার করা হয়, এবং তাহা কাগজ বা কালো রঙের কাপড় দ্বারা কারুকার্যখচিত করা হয়[১৭]। সামিয়ানার

---

১৬ T. P. Hughes : op. cit., p. 624.

* তাবুতের সূক্ষ্ম অর্থঃ মৃতদেহ দাফন করিবার পূর্বে খাটিয়ায় করিয়া লইবার অবস্থা। পক্ষান্তরে 'তুরবৎ' অর্থে কবরের প্রতিচ্ছবি বুঝায়। তাবুতের অপর নাম 'জারীহ্‌'।

১৭ 'In the houses of the wealthier Shiahs, these 'tabuts' are fixtures, and are beautifully fashioned of silver and gold,
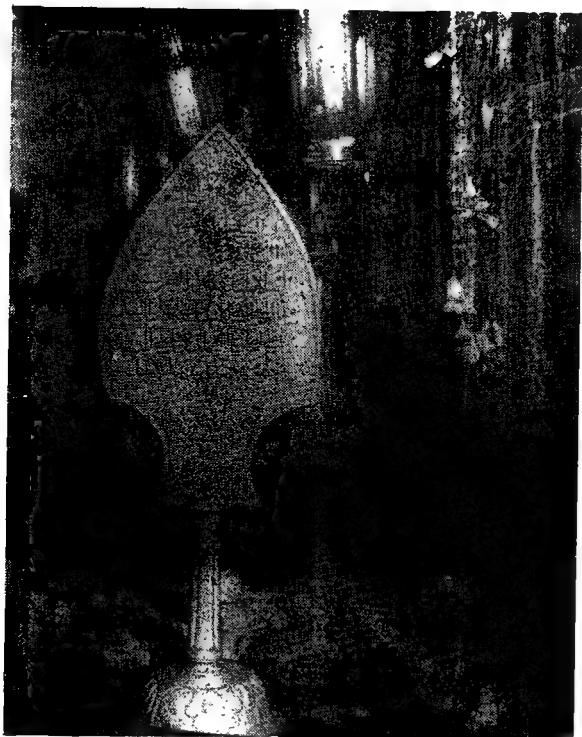
জিয়ারত নামা। (পৃঃ ১৴০)

চতুর্দিকে ফুলের ঝালর জড়ানো হয়। এই সানিয়ানা চারিজন লোক বহন করিয়া লইয়া যায়। ইহাকে আশুরা ও চেহ্‌লমের দিনে নির্দিষ্ট কারবালাতে লইয়া ঠাণ্ডা করা হয়।

চ। জিয়ারতনামা ঃ

'জিয়ারতনামা'-র সমস্তটাই রূপার তৈরী। পিতল দ্বারা নির্মিত একটি লম্বা রডের উপর এই আকৃতিবিশিষ্ট একটি কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো সালামের অংশগুলি আরবীভাষায় লিখিত। ইহার বিপরীত পার্শ্বেও দোওয়া লিখিত এবং তাহাও কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো। জিয়ারতনামায় লিখিত কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো সালাম মজলিশ-অনুষ্ঠানের শেষে পাঠ করা হয়। মজলিশ-অনুষ্ঠানে 'মাতম-ই-খানি' সমাপ্ত হইলে জনৈক ব্যক্তি 'জিয়ারতনামা'য় লিখিত অংশটি পড়িয়া যান এবং অন্যান্য সকলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে উহা আবৃত্তি করিয়া যায়। 'জিয়ারতনামায়' লিখিত অংশটি নিম্নলিখিত প্রকার ঃ

(١) السلام عليك يا ابا عبد الله

(٢) السلام عليك ابن رسول الله

---

or of ivory and ebony, embellished all over with in laid work. The poor shiahs provide themselves with a tabut made for the occasion of lath and plaster, tricked out in mica and tinsel. A week before the new moon of the Muharram they enclose a space, called a tabut khana, in which the tabut is prepared.' (Hughes : Dictionary of Islam. London, 1885. p. 410

(৩) السلام عليك امير المؤمنين

(৪) السلام عليك ابن فاطمة الطهراء سيدة النساء العلمين

(৫) السلام عليك سيد المرسلين

(৬) السلام عليك و رحمة الله و بركاته

বাংলা তরজমা ঃ

১। হে আবদুল্লাহ্‌র পিতা, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

২। হে আল্লাহ্‌র রসূলের পুত্র, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

৩। হে ধর্মবিশ্বাসীদের নেতা, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

৪। হে বিশ্বজগতের নারীকুলের সরদার ফাতিমা জোহ্‌রার পুত্র, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

৫। হে প্রেরিত পুরুষগণের সরদার, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

৬। আপনার উপর আল্লাহ্‌র রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক।

ছ। মিম্বর ঃ

ইহা তিন বা ততোধিক ধাপ-বিশিষ্ট কাঠের তৈরী একটি বসিবার উপকরণ। মজলিশ অনুষ্ঠানের সময় ইহার উপর সাধারণতঃ কালো রঙের কাপড়ের গেলাব দেওয়া থাকে। মিম্বরের সর্বোপরি ধাপে দুইটি অলম্ ও পাঞ্জা সংলগ্ন করা হয়। অলম্ এবং পাঞ্জার সঙ্গে কারুকার্যখচিত সিল্ক বা মখমল কাপড়ের পট্‌কা বাঁধা থাকে। এই পট্‌কার সঙ্গে কয়েকটি ফুলের সেহ্‌রা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। অলমে আল্লাহ্‌ এবং পাক পাঞ্জাতনের নাম খোদিত। অলমের

মিম্বর । (পৃঃ ১॥০)

পানসাল্লা। (পৃঃ ১৮০)
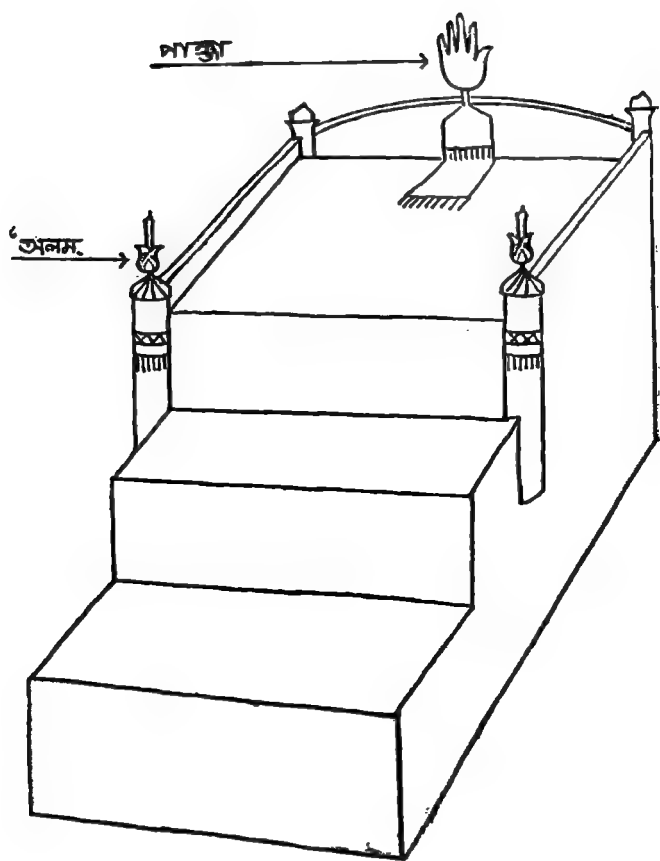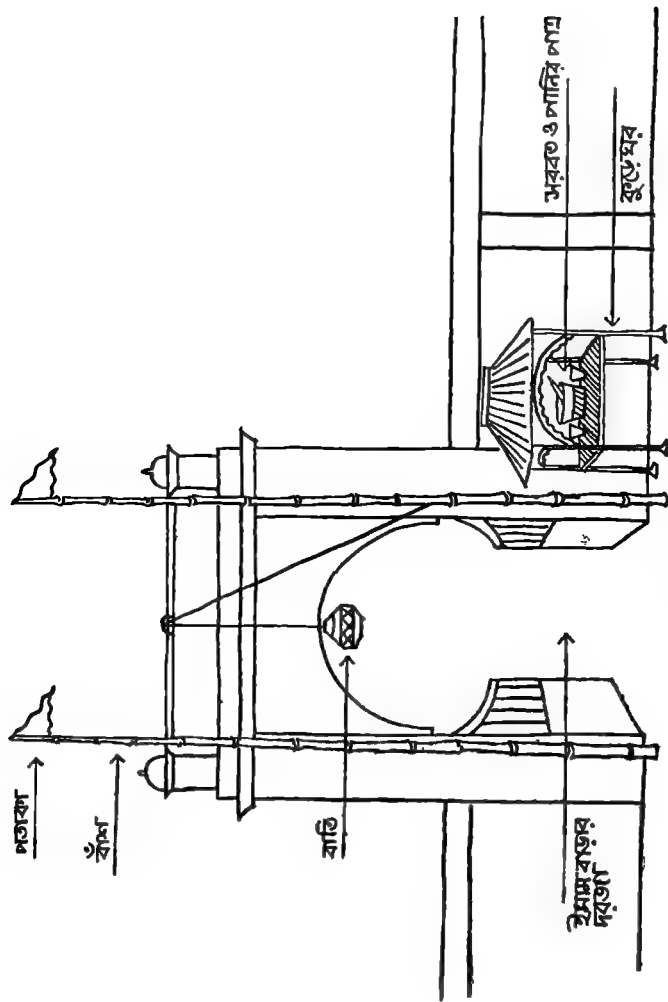
প্রান্তভাগে ফুলের কারুকার্য করা। মিম্বরের উপরিভাগে সামিয়ানা রজ্জু দিয়া বাঁধা হয়। ইহা ইমামবাড়ার কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে মুহর্রমের প্রথম তারিখে স্থাপন করা হয়। মিম্বরের যে-কোন একটি ধাপ হইতে 'জাকের' অর্থাৎ বক্তা সম্মুখে উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে কারবালার অরুন্তুদ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। মুহর্রমের সময়ে এই মজলিশ-অনুষ্ঠানে জাকের এই মিম্বর হইতে বক্তৃতা করিলেও দেখা যায় যে, বৎসরের অন্যান্য সময়েও মজলিশে এই মিম্বর ব্যবহৃত হয়। মুহর্রমের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মিম্বরে অলম্, পাঞ্জা, লালা প্রভৃতি লাগানো হয় না। মিম্বর তাজীয়ার সঙ্গে মিছিলে বাহির করার রীতি নাই। আশুরার দিনে নির্দিষ্ট কারবালায় কাগজ ও কাপড়ের তৈরী তাজীয়াগুলি ঠাণ্ডা করিবার পর অলম্, পটকা, লালা প্রভৃতি মিম্বর হইতে খুলিয়া লওয়া হয়। সামিয়ানাও খুলিয়া ফেলা হয়।

স্থায়ী ইমামবাড়া ভিন্ন শীয়া-প্রধান মহল্লায় কাহারও কাহারও দুই একটি ব্যক্তিগত ইমামবাড়াও থাকে। সেখানেও মিম্বর আছে। মিম্বরের তিন দিকে অনেকগুলি লালা সংযুক্ত থাকে এবং তাহার মধ্যস্থলে বিজলীবাতি ও মোমবাতি রোশনাই করার জন্য জ্বালান হয়।

জ। পান্সাল্লা ঃ

ইহা মুহর্রম চাঁদের দুই তিন দিন পূর্বে প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক ইমামবাড়ার সম্মুখে দুইটি লম্বা বংশদণ্ড মাটিতে প্রোথিত করা হয়। দণ্ড দুইটির মাথার সঙ্গে লাল, সবুজ বা কালো রঙের পতাকা টাঙাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাঁশের এই দণ্ড দুইটির সঙ্গে অপর একটী পাতলা বাঁশ মধ্যস্থলে সমান্তরাল করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। মধ্যস্থলে অবস্থিত পাতলা বাঁশের সঙ্গে দড়ি বা

রশি দিয়া একটী আলোকপাত্র টাঙাইয়া দেওয়া হয়। এই আলোকপাত্রটী মোমবাতি জ্বালাইয়া চল্লিশদিন পর্যন্ত আলোকিত করা হয়। ফলে, ইমামবাড়ার দরজার সম্মুখভাগ লাল, নীল ও সবুজ রঙের আলোকমালায় ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠে। যে-বাতিটী বাঁশের সঙ্গে টাঙাইয়া দেওয়া হয়, তাহার নাম 'কান্দিল'। 'কান্দিল' শব্দটী ইংরেজী 'Candle' হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। ইমামবাড়ার দরজার যে-কোন এক দিকে বাঁশ, খড়, চাটাই অথবা খল্‌পা দিয়া ছোটখাট একটী কুটীর তৈরী করা হয়। অতঃপর, সেই ঘরের মধ্যে একটী উঁচু মাচা তৈরী করিয়া তাহার উপর একটি মাটীর পাত্র রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মাটীর পাত্রে পানোপযোগী পানি বা সরবত থাকে। অনেক সময় দুধের সরবতও বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। চেহ্‌লমের পর এই সব খুলিয়া ফেলা হয়, এবং পানসাল্লার বাঁশ ও চাটাই গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

পানসাল্লা নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য—জনসাধারণকে মুহর্রম অনুষ্ঠান সম্পর্কে অবহিত করা, অনুষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণের ঔৎসুক্য জাগাইয়া তোলা।

ঝ। জওয়াবী গাওয়ারাহ্‌ঃ

ইহার সাধারণ নাম 'বোল্‌তা গাওয়ারা'। ইহা কারবালার সমস্ত শহীদের কবরের অনুকৃতি।

ঢাকার ফরাসগঞ্জ নামক অঞ্চলে 'বীবীর রওজা' নামক একটি ইমামবাড়া আছে। সেই স্থানে কাগজ দিয়া তাজীয়ার ন্যায় দেখিতে এই গাওয়ারা নির্মিত হয়। মুহর্রম মাসের পয়লা তারিখে ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। আটই এবং নয়ই তারিখে এই 'জওয়াবী গাওয়ারা' সহ একটি ছোট মিছিল বাহির করা হয়। পরে তাহা বীবী রওজায় ফিরিয়া যায়। দশই মুহর্রম তারিখে অপরাহ্ণ

জওয়াবী গাওয়ারাহ্‌ (পৃঃ ১৷৵০)

পাহাড়। (পৃঃ ১॥৶৹)
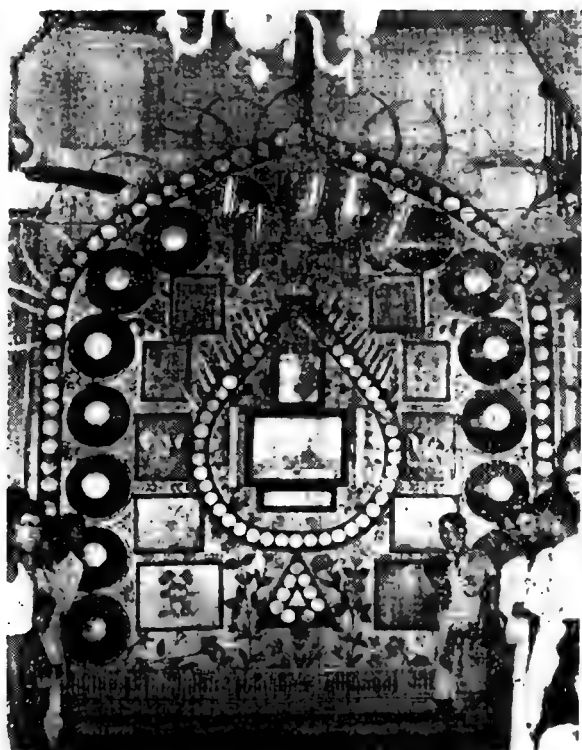
চারি ঘটিকার সময় এই গাওয়ারাটিকে পুনরায় মিছিলে বাহির করা হয়। এইদিন উহার সঙ্গে বিশ পঁচিশটী রঙীন সুতা টাঙানো থাকে। এই সুতাগুলি ধরিয়া অনুমান প্রায় চার পাঁচ শত যুবক এবং গাওয়ারা-বহনকারী বিশ পঁচিশজন বলিষ্ঠ যুবক 'হুসৈন' 'হুসৈন' রবে চীৎকার করিতে করিতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে নির্দিষ্ট কারবালায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এইখানে গাওয়ারাটী ঠাণ্ডা করা হয়। এই দৃশ্য দর্শনের জন্য সুদীর্ঘ দেড় মাইল পর্যন্ত পথের দুই পার্শ্বে বিরাট জনতা প্রতীক্ষা করে। ফলতঃ গাওয়ারা, তাজীয়ারই একটী ভিন্ন সংস্করণ।

ঞ। পাহাড় ঃ

কথিত আছে, হযরত আলী 'নজফ-ই-আশরফ' পাহাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহার অনুকৃতি স্বরূপ শীয়াগণ এই পাহাড় মুহর্‌রম অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে। ইহা কাঠের ফ্রেম করিয়া তৈরী। ফ্রেমের চতুষ্পার্শ্বে ঢাল, তলোয়ার প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ সংলগ্ন। পাহাড়ের চতুর্দিকে হযরত আলী, হাসান-হুসৈনের চিত্র (কিন্তু তাঁহাদের মুখমণ্ডল নেকাব দ্বারা আবৃত) এবং বোরাক, দুলদুলঘোড়া, উট প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত। বোরাকের উপরিভাগে পাঞ্জাতনের দোওয়া লিখিত। পাহাড়ের ঠিক নিম্নে ত্রিকোণাকার কাঁচের ফ্রেমে পাঞ্জাতনের নাম বাঁধানো আছে। পাহাড়ের ঠিক সম্মুখে একটী কাঠের চকি থাকে। চকিটীর তিনদিকে কাঠের রেলিং। এখানে নামাজের সরঞ্জাম, জায়নামাজ, তসবি, টুপী এবং ইমাম হুসৈনের উদ্দেশ্যে সিন্নী রাখা হয়।

মুহর্‌রমের প্রথম দশ রজনীতে এই পাহাড় বিজলী বাতি বা কুপীবাতি জ্বালাইয়া আলোকিত করা হয়। আশুরার দিবসেও এই পাহাড়কে স্থানান্তরিত করা হয় না, বরং ইহার অনুরূপ একটী ক্ষুদ্র পাহাড় নয়ই মুহর্‌রম তারিখে মিছিলে বাহির করা হয়।

মিছিল অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ

মিছিল মুহর্‌রম অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ। শীয়াগণ (এবং কিছু সংখ্যক সুন্‌নী মুসলমানও বটে) যে-সকল উপকরণ সহ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে, তাহার মোটামুটি পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

মিছিলের পুরাভাগে সর্বপ্রথম নিশান, ঝাণ্ডা এবং ধর্মীয়-পতাকাদি লইয়া কতকগুলি লোক অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকে।

অতঃপর, খুব বড় একটা ঘন্টা বাজান হয়। ঘণ্টা বাজানোর পর কয়েকজন অশ্বারোহী অলম্, পাঞ্জা লইয়া নির্দিষ্ট পথ দিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহাদের পর ঃ

১। ভেস্তার দল। ইহাদের হাতে লাল ও সবুজ নিশান থাকে। গায়ে ভিস্তিওয়ালার পোশাক। কটিতে লাল শালু কাপড়ের তহ্‌বন। বাম পার্শ্বে স্কন্ধোপরি একটি চামড়ার মশক থাকে। এই মশকে পানি রাখিয়া লোকজনকে বিতরণ করা হয়। ইহাদের স্কন্ধের উপর দিয়া আড়াআড়িভাবে 'বাদলার মালা' (পৈতা) পরাইয়া দেওয়া হয়, আর 'সেলি' (কালো রঙের সুতা দিয়া তৈরী মালা) সাধারণতঃ গলায় পরা হয়। সেলির ভিতর দিয়া একটি নিশান কটিদেশে সংলগ্ন থাকে। নিশানের উপরাংশ হাতের মধ্যে ধরা থাকে, এবং নীচের অংশ কটিদেশে আটকানো থাকে। ভেস্তাদলের আগে যে-বাদক দল থাকে, তাহারা 'নৌহা' সুর বাজায়। ভেস্তাগণের মধ্যে কেহ ধূমপান করিতে চাহিলে, তাহাকে ঐ সেলি ও নিশান খুলিয়া রাখিতে হইবে। যদি কেহ এই নিয়ম লঙ্ঘন করে অথবা অন্য কোন প্রকারে সেলির অমর্যাদা ঘটায়, তবে তাহাকে জরিমানা দিতে হইবে। ইহাদের এক একটি দল আছে, প্রতি দলে একজন করিয়া সরদার নিযুক্ত থাকে। মিছিলে এই

ভেস্তার দলে আনুমানিক এক হাজারের মত লোক যোগদান করে। এই ভেস্তাদল হযরত আব্বাসের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বাহির হয়। বলাবাহুল্য যে, ভেস্তাদলের অধিকাংশ ব্যক্তিই সুন্নী মুসলমান, তথাপি ইহারা শীয়াগণের মিছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ। তাহাদের পর ঃ

২। বীবীর ডোলা। বীবীর ডোলা দুইখানি মিছিলের দুই-দিকে থাকে। ইহা ইমাম হুসৈন-পরিবারের পর্দানশীন মহিলাদের বহনকারী এক প্রকার ডুলি বা পাল্কীর প্রতীক। এই ডোলা বা ডুলি তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বাহির হয়। ইহাদের পর ঃ

৩। মর্সীয়াখানির দল। এই দলের সম্মুখভাগে দুই জন সানাই-বাদক থাকে। মর্সীয়াখানি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শীয়াদের কণ্ঠ-স্বরের সহিত সানাই বাদকদ্বয় সানাইয়ে সুর দেয়। মর্সীয়াখানির দল হইতে দুলদুল ঘোড়া পযন্ত শীয়াগণ দুই পার্শ্বে পাঞ্জা, অলম্ প্রভৃতি হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। এই সকল অলম্ এবং পাঞ্জার প্রকার-ভেদ আছে। মর্সীয়াখানির দলে কয়েকটি লস্করী অলম্‌ও থাকে। অতঃপর ঃ

৪। জুলজনা ঘোড়া। ইমাম হুসৈন যখন কারবালার ময়দানে যুদ্ধের জন্য শত্রুসৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে একটি অশ্ব ছিল। এই অশ্বের অনুকরণ স্বরূপ যে-অশ্ব সাজান হয়, তাহাই জুলজনা ঘোড়া। এই অশ্বের পৃষ্ঠদেশে কারুকার্যখচিত জিন থাকে। জিনের উপরে দুইটি তরবারী অনেকটা গোলাকৃতি অবস্থায় রাখা হয়। অশ্বের মুখমণ্ডল মুখোস দ্বারা আবৃত। এই মুখোস রূপার তৈরী, তাহাতে মূল্যবান পাথর বসানো। অশ্বটির গলদেশ দুই তিনটি মূল্যবান্ কৃষ্ণবর্ণের শাল দ্বারা জড়াইয়া দেওয়া হয়।

অশ্বের মুখের দুই পার্শ্বদেশ হইতে প্রায় ৫০।৬০ ফুট দীর্ঘ দুইটি সুতা থাকে। যে-সকল ব্যক্তি তাহাদের স্ব স্ব ইচ্ছা পূরণার্থে মানত বা মানসিক করে অথবা যাহাদের মানত ইতঃপূর্বেই পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহারাই এই সুতা ধরিয়া পথ চলিতে থাকে। বলা বাহুল্য, শোভাযাত্রার শেষ পর্যন্ত ইহারা সুতা ধরিয়া থাকে। জুলজনা ঘোড়ার মুখের দুই পার্শ্বদেশ হইতে যে-দুইটি সুতা থাকে, তাহার মধ্যভাগে হযরত আব্বাসের অলমের প্রতীক লস্করী-অলম রাখা হয়। তারপর

৫। মাতম ও নৌহার দল। মাতম ও নৌহার দল জুলজনা ঘোড়ার পশ্চাদ্দিকে থাকে। এখানে প্রায় চারি পাঁচ শত লোক মাতম করিতে থাকে। ইহাদের পশ্চাদ্দেশে ঃ

৬। দুলদুল ঘোড়া। ইহা একটি শ্বেতবর্ণের আরবীয় অশ্ব। ইহার পৃষ্ঠভাগে থাকে একটি শ্বেতবস্ত্র ঝুলানো। তৎসঙ্গে জিন, লাগাম এবং তলোয়ার, তীর, ধনুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র ঝুলানো থাকে। অশ্বকে লাল রঙে রঞ্জিত করিয়া হুসৈনের আহত অশ্বের রক্তাক্ত অবস্থাকে দেখান হয়। অশ্বের পিঠের উপরে ঝুলন্ত রঙীন বস্ত্রখণ্ডে তীরগুলি বিদ্ধ থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায়, ঘোড়াটি তীরবিদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে খিমায় হুসৈন-পরিবার পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতেছে। এই অশ্বের পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত থাকে; কোন আরোহী থাকে না। অশ্বকে একটি সামিয়ানার ছায়ার তলায় মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাওয়া হয়। অশ্বের সম্মুখে এক ব্যক্তি (তাহাকে 'নকীব' বলে) অশ্বের অসহায় অবস্থার কথা সজোরে ঘোষণা করিতে করিতে গমন করে। নকীব ঘোষণা করে ঃ

সওয়ারী হ্যায়, শহীদে কারবালা, নমাসাএ রসূল ইমাম হুসৈন কী—ইত্যাদি।

গঞ্জ-শহীদান : (পৃঃ ১৮৩/০)
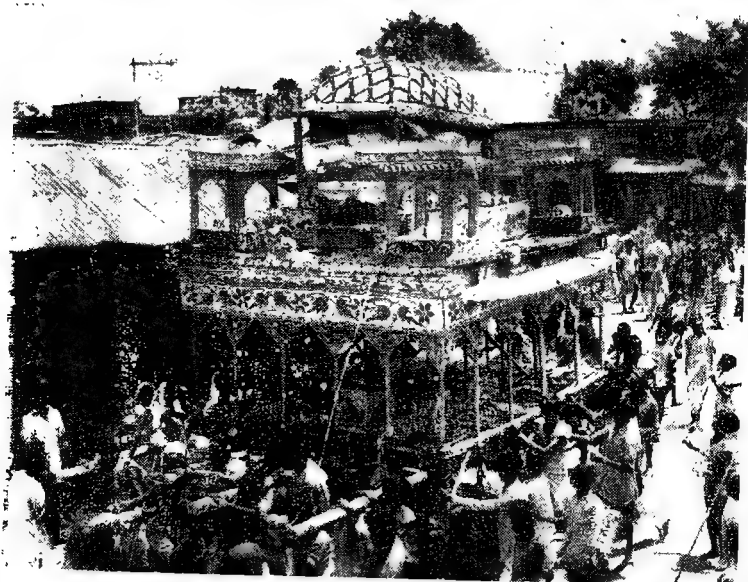
দুলদুল ঘোড়াকে যখন মিছিলে বাহির করা হয়, তখন রাস্তায় হিন্দু-মুসলমান জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দুধ ও মলিদা (রুটি শুষ্ক করিয়া দুগ্ধ-চিনি সহযোগে প্রস্তুত পায়েস) খাওয়ায় এবং পানি ও দুগ্ধ দ্বারা তাহার পাগুলি ধৌত করিয়া দেয়। কোন কোন অঞ্চলে কোন কোন স্ত্রীলোক তাহাদের কৃষ্ণকুন্তল দ্বারা অশ্বের পা মুছাইয়া দেয়। জুলজনা এবং দুলদুল একই ঘোড়া। শুধু পার্থক্য এই যে, জুলজনা ঘোড়া হুসৈনের যুদ্ধযাত্রার পূর্ব-অবস্থার এবং দুলদুল ঘোড়া হুসৈনের শহীদ হওয়ার পরের অবস্থার অনুকৃতি। অতঃপর ঃ

৭। পাহাড়। ইহা দুলদুল ঘোড়ার পরে থাকে। আটজন মানুষ এই পাহাড় স্কন্ধে ধারণ করিয়া মিছিলে সমস্ত রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। তারপর ঃ

৮। পাইকের দল। পাইকের দল সাধারণতঃ দুলদুল ঘোড়ার পশ্চাদ্দিকে থাকে। এই পাইকেরা নিজেদের মানত ও ব্রত উপলক্ষে উক্তবেশে মিছিলে যোগ দেয়। কোন বিষয়ে তাহাদের মনোস্কামনা পূর্ণ হইলে অথবা পূর্ণ করিবার বাসনা হইলে পাইক বা পেয়াদারূপে মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। তাহারা মিছিলের সঙ্গে নির্দিষ্ট কারবালা পর্যন্ত গমন করে। পাইকদলের পিছনে 'গঞ্জে-শহীদান' থাকে।

৯। গঞ্জে-শহীদান। কারবালার শহীদদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কবর দিতে না পারায় তাঁহাদের একই স্থানে দাফন করা হয়। এই স্থানটিকে 'গঞ্জে-শহীদান' অর্থাৎ শহীদগণের সমাধিক্ষেত্র হয়। এই সমাধিক্ষেত্রের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ইহা মিছিলে বাহির বলা করা হয়।

গঞ্জে-শহীদান মিছিলের সমস্ত উপকরণের পশ্চাতে থাকে।

শীয়াগণের মিছিল অনুষ্ঠানে ভেস্তা, বাঁবার ডোলা, মর্সীয়া খানির দল, জুলজনা ঘোড়া, মাতম বা নৌহার দল, তুলতুল ঘোড়া পাইকের দল, পাহাড় এবং গঞ্জে-শহীদান থাকে।

মিছিল অনুষ্ঠানের প্রকার ভেদ ঃ

মুহর্‌রম অনুষ্ঠানে যে-সকল মিছিল বাহির করা হয়, তাহার প্রকার-ভেদ আছে। যেমন ঃ

ক। আটই মুহর্‌রম অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত একটি মিছিল বাহির হয়। এই মিছিলের নাম 'তোগ গস্ত' طوغ گشت। ইহা তুর্কী শব্দ। 'তোগ গস্ত' অর্থ নিশানবাহীদল।

খ। নয়ই মুহর্‌রম রাত্রি দুইটা হইতে পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত যে-মিছিল বাহির হয়, তাহার নাম 'গাহ্‌ওয়ারাহ্‌ গস্ত' گواره گشت।

গ। দশই মুহর্‌রম তারিখের মিছিল 'মঞ্জিল গস্ত' নামে অভিহিত। এই মিছিল নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ কারবালায় পৌঁছানোর জন্য ইহাকে 'মঞ্জিল গস্ত' منزل گشت আখ্যা দেওয়া হয়।

অতএব মিছিল তিন প্রকারের[১৮]।

প্রথমতঃ, আটই মুহর্‌রমের মিছিল—তোগ গস্ত।

দ্বিতীয়তঃ, নয়ই মুহর্‌রমের মিছিল—আটই তারিখের মিছিল + তুলতুল ঘোড়ার পরে একখানা 'জারীহ্‌' এবং তাহার পশ্চাদ্দিকে পাহাড় ও গঞ্জে-শহীদান থাকিবে।

তৃতীয়তঃ, দশই মুহর্‌রমের মিছিল—নয়ই তারিখের অনুরূপ।

---

১৮ আর এক প্রকারের মিছিল আছে, তাহা 'মেহেন্দি গস্ত' নামে পরিচিত। ছয়ই মুহর্‌রম রাত্রি দশ ঘটিকার সময় পারস্যদেশীয় এক প্রকার 'সারতাওক অলম' সহ এই মিছিল বাহির করা হয়।

২। সুন্নী ঃ অনুষ্ঠানাদি।

স্থান বিশেষে সুন্নী সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান পালনের প্রকারভেদ আছে। এইজন্য মুহর্রমের সময় অনুষ্ঠিত সুন্নীগণের এই উৎসবকে **তিনভাগে** বিভক্ত করা যায়। যেমন ঃ

ক। শীয়া-প্রধান শহর অঞ্চলে সুন্নীদের অনুষ্ঠান।

খ। শীয়া-প্রধান শহর অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুহর্রম অনুষ্ঠান।

গ। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চল এবং অন্যান্য শহরের মুহর্রম অনুষ্ঠান।

ক। শীয়া-প্রধান শহর অঞ্চলে সুন্নীদের অনুষ্ঠান।

ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলীর শহর-অঞ্চল এবং কলিকাতার মাটিয়াবুরুজ অঞ্চল প্রধানতঃ শীয়া প্রভাবে প্রভাবান্বিত ; এই সকল স্থানে মুহর্রম-উৎসব জাকজমকের সহিত প্রতি-পালনের জন্য কতকগুলি ওয়াক্ফ ষ্টেট রহিয়াছে। ফলে, এই স্থানগুলির বহু সুন্নী মুসলমান শীয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবের ফলে মুহর্রম অনুষ্ঠানে যোগদান করে। তাহারা শীয়াদের মজলিশ-অনুষ্ঠানে যোগদান করিলেও মাতম-অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকে। সুন্নী মুসলমানগণ মুহর্রমের প্রথম দশ দিন খিচুড়ি এবং সরবত লোকজনের মধ্যে বিতরণ করে। তাহারা অনেক সময় ইমামবাড়াতে সিন্নী দিয়া থাকে এবং আশুরার দিনে মিছিলে যোগ দেয়, সারাদিন 'ফাকাকাশী' (ইহা রোজা

নহে, তবে অন্য এক প্রকারের উপবাস-ব্রত। ফাকাকাশী করা অবস্থায় শীয়াগণ মধ্যে মধ্যে এক আধটু দুধ বা সরবত পান করে) করে। সুন্নীগণের মধ্যে অনেক লোক লাঠি খেলে। এইভাবে মুহর্‌মের সময় লাঠি খেলাকে আখড়া[১৯] বলে। যেখানে আখড়ার অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়, সেখানে কেবল একটি তাজীয়া রাখাই নিয়ম। আখড়াতে নানাবর্ণের কারুকার্যখচিত পতাকা রাখা হয়। সুন্নী যুবকগণের অনেকে ভেস্তারূপে[২০] শীয়াদের মিছিল অনুষ্ঠানেও অংশ গ্রহণ করে। এ-সম্পর্কে ইতঃপূর্বেই বলা হইয়াছে। আশুরার রাত্রিতে অনেকে পতাকাসহ লাঠি খেলিতে খেলিতে বিভিন্ন ইমামবাড়া পরিভ্রমণ করে এবং পরে তাজীয়া ও পতাকাসহ নির্দিষ্ট কারবালায় গমন করে। তাহারাও

---

১৯ আখড়া : প্রত্যেক মহল্লায় একটি করিয়া 'ডনখানা' বা 'ব্যায়ামাগার' থাকে। ডনখানাগুলি জনসাধারণের চাঁদার সাহায্যে পরিচালিত হয় এবং এগুলি এক এক জন খলীফা বা ব্যায়ামবিদ্‌ ওস্তাদের অধীনে থাকে। উহাতে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে মওলা আলীর (হযরত আলীর) নামে 'নিয়াজ' বা মিষ্টি বিতরণ করা হয়। মুহর্‌ম উৎসবে এই সকল ডনখানায় যুবকগণ লাঠি খেলে। পূর্বে ঢাকা শহরে প্রায় তিন শতাধিক ডনখানা ছিল। এখনও অনেক জায়গায় ডনখানা আছে। মুহর্‌মের সময় সুন্নী মুসলমানগণ এখানে নানা ক্রীড়ানুষ্ঠান করে ও লাঠি খেলে। ঢাকার ডনখানাগুলি শীয়া আধিপত্যের নিদর্শন।

২০ ভেস্তা : ইহারা সকলেই সুন্নী। মুহর্‌মের প্রথম দশ দিন তাহারা অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া থাকে। সরদারগণ হযরত আব্বাসের নামে ইহাদের দলে ভর্তি করে। ইহাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি পোষাক আছে।

শীয়াগণের ন্যায় তাজীয়া ঠাণ্ডা করিয়া বাড়ি ফিরে এবং বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব সমাধা করে।

চেহলমের দিনেও তাহারা পতাকাসহ আখড়া বাহির করে। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সুন্নীগণ শীয়াদের ন্যায় দীর্ঘ দুইমাস ব্যাপী কোন অনুষ্ঠান পালন করে না।

খ। শীয়া-প্রধান শহর অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুহর্‌রম অনুষ্ঠান।

শহরের নিকটবর্তী এলাকায়ও আখড়া খেলার প্রচলন আছে। অনেক গ্রামে দরগাহ্‌ আছে। 'দরগাহ্‌' সাধারণতঃ আকারে খুব ছোট। ইহার আকৃতি ইমাম হুসৈনের মাযারের অনুরূপ। এখানে মুহর্‌রমের প্রথম দশ দিন মোমবাতি এবং

খাড়ুয়া কাপড়ের (এক প্রকার খদ্দরের কাপড়; ইহা আল্‌ বৃক্ষের রঙ্‌ দ্বারা রঞ্জিত হয়। তাহাতে সহজে পোকা ধরে না) একটি গামছা এবং সবুজ রঙের গেঞ্জী ও কোর্তা ইহাদের পরিধান করিতে হয়। প্রত্যেকের হস্তে লাল, নীল রঙের সিল্কের কাপড়ের তৈয়ারী একটি নিশান থাকে। নিশানের দণ্ড কাহারও রূপার কাহারও বাঁশের তৈরী। ইহার সঙ্গে রঙীন কাপড় বা কাগজ মোড়ানো থাকে। স্কন্ধের উপর একটি ক্ষুদ্র মশক ঝুলানো হয়। ইহা হযরত আব্বাসের অনুকরণে ফোরাত হইতে পানি আনিবার রীতি-পদ্ধতির প্রতীক স্বরূপ। ইহাদের গলদেশ হইতে কোমর পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে বাদলার সুতা ঝুলানো হয়। সুন্নীগণের ভেস্তাদলভুক্ত হইবার কারণ, হুসৈনের নামে তাহাদের কোন মানসিক বা ইচ্ছা পূরণ হওয়া। মুহর্‌রম মিছিলে ইহাদের সংখ্যাই অধিক।

কুপীবাতি জ্বালাইয়া আলো দেওয়া হয়। লোকজনের মধ্যে সরবত, মিষ্টান্ন, খিচুড়ি প্রভৃতি সিন্নী বিতরণ করা হয়। এই সকল স্থান হইতে সুন্‌নী বালকেরা কাসেদ সাজিয়া নিকটবর্তী শহর-অঞ্চলে গমন করে। কাসেদ পিতামাতার মানত বা মানসিক করা সন্তান। তাহারা হয়ত কোন এক সময় কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল, অথবা কোন কারণে ঘোরতর বিপদের মুখে পতিত হইয়াছিল। হয়তবা ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ অথবা বিপদ্ হইতে পরিত্রাণের অভিলাষেও তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে কাসেদরূপে মুহর্‌মের অনুষ্ঠানে প্রেরণের জন্য ইমাম হুসৈনের নিকট মানত করিয়াছিল। এই কাসেদের কটিদেশে ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা, হাতে ময়ূরপাখার চামর বা রুমাল থাকে। ইহারা এই সময় 'হায় হুসৈন', 'হায় হুসৈন' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে এক ইমামবাড়া হইতে অন্য ইমামবাড়ায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া থাকে। ইমামবাড়া না থাকিলে তাহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে দৌড়ায়। তাহারা প্রথম দশদিন অথবা শেষ তিন দিন রোজা রাখে। বিশেষ লক্ষণীয় যে, মুহর্‌ম উৎসবের সময় সুন্‌নী মুসলমানগণও বিবাহ প্রভৃতি আনন্দোৎসব হইতে বিরত থাকে।

গ। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চল এবং অন্যান্য শহরের মুহর্‌ম অনুষ্ঠান।

বাংলা দেশে গ্রামাঞ্চল ও অন্যান্য শহরের অশিক্ষিত সুন্‌নী যুবক মুসলমানেরা লাঠি খেলে এবং অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করে। তাহারা মুহর্‌মের প্রথম দশ দিন ঢাক ঢোল বাজাইয়া রাস্তায় রাস্তায় সারারাত্রি হল্লা করে। গ্রামাঞ্চলের সুন্‌নী যুবকেরা এই সময়ে দলবদ্ধ হইয়া বাড়ি বাড়ি জারী গান

গায়। জারীগান গাহিবার রেওয়াজ কেবল বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের সুন্‌নী মুসলমানগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষিত সুন্‌নী মুসলমানেরা উপরোক্ত অনুষ্ঠানের ধারে কাছেও যান না। তাঁহারা মুহর্‌রমের প্রথম কয়েকদিন বিশেষতঃ ৭ই, ৮ই ও ৯ই মুহর্‌রমে রোজা রাখেন এবং নামাজ পড়িয়া ইমাম হুসৈনের রূহের শান্তি কামনা করেন। মস্‌জিদে মস্‌জিদে এই কয়দিন মৌলুদ মহ্‌ফিলের ব্যবস্থাও থাকে। অনেকে গরীব, অন্ধ ও আতুরদের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন।

পূর্বকালে জমিদার এবং নবাবগণ অনেক গ্রামাঞ্চলে দরগাহ্‌র নামে সম্পত্তি দান করিতেন। মুহর্‌রম মাসে ঐ সকল স্থানে মহা ধূমধাম হইত। বর্তমানে ইহা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পশ্চিমা সুন্‌নী মুসলমানগণের মধ্যে এক প্রকার মর্সীয়া গানের অনুষ্ঠান ঢাকা প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। তাহারা এক এক খণ্ড বাঁশের টুকরা কাচা কাচা করিয়া দুই হাতে দুইখানা লইয়া পরস্পর আঘাত করিয়া মাতম করে।

হিন্দুগণের মধ্যেও আখড়া ও তাজীয়া বাহির করার রীতি পাক-ভারতের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত আছে[২১]।

৩। সুন্‌নী সম্প্রদায়ের উপর শীয়া প্রভাব।

অতীতে মুহর্‌রম-অনুষ্ঠান উপলক্ষে শীয়া ও সুন্‌নীর মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামী উগ্ররূপ ধারণ করিত। ইহার কারণ, শীয়াগণ

---

২১ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ৮ম সংস্করণ, ১৩৫৬, পৃঃ ৩১৯।

কুপীবাতি জ্বালাইয়া আলো দেওয়া হয়। লোকজনের মধ্যে সরবত, মিষ্টান্ন, খিচুড়ি প্রভৃতি সিন্নী বিতরণ করা হয়। এই সকল স্থান হইতে সুন্নী বালকেরা কাসেদ সাজিয়া নিকটবর্তী শহর-অঞ্চলে গমন করে। কাসেদ পিতামাতার মানত বা মানসিক করা সন্তান। তাহারা হয়ত কোন এক সময় কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল, অথবা কোন কারণে ঘোরতর বিপদের মুখে পতিত হইয়াছিল। হয়তবা ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ অথবা বিপদ্ হইতে পরিত্রাণের অভিলাষেও তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে কাসেদরূপে মুহর্মের অনুষ্ঠানে প্রেরণের জন্য ইমাম হুসেনের নিকট মানত করিয়াছিল। এই কাসেদের কটিদেশে ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা, হাতে ময়ূরপাখার চামর বা রুমাল থাকে। ইহারা এই সময় 'হায় হুসৈন', 'হায় হুসৈন' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে এক ইমামবাড়া হইতে অন্য ইমামবাড়ায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া থাকে। ইমামবাড়া না থাকিলে তাহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে দৌড়ায়। তাহারা প্রথম দশদিন অথবা শেষ তিন দিন রোজা রাখে। বিশেষ লক্ষণীয় যে, মুহর্ম উৎসবের সময় সুন্নী মুসলমানগণও বিবাহ প্রভৃতি আনন্দোৎসব হইতে বিরত থাকে।

গ। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চল এবং অন্যান্য শহরের মুহর্ম অনুষ্ঠান।

বাংলা দেশে গ্রামাঞ্চল ও অন্যান্য শহরের অশিক্ষিত সুন্নী যুবক মুসলমানেরা লাঠি খেলে এবং অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করে। তাহারা মুহর্মের প্রথম দশ দিন ঢাক ঢোল বাজাইয়া রাস্তায় রাস্তায় সারারাত্রি হল্লা করে। গ্রামাঞ্চলের সুন্নী যুবকেরা এই সময়ে দলবদ্ধ হইয়া বাড়ি বাড়ি জারী গান

গায়। জারীগান গাহিবার রেওয়াজ কেবল বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের সুন্‌নী মুসলমানগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষিত সুন্‌নী মুসলমানেরা উপরোক্ত অনুষ্ঠানের ধারে কাছেও যান না। তাঁহারা মুহর্‌রমের প্রথম কয়েকদিন বিশেষতঃ ৭ই, ৮ই ও ৯ই মুহর্‌রমে রোজা রাখেন এবং নামাজ পড়িয়া ইমাম হুসৈনের রূহের শান্তি কামনা করেন। মস্‌জিদে মস্‌জিদে এই কয়দিন মৌলুদ মহ্‌ফিলের ব্যবস্থাও থাকে। অনেকে গরীব, অন্ধ ও আতুরদের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন।

পূর্বকালে জমিদার এবং নবাবগণ অনেক গ্রামাঞ্চলে দরগাহ্‌র নামে সম্পত্তি দান করিতেন। মুহর্‌রম মাসে ঐ সকল স্থানে মহা ধূমধাম হইত। বর্তমানে ইহা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পশ্চিমা সুন্‌নী মুসলমানগণের মধ্যে এক প্রকার মর্সীয়া গানের অনুষ্ঠান ঢাকা প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। তাহারা এক এক খণ্ড বাঁশের টুকরা কাচা কাচা করিয়া দুই হাতে দুইখানা লইয়া পরস্পর আঘাত করিয়া মাতম করে।

হিন্দুগণের মধ্যেও আখড়া ও তাজীয়া বাহির করার রীতি পাক-ভারতের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত আছে[২১]।

৩। সুন্‌নী সম্প্রদায়ের উপর শীয়া প্রভাব।

অতীতে মুহর্‌রম-অনুষ্ঠান উপলক্ষে শীয়া ও সুন্‌নীর মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামী উগ্ররূপ ধারণ করিত। ইহার কারণ, শীয়াগণ

---

২১ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ৮ম সংস্করণ, ১৩৫৬, পৃঃ ৩১৯।

হযরত আলীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার সময় তাঁহার পূর্ববর্তী তিন খলীফার প্রতি বিদ্বেষ ও অভিসম্পাৎবাক্য উচ্চারণ করিত। এইজন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবার রক্তপাতের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু বেশ কিছুকাল যাবৎ শীয়া-সুন্নীর ধর্মীয় গোঁড়ামী অনেকটা শিথিল হইয়াছে, এবং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ও রক্তারক্তির সংবাদ পূর্বের ন্যায় আর শোনা যায় না। শুধু তাহাই নহে, সুন্নী সম্প্রদায়ের উপর শীয়া সম্প্রদায়ের যে গভীর প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা পাক-ভারতের সুন্নী মুসলমানদের শীয়া রীতি-পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহার অনুসরণ করিতে দেখিয়া মনে হয়। মুঘল আমলেও সুন্নীগণ শীয়া আচার-পদ্ধতি গ্রহণ করে, এবং নামের শেষে আলী, হায়দর, হাসান, হুসৈন প্রভৃতি উপনাম যুক্ত হইতে থাকে[২২]। মুহর্রমের প্রথম দশ দিন মাতম ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করা শীয়াগণের সামাজিক ও ধর্মীয় অঙ্গ বলিয়া গণ্য। তথাপি, পাক-ভারতে এমন অনেক সুন্নী মুসলমান দেখা যায় যাহারা প্রতি বৎসর শীয়াগণের ন্যায় নিয়মিতভাবেই মুহর্রম উৎসবে যোগদান করিতেছে। তাহা ছাড়া, এমন অনেক সুন্নী মুসলমানও আছে যাহারা প্রথম তিন খলীফার প্রতি অভিসম্পাৎ-বাণী উচ্চারণ করিতে দ্বিধা করে না। তাহারা শীয়াগণের ন্যায় দশই মুহর্রম তারিখে উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত তাজীয়া ও তাবুত্-মিছিলে যোগদান করিয়া ইমাম হুসৈনের স্মৃতি অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে[২৩]।

---

২২ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্: 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উরদূ ও হিন্দী প্রভাব'। মাহেনও, ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬৭, পৃঃ ৩।

২৩ M. T. Titus: R. Q. I., 1930, p. 93.

সুন্নী মুসলমানগণ চিরকালই হযরত রসূল এবং আহল-ই-বয়ত সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছে। শুধু সুন্নীগণের নহে, সমগ্র মুসলিম জাতির ধর্মগুরু এবং পথপ্রদর্শকরূপে তাঁহারা স্মরণীয় ও বরণীয়। সুতরাং, স্বাভাবিক কারণে ইমাম হুসৈনের আত্মদান সম্পর্কে সুন্নী মুসলমানগণও গভীর শ্রদ্ধা বরাবরই মনে মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। হুসৈনের বীরত্ব, ত্যাগ, ধৈর্য এবং মনুষ্যত্ববোধ সম্পর্কে সুন্নী মুসলমান কবিগণ যুগে যুগে কাব্য, কবিতা, গল্প প্রভৃতি রচনা করিয়া জনসাধারণের মনে আকর্ষণ এবং গভীর শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছেন; পক্ষান্তরে, ইয়াযীদের প্রতি অশ্রদ্ধা জানাইয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শীয়া প্রভাব সুন্নী কবি সাহিত্যিকগণের মনের উপর গভীরভাবে ক্রিয়া করিয়াছে[২৪]। এই শীয়া প্রভাবের ফলেই পল্লী বাংলার অসংখ্য সুন্নী পল্লীকবি শীয়াদের মর্সীয়া অর্থাৎ শোকসঙ্গীতের অনুকরণে অসংখ্য 'জারীগান' রচনা করিয়াছেন। মুহর্‌রমের সময় গ্রাম্য সুন্নী মুসলমান যুবকেরা এই জারী গাহিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত, শীয়াগণের মিছিল অনুষ্ঠানে যে হাজার হাজার সুন্নী, ভিস্তির দলে যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে, তাহাও প্রকৃতপ্রস্তাবে শীয়া প্রভাবের ফল। প্রতি বৎসর সুন্নী বালক এবং যুবকগণকে মনের অভিলাষ পূরণার্থে শীয়াগণের ন্যায় 'ডুর', 'বাদ্‌দী', 'কাফুনী' প্রভৃতি অঙ্গে ধারণ করিয়া ইমাম হুসৈনের নিকট মানত করিতে দেখা যায়।

বস্তুতঃ, শীয়া আদর্শ ও ধর্মীয় রীতি-পদ্ধতি এমন গভীরভাবে

---

২৪ Ibid. p. 93.

সুন্নী মুসলমানের সমাজ-অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহা ভাবিতেও আশ্চর্য লাগে। শীয়া ধর্মবোধ এবং আচার প্রণালী সুন্নী মুসলমানকে অজ্ঞাতসারে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তাহা চিনিবার উপায় নাই।

পরিশিষ্ট—খ

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানীপুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
অকুব	জ্ঞাত	অকূফ	—	—	—	—	১
অজুদ	অস্তিত্ব	অজূদ	—	—	—	—	
অকিফ	জ্ঞাত	অকিফ	—	—	—	—	
অছিয়ত	দান, উপদেশ	অছীয়ত্	—	—	—	—	
অজিফা	দৈনন্দিন নির্ধারিত জপতপ	—	অজীফা	—	—	—	২
আকবত	পরিণাম, ফল	আকেবৎ	—	—	—	—	
আউয়াল, আওল	সর্বপ্রথম	আউয়াল	—	—	—	—	
আওরত	স্ত্রীলোক	—	আওরত	—	—	—	৩
আওলাদ	সন্তান-সন্ততি	আওলাদ	—	—	—	—	
আক্কেল	বুদ্ধি	আকল্	—	—	—	—	

১ 'অকূফ' শব্দটি সাধারণতঃ কর্মরূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু উহার পূর্বে 'বে' যোগ হইলে (বে + অকূফ) কর্তৃবাচ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। তখন উহার অর্থ দাঁড়ায় 'কাণ্ডজ্ঞানহীন'।

২ 'অজীফা' শব্দ মূলে আরবী ভাষায় কোন নির্ধারিত দৈনন্দিন কার্যকে বুঝায়। কিন্তু ফারসী ভাষায় নির্ধারিত জপতপকে বিশেষরূপে বুঝায়।

৩ এই শব্দটি মূলে আরবী ভাষায় লজ্জাস্থান বা গুপ্তস্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ফারসী ভাষায় উহা স্ত্রীলোক অর্থ প্রকাশ করে।

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
আখের	শেষ	আখের	—	—	—	—	
আচানক	হঠাৎ	—	—	—	আচানক	—	
আছান	সহজসাধ্য	—	আসান	—	—	—	
আছর	নির্দিষ্ট নামাজের সময়	আছ্‌র	—	—	—	—	৪
আছুদা	পর্যাপ্তপরিমাণ	—	আসুদা	—	—	—	
আজমাইস	পরীক্ষা, অনুসন্ধান	—	আজমাইস	—	—	—	
আজল	নির্ধারিত বা শেষ সময়	আজল্	—	—	—	—	
আজিম	শ্রেষ্ঠ, মহান	আজীম্	—	—	—	—	
আজিয়াত	ক্লেশ	আজীয়াৎ	—	—	—	—	
আজদাহা	এক প্রকারের বৃহৎ সর্প	—	আজদাহা	—	—	—	
আজেজ	নম্র, বিনয়ী	—	আজীজ	—	—	—	
আতপ	রৌদ্র	—	—	—	—	—	১

---

৪ 'আছ্‌র' শব্দটি আরবী ভাষায় সাধারণতঃ সময়ের অর্থ বুঝায়। কখনও উহা একটি দীর্ঘ সময় বা যুগকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন ঃ 'আছ্‌রে আব্বাসী' (আব্বাসীয় যুগ) আবার কখনও উহা দিনের একটি নির্ধারিত কাল বা সময়কে বুঝায়। যেমন আছর বা তৃতীয় প্রহর।

১ আতপ শব্দের অর্থ সূর্য-কিরণ ; উহা সংস্কৃত (আ + √তপ্ + অ(তৃ)) শব্দজ।

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
আন্দাসা	সংশয়	—	আন্দেশা	—	—	—	
আন্দাম	স্থান, অঙ্গ	—	আন্দম	—	—	—	
আন্দাজ	অনুমান	—	আন্দাজ	—	—	—	
আপ	আপনি	—	—	—	আপ	—	
আপে	নিজে	—	—	—	আপে	—	
আমান	নিরাপত্তা, নিরাপদ	আমান	—	—	—	—	
আম্বর	এক প্রকারের সুগন্ধি দ্রব্য	আম্বর	আম্বর	—	—	—	
আবদানী	পানির পাত্র	—	আবদানী	—	—	—	
আবিদ	ধার্মিক, উপাসনাকারী	আবিদ	—	—	—	—	
আয়েশ	আরাম, উল্লাস	আইশ	আয়েশ	—	—	—	
আরজ	প্রার্থনা	আরজ	আরজ	—	—	—	
আরজু	আকাঙ্ক্ষা	—	আরজু	—	—	—	
আরমান	গভীর অভিলাষ	—	আরমান	—	—	—	
আরস	আসন	আরস	আরস	আরস	—	—	
আদাওতি	শত্রুতা	—	আদাওতি	—	—	—	
আলম্পানা	বিশ্বের শান্তি-দাতা, বিশ্বের রক্ষক	—	আলম্পানা	—	—	—	
আভি	এখন	—	—	আভি	আভি	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
আরাস্তা	সুসজ্জিত	—	আরাস্তা	—	—	—	
আদ্না	সামান্য	—	আদ্না	—	—	—	
আলম্	বিশ্ব, নিশান	আলম্	—	—	—	—	
আল্মদার	নিশানবাহী	—	আলমদার	—	—	—	
আল্‌বেদা	বিদায়	—	আলবেদা	—	—	—	
আলামত	নিশানা, চিহ্ন	—	আলামত	—	—	—	
আলেম	জ্ঞানী	আলিম্	—	—	—	—	
আল্‌বত	নিশ্চয়ই	আল্‌বত	—	—	—	—	
আশুরা	মহর্রমের দশম দিবস	—	আশুরা	—	—	—	
আমানত	গচ্ছিত	—	আমানত	—	—	—	
আসেকান	প্রেমিকগণ	—	আসেকান	—	—	—	
আস্তাগফার	ক্ষমা-প্রার্থনা	ইস্তেগফার	—	—	—	—	
আবলাক	সাদা বা কাল ফোঁটা ফোঁটা রং	আবলাক	—	—	—	—	
আসল	প্রকৃত	আসল্	—	—	—	—	
আহকাম	ধর্মীয় আদেশ, নির্দেশ	আহ্‌কাম	—	—	—	—	
আহাজারি	দুঃখ প্রকাশ	—	আহাজারী	—	—	—	
আহাদ	প্রতিশ্রুতি	আহাদ	—	—	—	—	
আকিকা	সন্তানের মঙ্গলার্থে আয়োজিত উৎসর্গ	আক্কীকা	—	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা।

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
আহলিয়াত	পরিজনবর্গ	আহ্লিয়াৎ	আহলিয়াত	—	—	—	
আতফাল	সন্তান-সন্ততি	আত্ফাল	—	—	—	—	
আজব	আশ্চর্য	আজব	—	—	—	—	
আছির	রস	আসীর	—	—	—	—	
আয়াল	পরিজনবর্গ	‘আয়াল	—	—	—	—	
আশা	যষ্ঠি	আসা	—	—	—	—	
আসু	অশ্রুবিন্দু	—	—	—	আঁসু	—	
আফতাব	সূর্য	—	আফতাব	—	—	—	
আরায়েস	আরাম	—	আরায়েশ	—	—	—	
আদব	ব্যবহার	আদব	—	—	—	—	
আমামা	পাগড়ি	—	আমামা	—	—	—	
ইনসান	মানুষ	ইনসান	—	—	—	—	
ইয়াদ	স্মরণ	—	ইয়াদ	—	—	—	
ইয়ার	বন্ধু	—	ইয়ার	—	—	—	
ইবলিশ	শয়তানের নেতা	ইবলিশ	—	—	—	—	
ইমান	বিশ্বাস	ইমান	—	—	—	—	
ঈদ	উৎসব	’ঈদ	—	—	—	—	
উম্মর	বয়স	‘ওমর	—	—	—	—	
একরাম	সম্মান	ইকরাম	—	—	—	—	
একরার	স্বীকৃতি	ইকরার	—	—	—	—	
একিন	দৃঢ় বিশ্বাস	য়্যাকীন	—	—	—	—	
এক্তেলাফ	মতভেদ	ইখতেলাফ	—	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
এক্তিয়ার	অধিকার	ইখতিয়ার	—	—	—	—	
এক্তেদা	নির্ভর, অনুসরণ	ইক্তেদা	—	—	—	—	
এগানা	আপন জন	—	এগানাহ্	—	—	—	
এওজ	বদল	‘এওজ	—	—	—	—	
এত্তা	এতটা	—	—	—	এত্তা	—	
এলাই	আল্লাহ্	ইলাহী	—	—	—	—	
এজাজাত	অনুমতি	ইজাজাত	—	—	—	—	
এজেন	অনুমতি	এজেন	—	—	—	—	
এবাদ	বান্দাগণ	‘ইবাদ	—	—	—	—	
এনাম	পুরস্কার	ইন্‘য়াম	...	—	—	—	
এনায়েত	দান	‘ইনায়েৎ	—	—	—	—	
এবারত	গ্রন্থের মূল বচন	‘ইবারৎ	—	—	—	—	
এমতেহান	পরীক্ষা	ইমতেহান্	—	—	—	...	
এন্তেজার	অপেক্ষা	ইন্তেজার	—	—	—	—	
এয়ছা	এইরূপ	—	—	এয়ছা	এয়ছা	—	
এরাদা	ইচ্ছা	ইরাদহ্	—	—	—	—	
এস্তেকবাল	অভ্যর্থনা	ইস্তেকবাল	—	—	—	—	
এসরার	পীড়াপীড়ি	ইস্‌রার	...	—	—	—	
এলহাম	ঐশ্বরিক ইঙ্গিত	ইলহাম	...	...	—	...	
এহাতক	এইপর্যন্ত	—	—	ইহাঁতক	ইহাঁতক	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদু	হিন্দী	অন্যান্য	
এপ্তার	পানাহার	ইফ্‌তার	—	—	—	—	১
এত্তেলা	খবরদেওয়া	ইত্তেলা	—	—	—	—	
এস্ক	প্রেম	‘ইস্ক	—	—	—	—	
ওলফত	সৌহার্দ	উল্‌ফৎ	—	—	—	—	
ওতন	মাতৃভূমি	ওয়াতন	—	—	—	—	
ওর	সীমা	—	—	—	ওর	—	
ওফাত	মৃত্যু	ওফাৎ	—	—	—	—	
ওতার	ওখানে	—	—	—	ওতার	—	
ওয়ালেদ	পিতা	ওয়ালেদ	—	—	—	—	
ওলি আহাদ	প্রতিশ্রুত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি	—	ওলি আহাদ	—	—	—	
ওহি	প্রত্যাদেশ	ওহি	—	—	—	—	
ওফাদারী	গুণগ্রাহিতা	—	ওফাদারী	—	—	—	
কওসর	স্বর্গীয় জলাশয়	কওসর	—	—	—	—	
কওম	জাতি, দল	কওম	—	—	..	—	
কওল	কথা	কওল	—	—	—	—	
কছম	শপথ	কসম	—	—	—	—	
কলেজা	হৃৎপিণ্ড	কলিজা	—	—	—	—	
কদম	পা	কদম	—	—	—	—	

---

১ সাধারণ অর্থ ‘পানাহার’; কিন্তু বিশেষ অর্থে রোজার শেষে পানাহার বুঝায়।

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানীপুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদু	হিন্দী	অন্যান্য	
কবিলা	বংশ	কবিলা	—	—	—	—	
কমিনা	হীন, নিকৃষ্ট	—	কমিনা	—	—	—	
কদিমী	পুরাতন, প্রাচীন	কদিমী	—	—	—	—	
কাফন	শবাচ্ছাদন বস্ত্র	কাফন	—	—	—	—	
কবুল	অঙ্গীকার, স্বীকার	কবুল	—	—	—	—	
কহর	শক্তি, গোস্বা, রাগ	কহর	—	—	—	—	
কাফেলা	যাত্রিদল	কাফেলা	—	—	—	—	
কমজোর	দুর্বল	—	—	কমজোর	কমজোর	—	
কামান	আগ্নেয়াস্ত্র	—	কামান	—	—	—	
কামালাত	পূর্ণতা, শ্রেষ্ঠতা		কামালাত	—	—	—	
কাঙ্কুই	চিরুনী	—	—	—	—	কঙ্কতিকা (সং)	
কাল্ব	হৃদয়	কাল্ব	—	—	—	—	
কালাম	বাক্য, কথা	কালাম	—	—	—	—	
কাতেল	হত্যাকারী	কাতিল	—	—	—	—	
কসুর	অপরাধ	কসুর	—	—	—	—	
কাসেদ	সংবাদবাহীদূত	কাসিদ	—	—	—	—	
কমবক্ত	নিকৃষ্ট	—	কমবক্ত	—	—	—	
কাছাছ	কাহিনী	কাসাস	—	—	—	—	
কাহাতক	কোন্ পর্যন্ত	—	—	কাঁহাতক	কাঁহাতক	—	
কেওড়	কপাট	—	—	—	—	কেড়ও (সংস্কৃত)	
কেরাম	সম্মানীব্যক্তিবর্গ	কেরাম	—	—	—	—	
কেরামত	দৈবশক্তি	করামত	—	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানীপুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
কোরবান	উৎসর্গ করা	—	কুরবান	—	—	—	
কোলফত	কষ্টদায়ক	কুলফৎ	কুলফত	—	—	—	
কিম্মতি	মূল্যবান	—	কিম্মতি	—	—	—	
কুদ্দরত	ক্ষমতা	কুদ্দরৎ	—	—	—	—	
কুওত	শক্তি	কুওৎ	—	—	—	—	
কুরতা	জামা	—	কুর্তা	কুর্তা	কুর্তা	—	
খছম	স্বামী	—	খসম	খসম	খসম	—	
খাক	মাটি	—	খাক	—	—	—	
খছলত	স্বভাব	খসলৎ	খসলত	—	—	—	
খবিছ	খারাপ	খবিছ	—	—	—	—	
খওফ	ভয়	খওফ	—	—	—	—	
খঞ্জর	ছোট আকৃতির দোধারী তলোয়ার	খঞ্জর	খঞ্জর	—	—	—	
খয়ের	ভাল	খয়ের	—	—	—	—	
খারাবি	মন্দ	—	খারাব	—	—	—	
খায়েস	ইচ্ছা	—	খাহিস	—	—	—	
খান্দান	বংশ	—	খান্দান	—	—	—	
খাতের	পক্ষপাতিত্ব	—	খাতির	—	—	—	
খানসা	ক্লীবলিঙ্গ	খুন্‌সা	খুন্‌সা	খুন্‌সা	—	—	
খামাস	একপঞ্চমাংশ	খামস	—	—	—	—	
খান্নাস	দুর্মতি	খান্নাস	—	—	—	—	
খেজাব	রং	খেজাব	—	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মসীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
খেচিয়া	টানিয়া	—	—	—	খেঁচিয়া	—	
খেজালত	অসম্মান	—	খজালত	—	—	—	
খেলাত	পারিতোষিক	—	খেলাত	—	—	—	
খোয়াব	স্বপ্ন	—	খোয়াব	—	—	—	
খোসাল	উল্লাস	—	খুশহাল	—	—	—	
খিমা	তাঁবু	—	খিমা	—	—	—	
খোসবু	সুগন্ধি	—	খোসবু	—	—	—	
খোলাসা	স্পষ্টতা	খুলাসাহ.	—	—	—	—	
গরক	ডুবা	গরক	—	—	—	—	
গজব	গোস্বা, অসন্তুষ্টি	গজব	...	—	—	—	
গর্দান	ঘাড়	—	গর্দান	—	—	—	
গমগীন	চিন্তাবিহ্বল		গমগীন	—	—	—	
গওর	তীক্ষ্ণদৃষ্টি	গওর	—	—	—	...	
গন্দম	যব	—	গন্দম	—	—	—	
গরুরী	গর্ব	—	গরুরী	—	—	—	
গালেব	জয়ী	গালিব	—	—	—	—	
গাফেল	অজ্ঞানী	গাফিল	গাফিল	গাফিল	—	—	
গাফলত	অবহেলা	—	গাফলৎ	—	—	—	
গাওয়ারা	সমীচীন	—	গাওয়ারা	—	—	—	
গায়রত	আভিজাত্য	গইরৎ	গইরৎ	—	—	—	
গারত	প্রলয়, ধ্বংস	গারৎ	—	—	—	—	
গেরা	পতন	—	—	—	গেরা	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উর্দূ	হিন্দী	অন্যান্য	
গেলেমান	ভৃত্যগণ	গেল্‌মান	গেল্‌মান	—	—	—	
গেরেপ্তার	বন্দী	—	গেরেফ্‌তার	—	—	—	
গেল্লা	খাদ্যবীজ	—	গেল্লা	গেল্লা	গেল্লা	—	
গোজার	নিবেদন	—	গুজার	—	—	—	
গোর্জ	মুদ্গর	—	গুর্জ	—	—	—	
গোমরা	পথভ্রষ্ট	গুমরাহ্	—	—	—	—	
গোমর	অভিমান, গর্ব	—	গুমান্	—	—	—	
গিবৎ	পরনিন্দা	গিবৎ	গিবত	—	—	—	
গিধি	দুরাত্মা	—	—	—	গিধি	—	
ঘুমায়	ঘুমায়	—	—	ঘুম্‌না	ঘুম্‌না	—	
চাটান	আঙ্গিনা, ময়দান	—	—	চাটান	—	—	
চারা	উপায়	—	চারা	চারা	চারা	—	
চিজ	বস্তু	—	চিজ	চিজ	চিজ	—	
চুল্ল্	অঙ্গুলি	—	চুল্ল্	—	—	—	
চাহারাম	চতুর্থ	—	চাহারাম	—	—	—	
ছাদ্‌কা	দান	সদ্‌কা	—	—	—	—	
ছদ্‌মা	অন্তর্বেদনা	সদ্‌মা	—	—	—	—	
ছদারত	নেতৃত্ব, সর্দারী	সদারৎ	সদারত	—	—	—	
ছলুক	আচার, নিয়ম-পদ্ধতি	সলুক	সলুক	—	...	...	
ছবর	ধৈর্য	সবর	—	—	—	—	
ছবব	কারণ	সবব	—	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
ছমোজ	বুঝ	—	—	সমোজ	সমোঝ	—	
ছয়লাব	জলপ্লাবন	—	সয়লাব	—	—	—	
ছহী	খাঁটি, বিশুদ্ধ	সহীহ্	সহীহ্	সহীহ্	—	—	
ছঙ্গদেল	কঠিন-হৃদয়	—	ছঙ্গদেল	—	—	—	
ছকি	সুরাপরিবেশনকারী	—	সাকী	—	—	—	
ছাহাবা	সঙ্গিগণ	সাহাবা	—	—	—	—	
ছাবিদ	স্থায়ী	সাবিৎ	—	—	—	—	
ছারির	চারিপায়া, চৌকি	সারীর	—	—	—	—	
ছাবেরিণ	ধৈর্যশীল ব্যক্তিগণ	সাবেরিণ	—	—	—	—	
ছামনা	সম্মুখে	—	—	সাম্না	সাম্না	—	
ছায়ের	ভ্রমণ	সায়ের	সায়ের	—	—	—	
ছিনা	বুক	—	সীনা	—	—	—	
ছেওয়া	ছায়া	—	ছায়া	—	—	—	
ছেতম	গোস্বা	—	সেতম	—	—	—	
ছেদেক	সত্য	সিদ্ক	—	—	—	—	
ছেরেফ	শুধু, কেবল	—	স্রেফ	স্রেফ	—	—	
ছুরাত	আকার	সুরাত	—	—	—	—	
ছোলে	সন্ধি	স্লেহ্	—	—	—	—	
ছোরাক	ছিদ্র	—	সুরাখ	—	—	—	
ছোলতানাত	রাজ্য	সুলতানাৎ	সুলতানাত	—	—	—	
ছোহবত	সংসর্গ	সোহবৎ	সোহবৎ	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মসীঁয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানীপুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
ছোবহান	প্রশংসিত জন	সোবহান	...	—	—	—	(আল্লাহ্‌র এক নাম)
ছুস্তি	অলসতা	—	—	সুস্তি	সুস্তি	—	
ছদ্‌রাতল মন্তাহা	সর্বশেষ গন্তব্যস্থল	ছদ্‌রাতল মন্তাহা	—	—	—	(যৌগিক শব্দ) ১	
জল্‌দি	তাড়াতাড়ি	—	—	—	জলদী	—	
জরদ	এক প্রকার রং	—	জরদ	—	—	—	
জনুন	পাগলামি, মাতলামি	জনুন	—	—	—	—	
জরু	স্ত্রী	—	জরু	জরু	—	—	
জহুদ	পরিশ্রম, প্রচেষ্টা	জহুদ	—		—	—	
জাছুছ	গুপ্তচর	—	জাসুস	জাসুস	—	—	
জামাল	সৌন্দর্য	জামাল	—	—	—	—	
জানানা	স্ত্রীলোক	—	জানানা	জানানা	—		
জাহাগীর	তুনিয়ার শাসক, রক্ষক	—	জাহাঁগীর	—	—	—	
জাহের	প্রকাশ্য	জাহির	—	—	—	—	
জাররা	কিঞ্চিন্মাত্র, বিন্দুপরিমাণ	জাররা	—	—	—	—	
জাহান্নাম	দোজখ	জাহান্নাম	—	—	—	—	

১ হাদিসে কথিত আছে, নবী মুহম্মদ (দঃ) যবে মেরাজের রাত্রিতে তাঁহার শেষ গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর তথায় একটি কুল গাছ দেখিলেন।

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদু	হিন্দী	অন্যান্য	
জাজা	প্রতিদান	জাজা		—	—	—	
জালেম	অত্যাচারী	জালিম	—	—	—	—	
জাকান্দান	আজাব, পীড়ন	—	জাকান্দান	—	—	—	
জেন্দেগানী	যাবজ্জীবন	—	জিন্দেগানী		—	—	
জেগর	অন্তর	—	জিগ্‌র	—	—	—	
জেয়াফত	অতিথিকে আপ্যায়িত করা	জিয়াফৎ	—	—	—	—	
জেরবার	ক্লান্ত		জীর্‌-বার	—	—	—	
জেল্লত	অসম্মান	জিল্লৎ	—	—	—	—	
জেরাবক্ত	আঘাত	জেরবক্ত	জেরাবক্ত	—	—	—	
জিউ	জীবন	—	—	—	জিউ	—	
জিকির	স্মরণ, জপতপ	জিক্‌র	—	—	—	—	
জিয়ারত	সাক্ষাৎ, দর্শন	জিয়ারত	—	—	—	—	
জিবায়েশ	সুসজ্জিত	জিবায়েশ	—	—	—	—	
জুদা	ভিন্ন	জুদা	—	—	—	—	
জুব্বা	বড় ঢিলাজামা	জুব্বা	জুব্বা	—	—	—	
জোলজালাল	মহিমান্বিত	জুলজালাল	—	—	—	—	
জোস	উদ্যম, উদ্দীপনা		জোস	—	—	—	
জোলফক্কার	হযরত আলীর তলোয়ারের নাম	জোলফক্কার	—	—	—	—	
জোয়ানী	যৌবন	—	জওয়ানী	জওয়ানী	—	—	
জঈফ	দুর্বল	জইফ	—	—	—	—	
জহর	মণি-মুক্তা	জওহর	—	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানীপুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
জওজিয়ত	বিবাহ-সূত্র	জওজিয়ৎ	জওজিয়ত	—	—	—	
জজবা	মাতোয়ারা	জজবা	—	—	—	—	
জহুর	দ্বিপ্রহর	জহুর	—	—	—	—	
জহমত	মন-কষাকষি, দ্বন্দ্ব	জহমত	জহমত	—		—	
ঝরকা	ঝর্ণা	—	—	—	ঝরকা	—	
ডালা	নিষ্পেষণ	—	—	—	ডালা	—	
ডঙ্কা	ঢোল	—	—	—	—	ডঙ্কা (সং)	
ঢোড়া	অনুসন্ধান	—	—	—	—	(সং√ ঢুণ্ড্)+আ	
ঢেণ্ডারা	ঢোল-শোহরত	—	—	—	—	ঢেণ্ডারী (সং)	
তাকিদ	কোন বিষয়ে জোর দেওয়া	তাকীদ	—	—	—	—	
তাবেদারী	বাধ্যতা, অনুসরণ	—	তাবেদারী	—	—	—	
তাবেদার	বাধ্যগত, অনুসরণকারী	—	তাবেদার	—	—	—	
তামাম	সমস্ত	—	তামাম	—	—	—	
তাকত	শক্তি, বল	তাকৎ	—	—	—	—	
তন	শরীর	—	তন	—	—	—	১
তেরা	তোমার	—	—	তেরা	তেরা	—	
তাছির	ক্রিয়া	তাসীর	—	—	—	—	

১ সংস্কৃত 'তনু' হইতে পাহ্লবী ও ফারসীতে 'তন' শব্দ আসিয়াছে।

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ (দোভাষী বা মুসলমানীপুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
তছল্লি	প্রবোধ	—	তাসাল্লী	—	—	—	
তেয়ছা	সেইরূপ	—	—	—	তেয়ছা	—	
তামান্না	আকাংক্ষা	তামান্না	তামান্না	তামান্না	—	—	
তাম্বু	তাঁবু	—	তাম্বু	তাম্বু	—	—	
তাইদ	সাহায্য	তাইদ	তাইদ	তাইদ	—	—	
তেগ	তলোয়ার	—	তেগ	—	—	—	
তছবি	জপতপ বা জপতপের মালা	তসবী	তসবী	তসবী	—	—	
তুঝে	তোমাকে	—	—	তুঝে	তুঝে	—	
তকরার	পুনরুক্তি	তকরার	তকরার	—	—	—	
তাজিয়া	হাসান-হুসৈনের সমাধির প্রতিকৃতি	—	তাজীয়হ্	—	—	—	
তজবিজ	প্রস্তাব	তজবিজ	তজবিজ	তজবিজ	—	—	
তোফেল	সাহায্য, ওছিলা	তোফায়েল	তোফায়েল	তোফায়েল	—	—	
তছলিম	স্বীকার, সালাম	তসলীম	তসলীম	তসলীম	—	—	
তন্দুর	রুটি তৈরীর চুল্লি বিশেষ	—	তন্দুর	—	—	—	
তড়পান	ছট্‌ফট্‌ করা	—	—	তড়পান	তড়পান	—	
তাজিম	সম্মান	তাজীম	—	—	—	—	
তরিক	রাস্তা, রীতিনীতি	তরীক	—	—	—	—	
তওবা	অনুশোচনা	তওবা	—	—	—	—	
তন্দরস্তি	সুস্থতা	—	তন্দরস্তি	—	—	—	
তাকওয়া	পরহেজগারী	তাকওয়া	—	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উর্দূ	হিন্দী	অন্যান্য	
তকব্বরি	গর্ব	—	তকব্বরি	—	—	—	
তকছিম	বণ্টন	তকসীম	—	—	—	—	
তকদির	ভাগ্য	তকদীর	—	—	—	—	
তসবির	ছবি	তসবীর	—	—	—	—	
তকরিম	সম্মান	তকরীম	—	—	—	—	
তওঙ্গরি	সচ্ছলতা	—	তওঙ্গরী	—	—	—	
তছকিন	সান্ত্বনা	তসকীন	—	—	—	—	
তওক্কল	ভরসা	তওক্কল	—		—	—	
তবদিল	বদল, পরিবর্তন	তবদীল	—	—	—	—	
তবক	স্তর	তবক	তবক		—	—	
তহফা	পারিতোষিক	তোহ্‌ফা	তোহ্‌ফা	তোহ্‌ফা	—	—	
তম্বি	তাগীদ, শাসানো	তাম্বীহ্‌	তাম্বীহ্‌	—	—	—	
তায়াম্মুম	পানির অভাবে মাটী দ্বারা কার্য সমাধা করা	তায়াম্মুম	তায়াম্মুম	—	—	-	
তক্‌	পর্যন্ত	—	—	তক্‌	তক্‌	—	
তওয়াল্লাদ	জন্ম-বৃত্তান্ত আলোচনা	তওয়াল্লাদ	—	—	—	—	
তলকিন	আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষাদান	তলকীন্‌	তল্‌কীন	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
তলব	অনুসন্ধান	তলব	তলব	তলব	—	—	
তালাব	জলাশয়	—	তালাব	—	—	—	
তাবেইন	সাহাবীদের অনুসরণকারিগণ	তাবেইন	—	—	—	—	
থোরা	অল্প	—	—	থোরা	থোরা	—	
দর্জা	মর্যাদা, দরজা	—	দর্জা	—	—	—	
দফন	পুঁতিয়াফেলা	দফন	—	—	—	—	
দামন	আঁচল	—	দামন্	দামন্	—	—	
দাদখা	প্রতিদান আকাংক্ষী	—	দাদখাহাঁ	—	—	—	
দস্ত	হাত	—	দস্ত	—	—	—	
দরমিয়ান	মধ্যে	—	দরমিয়ান	—	—	—	
দজ্জাল	অত্যাচারী	দজ্জাল	—	—	—	—	
দর্দগম	চিন্তাজনিত দুঃখ	দর্দেগম	—	—	—	—	
দরক্ত	গাছ	দরখ্ত	—	—	—	—	
দরেন্দা	হিংস্র	—	দরেন্দা	—	—	—	
দানাই	বুদ্ধি	—	দানাই	দানাই	—	—	
দাগা	ধোঁকা	—	দাগা	—	—	—	
দিল্	প্রাণ	—	দিল্	দিল্	—	—	
দিনদার	ধর্মভীরু	—	দ্বীনদার	—	—	—	
দিলদার	হৃদয়বান	—	দিলদার	—	—	—	
দুয়েম	দ্বিতীয়	—	দুয়াম	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানীপুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
দুষমন	শত্রু	—	দুশমন্	—	—	—	
দেরেগ	ভয়, ভীতি	—	দেরেগ	—	—	—	
দেওয়ানা	পাগল	—	দেওয়ানা	—	—	—	
দেলগীর	প্রশস্ত-অন্তর	—	দেলগীর	—	—	—	
দেলবর	সাহসী	—	দিলওয়ার	—	—	—	
দোজাহান	উভয়-জগৎ	—	দো-জাহান	—	—	—	
দোবারা	দ্বিতীয়বার	—	দোবারা	—	—	—	
দোরস্ত	বিধিগত, পরিপাটি, সুশৃংখল	—	দোরস্ত	—	—	—	
দোন	দুই	—	—	দোন	দোন	—	
দোসর	সঙ্গী	—	—	—	দোসর	—	
নওশা	বর	—	নওশা	—	—	—	
নওাছা	নাতি	—	নওয়াছা	—	—	—	
নজদিগ	নিকট	—	নয্‌দীক্	—	—	—	
নজম	কবিতা	নজম	নজম	—	—	—	
নসিহত	উপদেশ	নসীহৎ	নসীহৎ	—	—	—	
নিদান	মূল কারণ	—	—	—	—	নিদান (সংস্কৃত)	
নছল্ল	বংশাবলী	নছল	নছল	—	—	—	
নমুদার	প্রকাশ	—	নমুদার	—	—	—	
নাজাত	মুক্তি	নাজাৎ	নাজাত	—	—	—	
নাছারা	খ্রীষ্টান	নাছারা	—	—	—	—	
নাত	প্রশংসা, [রসুলের]	না'ত	—	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
নাদান	বোকা	—	নাদান	—	—	—	
নছব	সংযোগ	নছব	নছব	—	—	—	
নাজেল	অবতীর্ণ	নাজেল	—	—	—	—	
নেকাল	বাহির	—	—	—	নিকাল	—	
নেকনাম	সুনাম	—	নেকনাম	নেকনাম	—	—	
নেঘাবানি	রক্ষণাবেক্ষণ	—	নেঘাবানি	—	—	—	
নিয়েত	ইচ্ছা	—	নিয়ত	নিয়ত	—	.	
নেছার	উৎসর্গকারী	—	নেছার	—	—	—	
নেয়ামত	দান	নেয়ামত	নেয়ামত	—	—	—	
নেশানি	চিহ্ন, পতাকা	—	নিশানী	—	—	—	
নেশানদার	পতাকাবাহী	—	নিশানদার	—	—	—	
নেজা	বর্শা, বল্লম	নেংজা	নে'জা	নে'জা	—	—	
নোক্তা	বিন্দু	নোক্তা	নোক্তা	নোক্তা	—	—	
নেস্তানাবুদ	প্রলয়, ধ্বংস	—	নেস্তানাবুদ	—	—	—	
নাজুক	নম্র	—	—	নাজুক	নাজুক	—	
পছিনা	ঘাম	—	পছিনা	পছিনা	—	—	
পটকা	আতশবাজী	—	—	—	পট্কা	—	
পটকান	পাতিত করা		—		পটকান	—	
পয়গাম	বার্তা, সংবাদ	—	পয়গাম	—	—	—	
পরেন্দা	পাখী	—	পরেন্দা	—	—	—	
পরহেজ	বাঁচা	—	পরহেজ	—	—	—	
পাকড়	ধরা	—	—	পাকড়	পাকড়	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদু	হিন্দী	অন্যান্য	
পলিদ	অপবিত্র	—	পলিদ	—	—	—	
পাক বারি	পবিত্র সৃষ্টিকর্তা	—	পাকবারি	—	—	—	
পাঞ্জেগানা	পাঁচওয়াক্ত	—	পাঞ্জেগানা	—	—	—	
পর্দা	আবরণ	—	পর্দা	—	—	—	
পানা	আশ্রয়	—	পানা	—		—	
পুকার	আওয়াজ	—	পুকার	—	—	—	
পুসিদা	গোপন	—	পুসিদা	—	—	—	
পিয়ারা	আদর	—	পিয়ারা		—	—	
পুরজা	ক্ষুদ্র অংশ		পুরজা	—	—	—	
পেয়াদা	পদব্রজ	—	পেয়াদা	—	—	—	
পেরেশান	চিন্তা-বিহ্বল		পেরেশান	—	—	—	
পাঞ্জাতন	পঞ্চব্যক্তি	—	পাঞ্জেতন	—	—	—	১
পোস্তপানা	পশ্চাদ্দেশ হইতে সাহায্য করা	—	পোস্তপানা	—	—	—	
পোতা	দৌহিত্র	—	—	পোতা	পোতা	—	
পরওয়ারেশ	লালনপালন	—	পরওয়া-রেশ	—	—		
ফজুলি	চালাকী	ফজুলী	ফজুলী	—	—	—	
ফানাফিল্লাহ্	আল্লাহ্‌র সহিত একাত্ম হওয়া	ফানা-ফিল্লাহ	—	—	—	—	

১ হযরত রসুল, হযরত আলী, বীবী ফাতিমা, ইমাম হাসান ও হুসৈন—এই পাঁচজনকে 'পাঞ্জাতন' বলা হয়।

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
ফিকির	চিন্তা	ফিক্‌র	—	—	—	—	
ফরমাবরদার	আনুগত্য	—	ফরমা-বরদার	—	—	—	
ফেদা	আত্মবিলীন	ফেদা	ফেদা	—	—	—	
ফেত্‌না	বিবাদ-বিসম্বাদ	ফিৎনা	ফিৎনা	—	—	—	
ফলানা	অমুক	ফলানা	ফলানা	ফলানা	—	—	
ফাবাগত	অবসর	ফারাগত	ফারাগত	—	—	—	
ফানা	নিশ্চিহ্ন	ফানা	ফানা	—	—	—	
ফরজন্দ	সন্তান-সন্ততি	—	ফরজন্দ	ফরজন্দ	—	—	
ফরমান	আদেশ	—	ফরমান	—	—	—	
ফজিলত	মর্যাদা, গুণ	ফজিলৎ	ফজিলত	—	—	—	
ফেরেব	ধোঁকা	—	ফেরেব	ফেরেব	—	—	
ফসাদ	বিবাদ, কলহ	ফসাদ	ফসাদ	ফসাদ	—	—	
ফেরেস্তা	স্বর্গীয় দূত	—	ফেরেস্তা	ফেরেস্তা	—	—	
ফারাগ	দূর, ব্যবধান	ফারাগ	—	—	—	—	
ফায়দা	উপকার, লাভ	ফায়দা	—	—	—	—	
ফুরসৎ	অবসর	ফুরসৎ	ফুরসত		—	—	
ফাতেনামা	বিজয়-কাহিনী	—	ফাতেনামা	—	—	—	
বদবক্ত	দুর্ভাগা	—	বদবক্ত	—	—	—	
বদলা	প্রতিশোধ	—	বদলা	—	—	—	
বয়ত	কবিতা	বয়াত	বয়াত	—	—	—	
বন্দেগী	উপাসনা	—	বন্দেগী	বন্দেগী	—	—	
বকসেস	ক্ষমা, দান	—	বখ্‌শেস	বখ্‌শেস	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					প্রসঙ্গ
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
বাব	অধ্যায়	—	বাব	—	—		আরবী 'বাব' শব্দের অর্থ দরজা।
বিচ	মধ্যে	—	—	বিচ	বিচ	—	
বাহানা	কোন কাজ না করার ভান করা	—	বাহানা	বাহানা	—	—	
বাগ, বাগিচা	বাগান	—	বাগ, বাগিচা	—	—	—	
বালাম	বড় অধ্যায়	—	বালাম	—	—	—	
বায়তুল মাল	সাধারণ ধনভাণ্ডার	বায়তুল মাল	—	—	—	—	
বন্দীয়ান	বন্দিসমূহ	—	—	বন্দীয়ান	বন্দীয়ান		'বন্দী'র বহুবচন।
বুরা	খারাপ, মন্দ	—	বুরা	বুরা	—	—	
বেওফা	কৃতঘ্ন	বেওফা	বেওফা	বেওফা	—	—	
বেলেহাজ	অমার্জিত	বেলেহাজ	বেলেহাজ	—	—	—	
বেগানা	অনাত্মীয়, বিচ্ছিন্ন	—	বেগানা	বেগানা	—	—	
বেকারার	অস্বস্তি	বেকারার	বেকারার	বেকারার	—	—	
বেপির	পীরহীন	—	বেপীর	বেপীর	—	—	
বেহুরমত	অসম্মান	বেহুরমত	বেহুরমত	—	—	—	
বেগর কওস্থুর	বিনা-অপরাধে	বেগয়ের কসুর	বেগয়ের কসুর	বেগয়ের কসুর	—	—	
বেতকছিম	অভিন্ন	—	বেতকসীম	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা।

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
বেবাহা	বহুমূল্য, অপরিসীম	—	বেব্যাহা	—	—	—	
বেশুমার	অগণিত	—	বেশুমার	—	—	—	
বেহান	প্রাতঃকাল	—	—	—	—	বিভান (প্রা° আ° কথ্যভাষা)	
বেইজ্জত	অসম্মান	বেইজ্জত	বেইজ্জত	বেইজ্জত	—	—	
বেদেল	প্রাণহীন	—	বেদেল	বেদেল	—	—	
বেখুবি	অসুন্দর	—	বেখুবি	—	—	—	
বাহাছ	তর্ক-বিতর্ক	বহস্	বহস্	—	—	—	
বাত	কথা	—	—	বাত	বাত	—	
বাত্চিত	কথাবার্তা	—	—	বাতচিৎ	বাতচিৎ	—	
বাতেন	গোপনীয়	বাতেন	বাতেন	—	—	—	
বাতেল	অগ্রাহ্য	বাতিল	বাতিল	—	—	—	
বদবুই	দুর্গন্ধ	—	বদবুই	—	—	—	
বরতন	থালা		—	বরতন	বরতন	—	
বরতর	উচ্চতর	—	বরতর	—	—	—	
বাখান	প্রশংসা		—	—	—	সংস্কৃত 'ব্যাখ্যান' হইতে জাত।	
বাওরা	উন্মাদ	—	—	—	বাউরা	(সংবাতুল)	
বাসারত	সুসংবাদ	বাসারৎ	বাসারৎ		—	—	
বালামুসিবত	বিপদাপদ	—	বালা-মুসীবত	বালা-মুসীবত	—	—	
বুজরগি	চালবাজী, সম্মান	—	বুজর্গী	—	—		

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
বাতুন	গোপনীয়	বাতীন	—	—	—	—	
বেতাব	অস্বস্তি	বে'তাব	বেতা'ব	—	—	—	
বিয়াবান	মরুভূমি, জঙ্গল	—	বিয়াবান	—	—	—	
বিলকুল	সমস্ত	বিলকুল	বিলকুল	—	—	—	
বোছা	চুম্বন	...	বুসা	বুসা	—	—	
বিরান	জনমানবশূন্য	—	বিরান	বিরান	—	—	
বোররাখ	এক প্রকার প্রাণী	বোরাখ	বোরাখ	বোরাখ	...	...	১
বোরখা	মুসলিম মহিলা-দের আবরণী	—	বোরক'া	বোরক'া	বোরক'া	—	
বোলন্দ	উচ্চ	—	বোলন্দ	বোলন্দ	—	...	
বোজর্গ	সম্মানী	—	বোজর্গ	বোজর্গ	—	—	
বোগজ	হিংসা	বোগ্‌য	বোগ্‌য	বোগ্‌য	—	—	
বেসক	নিঃসন্দেহে	—	বেসক	—	—	—	
বেহুদা	অকেজো	—	বেহুদা	বেহুদা	—	—	
বেহেতের	উত্তম	—	বেহেতর	বেহেতর	—	—	
বেগোর	ব্যতীত	বেগায়ের	বেগায়ের	বেগায়ের	—	—	
বেদেরেক	ভীতিশূন্য	—	বেদেরেক	—	—	—	
বেবাক	ভয়হীন	—	বেবাক	বেবাক	—	—	২

১ কথিত আছে যে, মনুষ্য চেহারা ও অশ্বের অঙ্গবিশিষ্ট এক বিচিত্র ধরণের প্রাণীর পিঠে চড়িয়া আঁ হযরত শবে মেরাজে ভ্রমণ করেন।

২ 'বেবাক' শব্দ দেশজ অর্থে 'সমস্ত' বুঝায়।

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানীপুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদু	হিন্দী	অন্যান্য	
বেসারা	শরিয়ৎ বিরোধী	—	বে-শরা	বে-শরা	—	—	
বেওজর	বিনা আপত্তি	বেওজর	বেওজর	—	—	—	
বেএক্তিয়ার	অনিচ্ছায়	—	বে-এক্তি-য়ার	—	—	—	
বেহুস	অজ্ঞান	—	বেহুঁস	বেহুঁস	—	—	
ভাঙ্গা	ভাজা	—	—	—	—	(সং √ভৃজ্)+আ	
ভি	ও (also)	—	—	ভি	ভি	—	
ভেজ	পাঠাও (আদেশার্থে)	—	—	ভেজ	ভেজ	—	
মকলুকাত	সৃষ্টি	মখ্লুকাত	মখ্লুকাত	মখ্লুকাত	—	—	
মক্কর	ধোঁকা	মকর	মকর	মকর	—	—	
মকরর	নিযুক্তি	মুকর্রর	মুকর্রর	—	—	—	
মহিব	ভীতিপ্রদ	মুহীব	মুহীব	—	—	—	
মছনদ	সিংহাসন	মসমদ	মসনদ	—	—	—	
মছান্নেফ	গ্রন্থকার	মসান্নেফ	মসান্নেফ	—	—	—	
মাকেরুল্লা	আল্লার ধোঁকা	মকরুল্লাহ্	—	—	—	—	
মাকেরিণ	ধোঁকাবাজগণ	মাকেরীন	—	—	—	—	
মকবারা	কবর	মকবারা	—	—	—	—	
মকবুল	গৃহীত	মকবুল	—	—	—	—	
মউত	মৃত্যু	মউত	—	—	—	—	
মওজা	স্থান	মওজা	—	—	—	—	
মকদুর	ভাগ্য	মকদুর	—	—	—	—	
মজলুম	অত্যাচারিত	মজলুম	—	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
মজলিশ	বসিবার স্থান, জল্সা	মজলিশ	—	—	—	—	
মসনবি	বিখ্যাত ফারসী কাব্য	—	মসনবী	—	—	—	
মর্দমী	পৌরুষ, বীরত্ব	—	মর্দমী	—	—	—	
মমিন	বিশ্বাসী	মুমিন	—	—	—	—	
মঞ্জিল	ঘর, স্থান	মঞ্জিল	—	—	—	—	
মদদগার	সাহায্যকারী	—	মদদ্গার	—	—	—	
মহতাজ	ঠেকা	মুহতাজ	—	—	—	—	
মহরুম	বিমুখ	মহরুম	—	—	—	—	
মরাকেবা	ধ্যান	মরাকেবা	—	—	—	—	
মাজেরা	অলৌকিক	মাজেরা	—	—	—	—	
মাজাল্লা	পত্রিকা, ম্যাগাজিন	মাজাল্লা	—	—	—	—	
মতওজ্জা	মনোনিবেশ	মতওজ্জা	—	—	—	—	
মহবুব	প্রিয়	মহবুব	—	—	—	—	
মশহুর	প্রসিদ্ধ	মশহুর	—	—	—	—	
মেহরাব	নামাজে ইমামের দাঁড়াইবার স্থান	মেহ্‌রাব	—	—	—	—	
মহিম	যুদ্ধ	—	মহিম	—	—	—	
মিছকিন্	দরিদ্র	মিসকীন	—	—	—	—	
মুনাফেক	কপট	মুনাফেক	—	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
মিছমার	চূর্ণবিচূর্ণ	—	মিসমার	—	—	—	
মছিবত	বিপদ	মুসীবৎ	—	—	—	—	
মোদাম	সর্বদা	—	মোদাম	—	—	—	
মস্তফিদ	উপকারী	মস্তফীদ	—	—	—	—	
মাতম	শোক	মাতম	মাতম	মাতম	—	—	
মাবুদ	উপাস্য	মা'বুদ	—	—	—	—	
মালুম	জ্ঞাত	মালূম	—	—	—	—	
মাহতাব	চন্দ্র	—	মাহ্তাব	—	—	—	
মাহিনা	মাস	—	মাহিনা	—	—	—	
মাহফুজ	রক্ষিত	—	মাহ্ফুজ	—	—	—	
মালাউন	অভিশপ্ত	মলউ'ন	—	—	—	—	
মজনুন	পাগল	মজনূন	—	—	—	—	
মজমুন	প্রবন্ধ	মজমূন্	—	—	—	—	
মিজান	মাপযন্ত্র	মীজান	—	—	—	—	
মামেলা	ব্যাপার, আচার ব্যবহার	মুয়ামেলা	—	—	—	—	
মাতেকাদ	বিশ্বাসী	মু'তেকাদ	—	—	—	—	
মাকানাত	স্থানসমূহ	মাকানাত	—	—	—		'মাকান' শব্দের বহু বচন।
মালায়েক	ফেরেস্তাগণ	মালায়েক	—	—	—		'মালাক' শব্দের বহু বচন
মাজুল	পদচ্যুত	মাজূ'ল	—	—	—	—	
মেহেনত	পরিশ্রম	মেহ্নৎ	মেহনত	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
মেহেরবানী	দয়া	—	মেহেরবাণী	—	—	—	
মেহেরার	লেখক	মহার্রির	—	—	—	—	
মোবারক	পবিত্র, ধন্য	মুবারক	—	—	—	—	
মোলাহেজা	নিরীক্ষণ	মুলাহেজা	—	—	—	—	
মোসরেকান	বিধর্মিগণ	—	মুসরীকান	—	—	'মোসরেক' শব্দের বহুবচন	
মোরছালিন	রসুলগণ	মোর-সালীন	—	—	—	—	
মোখলেস	বিনীত, বিশ্বস্ত	মুখ্লীস্	—	—	—	—	
মোলাকাত	সাক্ষাৎ	মুলাকাৎ	মুলাকাত	—	—	—	
মৌকুফ	স্থগিত	মৌকুফ	—	—	—	—	
মোক্তাসার	সংক্ষেপ	মুখ্তাসার	—	—	—	—	
মুদ্দত	সময়	মুদ্দত	—	—	—	—	
মুস্কিল	কঠিন	মুস্কিল	—	—	—	—	
মুঝে	আমাকে	—	—	মুঝে	মুঝে	—	
মৌজুদ	জমান	মৌজুদ	মৌজুদ	—	—	—	
মুল্লুক	রাজ্য	মুল্ক	মুল্ক	—	—	—	
মুহরর্ম	আরবী বছরের প্রথম মাস	মুহর্রম	মুহর্রম	—	—	—	
মোক্তাদি	নামাজে ইমামের পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান ব্যক্তি	মোক্তাদি	—	—	—	—	
মোনাদি	আহ্বানকারী	মোনাদি	—	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উর্দূ	হিন্দী	অন্যান্য	
মনকের নকির	কবরে মৃত ব্যক্তির নিকট আগমনকারী ফেরেস্তাদ্বয়	মনকের নকির	মনকের নকির	—	—	—	
মসগুল	ব্যস্ত	মস্গূল	—	—	—	—	
রফিক	বন্ধু	রফীক	—	—	—	—	
রব	প্রভু, প্রতিপালক	রব	—	—	—	—	
রহম	দয়া	রহম	—	—	—	—	
রাবি	বর্ণনাকারী	রাবি	—	—	—	—	
রাহা	পথ	—	রাহা	—	—	—	
রওনক	উজ্জ্বল	—	রওনক	—	—	—	
রইছ	নেতা, প্রধান	রইস	—	—	—	—	
রওশন	উজ্জ্বল	—	রওশন	রওশন	—	—	
রাফেজি	মুসলমানগণের এক সম্প্রদায়	রাফিজা	—	—	—		ইহারা হযরত আলীর বিরোধী ছিল।
রেছানি	পৌছান	—	রেছানি	—	—	—	
রেজা	খুশী	রেজা	—	—	—	—	
রেয়াত	রেহাই	—	রিয়ায়েত	—	—	—	
রেস্তা	সম্পর্ক	—	রেস্তা	রেস্তা	—	—	
রেসওয়াহ	অসম্মান	—	রেসওয়াহ	—	—	—	
রোখছত	বিদায়	রুখসৎ	রুখসত	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					গ্রন্থ
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
রুকু	নামাজের অঙ্গবিশেষ	রুকু'	রুকু'	—	—	হাঁটুতে হাত রাখিয়া মস্তক অবনত করা	
রোতাবা	মর্যাদা	রোত্‌বা	—	—	—	—	
রুহ	আত্মা	রুহ্‌	—	—	—	—	
রাজ্জাকুল এবাদ	বান্দাগণের অন্নদাতা	রাজ্জাকুল এবাদ	—	—	—	—	
লব	ঠোঁট	লব	লব	—	—	—	
লবেজান	ওষ্ঠাগত প্রাণ	—	লবেজান	—	—	—	
লস্কর	সৈন্য, সিপাহী	—	লস্কর	লস্কর	লস্কর	—	
লজ্জত	স্বাদ	লজ্জত	—	—	—	—	
লহু	রক্ত	—	—	লহু	লহু	—	
লহ্জা	মুহূর্ত	লহ্জা:	—	—	—	—	
লেকিন	কিন্তু	লেকিন	লেকিন	লেকিন	—	—	
লাজেম	জরুরী	লাজেম	—	—	—	—	
লা-জওয়াব	জবাবহীন অদ্বিতীয়	—	লাজওয়াব	লাজওয়াব	—	—	
ল-মাকান	স্থানবিহীন	—	লমাকান	—	—	—	
লানত	অভিশাপ	লানত	—	—	—	—	
লেয়াকাত	দক্ষতা	লিয়াকৎ	—	—	—	—	
লেবাস	পোষাক	লেবাস	—	—	—	—	
লায়েক	উপযুক্ত	লায়েক	—	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মসী'য়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানীপুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদু	হিন্দী	অন্যান্য	
লানতান	অভিশাপ, গালিগালাজ	লা'য়ান তা'য়ান	—	—	—	—	
লাড়কা	ছেলে	—	—	লাড়কা	লাড়কা	—	
শরমেন্দা	লজ্জিত	—	শরমেন্দা	—	—	—	
শহীদ	পবিত্র মৃত্যু	শহীদ	—	—	—	—	
শাফা	আরোগ্য	শাফা	—	—	—	—	
শাফিয়েল মজনেবিন	পাপীদের ক্ষমাকারী	শাফিয়েল মজনেবিন্	—	—	—		আল্লাহ্‌র গুণ-বাচক একটি নাম
শোহরত	খ্যাতি	শোহরত	শোহরত	শোহরত	—	—	
শোকরানা	ধন্যবাদ জ্ঞাপক	—	শোকরানা	শোকরানা	—	—	
সলুক	পদ্ধতি, ধারা	সলুক	—	—	—	—	
সওয়ার	আরোহণ	—	সওয়ার	সওয়ার	—	—	
সবুর	ধৈর্য	সবুর	—	—	—	—	
সাদেক	সত্য	সিদ্‌ক	—	—	—	—	
সান সওকত	জাকজমক	—	সান সওকত	—	—	—	
সাম	সন্ধ্যা	—	সাম	সাম	—	—	
সওগাত	যৌতুক	—	সওগাত	সওগাত	—	—	
সয়লাব	জলপ্রবাহ	—	সয়লাব	—	—	—	
সারাবী	মদ্যপায়ী	—	সারাবী	—	—	—	
সারাবনতহুরা	পবিত্র পানীয়	—	সারাবন তহুরা	—	—	—	
সরঞ্জাম	ব্যবস্থা, প্রস্তুতি	—	সরঞ্জাম	—	—	—	
সরাফতি	ভদ্রতা	—	সরাফতি	সরাফতি	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উর্দু	হিন্দী	অন্যান্য	
সালেহীন	সংকার্যকারী ব্যক্তিগণ	সালেহীন	—	—	—	—	
সেতম	গালিগালাজ	—	সেতম	—	—	—	
সেকেস্ত	পরাজয়	—	সেকেস্ত	সেকেস্ত	—	—	
সেপাই	সৈন্য	—	সিপাহী	সিপাহী	সিপাহী		
সেলসেলা	যোগাযোগ	—	সেলসেলা	সেলসেলা	সেলসেলা	—	
সেরেফ	শুধু, কেবল	—	স্রেফ্	স্রেফ্	—	—	
সোহাদা	শহীদগণ	শোহাদা	—	—	—	—	
সিরি জবান	মিষ্টিকথা	—	শিরীঁ জবান	—	—	—	
হাল	অবস্থা	হাল	—	—	—	—	
হামেশা	সর্বদা	—	হামেশা	হামেশা	—	—	
হলকুম	গ্রীবাদেশ	—	হলকুম	—	—	—	
হদ্	সীমা	হদ্	হদ্		...		
হরগেজ	নিশ্চয়	...	হরগেজ	হরগেজ	হরগেজ	—	
হরদম	সর্বদা	—	হরদম	—	—	—	
হায়াত	আয়ু	হায়াত	—	—	—		
হাসব নসব	বংশাবলী	হাসব-নসব		—	—	—	
হায়ওয়ান	জানোয়ার, পশু	হায়ওয়ান	—	—	—	—	
হাসমত	জাকজমক	—	হাসমত	—	—	—	
হাসিন	সুন্দরী	হাসীন্	—	—	—	—	
হামছায়া	সমকক্ষ, সমসাময়িক, সমমর্যাদা	—	হামছায়া	—	—	—	

বিদেশী শব্দ-তালিকা

মর্সীয়া সাহিত্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ। (দোভাষী বা মুসলমানী পুঁথির)	শব্দের অর্থ	কোন্ ভাষার শব্দ					মন্তব্য
		আরবী	ফারসী	উরদূ	হিন্দী	অন্যান্য	
হাকিমুল হাকিম	শাসকের শাসক, রাজার রাজা	হাকিমল হাকিম	—	—	—	—	
হওালা	সোপর্দ করা, হস্তান্তর করা	হাওয়ালা	হাওয়ালা	—	—	—	
হাতিয়ার	অস্ত্র	—	হাতিয়ার	হাতিয়ার	—	—	
হেদায়েত	পথ-প্রদর্শন	হেদায়েত	হেদায়েত	—	—	—	
হেকায়েত	গল্প, কাহিনী	হেকায়েত	—	—	—	—	
হামেহাল	সর্ব অবস্থায়	—	হামাহাল	—	—	—	
হুসমন্দ	বিবেক সম্পন্ন	—	হুসমন্দ	—	—	—	
হুজ্‌রা	কামরা	হুজ্‌রা	—	—	—	—	
হিম্মৎ	সাহস	হিম্মৎ	হিম্মৎ	—	—	—	
হুজ্‌জুম	ভীড়করা	হুজুম	—	—	—	—	
হুর	অপ্সরা	হুর	হুর	—	—	—	
হজিমত	পরাজয়	—	হজিমত	—	—	—	
হাদিয়া	যৌতুক	হাদিয়া	হাদিয়া	—	—	—	
হিলাসাজী	কৌশলকরা	—	হিলাসাজী	হিলাসাজী	—	—	
হৈবত	ভয়, ডর	হয়বৎ	হয়বত	—	—	—	
হাক্কানী	প্রকৃত, সত্য	—	হাক্কানী	—	—	—	

পরিশিষ্ট—গ

হযরত রসূলুল্লাহ্‌র পরে বারজন ইমামের জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির তালিকা।

নাম	জন্মের তারিখ	জন্মের স্থান	মৃত্যুর সময়	সমাধিস্থল	বয়স	মাতার নাম
হযরত মুহম্মদ (দঃ) ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুল মুতালিব ইবন হাশিম ইবন আবদুল মনাফ।	৫৭০ খ্রীঃ, ২৯শে আগষ্ট	মক্কা	১২ই রবিউল আউয়াল ১১ হিঃ	মদীনা, হযরত আইশার গৃহে	৬৩ বৎসর	আমীনা বিন্‌তে ওহাব
আবূ বকর ইবন আবূ কুহাফা উসমান ইবন আবীর।	আ'মূল ফিলের ২ বৎসর পরে	ঐ	২৩শে জমাদিউল আখের, ১৩ হিঃ	মদীনা, হযরত রসূলের মাযারের সন্নিকটে	৬৩ ,,	উম্মুল খয়ের বিন্‌তে সাখার বিন্‌তে আমীর
উমর বিন আল্ খাত্তাব।	১লা মুহর্‌রম ; ১৩ আ'মুল ফিল	ঐ	১লা মুহর্‌রম, ২৩ হিঃ	মদীনা, হযরত রসূলের মাযারের নিকটে	৬৩ ,,	হাত্‌মা বিন্‌তে হাশিম ইবন আবদুল্লাহ্
উসমান বিন্ আফ্‌ফান	৬ আ'মুল ফিল	ঐ	১৬ই ও ১৮ই যিলহজ্জের মধ্যে ; ৩৯ হিঃ	জান্নাতুল বাকী	৮২ ,,	আরওয়াই বিন্‌তে কোরাইশ ইবন রাবিয়া ইবন হাবীব ইবন আবদুস সমস।

হযরত রসূলুল্লাহ্‌র পরে বারজন ইমামের জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির তালিকা

	নাম	জন্মের তারিখ	জন্মের স্থান	মৃত্যুর সময়	সমাধিস্থল	বয়স	মাতার নাম
১।	আলী ইবন আবু তালিব ইবন আবদুল মনাফ	৩০ আ'মূল ফিল	মক্কা	১৭ই রমজান, ৪০ হিঃ	কুফা, শীয়াদের মতে, খারিজীদের ভয়ে তাঁহার মাযার গোপন রাখা হইয়াছে।	৬৩ বৎসর	ফাতিমা বিনতে আছাদ ইবন হাশিম ইবন মুনাফ।
	ফাতিমা	৩৫ আ'মূল ফিল	ঐ	১১ হিঃ	মদীনা, জান্নাতুল বার্কা।	২৮ ,,	খাদিজা, রসূলুল্লাহর ১মা পত্নী।
২।	হাসান ইবন আলী	১৫ই রমজান, ৩ হিঃ	মদীনা	১লা বা ৫ই রবিউল আউয়াল ৪৯ বা ৫০ হিঃ	ঐ	৪৭ ,,	ফাতিমা বিনতে মুহম্মদে রসূলুল্লাহ।
৩।	হুসৈন ইবন আলী	৫ই সাবান, ৪ হিঃ	মদীনা	১০ই মুহর্‌রম, ৬১ হিঃ।	কারবালা	৫৬ বৎসর ৫ মাস ৫ দিন	ফাতিমা বিনতে হযরত রসূলুল্লাহ্।
৪।	আলী, জয়নুল আবেদীন ইবন হুসৈন	৯ই সাবান, ৩৮ হিঃ	ঐ	১৮ই মুহর্‌রম ৯৪ হিঃ	জান্নাতুল বাকী, হাসানের সমাধির পার্শ্বে	৫৭ বা ৫৮	সাহেরবানু বা সুলাফা বিনতে ইয়াজগোর্দ

হযরত রসূলুল্লাহ্-র পরে বারজন ইমামের জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির তালিকা

নাম	জন্মের তারিখ	জন্মের স্থান	মৃত্যুর সময়	সমাধি স্থল	বয়স	মাতার নাম
৫। মুহম্মদ আল্ বাকের (আবু জাফর ইবন আলী ইবন হুসৈন	৩রা সফর, ৫৭ হিঃ	মদীনা	১১৩ হিঃ, মতান্তরে ১১৭ বা ১১৮ হিঃ	মদীনা, জান্নাতুল বাকী।	৫৮ বা ৬৩ বৎসর।	উম্মে আবদুল্লাহ বিন্‌তে হাসান।
৬। জাফর আস্ সাদিক	১১ রবিউল আউয়াল, ৮০ বা ৮৩ হিঃ	ঐ	১৫ রজব, ১৮৮ হিঃ	মদীনা, হাসানের সমাধির নিকট	৬৮ ”	উম্মে ফারওয়া বিনতে কাসেম।
৭। মুসা কাজিম	১২৮ হিঃ	মদীনা, মতান্তরে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী কোন গ্রামে।	১৫ রজব, ১৮৩ হিঃ	বাগদাদ	৫৪ বা ৫৫ ”	হামিদার কন্যা
৮। আলী-অর্-রেজা ইবন মুসা কাজিম	১১ই রবিউল আউয়াল, ১৫৩ হিঃ	মদীনা	২১শে রমজান, ২০২ হিঃ মতান্তরে ২০৩ বা ২০৮ হিঃ।	তুস (খোরাসান)	৪৯ ”	নাকনামের কন্যা
৯। আবু জাফর মুহম্মদ ইবন আলী ইবন মুসা।	১০ই রজব, ১৯৫ হিঃ	ঐ	২২০ হিঃ	বাগদাদ, মুসার কবরেরপশ্চাদ্দিকে	২৫ ”	খাইজানের কন্যা

হযরত রসূলুল্লাহ্‌র পরে বারজন ইমামের জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির তালিকা।*

নাম	জন্মের তারিখ	জন্মের স্থান	মৃত্যুর সময়	সমাধিস্থল	বয়স	মাতার নাম
১০। আবুল হাসান আলী ইবন মুহম্মদ ইবন আলী ইবন মূসা কাজিম।	১৩ই রজব ২১৫ হিঃ	মদীনা	জামাদ-উল-আখের, ২৫৪ হিঃ	সামারা	৪০ হিঃ	সামানার কন্যা
১১। আবু মুহম্মদ হাসান আসকারী ইবন আলী ইবন মুহম্মদ ইবন আলী রেজা।	২৩২ হিঃ	ঐ	রবিউল আওয়াল ২৬০ হিঃ	সামারা	২৮ বৎসর	সোসুর কন্যা
১২। মুহম্মদ আল্ মন্তাজের (মাহদী)	১৫ই সাবান, ২৫৫ হিঃ	ঐ	২৬৫ হিজরীতে ইনি অন্তর্হিত হইয়া যান।	শীয়াদের বিশ্বাস অনুসারে ইনি সামারা নামক স্থানে অদৃশ্য হইয়া যান।	—	নারজিসের কন্যা

* বার ইমামের জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সন তারিখ ও অন্যান্য বিষয়ের দুই এক স্থানে মতভেদ থাকিতে পারে। এই তালিকা প্রণয়নে নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। যথা :

১। P. K. Hitti : History of the Arabs, London 1951, p442.
২। James Hastings : Encyclopaedia of Religion & Ethics, vol XI & XII (1920-21), p453.
৩। Syed Ameer Ali : The spirit of Islam, London, 1949. pp. 345-346.
৪। Journal of the Royal Asiatic Society, London. Vol XIII, 1852, article XIV.

পরিশিষ্ট—ঘ

গলাত সম্প্রাদায়ভুক্ত শীয়াগণের বিভিন্ন উপদল এবং তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস। *

১।	মফাজ্জলিয়া	:	দলপতি মফাজ্জল সায়রফি
২।	সরিগিয়া	:	,, সরিগ
৩।	বজিগিয়া	:	,, বজিগ ইবন ইউনুস। ইহারা হযরত সাদিককে খুদার আসনে বসায় বা খুদার রূপান্তর গ্রহণে বিশ্বাস স্থাপন করে।
৪।	জাম্মিয়া	:	ইহাদের বিশ্বাস হযরত আলী মা'বুদ এবং হযরত রসূল পয়গম্বর।
৫।	কামেলিয়া	:	দলপতি কামেল ;- ইহারা মানবের দেহের বা আত্মার রূপান্তরে বিশ্বাসী।
৬।	মগিরিয়া	:	দলপতি মগিরিয়া ইবন সঈদ আজলী
৭।	জিন্নাহিয়া	:	ইহারা দেহ ও আত্মার রূপান্তর গ্রহণে বিশ্বাসী। ইহারা কেয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং পাপ কর্মকে হালাল মনে করে।

---

* (i) আবদুল আজিজ মহাদ্দিস দেহ্‌লবী রচিত 'তোওফায়ে এসনা আসারিয়া' গ্রন্থের উরদু অনুবাদ 'আয়নায়ে মজহাবে ইমামিয়া' গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। প্রকাশিত : কাশ্মীরি বাজার, লাহোর, ১৯২৯ খ্রীঃ। রফিকে আম প্রেস, লাহোর, পৃঃ ১৯ ;

(ii) সৈয়্যিদ আমীর আলী : দি স্পিরিট অব্ ইসলাম। ৫ম সংস্করণ ১৯৪৯, পৃঃ ৩৪৩-৩৪৪ ;

৮। বয়ানিয়া : দলপতি বয়ান ইবন সামায়ান। সামায়ানের অনুচরবর্গ বয়ানিয়া নামে অভিহিত। তাহারাও খুদার রূপান্তর গ্রহণে বিশ্বাস করে।

৯। মনসুরিয়া : দলপতি আবু মনসুর আজ্‌লী। তাহাদের বিশ্বাস পয়গম্বরের শেষ নাই। বেহেস্ত দোজখ কিছু নয়। ইমাম বাকেরের পর আবু মনসুর ইমাম হন; এইজন্য এই উপদলের নাম মনসুরিয়া।

১০। গামামিয়া : ইহাদের বিশ্বাস, মেঘকে আশ্রয় করিয়া আল্লাহ্‌ দুনিয়ায় আসেন এবং পরে আসমানে চলিয়া যান। এইজন্য পৃথিবীর যাবতীয় ফল পাকে ও ফুল ফোটে।

১১। আমুবিয়া : ইহাদের বিশ্বাস, হযরত আলী নবুয়তের কার্যে হযরত রসুলের অংশীদার ছিলেন।

১২ তাফুবিজিয়া : তাহাদের বিশ্বাস, পৃথিবী সৃষ্টি করিবার পর আল্লাহ্‌ পৃথিবীর যাবতীয় কার্য পয়গম্বরের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। তারপর, হযরত আলীর হস্তে পৃথিবীর যাবতীয় কার্যভার ন্যস্ত হইয়াছে।

১৩। খেতাবিয়া : দলপতি আবুল খাত্তাব ইবন রবিবুল আসাদি। তাহাদের মতে, ইমামগণ আল্লাহ্‌র সন্তান এবং মর্ত্তুজা আলী খুদা।

১৪। মোয়াম্বরিয়া : দলপতি মোয়াম্বর। তাহাদের বিশ্বাস, ইমাম জাফর পয়গম্বর এবং মোয়াম্বর শেষ নবী।

১৫। গোরাবিয়া : তাহাদের বিশ্বাস, আল্লাহ্‌তালা হযরত জিবরাইলকে হযরত আলীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু জিবরাইল ভুলক্রমে আল্লাহ্‌র বার্তা হযরত রসুলের নিকট পাঠাইয়াছেন; কারণ আলীর মুখমণ্ডল রসুলুল্লাহ্‌র ন্যায় ছিল ভুলের জন্য হযরত জিবরাইলকে তাহারা অভিসম্পাৎ করে।

১৬। জাহাবিয়া : ইহাদের বিশ্বাস, হযরত আলী মাবুদ এবং হযরত মুহম্মদ (দঃ) পয়গম্বর।

১৭। আছানিয়া : ইহাদের বিশ্বাস, হযরত মুহম্মদ (দ:) এবং হযরত আলী দুইজনেই মাবূদ।

১৮। খামসিয়া : ইহারা হযরত রসূল, হযরত আলী, ইমাম হাসান, ইমাম হুসৈন এবং বীবী ফাতিমাকে খুদা মনে করে।

১৯। নাসিরিয়া : ইহাদের বিশ্বাস, হযরত আলী এবং তাঁহার বংশধরগণ মাবূদের পরিবারভুক্ত।

২০। ইসহাকিয়া : দলপতি ইসহাক ইবন উ'মর। ইহাদের বিশ্বাস, পয়গম্বর ব্যতীত পৃথিবী খালি থাকে না। আলী ও অন্যান্য ইমামের রূপ ধারণ করিয়া আল্লাহ্ মর্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন।

২১। গালবাইয়া : দলপতি গল্বা ইবন আরুহ। ইহাদের বিশ্বাস, হযরত আলীই খুদা।

২২। জারামিয়া : ইহাদের বিশ্বাস, হযরত আলী হইতে মুহম্মদ হানাফিয়া এবং আলী ইবন আব্বাস পর্যন্ত সকলেই ইমাম। ইসলামে যেগুলি ফরজ, ইহারা সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং হালাল জিনিসকে হারাম বলিয়া মনে করে।

২৩। মকানাইয়া : ইহাদের বিশ্বাস, ইমাম হুসৈনের পরে মকান্নাফ খুদা।

—

পরিশিষ্ট—ঙ

ইসলাম-ধর্মীয় কতিপয় পারিভাষিক শব্দ।

ওহ্‌হাবী : খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুহম্মদ বিন্ আবদুল ওহ্‌হাব নামক জনৈক ধর্ম-সংস্কারক আরব দেশের 'নজদ' প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অনুসারী ব্যক্তিদের 'ওহ্‌হাবী' বলা হয়।

আগা খান : ইস্‌মাঈলিয়া শীয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুর উপাধি। পাক-ভারতের এই শীয়াগণ 'খোজা' নামে সুপরিচিত।

আজাদ : 'স্বাধীন', 'মুক্ত'। (সংসার-বিমুক্ত দরবিশ ও ফকীরকে সাধারণতঃ বুঝায়।)

আব্বাসীয় বংশ : হযরত রসূলের চাচা আল্ আব্বাসের উত্তরাধিকারিগণ যে-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, ইতিহাসে তাহাই 'আব্বাসীয় বংশ' বলিয়া খ্যাত। এই রাজবংশের প্রথম নরপতি দামেস্ক হইতে উমাইয়া রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বাগ্‌দাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আব্বাসীয় রাজবংশ ৭৪৯ হইতে ১২৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মোঙ্গলদের আক্রমণে এই রাজবংশের পতন ঘটে।

আনসার : 'সাহায্যকারী'। হযরত রসূল (দঃ) যখন মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন, তখন মদীনাবাসী যে-মুসলমানগণ তাঁহাকে সাহায্য ও সহায়তা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'আনসার' বলা হয়।

আহল-ই-বয়ত : হযরত রসূলুল্লাহ্, হযরত আলী, বীবী ফাতিমা, ইমাম হাসান ও হুসৈন এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনকে 'আহল-ই-বয়ত' বলা হইয়া থাকে।

ইজ্‌মা : ইসলামের শরা-শরিয়ৎ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিতবর্গের মতামত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ। ইহা ইসলাম ধর্মের চারিটি প্রধান ভিত্তির অন্যতম।

ইস্‌লাম : আল্লাহ্‌তালার প্রতি আত্মসমর্পণ বা আত্মবিলোপ। ইস্‌লামের স্তম্ভ প্রধানতঃ পাঁচটি। যথা ক। কালেমা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করা এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহম্মদের (দঃ) প্রতি আস্থা স্থাপন করা (লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্‌)। খ। নামাজ। গ। রোজা। ঘ। হজ্জ। ঙ। জাকাত।

ইসমাঈলিয়া : 'সাবাইয়া' (Seveners) নামে পরিচিত এক শীয়া সম্প্রদায়। ইহাদের মতবাদ—ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস্‌ সাদিকের পুত্র ইসমাঈল সর্বশেষ ইমাম। এই সম্প্রদায় অনেকগুলি প্রশাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রধান দুইটি সম্প্রদায়কে (বোহারা এবং খোজা) পাক-ভারতের অনেক স্থানে দেখা যায়।

ইস্‌নে আসারিয়া : শীয়া সম্প্রদায়ের প্রধান শাখা। এই শাখাভুক্ত শীয়াগণ দ্বাদশ ইমামকে (হযরত আলী হইতে দ্বাদশ ইমাম মুহম্মদ ওরফে মাহ্‌দী পর্যন্ত) অনুমোদন করে। তাহাদের বিশ্বাস, ইমাম মাহ্‌দী গুপ্তভাবে এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন; তিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে পৃথিবী ধ্বংসের সময় ইমাম মাহ্‌দীরূপে আবির্ভূত হইবেন।

ইমাম : মূল অর্থ যিনি সম্মুখবর্তী থাকেন এবং যাঁহার নির্দেশ অপরাপর ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুসৃত হয়। অন্য অর্থঃ ক। মসজিদে নামাজ পড়াইবার নেতা। খ। মুসলিম জগতের খলীফা। গ। ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক নীতিনির্দেশের ব্যাপারে কোন এক

সম্প্রদায়ের (school) মতবাদ প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত বা আলেম। যেমন: ইমাম আবু হানিফা বা ইমাম গাজ্জালী। ঘ। শীয়াগণও তাহাদের ধর্মনেতাগণকে 'ইমাম' আখ্যায় ভূষিত করিয়া থাকে।

উলামা : 'আলেম' শব্দের বহুবচন। অর্থ 'ধর্মবিদ্'।

ওফাত : পরলোক গমন।

কারবালা : শহর হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট স্থান। এই স্থানে শীয়াগণের মুহর্‌রম অনুষ্ঠানের শেষে মিছিল বা তাজিয়া থানায় ব্যবহৃত কাগজ, কাপড়ের উপকরণ ও সরঞ্জামগুলি খুলিয়া পানিতে ঠাণ্ডা করা হয়।

কাযী : : বিচারক। মুসলিম আইনানুসারে তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার করেন।

কিয়াস : সিদ্ধান্ত। কুরআ'ন এবং সুন্না হইতে সাদৃশ-ভিত্তিক যুক্তি বলে বিধিনির্দেশ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

কারমাত : প্রচলিত সুন্নী ধর্ম-বিরোধী এক মুসলিম সম্প্রদায়। ইহাদের ধর্মমত কতকটা ইসমাঈলিয়া শীয়ার ধর্ম-বিশ্বাসের অনুরূপ। এই সম্প্রদায়ের বহু লোক মিশর ও ইরাক হইতে বিতাড়িত হইয়া নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতের সিন্ধু নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে।

কুরআ'ন : মূল অর্থ 'পাঠ করা'। মুসলমানগণের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ।

খোজা : ভারতে ইসমাঈলিয়া শীয়াভুক্ত একটি সম্প্রদায়। প্রধান শাখার ধর্ম-গুরুর নাম মহামান্য আগা খান। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণকে প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তান, পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাথিওয়ার, বোম্বাই পুনা প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

খলীফা : 'প্রতিনিধি'। মহানবী হযরত মুহম্মদের (দঃ) ওফাতের পর মুসলিম জগতের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতা।

খুৎবা : 'অভিভাষণ' বা 'বক্তৃতা'। ক। মসজিদে শুক্রবারে জুমা নামাজের সময় ইমাম কর্তৃক যে-অভিভাষণ পাঠ করা হয়। খ। মুহর্‌রম-অনুষ্ঠানে শীয়া ইমাম কর্তৃক ইমাম হুসৈনের শাহাদৎ-বৃত্তান্ত সম্পর্কিত অভিভাষণ।

গাজী : ধর্মযুদ্ধ বিজয়ী ব্যক্তি।

জেহাদ : ইসলাম ধর্ম বা রাজ্য রক্ষার্থে ইসলাম বিরোধী জাতির সহিত মুসলমান সম্রাট্ বা জনসাধারণের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। জেহাদের অপর নাম 'ধর্মযুদ্ধ'।

তাকিয়া : মূল অর্থ, 'সাবধান হওয়া' বা 'ভীত হওয়া'। ইহা শীয়া ধর্মের এক বিশিষ্ট মতবাদ। সুন্নী মুসলমান-গণের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য শীয়াগণ তাঁহাদের ধর্মীয়-বিশ্বাস গোপন রাখিয়া বাহ্যতঃ অন্য প্রকার আচরণ করে।

তকবীর : নামাজ আরম্ভের সময় 'আল্লাহ্ আকবর' (আল্লাহ্ মহান ও দয়ালু) ধ্বনি উচ্চারণ।

তাখাল্লুস : ছদ্ম নাম।

তাসাউফ : ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় অতীন্দ্রিয়বাদ বা সুফীবাদ। অর্থাৎ ধ্যান ও আত্মসমর্পণ দ্বারা আল্লাহ্‌র সহিত জীবের প্রত্যক্ষ যোগ বা লয় হইতে পারে এই মতে বিশ্বাস।

দরগাহ্ : কোন দরবেশ বা সাধু-পুরুষের সমাধি ও তৎসংলগ্ন স্মৃতিমন্দির।

দরবেশ : ধর্মবল ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান মুসলমান ফকীর। মূল অর্থ ভিক্ষাজীবী।

দাকিনী : দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন উরদূ ভাষা। ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজ-বংশের বিদ্রোহ হয়। সম্ভবতঃ স্বাধীনতার নিদর্শন স্বরূপ বাহমনী রাজগণ উরদূকে রাজভাষা-রূপে গ্রহণ

করেন। দাক্ষিণাত্যের এই উরদূ ভাষার নাম 'দাকিনী'। তৎকালে এই ভাষায় কাব্যাদি রচিত হইত।

নবী : পয়গম্বর।

পীরী-মুরীদী : গুরু-শিষ্য প্রথা। জনসাধারণকে শিষ্যত্বে দীক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে পীর ও মুর্শিদ কর্তৃক অবলম্বিত অভ্যাস।

ফাতেহা : আল্ কুরআ'নের প্রথম সুরার নাম।

ফাতেমী বংশ : হযরত রসুলের কন্যা বীবী ফাতিমার উত্তরাধিকারিগণের দ্বারা এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ইঁহারা ৯০৮ খ্রীঃ হইতে ১১৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় রাজত্ব করেন।

ফিক্হ : মুসলমানগণের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ও ব্যবহার-তত্ত্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

বাতিনী : 'গূঢ়', গুপ্ত।

বোহারা : ইসমাঈলিয়া শীয়ার অন্তর্গত একটি উপসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়কে প্রধানতঃ ভারতের বোম্বাই এবং বরোদা রাজ্যে দেখা যায়।

মাহ্দী : মূল অর্থ 'ধর্মপথ প্রদর্শক'। মুসলমানগণের মধ্যে এমন বিশ্বাস প্রচলিত যে, পৃথিবী ধ্বংসের প্রাক্কালে এক শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হইবে। তিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। এই শক্তিমান পুরুষই ইমাম মাহ্দী।

মুঘল : 'মোঙ্গল' শব্দের আরবী রূপ 'মুঘল'। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে সম্রাট্ বাবুর যে-রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন, সেই বংশের নরপতিগণ তুর্কী বংশসম্ভূত ছিলেন। এই তুর্কীরাই ভারতে 'মুঘল' নামে পরিচিত হন। এতদ্ব্যতীত, মুসলিম ভারতের চারিটি প্রধান সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের অন্যতমরূপেও 'মুঘল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

মুহাজের : মূল অর্থ ধর্ম রক্ষার্থে দেশত্যাগী ব্যক্তি। যে সাহাবাগণ মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়া তথায় বসতি স্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে 'মুহাজের' আখ্যা দান করা হয়। বহু বচন--মুহাজিরুন।

মুরীদ : পীর বা মুর্শিদের শিষ্য।

মুহর্রম : মূল অর্থ 'নিষিদ্ধ'। বর্তমানে ইহার অর্থ 'পবিত্র।' এতদ্ব্যতীত, ইহা ক। হিজরী সালের প্রথম মাস। খ। শীয়া মুসলমানগণের একটি উৎসবের নামও বটে। বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের (দঃ) প্রাণাধিক দৌহিত্র এবং হযরত আলী ও বীবী ফাতিমার দ্বিতীয় পুত্র ইমাম হুসৈনের স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানতঃ শীয়া মুসলমান কর্তৃক (অনেক সুন্নী মুসলমানও ইহাতে যোগদান করে) মুহর্রম মাসের প্রথম ১০ দিন যাবৎ যে-উৎসব অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

মাদ্রাসা : 'বিদ্যাশিক্ষাদানের উপযোগী স্থান'। যে-বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ইসলাম ধর্মশাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়।

মিম্বর : মসজিদ ও দরগায় তিন বা ততোধিক ধাপবিশিষ্ট বেদী। এখানে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া ইমাম খুৎবা পাঠ করেন। ইহা ইট-পাথরের গাঁথুনি দ্বারা স্থায়ি-ভাবে বা কাষ্ঠ দ্বারা অস্থায়িভাবে তৈরী করা হয়।

রওশনিয়া : পাঞ্জাবের 'জলন্ধর' নামক স্থানের পীর রওশন যোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া প্রচলিত সুন্নী ধর্ম-বিরোধী মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মতবাদভুক্ত ব্যক্তিগণ 'রওশনিয়া' নামে অভিহিত। বর্তমানে ইহাদের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে।

রসূল : দূত বা বার্তাবাহক। আল্লাহ্‌র বাণী যিনি মানবের নিকট পৌঁছাইয়া দেন।

শহীদ : ইসলাম ধর্ম-রক্ষার জন্য যে-মুসলমান আত্মবলী দান করেন।

সদর-ই-সুদুর : দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌গণের শাসনকালে জনৈক রাজকর্মচারীর উপাধি। এই উপাধিধারী ব্যক্তি রাজ্যের ধর্মসংক্রান্ত সম্পত্তি (যেমন পীরোত্তর)। ও গচ্ছিত অর্থের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে কাজ করিতেন।

সায়ের : কবি।

হদীস : বচন, কথা বা বাণী ইত্যাদি। বহু বচন 'আহাদীস'। ইসলামী পরিভাষায় হযরত রসুলের কথা, কার্য এবং অনুমোদনকে 'হদীস' বলা হয়।

হাজী : যিনি মক্কায় হজ্জ-ব্রত সম্পন্ন করেন।

হযরত : মূল অর্থ 'উপস্থিতি'। সম্মান প্রদর্শনের উপযোগী একটি উপাধি। ইহা যখন কোন ধর্মনেতা বা পীর পয়গম্বরের নামের সহিত যুক্ত হয়, তখন ইহা 'সম্মান' বা 'মর্যাদা' অর্থ প্রকাশ করে।

হিযরত : ধর্ম রক্ষার্থে দেশত্যাগকে 'হিযরত' বলে

--

পরিশিষ্ট – ট

'সংগ্রাম-হুসন' পুঁথির পৃষ্ঠা তিনটির পাঠ।

(৩৪ পৃষ্ঠার পাঠ)

তুমিও চলিআ অস। না কর অন্যএথা
পাপিষ্ঠ এজিদ পামর দুরাচার।
তার সনে প্ররিশ্রম কি কার্য তুমার॥
এই মতে হুছন জে দেখিলা সপন।
পয়াম্বরে কহিলা এ সব বিবরণ॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈআ চিন্তা চিন্তি মহাসয়।
ধিরে ২ চলি গেলা আপনার পুরএ॥
পুরে প্রবেসিআ তবে পুরজন স্থানে।
সে সব কহিলা বসি সভা বিদ্যমানে॥
শুনি কুলাহল করিলা নারিগণ।
হাছন হুছন বোলি করএি কান্দন॥
সাহা তামাছের চরণ প্রসাদে।
তাহান আজ্ঞাএ তবে কহএ হামিদে॥
মুক্তোল হুছন এক কিতাব আছিল।
বাঙ্গালা করিতে তবে তান আজ্ঞা হৈল॥
প্রচার

(৩৫ পৃষ্ঠার পাঠ)

করিলু মুই রচিআ পয়ার।
সংগ্রাম হুছন নাম রাখিলু ইহার॥
তবেত মুমিনপতি পুরজন সনে।
কোফের পথে পদ দিআ চলিলা তখনে॥
ভাই ২ পাত্র মিত্র দাসদাসি জতি।

সে সবের আঘে কিছু করঞি মিনতি॥
আজি দুঃখে দুঃখি হৈআ মকে জেই চায়।
পরলোকে বাবা আলি তাহান সহায়॥
মর কার্য করে যেই মরে করে দয়া।
পরলোকে পাইব সেই নবি পদে ছায়া॥
দাস দাসি আদি জত সব পুরজন।
অন্য বির বিনে দুঃখ পাইঞি অনুক্ষন॥
রছুলকে দেখি জেই হইব আমার।
জিবন্তে মরনে আমি সহায় তাহার॥

[শেষ পৃষ্ঠার (১০২) পাঠ]
সত্য রনে জয়-বিজয় সর্ব্বথা॥
মুগরিবি বাছিআ দিলেক দুই ......।
... ... সমরে॥
ছিপেরের উপরে দিল কনকের চাকি।
হাথে তুলি দুইরে দিল ... ...॥
... ... শুন মাঝে তুমি দুইজন আঘে।
আজি গিয়া রণে জুঝ জেন জুঝে বাঘে॥
বাঘের সমান মর তুমি দুইজন।
ইআ ইমাম সাই মাম ... ...॥

ইতি থানেদার নয়াব শ্রী জবর দস্ত খাঁ ... ...
শ্রী মিঙ্গা সুলতান ... ... পুর মৌজে রাজনপুর
হক মালিক শ্রী দুস্ত মং লিখিতং ... ... শ্রী আছে খাঁ
ফতিদায় .. .. রোজ দুসম্বে লেখন স্থান
শ্রী সেকজামান মীরটঙ্গি ইতি সন ১১৪৭ সাল।

গ্রন্থপঞ্জী

[লেখকের নামানুসারে]

ক. মূল গ্রন্থ এবং পাণ্ডুলিপি

আবদুল বারী : কারবালা। মাইজ্‌দি, নোয়াখালী, অগ্রহায়ণ ১৩১৯।

আবদুল মুনায়েম : পঞ্চশহীদ কাব্য। মুনশী মওলা এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। ১ম সংস্করণ, ১৯১৯ ; কলিকাতা।

আজীজুল হাকিম : মরুসেনা। প্রকাশক : আবদুল হামিদ মিঞা, খানপুর, ঢাকা ১৩৪০ (১৯৩৩ ইং)

আবুল মাআ'লী মুহম্মদ হামিদ আলী : কাসেমবধ কাব্য। কলিকাতা ১৩১১।

ঐ : জয়নলোদ্ধার কাব্য। কলিকাতা ১ম সংস্করণ ১৩১৪।

আহমদ শরীফ সম্পাদিত : লায়লী মজনু। ঢাকার বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৭।

ইসহাক উদ্দীন : দাস্তান শহীদে কারবালা। হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৫৮।

কাযী আমীমুল হক : ছহি বড় জঙ্গে কারবালা। হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৫৮।

কায়কোবাদ : মহরম শরীফ। ঢাকা ইউনিভার্সেল প্রেস, ১৩৫৬।

জনাব আলী : শহীদে কারবালা। সত্য নারায়ণ প্রেস, কলিকাতা, ১০ম সংস্করণ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

ঐ : শহীদে কারবালা। সিদ্দিকিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

জাফর : শহীদে কারবালা। (কলমী পুঁথি)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত, পুঁথির ক্রমিক নং ৪৫৯।

তসের আলী : জারী সঙ্কলন। নিউ এজ পাবলিকেশনস্, ঢাকা, ১ম মুদ্রণ, ১৯৫৮।

ফকীর মুহম্মদ : ছহি বড় সোনাভান। হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৪।

মীর মনোহর : হানিফার লড়াই। (পাণ্ডুলিপি) রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে (বাংলা বিভাগ) সংরক্ষিত।

মুহম্মদ খান : কাশিমের লড়াই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, পুঁথি নং ২১৭-২১৮ (যুক্ত বাঁধাই)।

ঐ : কাশিমের যুদ্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি, পুঁথি নং ৪৬৪।

ঐ : কেয়ামতনামা। পূর্বোক্ত, পুঁথির নং ৩০৩, ৩৩৭, ৩৫১, ৫০১, ৫২৬।

মুহম্মদ ইবরাহীম : শহীদের খুন। ১ম সংস্করণ, বাং ১৩৪০, কলিকাতা।

মুহম্মদ খান : মোহাম্মদ হানিফার লড়াই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি। পুঁথি নং ২৮৬, ৬১৯, ৬১২, ৫৪৮, ২০২, ১২৩, ১২৪, ২৫, ৬৮৬, ২২০ক, ৬১৯, ১৭৫, ১০১, ৯৩।

মুহম্মদ খান : মোক্তাল হোসেন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি। পুঁথি নং ২২৩, ২২৪, ৪৩০, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯, ৩৮০, ৬০৪, ৬৪০, ৬৪৩।

মুহম্মদ ইয়াকুব : জঙ্গনামা। (আরবী পাণ্ডুলিপি) ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত। পুঁথি নং ৬৫৩।

ঐ : জঙ্গনামা। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কর্তৃক সংগৃহীত আরবী কলমী পুঁথি।

মীর মুশার্‌রফ হুসৈন : বিষাদ-সিন্ধু। প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

মীর রহমত আলী : মুহর্রম কাব্য। ৯ম সংস্করণ, বাং ১৩৫৬, ঢাকা।

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ : ছহি বড় সোনাভান। কলিকাতা, প্রকাশিত বাং ১৩৩০ (?)।

শৈখ মুহম্মদ ইয়াকুব : ছহি বড় জঙ্গনামা। মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ওসমানিয়া বুক লাইব্রেরী, কলিকাতা, বাংলা ১৩৬০।

শৈখ ফয়জুল্লাহ্ : জয়নবের চৌতিশা। বাংলা একাডেমী পত্রিকায় (ঢাকা) প্রকাশিত, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

সাদ আলী ও আবদুল ওহাব : শহীদে কারবালা। আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ঢাকা, প্রকাশের তারিখ নাই।

সৈয়দ হামজা : হাতেম তাই। হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ইং ১৯৫৫।

সৈয়দ ইসমাইল হুসৈন সিরাজী : মহাশিক্ষা (পাণ্ডুলিপি)। সিরাজগঞ্জের বাণীকুঞ্জে সংরক্ষিত।

হামীদুল্লাহ্ খান, খানবাহাদুর : গুলজার-ই-শাহাদৎ। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্ কর্তৃক সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি।

হায়াৎ মাহ্মূদ : জারী জঙ্গনামা (পাণ্ডুলিপি)। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে (রাজশাহী) সংরক্ষিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কর্তৃক প্রদত্ত পুঁথি।

ঐ : জারী জঙ্গনামা। (পাণ্ডুলিপি)। দিনাজপুর নাজিম উদ্দীন হলে সংরক্ষিত পুঁথি।

ঐ : জারী জঙ্গনামা (পাণ্ডুলিপি)। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের সংগৃহীত পুঁথি।

ঐ : জারী জঙ্গনামা (ছাপানো পুঁথি)। ঢাকা ৮।১ নং বাবুর বাজার হইতে প্রকাশিত। তারিখ নাই।

হামিদ : সংগ্রাম হুসন (পাণ্ডুলিপি)। বাঙ্লা একাডেমী কর্তৃক সংগৃহীত।

খ. ইতিহাস ও সমালোচনা

আলী আহ্‌মদ: বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ। ১ম ভাগ, বাং ১৩৫৪।

আহ্‌মদ শরীফ (সম্পাদিত): পুঁথি পরিচিতি। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম মুদ্রণ, ১৯৫৮।

আহ্‌মদ ইব্‌ন 'উসমান আল্ জাহাবী: তারীখুল ইসলাম, ২য় খণ্ড, প্রকাশিত: মক্‌তাবাতুল কুদসী, হিঃ ১৩৬৭।

আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম (সম্পাদিত): কাব্য মালঞ্চ। ১ম সংস্করণ ১৯৪৫, নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা।

আল্লামা শিব্‌লী নোমানী: মোআজেনায়ে আনীস ওয়া দবীর। লক্ষ্ণৌ, ১৯২১।

আগা মুহম্মদ বাকের: তারিখ-ই-নজম ও নসরে উরদূ। লাহোর, ১৯৪৫।

আবদুল হালিম সারার: তারিখ-ই-ইসলাম, ২য় খণ্ড, উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ১৯২৫।

আহ্‌মদ হুসৈন অনূদিত: ইবনে খলদুন। ২য় খণ্ড, ১৯১০ এবং ৫ম খণ্ড ১৯০২ এলাহাবাদ।

আবুল কালাম আজাদ, মওলানা: ইনসানিয়াত মউত কে দরওয়াজা পর। বাংলা অনুবাদ: মুহি উদ্দীন খান—জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ, হেজাজ প্রেস, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৯।

ঐ : শাহাদতে হুসৈন। লাহোর, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৭।

আতাউর রহমান সিদ্দিকী: তাজকিরা-ই-বাহাদুরানে ইসলাম (উরদূ তর্জমা) প্রকাশিত ১৩৪২ হিজরী, লাহোর। (মূল: আল্লামা সিউতি: তারিখুল খুলাফা)

আবদুল আজিজ মহাদ্দিস দেহ্‌লবী: তোওফায়ে এসনা আসারিয়া। (উরদূ তর্জমা: আয়নায়ে মজাহাবে ইমামিয়া—লেখক অজ্ঞাত। শেখ ইলাহী বকস কর্তৃক কাশ্মীরি

বাজার, লাহোর হইতে প্রকাশিত। ১৯২৯ খ্রীঃ, রফিকে আম প্রেস, লাহোর।)

আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর : বাংলার লোক সাহিত্য। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ১৯৫৭, কলিকাতা বুক হাউজ, কলিকাতা।

ইব্‌ন আছীর : তারিখে ইব্‌ন আছীর। ৩য় খণ্ড, প্রকাশিত মাত্‌বাতুল আজহারিয়া প্রেস, মিশর, ১৩০১ হিঃ।

এজাজুর রহমান : জয়নব। লাহোর, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৮।

ওবায়দুল বিসমিল্ অমৃতসরী : সওয়ানে উমরি হযরত আলী ইব্‌ন আবুতালিব। ২য় সংস্করণ ১৩১৭ হিঃ, লাহোর। (মূল : আল্লামা বাদাখশী : নজলুল আবরার)

কাজী আকরম হুসৈন : ইসলামের ইতিহাস। ৯ম সংস্করণ, কলিকাতা, তারিখ নাই।

কাজী আবদুল ওদুদ : শাশ্বত বঙ্গ। ১ম সংস্করণ ১৩৫৮ বাং, কলিকাতা।

খাজা হাসান নিজামী : মুহর্রমনামা। প্রকাশিত ১৩৫৮ হিঃ, দিল্লী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্।

খাজা হাসান নিজামী : ইয়াযীদ নামা। প্রকাশিত ১৯২২ ইং, দিল্লী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্।

দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। অষ্টম সংস্করণ, ১৩৫৬ কলিকাতা।

নগেন্দ্র নাথ বসু (সঙ্কলিত) : বিশ্বকোষ। ৭ম ভাগ (১৩০৩) এবং ১৪শ ভাগ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা।

নাসির উদ্দীন হাশিমী : ইউরোপ মে দাকিনী মকতুতাত। ১৯৩০ ইং,

ঐ : দাকিন মে উরদূ। লাহোর, ১৯৫২।

নিজামী বদায়ুনী (সম্পাদিত) : আনিস ও দবীর কি পাঁচ মর্সীয়াওকা মজমুয়া। নিজামী প্রেস, ১৯৩৩ জুন।

নিরঞ্জন চক্রবর্তী : উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য। ১ম সংস্করণ ১৮৮০ শকাব্দ, কলিকাতা।

পঞ্চানন মণ্ডল, ডক্টর (সম্পাদিত): পুঁথি পরিচয় (২য় খণ্ড)। শান্তিনিকেতন, বিদ্যাভবন, বিশ্ব ভারতী ১৩৬৪।

পাকিস্তান পাবলিকেশনস্: বাঙ্গালা পুঁথি সাহিত্য। ঢাকা ১ম সংস্করণ ১৯৫৫।

বিনয় ঘোষ: বাদশাহী আমল (Travels in the Mughal Empire—1656-1668. A. D.—অবলম্বনে) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ১ম সংস্করণ ১৩৬৩, কলিকাতা।

ঐ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। ১৩৬৩ বাং, কলিকাতা।

মঈনুদ্দীন নদ্‌ভী: খুলাফায়ে রাশেদীন। আজমগড়, ১৯১৮।

মীর্যা মুহম্মদ আশকারী (অনূদিত): তারীখ-ই-আদবে উরদূ। নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ ১৯২৯ (মূল: Rambabu Saksena: History of Urdu Literature)

মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর: মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য। পাকিস্তান পাবলিকেশনস্, ১৯৫৭, ঢাকা।

ঐ : পূর্বপাকিস্তানে ইসলাম। পুনর্মুদ্রিত ১৯৪৮, আদিল ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ: আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা ১৯৩৫।

মুহম্মদ একরাম (সম্পাদিত): পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। পাকিস্তান পাবলিকেশনস্, ঢাকা, বাং ১৩৫৪।

মুহম্মদ ইয়াহিয়া তাল্‌হা: সিয়ারুল মুসন্নিফিন। আলমগীর ইলেকট্রিক প্রেস, লাহোর, ১৯৪৮।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্‌সান: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৫৬।

মুহম্মদ বরকতুল্লাহ: কারবালা। ঢাকা, ১৯৫৭।

মুহম্মদ আবদুল খালেক: কায়কোবাদের আত্মচরিত (ইংরেজী অনুবাদ)

মযহারুল ইসলাম, ডক্টর : কবি হেয়াত মামুদ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬১।

ম্যাকাঞ্জি ওয়ালেস : তারীখ-ই-উরদূ। লক্ষ্নৌ, ১৮৯৩।

যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য : বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। বুক সোসাইটি, কলিকাতা বাং ১৩৫৬।

রওশন ইজদানী : মোমেনশাহীর লোক সাহিত্য। বাংলা একাডেমী (ঢাকা) কর্তৃক প্রকাশিত, বাং ১৩৬৪।

লাল মোহন বিদ্যানিধি, পণ্ডিত : কাব্য-নির্ণয়। কলিকাতা, বাং ১৩৫৪।

শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য, ডক্টর : ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ। কলিকাতা, ১৯৫৬।

সৈয়দ মুহম্মদ : আরবাবে নাসির-ই-উরদূ। হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৩৭।

সামসুদ্দৌলা শাহ্ নওয়াজ খান, নওয়াব : মাসিরুল ওমরা, ৩য় খণ্ড। সম্পাদিত : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলিকাতা ১৮৯১।

সৈয়দ আবদুল গনি ওরফে হামিদ মীর : তাজকিরা-ই-নবাব নরসত জঙ্গ বাহাদুর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত উরদু পাণ্ডুলিপি (কাজিম উদ্দীন সিদ্দিকী কর্তৃক সংগৃহীত।)

সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের কালক্রম। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা ৬, প্রকাশিত ১৯৫৮।

সুকুমার সেন, ডক্টর : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৪৮।

ঐ : ইসলামি বাংলা সাহিত্য। বর্ধমান সাহিত্য সভা কর্তৃক প্রকাশিত, বাং ১৩৫৮।

সুধীর কুমার দাশগুপ্ত, ডক্টর : কাব্যালোক, ১ম খণ্ড। বীণা লাইব্রেরী, কলিকাতা, বাং ১৩৫২।

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, ডক্টর : উরদূ সাহিত্যের ইতিহাস। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, সাধনা প্রেস, ১৯৬২, কলিকাতা ১২।

ঐ : পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সংস্করণ, ১৩৬০, কলিকাতা।

হামিদ হাসান কাদ্‌রী : দাস্তানে তারীখে উরদূ। সিন্ধু সেণ্ট জন্‌স কলেজ, আগ্রা, ১৯৪৯।

হাকিম হাবিবুর রহমান : আসুদগান-ই-ঢাকা। ঢাকা, ১৯৪৬।

ঐ : ঢাকা আজসে পচাশ বরছ পহ্‌লে। লাহোর, ১৯৪৯।

Ali Ahmed Khan : Mirat-i-Ahamadi (tr. James Bird : History of Gujrat, London, 1835)

Ameer Ali Syed : The Spirit of Islam, 5th Edition, 1949, London.

Do : A short History of the Saracens, London, Reprinted 1934.

Arnold, Sir T. W. : The Preaching of Islam. London, Westminster, 1896.

Brown, E. G. : A Literary History of Persia – Vol. IV- Cambridge University Press 1930, 1953.

Do : Do, Vol. I, London 1902, Reprinted in 1929. Cambridge University Press, Cambridge.

Brooks, T. Archibold : Islam : A short Study. Simla, Thacker Spink & Co. 1911.

Beale, Thomas William : The Oriental Biographical Dictionary. edited by--Asiatic Society of Bengal, 1881.

Blumhardt J. F. : Catalogue of the Hindi, Punjabi & Hindustani Mss. in the library of the British Museum, 1899.

Chatterjee, Suniti Kumar, Dr. : Origin and Development of Bengali Language (Part-I) Calcutta, University Press-1926.

Dani, Ahmed Hossain, Dr. : Dacca-Ramna, Dacca, 1956.

Dey, Susil Kumar, Dr. : History of Bengali Literature in the 19th Century (1800-1825). Calcutta University, 1919.

Damaut, H. : Birsalatosh-Suhada (Eng. tran.) Published in J. A. S. B-1874, (Original-Mohammad Sattery)

Elphinstone : History of India, London-1866.

Elliot, H. M. & Dowson, S. : The History of India as told by Its own Historian, 8 Vols. (London)-1867-79.

F. Karim, Moulana : The Ideal world Prophet – Ajmeri Printing Works, Dacca 1955.

Gibb, H A. R. & Krammers ed. : Shorter Encyclopaedia of Islam, E. J. Brill. Leiden. 1953.

Gladwin, F. (translated): Aynee-Akbary— Vol. 11, Part 11, Published by the Indian Publication Society Ltd, Calcutta— 1783.

Ghose, J. C.: Bengali Literature, Oxford University Press, 1948.

Govt. Publication: Catalogue of the Arabic & Persian Mss. in the Oriental Public Library of Bankipure, vol. 111, 1912, Calcutta,

Hughes, T. P.: Dictionary of Islam, London— 1885,

Houtsma, M. TH, Wensinck, A. J. etc ed: Encyclopædia of Islam Vol. IV-1934 & Vol. III-1936 (Leiden Late E. J. Brill Ltd.)

Hastings, James: Encyclopædia of Religion & Ethics, Vol. XI-1920 & vol. XII-1921.

Hitti P. K.: History of the Arabs, London, Revised in 1951.

Hafiz Md. Khan Shirani ed.: Mahometanism, Published in Lahore-1954.

Hunter, W. W.: The Indian Musalmans, Reprinted from Third Edition-1945. The Comrade Publishers, Calcutta.

Hamadani Basir Ahmed, Sayyed: Ali the Man (Bk-I)-Ist. edition-1935.

Iswari Prosad: The life & time of Humayun, Orient Longman-Ist. Publication-1955.

Khuda Bakhsh, Syed : The Arab Civilization-2nd. edition-1943.

Do : A History of the Islamic Peoples, C. U.-1914.

Lammens, H : Islam : Beliefs & institutions. Trans. from French by Sir E. Denison Ross (London) Ist edition. Published-1929.

Lane Poole, S. : The Mohamedan Dynasties. Paul Gaulhner—13, rue Jacob, Paris-1925.

Lyall, Charles James : Ancient Arabian Poetry, London, 1930.

Lewis Pelly, Colonel Sir ; The Miracle Play of Hasan & Hussain Vol. II-London, 1879. (Collected from oral Tradition.)

Long, J : A Descriptive catalogue of Bengali Works. Calcutta—1855.

Mirza Md. Hadi : Nur Allah Shustari, Shahid Thalith. Lucknow, 1925 (Urdu compiled)

Mohammad Ali Maulana : The Religion of Islam. Ripon Printing Press, Bull Road, Lahore—1950

Do : Early Caliphate-Lahore, Ist Edition. 1932

Mrs. Meer Hasan Ali : Observations on the Musalmans of India-Vol. II (London)—1832

Muir, W : The Caliphate-2nd. Edition (London) Smith & Elder Co.—1891, 3rd. Edition

1898, 15, Waterloo Place and Revised edition, Edinburgh : John Grant, 31 George IV Bridge—1915.

Marsman, John Clark : History of India, Part I- 4th Edition, Serampore—1868.

Nazmul Ghani : Madhahib-ul-Islam. Newal Kishore Press, Lucknow, 1924

Nicholson, R. A. : Literary History of the Arabs. Cambridge University, 1930

Ockley, S : History of the Saracens. 5th Edition, London—1848

O' Leary : Arabic Thoughts and its place in History. Revised Edition, 1939

Perceval, Caussin de : 3 Vols., Paris, 1847-48.

Sprenger, A : Catalogue of the Arabic, Persian & Hindustani Mss. of the libraries of the kings of Oudh. Vol. I—1854.

Saksena, Rambabu : A History of the Urdu Literature, Allahabad, 1940

Do : European & Indo European Poets of Urdu & Persian. Lucknow—1941.

Sarkar, Sir Jadunath ed : History of Bengal Vol II, D. U. —1948

Do : A short History of Aurangzib (1618-1707), Calcutta 1930.

Smith, V. A. : The Oxford History of India, 2nd. Edition—1923.

Do : Akbar the Great Mughal (1542-1605) Oxford, 2nd. Edition, Revised 3rd. impression—1926

Steingass : A comprehensive Persian English Dictionary—1930

Titus, M, T. : The Religious Quest of India, Oxford University Press—1930

Taylor : Topography & Statistics of Dacca, Calcutta 1840

Wellhausen, J. : The Arab kingdom and its fall, ed. Margaret Graham Weir. University of Calcutta—1927

Wright, H, N. : Catalogue of the coins in the Indian Museum, Calcutta. Vol. III, Oxford—1908

গ. সাময়িক পত্র (বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ।)

আল্ ইসলাম : আষাঢ় ও শ্রাবণ, বাংলা ১৩২২।

ইমরোজ : ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল: মর্সীয়া কাব্য এবং মীর আনীস ও মীর্যা দবীর। ৫ম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা একত্রে, ১৩৬০ ইং।

দিলরুবা : আহমদ শরীফ : দোভাষী পুঁথির ভাষা। ৭ম বর্ষ, আজাদী সংখ্যা, শ্রাবণ, বাংলা ১৩৬২।

নব্যভারত : ধর্মানন্দ মহাভারতী। চেহলম, ১৯শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩০৮ সাল।

নওরোজ : মুহম্মদ মেহরাব আলী : কাজী হায়াৎ মাহমুদ ও তাঁর কাব্য পরিচয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৬৩, ১৫শ বর্ষ।

প্রবাসী : রামপ্রাণ গুপ্ত : মুহর্রম, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুণ, বাং ১৩১২।

পল্লীবার্তা : সুনীল কুমার রায় চৌধুরী, রংপুরের প্রাচীন কবি কাজী হায়াৎ মাহমুদের কাব্য পরিচয়, ২৩শে মার্চ ১৯৫৯।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা : আহমদ শরীফ : জয়নবের চৌতিশা। ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

ঐ : আবদুল কাদির : মতীয়ুর রহমান খানের সাহিত্য সাধনা। ভাদ্র-আশ্বিন, বাং ১৩৬৪।

ঐ : ডক্টর গোলাম সাকলায়েন : সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী। ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, বাং ১৩৬৪।

বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ : সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, বাং ১৩২০।

বিচিত্রা : আবদুল কাদির : বাংলার পল্লীগানে বৌদ্ধ সাধনা ও ইসলাম। ২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র বাং ১৩৩৫।

সওগাত : আবদুল কাদির : ফাল্গুন সংখ্যা, বাং ১৩৪৭।

ঐ : ডক্টর গোলাম সাকলায়েন : একজন অজ্ঞাতনামা মুসলমান কবি—মোহাম্মদ ইবরাহীম। অগ্রহায়ণ, বাং ১৩৬৬।

মাহেনও : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান। সঙ্কলন, ১৯৫২।

মাহেনও : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উরদূ ও হিন্দী প্রভাব। ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬৭।

ঐ : ঐ, পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তি, পৌষ, ১৩৬৩—৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

ঐ : মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন : সারী ও জারীগান, মাঘ, ১৩৬৬, ১১শ বর্ষ—১০ম সংখ্যা।

মাসিক মোহাম্মদী : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি গরীবুল্লাহ্, ১৩৬১ কার্তিক, ২৬শ বর্ষ।

ঐ : ডক্টর আহমদ হুসৈন দানী : বঙ্গদেশের সহিত মুসলমানদের যোগাযোগ। ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯।

মাসিক মোহাম্মদী : এ. কিউ. এম. আদম উদ্দীন : পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস, আশ্বিন ১৩৫২।

ঐ : ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান : হামিদ আলীর কাসিম-বধ কাব্য, ৩০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫।

সাহিত্য পত্রিকা : ডক্টর আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলেবকাওলী, ১ম বর্ষ-২য় সংখ্যা, বাং ১৩৬৪।

ঐ : আহমদ শরীফ– সত্যকলি বিবাদ সংবাদ, বর্ষা সংখ্যা, বাং ১৩৬৬।

ঐ : ডক্টর আনিসুজ্জামান—সায়ের ফকীর গরীবুল্লাহ্, বর্ষা সংখ্যা, বাংলা ১৩৬৫।

সাহিত্য প্রকাশিকা : সুখময় মুখোপাধ্যায়—বাংলার নাথ সাহিত্য : সাহিত্য প্রকাশিকা, ১ম খণ্ড, বিদ্যাভবন, বিশ্ব-ভারতী—১ম প্রকাশ বাং ১৩৬২, আশ্বিন।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : আরবী, ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর। ৪র্থ সংখ্যা বাং ১৩২৪।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : রাজেন্দ্র কুমার মজুমদার : ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা : ৪র্থ সংখ্যা, বাং ১৩১২।

ঐ : মোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য। নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা, ২য় সংখ্যা, বাং ১৩১২।

হিন্দুস্থানী একাডেমী কা তে মাহি রেসালা : সগীর আহমদ জান - 'সওদা' জুলাই, ৩য় সংখ্যা, ১৯৩৩।

রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক) : শ্যামাপদ বাগচী : কাজী হায়াৎ মাহমুদের কাব্য পরিচয়। ১৭শ ভাগ, ১—৪র্থ সংখ্যা রংপুর, বাং ১৩৩৭।

Islamic Culture : Dr. S. M. Imamuddin—A visit to the Rampur State Library - 1947, Vol. XXI.

Do : Dr. N. B. Roy - The victories of Sultan Firoz Shah of Tughluq Dynesty (Eng tr. of Futuhat i-Shahi), 1941-Vol. XV.

Do : M. Mujib - The Urdu Language, 1937, Vol. XI

Islamic Literature : S. Lane Poole, Glimses of Islam—1956-Oct.

Do : Husein Rofe - The struggle of leadership in the early Caliphate—1957-May.

The Indian Antiquary : Charles E. Gover : The Muharrum —A Shiah House of Mourning in Madras —June 7, 1872.

Journal of the Royal Asiatic Society : Mir Shamat Ali—Takwiyatul Islam - article XIV, Vol XIII, London - 1852

Do : Sir Wolseley Haig--The Religion of Ahmad Shah Bahmani—1924.

Journal of the Royal Asiatic Society : W. Ivanow A forgotten branch of Ismailies – 1938.

Do : F. W. Buckler—A New interpretation of Akbar's Infallibility Decree 1924.

Pakistan Quarterly : M. S. Khan—Glimses of Jahangir nagar – Vol III. No--2, Summer, 1958,

The Proceeding of All Pakistan Conference : (First Session held at Karachi, 1951.) "Early Muslim Contact with Bengal" by Dr. A. H. Dani.

Statesman : S. Khuda Bakhsh—The tragedy of Karbala—the fact & legend—29th, May 1931.

—

নাম-সূচী

অতিরিক্ত

পৃঃ ১৮৪—২১১ :

মুঘল আমলের মর্সীয়া সাহিত্যের আর একজন কবি আবদুস্ সোবহান। তিনি 'ছহি বড় ইমান সাগর অর্থাৎ ইমাম সাগর' রচনা করেন। এই কাব্যের একখানি কলমী পুঁথি এবং একখানি ছাপানো পুঁথি* পাওয়া গিয়াছে। কলমী পুঁথির লিপিকর রওশন মাহ্মূদ। লিপিকাল ১২৪১ সাল (১৮৩৪ খ্রীঃ); পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮০; পুঁথিখানি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সংরক্ষিত আছে। ছাপানো পুঁথিখানি ১২৬৭ সালের পুঁথি অবলম্বনে ১৩৩৭ সালে মুদ্রিত হয়। মূলতঃ মুসলমানদের নিত্যকৃত বিষয়ের বর্ণনাচ্ছলে মুসলমানী কথা ও কাহিনীর বিবরণ এ-কাব্যের উপজীব্য; বিশেষতঃ কারবালায় ইমাম হাসান-হুসৈনের শাহাদতের বয়ান ইহাতে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কাব্যের ভাষা সাধু বাংলা। কবি আবদুস্ সোবহান সম্ভবতঃ প্রাচীন ঘোড়াঘাট (বর্তমানে দিনাজপুরের অধীন) এলাকার কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার আত্মবিবরণী হইতে মনে হয়, তাঁহার আবির্ভাব-কাল অষ্টাদশ শতাব্দী। 'ইমাম সাগর' কাব্যখানি উত্তরবঙ্গের লোকের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল।

পৃঃ ৪২৮-৪৫৪ :

পাশ্চাত্ত্য প্রভাবজাত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মর্সীয়া সাহিত্যের অপর একখানি গ্রন্থ 'কারবালা তরঙ্গ কাব্য'* (প্রকাশিত ১৩১৩ সাল)। ইহার প্রণেতা মুন্শী খয়রাতুল্লাহ্। কবির আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ ১৮৪২ খ্রীঃ

---

* পুস্তক দুইখানি জনাব আবূ তালিবের সৌজন্যে পড়িবার সুযোগ পাই। — লেখক।

হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি খুলনা জেলার কাইজদিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সমগ্র কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহাতে কারবালায় ইমাম হুসেনের শাহাদতের বর্ণনা আছে। ছন্দে কবির বেশ দখল ছিল। কবির রচনার নমুনা :

"হে প্রাণবল্লভ তব পদে
করি এ মিনতি ক্ষণেক দাঁড়াও প্রভো,
অন্তঃপুরে গিয়া ক'রে আসি রণ-সাজ
অসি-চর্ম ধরি যাবে সঙ্গে নাথ তব
এ চিরসঙ্গিনী রণ-উন্মাদিনী সাজ
ছায়ারূপে রবে পার্শ্বে হেরিবে সমর
রঙ্গে প্রতিহিংসা সাধি পুত্র হা রিপুরে।
বলে বলিয়সী, জানি সমর কৌশল।
ভয় নাই তব, রক্ষিতে হবে না, পৃষ্ঠ
রক্ষিবে এ দাসী পুত্রহন্তা মহা অরি
করি ধ্বংস শোণিতে রঞ্জিব তীক্ষ্ণ অসি।"

(কারবালা তরঙ্গ কাব্য, হোসেনের প্রতি শহরবানুর উক্তি, পৃঃ ৮৪)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধপাঠ
(ভূমিকা) ॥৹	১৪	জ্যেষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ
১৫	৩	আশর্যের	আশ্চর্যের
৩২	১৩	রচনার	রচনায়
৩৯	(পাদটীকা) ৩	Val-I	Vol-I
৮৬	(পাদটীকা) ৫	1885	1835
১০৮	২	অধঃস্তন	অধস্তন
১৪০	৫	উরসে	ঔরসে
১৬৫	১৭	অভুত্থান	অভ্যুত্থান
২১৮	১১	সপূর্ণ	সম্পূর্ণ
২৩৭	১৩	শহীদের কারবালা	শহীদে কারবালা
২৯৯	(পাদটীকা) ৪	পৃঃ ৪৭	পৃঃ ৬৭
২৯৯	১৪	প্রমাণ করিয়াছেন।	প্রমাণ করিয়াছেন। (ক)
৩০৩	৬	নজমুল আবরার	নজলুল্ আবৃরার
৩১৩	১৪	সম্পর্কে	সম্পর্কে
৩২৩	১৮	কাব্য চিত্রিত	কাব্যে চিত্রিত
৩৮৪	১০	১৭২৩	১৭১৭
৪৪৯	১১	৮ম সর্গে	৯ম সর্গে
৪৬৮	(পাদটীকা) ৯	রসরসিকতাপূর্ণ	রঙ্গরসিকতাপূর্ণ
(পরিশিষ্ট) ১৬৶৹	২৩	বাহির বলা করা হয়	বাহির করা হয়

—